গল্প ভারতী

উৎসব অনুষ্ঠানে অপরিহার্য

লিলির

তিনটি জনপ্রিয় বিস্কুট

থিন এরারুট • কার্নিভ্যাল • ক্রীম ক্র্যাকার

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-৪

আকাশে বাতাসে একি কলরব
একি জয়গান ভুবন ঘিরে।

এই জয়গান শারদীয় উৎসবের—

আর ঘরে ঘরে এই উৎসবকে
মধুর করে তুলবে
আমাদের রেশমী সুতার বর্ণোজ্জ্বল
শাড়ী—বিচিত্র অভিনব অনুপম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেস সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে মেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইণ্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

**দক্ষিণ কলিকাতা**

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—প্রপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; মোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

**মধ্য কলিকাতা**

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১১৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; মেশানা—লিওসে ষ্ট্রীট; ইস্টারেন্স ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; রেন্স ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চৈনটনিয়া)।

**উত্তর কলিকাতা**

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ নিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

**বড়বাজার**

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিষ্ণুমাহত্ত, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; মল্লী ব্রাদার্স; কালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল জাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ নরায়াম কেত্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; রেন্স হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টীলাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

## পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮০

# গল্প-ভারতী

## পূজার অর্ঘ্য

আশ্বিন, ১৩৭১

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :

*শ্রীকালিদাস নাগ*

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য চার টাকা

---

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মহিলাদের
আধুনিক
পোষাকের জন্য

ফোন : ৪৬-২৮৩৩

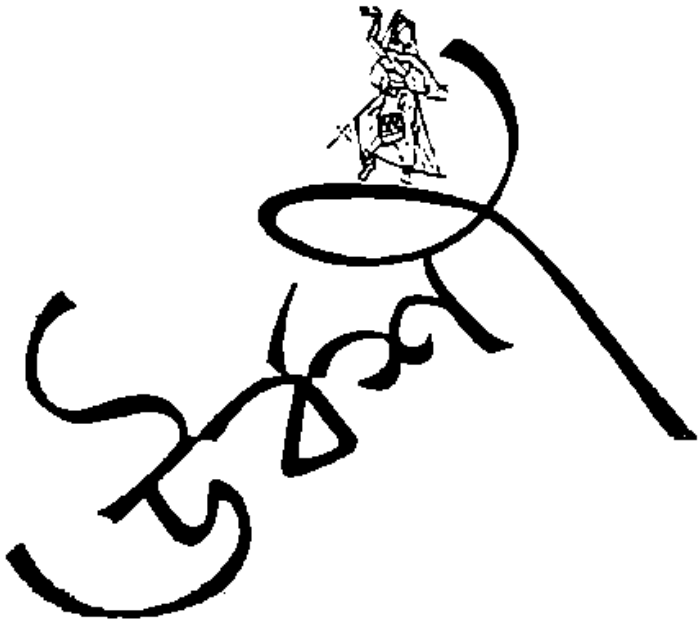

২৮/২, গড়িয়াহাটা রোড,
কলিকাতা-১৯
গোল পার্কের নিকট

# এই সংখ্যায়


| | | |
|---|---|---|
| শক্তি-সাধনা | —শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ | |
| আগমনী | —শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| দণ্ডিত | —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | |
| গল্পের সন্ধানে | —প্র. না. বি. | |
| মিষ্টার ডি'কষ্টা | —শ্রীবিমল মিত্র | |
| বিপরীত | —শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র | |
| বন্ধু | —শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় | |
| হেজাল | —শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী | |
| কবিকথা | —শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| বিবেক | —শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু | |
| গুরুশিষ্য কথামৃত | —শ্রীপরিমল গোস্বামী | |
| মাতাল হাওয়া | —শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু | |
| বায়ু বয় পুবদিকে ( উপন্যাস ) | —শ্রীমতী বাণী রায় | |
| অন্ধকারের মুখ | —শ্রীরমনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় | ১১৯ |



শারদীয় উৎসবে

গ্লুকোজ, ল্যাকটোস, সল্ট,
রোজ ক্রীম, অরেঞ্জ ক্রীম,
পাইন-আপেল ক্রীম,
পাফ্ ক্রীম

বিস্কুট

পরম উপাদেয়

পাতিয়ালা বিস্কুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স প্রাইভেট লিঃ রাজপুরা-পাঞ্জাব

কলিকাতা অফিস : ১০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৯৩৭৩

# এই সংখ্যায়


| | | |
|---|---|---|
| শিল্পচিন্তার নূতন যুগ | —ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় | ১৪২ |
| কান্না | —শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী | ১৪৫ |
| যৌবন | —শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত | ১৫৫ |
| পিতৃদেবের ছবি | —শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি | ১৬৩ |
| পুতুল | —শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ১৬৭ |
| লঘুনেঘ | —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ১৭৫ |
| দেশান্তর | —শ্রীসুবোধ বসু | ১৮৩ |
| বিসর্জন | —শ্রীমানবেন্দ্র পাল | ১৯১ |
| বনপাশ টাউন থেকে | —শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য | ১৯৬ |
| একই স্কুলের ছাত্র | —শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী | ২০১ |
| নামবার সিঁড়ি ( উপন্যাস ) | —শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ২০৭ |
| রং বদলায় | —শ্রীআশীষ গুপ্ত | ২৬১ |
| ওমিক্রা | —শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত | ২৬৮ |
| পূর্ব ফাল্গুনী ( উপন্যাস ) | —শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২৭১ |



আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এসে
ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত
৫৭, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

শাখা
২৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

৫, ৬, হেয়ার স্ট্রীট.
ফোন: ২৩-১৮৯১
১৪, হেয়ার স্ট্রীট
(মহিলা বিভাগ)

# এই সংখ্যায়


| | |
|---|---|
| মোহমুক্তি | —ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায় |
| দুঃস্বপ্নের রাত | —শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় |
| একটি তরুণ আর কার্নেশান ফুল | —শ্রীগৌরীশংকর দে |
| মেয়েদের কথা | —শ্রীমতী শান্তা দেবী |
| হাউসফুল ( নাটক ) | —শ্রীবিজন ভট্টাচার্য |
| হারানো আয়না | —শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় |

—বিশ্ব উৎসব—

| | |
|---|---|
| বৃক্ষরোপণ উৎসব | —শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষ |
| বসন্তোৎসব | —শ্রীমতী নীলিমা দে |
| বর্ষ উৎসব | —শ্রীনীলাদ্রি সোম |
| ভারতের উৎসব | —শ্রীমতী হিরণ্ময়ী বসু |
| প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপান | —ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র |
| উৎসবের বিনে মিশর | —শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক |
| গ্রীসের উৎসব | —ডক্টর উমা দেবী |
| বিচিত্র উৎসবের দেশ ব্রিটেন | —শ্রীনির্মলেন্দু মাল্লা |
| উৎসবের দেশ—ফ্রান্স | —শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| জার্মানীর উৎসব | —শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু |
| আমেরিকার উৎসব | —শ্রীগোপাল ভৌমিক |
| আমেরিকার লোক উৎসব | |
| উৎসব-রাজ শান্তিনিকেতনে | —ডক্টর কালিদাস নাগ |



ভারতীয় তাঁতশিল্পে হায়দ্রাবাদের অবদান—

পুতুল—পাটোলা—গাদোয়াল শাড়ী ও বিভিন্ন প্রকারের ব্লাউসপীস্।

বর্ণে—বৈচিত্রে ও কারুশিল্পে অনন্য।

অতিরিক্ত বিশেষ রিবেট : প্রতি টাকায় পাঁচ নয়া পয়সা

( ৫ই হইতে ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত দেওয়া হবে )

**হাইকো ফেব্রিক্স এম্পোরিয়াম**

( দি হায়দ্রাবাদ হ্যাণ্ডলুম উইভার্স সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ )

১২৪, গ্রে ষ্ট্রীট, ( শোভাবাজার জংশন ) কলিকাতা-৫

৭৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

# হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

# শক্তি-সাধনা

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ঋগ্বেদের ঋষিগণ পরমাত্মার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইয়া যেমন এক অখণ্ড অদ্বিতীয় বিভু বিরাট্, স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাকে বিশ্বধারিণী বিশ্বজননী মহাশক্তিরূপে চিন্তা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ—নিম্নে ধরণী—দিগন্তে দিগন্তে যেন উভয়ের এক অপূর্ব মিলন। ঋষিগণ চাহিয়া চাহিয়া বিভোর হইলেন! দ্যাবা-পৃথিবী যেন অর্দ্ধনারীশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে—অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র মণ্ডলীকে নিজ অঙ্কমধ্যে স্থান দিয়া শান্ত ধীর স্থির নীরব হইয়া অবস্থিত এই দ্যাবা-পৃথিবী।

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্"—'দ্যৌঃ' পিতা ও 'পৃথিবী' মাতা, আর তাহার নাভি—অন্তরিক্ষ আমার বন্ধু। ঋষিচিত্তে যে ভাব প্রবাহ উন্মেষিত হইয়াছিল—তাহাই শক্তি-সাধনার প্রাথমিক সোপান।

এই বিশ্বসৃষ্টি আকস্মিক না কেহ ইহার নির্মাতা আছেন—'কো অদ্ধাবেদ—কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে—কোথা হইতে এই সৃষ্টি সম্ভবপর হইল? এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে অম্ভৃণ মুনি-কন্যা আম্ভৃণী দেবী আত্ম সংবিৎ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা'—আমিই বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া এই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি স্বয়ং পরমাত্মারূপে নিজরূপ উপলব্ধি করিয়া এই দৃশ্যমান বিশ্বের মূলে যে এক মহাশক্তি বিরাজমানা আছেন—ইহাই উপদেশ করিলেন। জীব যে অন্নগ্রহণ করে, সে আমারই ভোক্তৃ-শক্তি, জীব দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, শ্রবণ করে—এই সমস্তই আমার শক্তি, যাহারা আমাকে এভাবে না জানে—তাহারা হীনভাবাপন্ন হয় এজন্য হে শ্রুত! (ধীমন্) আমার উপদেশ শ্রবণ কর। আমিই রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও বসুগণকে ধারণ করিয়া আছি—আমিই ক্ষত্রের শক্তি।

এই ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থকে সপ্তশতী সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ব্যখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।

জগতে যত কিছু সৎ বা অসৎ বস্তু আছে—সে সকলের যে শক্তি—তাহাই তোমার স্বরূপ।

এই মহাশক্তি চেতন ও অচেতন উভয়ে পরিব্যাপ্ত। জগতের যাহা কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়—তাহার মূলে আছে—এই শক্তির লীলা। এই জন্য তাঁহাকে প্রকৃতি বা মায়া নামেও অভিহিত করা হয়। আবার তিনি চিতিশক্তি—চৈতন্যময়ী মহতী সত্তা।

তাই ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের উদ্দেশ্যই ছিল—এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালিকা মহা শক্তির উপাসনা। তাঁহার প্রসাদে ফলমূল শস্য সলিল—তাঁহারই প্রসাদে ঘর সোনার বাছুর—তাঁহারই প্রসাদে—দধি দুগ্ধ ঘৃত, তাঁহারই প্রসাদে—জীবনীশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। এ সকলের বিনিয়োগ হইত—এক যজ্ঞকার্যে। ঋষিগণ তন্ময় হইয়া সর্বস্ব অর্পণ করিয়া বাঙ্‌মনঃকায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। সেই যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার প্রীতি সাধনই প্রকৃষ্ট উপাসনা—ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। যজ্ঞের দেবতা ছিলেন—কোনটি পুরুষাকৃতি, কোনটি বা স্ত্রীরূপিণী। তাঁহারা সকলকেই যজ্ঞে আহ্বান করিতেন—

'ইন্দ্রাণীমূপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে।

এই যজ্ঞে ইন্দ্রাণীকে ও বরুণানীকে আমাদের কল্যাণের জন্য আহ্বান করিতেছি; আর অগ্নায়ীকে সোমপানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

ইন্দ্রশক্তি, বরুণশক্তি ও অগ্নিদেবের শক্তিকে কখনও খণ্ডিতভাবে কখনও বা অখণ্ডিত মহাশক্তি রূপে যজ্ঞে আবাহিত করা হইত। কখনও উষা, কখনও বা সরস্বতী, ইলা, ভারতী, ওষধি, অপ্, রাকা, সিনীবালী—এইরূপ নানা ভাবে, কখনও প্রকৃতিরূপে, কখনও বিদ্যারূপে, কখনও ওষধি, কখনও জলদেবীরূপে যজ্ঞে পূজিতা হইতেন। এই খণ্ড শক্তিগুলি সাধকের চিত্ত অধিকার অনুসারে, ভাব ও ধ্যান ধারণাভেদে প্রকাশিত হইতেন। যজ্ঞান্তে উপনিষৎ পাঠের সময়ে উপাসিত দেবতার স্বরূপ সাধকচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি যে সর্বভাবে অনুস্যূত—কি পুরুষ, কি নারী, কি বৃদ্ধ কি শিশু—সর্ববিধ জীব প্রকাশের মধ্যেই যে তাঁহার সত্তা—ইহা কীর্তিত হইত।

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ।'

এই বেদার্থকে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী সাধক গাহিলেন—"কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি—কখনও নিরাকার হে।" পরমাত্মার যে সর্বরূপতা—সর্বব্যাপকতা শক্তিবাদে তাহাও সমাদরে স্বীকৃত। বেদে ও পুরাণে সেই একই সিদ্ধান্ত উদ্ঘোষিত হইয়াছে। তাই সপ্তশতীতে কথিত হইয়াছে—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এ জগতে আমি এক এবং অদ্বিতীয়া আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। শক্তি সাধনার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে—বিশ্বসংসারকে অলীক স্বপ্নবৎ ধ্যান করিবার প্রয়োজন নাই। মহাশক্তির একাংশ—এই বিশ্বসংসার, অপর অংশ হইল—চিন্ময়। জড়সত্তা ও চেতনসত্তা—পরস্পর

এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া আছে। ও অখণ্ডরূপের প্রতীক হইল—দ্যাবা-পৃথিবী, উমামহেশ্বর বা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—বা যুগলমূর্ত্তি। অখণ্ডরূপের পূর্ণ উপলব্ধি হইল শক্তি সাধনার চরম ফল। 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে 'সর্ব' শব্দে জড় ও চেতন উভয়কে গ্রহণ না করিলে সর্বপদের অর্থকে সঙ্কুচিত করিতে হয়। বেদবাক্যের এরূপ অর্থসঙ্কোচ করা অনুচিত। সুতরাং বিশ্বের যাহা কিছু পদার্থ—জড় বা চেতন, সমস্তই সেই ব্রহ্ম। যাঁহারা মায়াবাদী—তাঁহাদের সহিত এইটুকু পার্থক্য—মায়া ব্রহ্ম শক্তি, মায়া কোনও বস্তু নহে, তাহা সৎও নহে অসৎও নহে, কিন্তু শক্তিবানীর মায়া বস্তুর এবং শক্তি স্বয়ং মায়া বা মহামায়া। এই মায়াবাদী জড়জগৎকে ধরিয়া আছেন। মায়া মিথ্যা আর জড়জগৎ উৎপাদ বিনাশশীল। এই জড়জগৎই সঞ্জিত হইয়া সংসার নামে পরিচিত। মা আদরে মায়াপ্রপিণী হইয়া এই সংসারকে রক্ষা করিতেছেন। বিষয়ের ভোগ যে ক্ষণস্থায়ী—ইহা মানব বুঝিতে পারিলেও ভোগের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। নানাবিধ দুঃখ ক্লেশের মধ্যে বহুবিধ ভোগসম্ভোগের মধ্যে—অভাব অনটনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে থাকিয়াও মানব যে বৈরাগ্যযুক্ত হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিও মহামায়ার আবর্ত্তে এবং মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়, তাহার কারণ এই মহামায়ার প্রভাব, এই প্রভাবই সংসারকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

কোনও সময়ে দেবর্ষি নারদ ভাবিয়াছিলেন, যে আমি মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি। সে কথা তিনি বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীহরি বলিয়াছিলেন—দেখ নারদ! দেবদেহই হউক আর নরদেহই হউক, যে কোন দেহ ধারণ করিলেই মায়ার বশীভূত হইতে হইবে। যোগী বা যোগী, জিতেন্দ্রিয় বা সর্বজ্ঞ—কেহই সহসা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

নারদ যেন অন্তরে একটু অভিমান পোষণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নারায়ণ, আমি মায়াকে দেখিতে ইচ্ছা করি। মায়ার বল কিরূপ? কোন্ আধারে তাহার অবস্থান কৃপা করিয়া আমাকে বলুন এবং মায়ার স্বরূপ আমাকে দেখাইয়া দিন। নারায়ণ বলিলেন,—তিনি ত্রিগুণময়ী, তিনি অখিল আধারে বিরাজমানা। অথচ তিনি সর্বজ্ঞা, তিনি অজ্ঞেয় ও দুরতিক্রমা। যদি তোমার মায়াকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, তোমাকে সেই দুর্জ্ঞেয় মায়াকে দেখাইব।

নারায়ণের স্মরণমাত্রে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উভয়ে গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন; বায়ু বেগে গরুড় উড়িতে উড়িতে কান্যকুব্জদেশের সন্নিকটে আসিতেই নারায়ণের ইচ্ছায় গরুড় থামিলেন।

দেখা গেল—এক অপূর্ব সরোবর। হংস কারণ্ডব চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। শ্বেত রক্ত কমল বিকশিত হইয়া আছে—মধুকরগণ গুঞ্জরণ করিতেছে। উভয়ে গরুড় হইতে অবতরণ করিলেন।

নারায়ণ বলিলেন—নারদ! কি সুন্দর রমণীয় সরোবর, এখানে তুমি স্নান কর। স্নান করিয়া আমরা কান্যকুব্জপুরীতে গমন করিব। তোমার বীণা ও মৃগচর্মের উত্তরীয় আমার হাতে দাও। নারদ তাহাই করিলেন এবং সরোবরে স্নান করিলেন। স্নান হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে—সরোবর তীরে নারায়ণ নাই, গরুড়ও নাই। নিজেও পুরুষরূপ হারাইয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী বহুভূষণে ভূষিতা নারীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

এমন সময়ে তাঁহার নয়নপথে পড়িল এক সুন্দর নরপতি। রথারূঢ় যুবা, অবগত পরিচ্ছদ—দেখিতে পরম সুন্দর। রাজাও সেই রমণীয় নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি কল্যাণি! তুমি কাহার কন্যা? দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব বা নাগ কোন্ কুলে তোমার জন্ম? তুমি বিবাহিতা না অবিবাহিতা?

রাজার নাম তালধ্বজ, কান্যকুব্জের রাজা। সেই নারী তখন বলিলেন—জানি না—আমি কাহার কন্যা বা কেনই বা এখানে আসিলাম। আপনি ধর্মজ্ঞ, আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন। আমার আর কেহ নাই। রাজা সেই কথা শুনিয়া ভৃত্যবর্গকে এই নারীকে শিবিকা-যোগে রাজধানীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলে শুভদিনে অগ্নি সাক্ষী করিয়া রাজা সেই নারীকে বিবাহ করিলেন। তালধ্বজ তাঁহাকে পট্টমহিষী করিলেন এবং নাম হইল সৌভাগ্যসুন্দরী। ইহার গর্ভে একে একে আঠারটি সন্তান হইল। পুত্র-পৌত্র দ্বারা সংসার পূর্ণ হইল।

কিছুকাল পরে সুরেশ হইতে এক বিপক্ষ রাজা আসিয়া কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিল। পুত্র-পৌত্র সহ তালধ্বজ তুমুল সংগ্রাম করিলেন। সেই যুদ্ধে পুত্র পৌত্রাদি সকলে নিহত হইল—রাজা গৃহে ফিরিলেন। তখন সৌভাগ্যসুন্দরী বিলাপ করিতে রণক্ষেত্রে আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই সমরাঙ্গনে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন এখন এস মা এই সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হও। সৌভাগ্যসুন্দরী স্নান করিয়া উঠিতেই দেখিলেন যে তিনি আর নারী নহেন পুনরায় পূর্বের নারদদেহ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন—নারদ! তুমি না নারীকে জয় করিয়াছিলে? এখন বুঝিলে কি—মায়ার কত বড় প্রতাপ? নারদ বিস্মিতবিমূঢ়ভাবে মহামায়াকে প্রণাম করিলেন।

এইজন্য সপ্তশতীতে বলা হইয়াছে যে,—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

এই মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলে তাঁহার সাধনা দ্বারা এই মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

---

# আগমনী

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাবিধৌত ধরিত্রী, স্বর্ণোজ্জ্বলচিত্রিত শিশির ব্যাপিত শস্যক্ষেত্র, ঝুমু ঝুমু ধ্বনি মুখরিত ননদী, শ্যামল বনরাজি, শারদীয় নীলাকাশ, মহামায়ার শুভাগমন প্রতীক্ষারত। সূর্য কিরণ প্রতিভাত শিউলি, বাসন্তী সৌরভান্বিত, বিহগ কূজন মুখরিত এক শারদ প্রাতে আগমনীর শুভ শঙ্খ বেজে ওঠে। মহামায়ার ধরণীতে আবির্ভাব আত্মস্বরূপে। বৎসরান্তে মাতা যেমন আকুল হৃদয়ে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করেন—বাঙালীও সেই আকুলতা নিয়েই মহামায়ার আগমন প্রতীক্ষা করে। অন্তরের এই আকুলতাই ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র—তন্ত্র, মন্ত্র কৃচ্ছ্র সাধন নয়। এ দেশে, আরাধ্য দেবতা মানবধর্মীরূপে কল্পিত, পূজা ও পূজারীর মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত। আগমনের রেশে ভক্ত, গীতিকারগণ, তাঁদের প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস গানের মধ্যে নিবেদন করেছেন। তাঁরা দেবীকে সম্পূর্ণ আপনার জন রূপে বর্ণনা করেছেন। পূজারী যেমন প্রতিদিন নব প্রস্ফুটিত কুসুমে পূজা নৈবেদ্য রচনা করেন, সাধক-গীতিকার তেমনি নিত্য নতুন গীতিকুসুম নিবেদন দ্বারা পূজা সার্থক করে তোলেন।

একদিন বাংলার শান্তশ্রী পল্লীতে পল্লীতে কৃত্রিমতা রহিত প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত সরল, সহজ মানুষ আগমনী গান গেয়ে দেবীকে বরণ করত। আবার পূজার শেষ দিনে বিজয়ার করুণ সুর সকলের অন্তর ব্যথাতুর করে তুলত। আগমনী গান বাংলার সংগীতের এক অমূল্য সম্পদ। এক সময় এই গান বাঙলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কথা, ভাব ও সুরের অপরূপ সমাবেশ অন্যান্য গানে বিরল। সাধক কমলাকান্ত রচিত দুইটি আগমনী গান স্বরলিপিসহ প্রদত্ত হল।

## আগমনী গান

মিশ্র-ঝিঁঝিট—একতাল

গিরি। প্রাণগৌরী আন আমার
উমা বিধুমুখী না দেখি বারেক
এ-ঘর লাগে অন্ধকার।
আজি কাল করি দিবস যাবে
প্রাণের উমারে আনিবে কবে
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে
এ কি তব অবিচার॥

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত
কেঁদোনাকো রাণি হও গো শান্ত
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত
তুমি কি ভাব আমার।

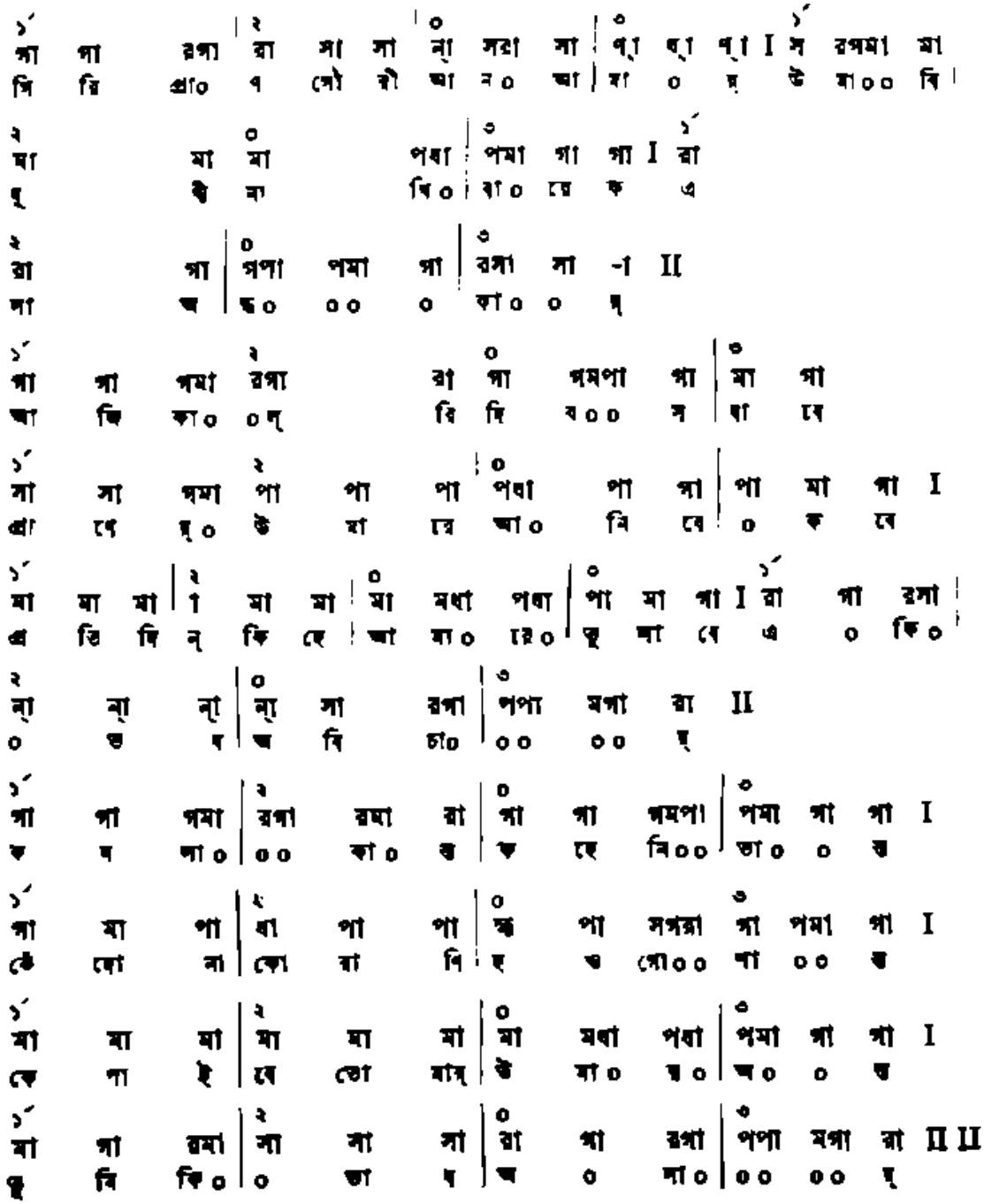

## আগমনী গান

**মিশ্র-বিতাল—সাপতাল**

কবে যাবে গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে॥
কমলাকান্তের বাণী শুন হে শিবর মণি
কেমনে সহিব এত মায়ের প্রাণেতে॥

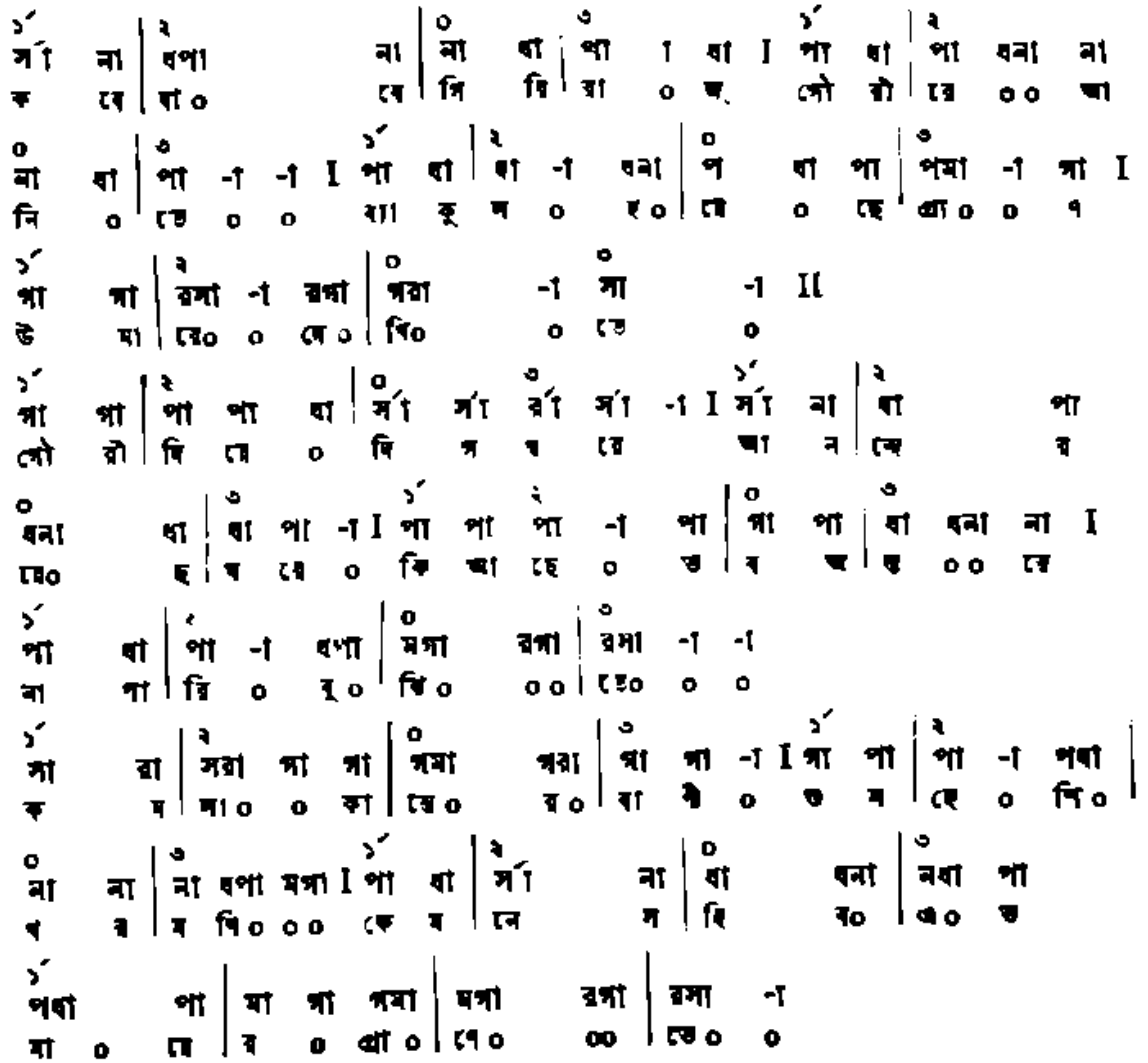

# সঙ্গীত মুখর পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরে উঠুক

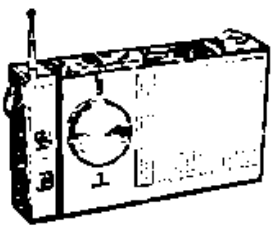

৬ ট্রানজিস্টার, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড-এর একটি সুন্দরী সেরেনেড বেতারযন্ত্র।
মডেল বিসি ৮১৪
মূল্য ৩৭৫৲

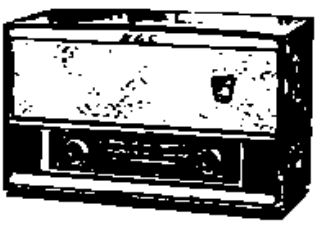

একটি ৬ ভালভ, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড ও ম্যাজিক আই-যুক্ত বেতারযন্ত্র। দৃষ্টিনন্দন কাঠের ক্যাবিনেট।
মডেল বিসি ৫৩৫৪ এসি মেইন্সের জন্য।
মডেল বিসি ৬৩৫৩ ডিসি/এসি মেইন্সের জন্য। মূল্য ৪১৫৲

৮ ভালভ, ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত একটি হাই-ফাইডেলিটি সমৃদ্ধ বেতারযন্ত্র—ইলেকট্রনিক ট্রিউনিং ইণ্ডিকেটরের সহ দৃষ্টি-নন্দন কাঠনিমেট বসানো। মডেল বিসি ৫৮৫১ এসি এন বিসি ৬৮৫৩ এসি/ডিসি মেইন্সের জন্য।
মূল্য ৮৮৫৲

একটি ৪ ভালভ, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত বেতারযন্ত্র—চমৎকার ডিজাইন। প্লাস্টিক ক্যাবিনেট।
মডেল বিসি ৫১৫১ এসি মেইন্সের জন্য।
বিসি ৬১৫৩ ডিসি/এসি মেইন্সের জন্য।
মূল্য ৩২৫৲ মডেল বিসি ১১৫৫ ৪ ভালভ, ড্রাইভোমেটিক টোনোর জন্য। মূল্য ৩৩৫৲

উপরোক্ত মূল্য উৎপাদন শুল্ক সমেত। স্থানীয় কর অতিরিক্ত লাগবে।

বেতারযন্ত্রগুলি নিকটতম বিক্রেতাকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন।

G.E.C.

সেরা রেডিও

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের জন্য পরিবেশক

**রেডিও ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড**

সুরমা হাউস, ৩, মাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২৩-২০১৪

GEC/G/724

# দণ্ডিত

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়ে-যাত্রাদলের মেয়ে।

'কী নাম তোমার?' সেক্রেটারিকে না দিয়ে প্রবেশ নিজেই সাক্ষীর কর্মটা পূরণ করছিল।

'ময়না দাসী।'

'স্বামীর নাম কী' চোখ তুলে তাকাল প্রবেশ।

'বিয়ে হয়নি।'

'বাবার নাম!'

'জানিনা।'

যা খুশি বলে দিতে পারত। কিন্তু মেয়েটা সরল ও সৎ। সত্য কথা বলতে সঙ্কোচ করেনি।

এই যাত্রাদলকে বিবাদীপক্ষ বায়না করেছিল। শো-র পর বাকি টাকা দেয়নি তার জন্যে নালিশ। চুক্তির টাকা আর ক্ষতিপূরণ।

বিবাদী পক্ষ বলছে যে-শো করবার চুক্তি ছিল তা না করে অন্য শো করেছে। সে একটা নেহাৎ বাজে বই। দর্শকের দল ছি ছি করেছে। তা ছাড়া কথা ছিল ময়না হিরোয়িন হবে, তা না হয়ে ও, ছোট পার্টে নেমেছে, দর্শকের দল খুশি হয়নি।

ময়না বলছে, যে বই করেছি তার সম্বন্ধেই চুক্তি ছিল আর আমি ছাড়া হিরোয়িন কে?

বিবাদীপক্ষের উকিল বললে, তার মানে উনি বলতে চান যে পার্টে উনি নামবেন সেইটেই হিরোয়িনের পার্ট। উনি ছাড়া দুনিয়ায় হিরোয়িন নেই। দেখতে তো কাকের মত, নাম রেখেছে ময়না!

সব দেখে-শুনে বিচার করে প্রবেশ ঠিক করল বাদীপক্ষের দাবি মাস-খরচা ডিক্রি দেবে। রায় লেখা হয়েছে, সই করে তারিখ বসানো শুধু বাকি।

তাহলে ময়না দাসীকে বাড়িতে একবার ডাকা

না-আসবার তো কোনো কারণ নেই।

বরং, আকর্ষণ আছে।

গলা খাটো করে আর্দালিকে বললে কথাটা। দেখো উকিল-টুকিল যেন জানতে না পায়।

গায়ে চাদর জড়িয়ে রাতের অন্ধকারে খিড়কির দরজা দিয়ে ভিতরে চলে এল ময়না।

চেয়ারে বসল। হেসে বলল, 'উকিল আমাকে কাক বলেছিল—'

'উকিলে কী না বলে!' হাসি ফিরিয়ে দিল প্রবেশ।

না, টাকা-পয়সা নেয়নি কিছু ময়না। প্রবেশ দিতে চাইলেও, না। বুঝে নিল তার এত বড় জেদের কারণ। সে নির্ঘাৎ জিতবে। অনেক তদবিরের মত এও এক তদবির। চূড়ান্ত তদবির।

খুশি মনেই ফিরে গেল মমতা।

আর, বলাই বাহুল্য, ডিক্রি পেয়ে গেল।

রায়ে সই দেবার সময় একটু বুক দুরুদুরু করছিল বুঝি প্রবেশের। কিন্তু, না, ভয় কী, কে কী বলবে! বাদীপক্ষ তো কিছুই বলবে না, তার অনুকূলে রায়! বিবাদীপক্ষ বলতে পারে। জানলে পরে তো বলবে! বলুক—তারপক্ষ কী না বলে! আর, বেশ তো, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, কী যায়-আসে! জাজমেন্টটা প্রবেশ ব্যাক-ডেট করে দিয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর মমতা যদি তার বাড়িতে আসে তাতে অপরাধ কী! মমতা তো না-আসবার মত মেয়ে নয়। সেটা তো তখন 'অনেস্ট ডিল'।

প্রবেশ আরো একবার উলটেছিল পামেলার বেলায়।

একটা এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। যেন একটা ফুটন্ত রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

বুড়ো বাপ মরার একদিন আগে তার সমস্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দানপত্র করে দিয়েছে প্রথম পক্ষের ছেলে ও মেয়েকে বঞ্চিত করে। পামেলা সেই প্রথম পক্ষের মেয়ে। সে আর তার বড় ভাই দুয়ে মিলে নালিশ করেছে দানপত্র রদ করতে। তাদের বক্তব্য দলিল স্বেচ্ছাকৃত নয়, অবৈধ প্রতিপত্তি দ্বারা দূষিত। সমস্তই বিমাতার কারসাজি।

তিনদিন ধরে পামেলার জবানবন্দি ও জেরা হয়েছিল। প্রবেশ একটা চেয়ার দিতে চেয়েছিল, নেয়নি। দাঁড়িয়ে থেকেই লড়াই করলে।

শুধু একবারটি ভেঙে পড়তে চেয়েছিল যখন বিবাদী তার অতীতে চেয়েছিল ছুরি চালাতে।

প্রবেশের দিকে চেয়ে ফুঁসে উঠল পামেলা; 'স্যার, ইজ দিস রেলিভেন্ট?'

প্রবেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'হাঁ, প্রাসঙ্গিক নিশ্চয়ই।'

বিবাদী বিমাতা বলতে চাইছে পামেলার অতীত একেবারে অনাঘ্রাত নয়। বিয়ের আগে কলকাতায় থাকতে যখন সে অফিসে কাজ করত তখন সে সন্ধের দিকে কোনো কোনো চিহ্নিত বাড়িতে 'নাইস টাইমের' বিজ্ঞাপন হয়ে টাকা কামাত। বিয়ে করে সে পুরো ওলটাতে চেয়েছিল, কিন্তু পুরোনো দিনের গন্ধ তখনো লেগে ছিল বলে তার স্বামী তাকে বরদাস্ত করতে পারেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত মিথ্যে। গর্জে উঠল পামেলা।

প্রবেশ তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। সত্য হলেই বা ক্ষতি কী। সত্য সব সময়েই সুন্দর। পাপ যদি সত্য হয় তবে পাপও সুন্দর।

সব দেখে-শুনে প্রবেশ বিচার করে দেখল দলিলটাকে হটানো যায় না, মামলা ডিসমিস না করে উপায় নেই।

রায় লেখা হয়ে গিয়েছে, সই করতে বাকি, প্রবেশের মনে হল, পামেলাকে ডাকলে কি আসে?

যদি না আসে তো না এল, বয়ে গেল। মামলা তো এমনিতেই ডিসমিস।

কিন্তু যদি সত্যি আসে? যদি সত্যি অনুকূল হয়?

যদি আসে তো এই আশ্বাসেই আসবে যে মামলা কলপ্রসূ হবে। দলিল নাকচ হবে। ওয়ারিশি মিলবে পামেলার। তারপর কি আর মামলা ডিসমিস করা ঠিক হবে? ফের নতুন করে উলটো সুরে লিখতে হবে না জাজমেন্ট? কী বলবে তার বিবেক? কী ভাববে পামেলা?

যা হবার হবে, একবার তো আসুক বাড়িতে।

এবার আর্দালি নয়, বাদী পক্ষের তরফকারকে ডাকল প্রবেশ।

গলা খাটো করে বললে, 'একটা স্পেশাল পয়েন্ট ক্লিয়ার করে নেবার জন্যে পায়েলাকে একটু দরকার। খবর দিতে পারেন?

'যা, পারি না খুব পারি।

'আমার কোয়ার্টারে।'

লোকটা যেন কী রকম করে তাকাল। পয়েন্ট ক্লিয়ার করবার জন্যে উকিলকে দরকার নয় পক্ষকে দরকার, তাও এবেলাসে খাসকামরায় নয়, একেবারে বাড়িতে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে কি? না কি একেবারে—

'কখন আসতে বলব? সন্ধের দিকে?'

'যখন তার খুশি।'

তারই জন্যে তো রায়টা পালটানো চলবে না। ডিসমিস ডিসমিসই থাকবে। পায়েলা দেখবে তার ধানও গেছে দুকড়িও গেছে। কিন্তু কিছুই সে করতে পারবে না।

কী করবে সে? নালিশ করবে? কী বলে? তখন স্পষ্ট বলা যাবে হারপক্ষ অমনি যা-তা বলেই থাকে। সে যদি কোয়ার্টারে গিয়েছে বলে, তার এভিডেন্স নেই, বলা যাবে সে ঘুষ দিতে বা ইনফ্লুয়েন্স করতে গিয়েছিল। আর তার সঙ্গে যদি তেমন বন্ধুতাই হবে তবে মামলায় তাকে জিতিয়ে না দিয়ে হারিয়ে দেব কেন?

সুতরাং পায়েলা যা এখন বলছে সমস্ত অবিশ্বাস্য।

কিন্তু, আরো অবিশ্বাস্য, পায়েলা এল না। মামলা যে-ডিসমিস সে-ডিসমিসই থেকে গেল।

রায়টা খবরে শুনে যেতে পায়েলা এসেছিল কোর্টে। তার কালো হয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে তার বিধাতার তো ভালো লাগছিলই, প্রবেশেরও লাগছিল।

কিন্তু এবার—এবার কী?

এবার তো ডাকবার মতন নয়, এবার বুঝি নিজেরই যেতে হয় চুপি চুপি, হয়তো আঁধারে, অন্ধকারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে।

যা, রাত্রে কেন? দিনে, মধ্যদিনে যেতেই বা দোষ কী! অনায়াসে বলা যাবে যে লোকাল ইনস্পেকশান করতে এসেছি।

বলাবলিরই বা কী দরকার! সরল রেখার মত পরিচ্ছন্ন চলে গেলেই বা আটকায় কে?

অহীন্দ্র গুহ আসামী। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ। উঁচু ঘরের ছেলে। একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে কোয়ানিগিরি করে। বিয়ে করেছে। স্ত্রী জীবিত, মেয়ে আছে একটি।

মাঝারি আয়ের ছোট সংসারের নিরীহ নায়ক। ছাপোষা। দেখতে নিতান্ত ভালোমানুষ।

ডিফেন্স কী?

নির্দোষ।

'আর কিছু বলবেন?' প্রবেশ জিজ্ঞেস করল।

'বলব।'

আসামীর উকিল পর্যন্ত চমকে উঠল। সে কী! এমন তো কোনো কাহিনী নেই। নিম্ন আদালতে তদন্তের সময়ও তো কোনো বক্তব্য ছিল না। 'নির্দোষ' শুধু এই বলেই চুপ ছিল। দায়রার কেস ওপনিং-এর সময়ও কোনো গল্পের আভাস দেওয়া হয়নি। এখন হঠাৎ এই দুর্মতি কেন?

'বলুন।'

'খুনের সময়,' অহীন স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'আমি অন্যত্র ছিলাম।'

'ব্যস, এই? আর কিছু নয়?'

'অন্যত্র কোথায় ছিলাম তা বলছি।' সভা ভাবণের মত মুখ করল অহীন: 'ছিলাম একশো সতেরোর বি মন্দিরবাড়ি স্ট্রীটে, সরস্বতীর ঘরে।'

সর্বনাশ করেছে! আসামীর উকিল মাথায় হাত দিয়ে বসল। সর্বস্বান্তের মত মুখ করে তাকাল অহীনের দিকে। এ সব গল্প ফাঁদবার কী দরকার ছিল? প্রমাণের ভার সরকারের উপর সে তোমার দোষ প্রমাণ করুক। তুমি কেন মিছিমিছি তোমার নির্দোষিতা প্রমাণের ভার নাও? ছি ছি, বলা নেই কওয়া নেই, কারু সঙ্গে পরামর্শ করা নেই, এমন কেলেঙ্কারি কেউ করে বসে? নিজের পায়ে কুড়ুল মারে?

'সাক্ষী রেখেন?' প্রজেশ জিজ্ঞেস করল।

'রেখে।

'কে সাক্ষী?'

'সরস্বতী দাসী।'

'আর কেউ?'

'না।'

তখুনি সরস্বতী দাসীর নামে সমন বেরুল। মামলা মুলতুবি রইল। দেখা যাক সরস্বতী কী কতদূর সমর্থন করে আসামীকে।

প্রসিকিউশান কেসটা কী?

দুপুরবেলা প্রায় একটার সময় ব্যাঙ্কের সামনে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিল অহীন্দ্র গুহ। সে জানত তার বন্ধু শিবশঙ্কর তটচাজ মোটা চেক ভাঙাতে ভিতরে গিয়েছে। এ টাকা থেকে তার কারখানার কর্মচারীদের সে মাইনে দেবে।

ট্যাক্সি রেখে শিবশঙ্কর এগিয়ে যায়, ড্রাইভার বলে, ক্ল্যাগ ডাউন, লোক আছে। লোক কোথায়, পিছন তাকাতেই—কোথায় সে ঢাকা দিয়েছিল কে জানে—অহীন্দ্র বেরিয়ে এল। বললে, ওঠো, এ আমারই ট্যাক্সি, আমি তোমারই দিকে যাচ্ছি, তোমাকে তোমার কারখানায় অনায়াসে নামিয়ে দিতে পারব।

হাসতে-হাসতে, সরল বিশ্বাসে, শিবশঙ্কর উঠে বসে ট্যাক্সিতে। কতদূর আসতেই, দুপুর বলে রাস্তায় তখন লোক চলাচল কম, হঠাৎ রিভলভার বার করে শিবশঙ্করকে গুলি করে অহীন্দ্র। টাকার প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে। তাকে ট্যাক্সি থামাতে বলে। ট্যাক্সি ড্রাইভার ট্যাক্সি থামায়। ট্যাক্সি থামতেই অহীন্দ্র নেমে পড়ে। ট্যাক্সি ড্রাইভার পাছে রব তোলে বা ট্যাক্সি ছুটিয়ে পিছু নেয়, সেই পথ বন্ধ করবার জন্যে অহীন্দ্র

ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। পর-পর দুবার। তারপর পাশের গলি দিয়ে ছুটে পালায়। খুব কুলেছিল রাস্তার লোক, কিন্তু সেটা ঠিক ধর-ধর ছিল না, এখান দিয়ে গেল ওখান দিয়ে পালাল—এমনি একটা অনুতাপের সুর। তার মানেই পিছু নিতে দেরি হয়ে গিয়েছে। পেরিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে আততায়ী।

খুব কাছাকাছি থেকে নেরেছে বলে শিবশঙ্কর শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার, অভয়পদ বিশ্বাস, মরেনি। তার আঘাত গুরুতর কিন্তু হাসপাতালে মাস খানেকের উপর থেকে সে সেরে উঠেছে।

ঘটনার সাত দিন পরে পুলিশ অহীন্দ্রকে তার বাড়িতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের সন্ধানের গোপন সূত্র প্রকাশ করতে বাধ্য নয়, কী পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দেখ। দেখ তা অহীন্দ্রের অপরাধ নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত করতে যথেষ্ট কিনা।

মোটেই যথেষ্ট নয়—অহীন্দ্রের উকিল সরলীলাল ব্যানার্জি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ, আজ এ কী অদ্ভুত কথা বলে বসল অহীন্দ্র!

একমাত্র চাক্ষুষ প্রমাণ ট্যাক্সি-ড্রাইভার অভয়পদ। সে বলছে সে চিনেছে অহীনকে। এই সেই লোক যে রাস্তা থেকে তার ট্যাক্সি ধরেছিল। ব্যাঙ্কের সামনে এসে হাঁক করিয়েছিল। নেমে গিয়েছিল, পরে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বন্দুকে তুলে নিয়েছিল গাড়িতে। এই সেই লোক যে গুলি করেছে!

টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডেও অভয়পদ অহীনকে সনাক্ত করেছে।

এই একটা দুর্বল সাক্ষী, তাকেও সরলীলাল জেরায় কোণঠাসা করেছিল। কে ট্যাক্সি ধরে, তার মুখ আপনি মনে করে রাখেন না। পিছনের সিটে প্যাসেঞ্জার যদি পুরুষ ও তার সঙ্গে যদি একাকিনী স্ত্রীলোক না থাকে তবে ড্রাইভারের আয়নাতে তার প্যাসেঞ্জারকে লক্ষ্য করার কথা নয়। তাহলে কী করে সনাক্ত করছেন? যখন রিভলভার উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গাড়ি থামায় তখন? সেটা তো এক পলকের ব্যাপার। আপনি তখন গাড়ি থামাবেন, না, রিভলভারধারীকে দেখবেন? তারপর আর দেখলেন কখন? যেন গুলি ছুঁড়ল? তখন তো বেশ খানিকটা ঘুরে সরে গিয়েছে। তখন কি আপনি নিজে পালাবার কথা ভাববেন না লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন একদৃষ্টে? তাকিয়ে থাকলেও কি সে মুখ মুখস্ত থাকবে? শুনুন, মিথ্যে কথা বলবেন না। সন্দেহাতীত নিশ্চিত না হলে বলবেন না। ভগবানের অনন্ত দয়া যে বেঁচে গিয়েছেন, গুলিটা কেটাল হয়নি।

সুদীর্ঘ জেরা করেছে ড্রাইভারকে। শেষ পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে অভয়পদ বলে ফেলেছে, নাক মুখ চোখ অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে মনে করে রাখেনি, তবে সেই খুনেটা ডকের আসামীর মত দেখতে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনমরণ উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষের ভুল করা ভুল দেখা অস্বাভাবিক নয়—ভুল কার না হতে পারে! কিন্তু অভয়পদর অত সন্দেহে ভুল হয় না।

ব্যস, ওতেই হবে। অভয়পদের সাক্ষ্যের মধ্যে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। অভয়পদ একেবারে ষোল আনা নিঃসন্দেহ নয়। বিশও রিজনেবল ডাউট তাহলে হচ্ছে না।

আর সাক্ষী কে?

রাস্তার কতগুলো চলতি লোক। সেদব অনুমানের সাক্ষী। তাদের কথার কানাকড়িও দাম নেই।

আর ?

বিভলভারটা পাওয়া গিয়েছে অহীনের বাড়ির কাছের ডাস্টবিনের মধ্যে।

এ একটা প্রমাণ ? বাড়িতে বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেলে তা হলেও বরং কথা ছিল। ডাস্টবিনে কে কী ফেলবে তার দায়িত্ব হবে অহীনের ? তাছাড়াকাছি আরো তো কত বাড়ি আছে তাদেরও তো না।

আরেক প্রমাণ টাকা। মোট টাকা খোয়া গিয়েছে দশ হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে তিন হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা অহীনের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। অত টাকা অহীনের কাছে আসে কোত্থেকে ?

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে। অহীন রেস খেলে। না হয় ও টাকাটা ও দীর্ঘ দিন ধরে তিল-তিল করে জমিয়েছে। নোটে কি কোনো চিহ্ন আছে যে ও টাকাটা শিবশঙ্করের বলে সাব্যস্ত করতে হবে ? রেস তো টাকার কৈফিয়ৎটা গ্রাহ্য করবার মত নয়। তাহলে কী হয় ? তাহলেই কি ধরে নিতে হবে অহীন খুন করেছে ? একটা সন্দেহ হতে পারে—এই পর্যন্ত। কিন্তু সন্দেহই তো প্রমাণ নয়।

হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় অহীনের বিরুদ্ধে আছে। সেটা আর কিছুই নয়, দেখা যাচ্ছে খুনের দিন ও তার পরের দিন দুদিন তার অফিস থেকে ছুটি নেওয়া। ছুটি নেওয়া কেন ? ফর এন আর্জেন্ট পিস অফ বিজনেস। বিজনেসটার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি অহীন। তাই বলে বিজনেসটা খুন হবে তার কোনো মানে হয় না।

সাক্ষ্যপ্রমাণ তো এই। এর উপর কখনো কনভিকশান হয় ?

হ্যাঁ, জুরির খামখেয়ালের উপর বিচার নির্ভর করছে। এক ট্যাক্সিড্রাইভারকে বিশ্বাস করেই হয়তো দোষী বলবে। তার উপর ছুটিটার ব্যাখ্যা নেই সেটাও হয়তো জুরির মনে কাজ করবে। তাছাড়া অতগুলি টাকা !

তাই বলে সরস্বতীর ঘরে দিন কাটাবার ওজুহাত দেবার মানে কী ? ছুটি নিয়েছিল, দাঁতের ব্যথা থেকে শ্বশুরবাড়ি কত কিছু কারণ দেখানো যায়—একেবারে মন্দিরবাড়ি স্ট্রীটের সরস্বতী দাসীর কথা মনে পড়ে কেন ? এখন যদি সরস্বতীকে না পাওয়া যায় ? সে যদি পুলিশের ভয়ে সাক্ষী দিতে না আসে ?

এ একেবারে সখ করে দাড়িকাটে গলা বাড়ানো। একটা লোকের জীবন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, আরেকটা লোককে জখম করা হয়েছে, এতগুলি টাকা লুট করা হয়েছে, জুরিদের মেজাজ এমনিতেই ঘোরালো হয়ে আছে, যে-কোনো একজনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলেই তাদের শান্তি—সেখানে এতদূর জটিল অবস্থার মধ্যে আবার এই একটা নতুন উৎপাত কে সৃষ্টি করে !

'কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা নেই !' ভীষণ বিরক্ত হল সরসীলাল : 'আমি তোর উকিল আমাকে কনফিডেন্সে নিবিনে ? সরস্বতীর বাড়িতে দিন কাটানো যদি সত্যিও হয় তাহলে এখন, এই স্টেজে তা বলতে হবে নাকি ? সব সত্যই কি সব সময়ে বলতে হয় খুলে মেলে ? ছি ছি ছি, এখন স্বপ্নাতদলিলে ভুললে আমি করব কী !'

বাড়িতে অহীনের স্ত্রী নিভাননী একথা শুনে কাঁদতে বসল। ঘটনার সময়ে অহীন একটা পতিতার বাড়িতে ছিল এই ওজুহাতে সে যদি খালাস হয় তাহলেও সে লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে

পারবে না। সে একজন গণিকাসংঙ্ঘের স্ত্রী এ অপমান খুনের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। মোটর ডাকাতি করতে গিয়ে গুলি করে তাইকে খুন করেছে এর মধ্যে তবু খানিকটা গৌরব ছিল। ও-বালাদের থেকে এ-ছেলে অনেক মহান! ছি ছি, গণিকাপল্লীর কথা মুখ ফুটে কোর্টে বলতে তার বাধল না একটুও! অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ওর এই অফিসে বরকার। বেরালে মাথা কুটতে লাগল নিভাননী। ভগবান তার আগে আমায় কেন ফাঁসি হল না?

ঠিক যা ভয় করেছিল সরসীলাল। সরস্বতীকে পাওয়া গেল না। সমন পরওয়ারি হল। বাসিন্দেরা কেউ বললে, ও নামে কোনো মেয়ে নেই। আবার কেউ বলল, ছিল, উঠে গেছে।

'তা আমরা জানিনা।' সরকারী উকিল বললে, 'র‍্যালিবাই—অর্থাৎ ঘটনার সময় আসামী অন্যত্র ছিল এই ওজুহাত যখন আসামী তুলেছে তখন আসামীকেই তা প্রমাণ করতে হবে। বেশ তো, আসামী প্রমাণ করুক, নির্দিষ্ট সময়ে সে সরস্বতীর ঘরে ছিল, রয় খাচ্ছিল বা অন্য কিছু করছিল, সে খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে তা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে—'

'তাহলেও সে খুন করেছে প্রমাণ হবে না।' লাফিয়ে উঠল সরসীলাল।

'সেটা জুরি মহোদয়রা বিচার করে দেখবেন। দেখবেন র‍্যালিবাই চলে গেলে প্রসিকিউশানের কেসটা আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় কিনা। প্রমাণ আর কী! সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারাটাই প্রমাণিত হওয়া। কেন, কেন আপনারা ট্যাক্সি-ড্রাইভার অজয়পদ বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করবেন? প্রত্যক্ষ দিনের আলোয় তার ভুল হবার কারণ কী? ও কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবে? ওর নিজের মনে সন্দেহ থাকলে ও কেন আসামীকে জড়াবে? ওর কী স্বার্থ? সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব অবস্থা দেখুন—

সরকারী উকিল ছুটিয়ে আর্গুমেন্ট করল।

'র‍্যালিবাইটা প্রমাণ করা যায়নি বলে সরকার পক্ষ খুব তড়পাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ করা কি সহজ কথা? ও ধরনের স্ত্রীলোককে কি সমন দিয়ে ধরা যায়? এমনিতেই টাকা নিচ্ছে আর এ অবস্থায় বারবরদারি কত চাইবে তার লেখাজোখা নেই—'

'কোনো প্রমাণ নেই যে সরস্বতী টাকা পায়নি বলে আসছে না।' সরকারী উকিল বললে, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সরস্বতীর অস্তিত্বই নেই। সমস্ত র‍্যালিবাইটাই বানানো।'

'সেইটেই আপনারা বিচার করে দেখবেন।' সরসীলাল বললে তপ্তকণ্ঠে, 'বিচার করে দেখবেন একজন ছাপোষা কেরাণী, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত, এমন একটা জঘন্য কথা বানিয়ে বলবে কিনা। না কি কাহিনীটার মধ্যে সত্যিই সত্য আছে? নিখেঁ সুনায়ককে মানুষ বিপন্ন করতে পারে একমাত্র সত্যের খাতিরে। অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করা যাচ্ছে না বটে, কেননা এবেলার সরস্বতী ওবেলার চঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা দেখবেন, খুন বা ডাকাতি করার মতলব থাকলে কেউ আপিস থেকে ছুটি নেয় কিনা—'

সরসীলালও গলা কাটিয়ে আর্গুমেন্ট করল।

প্রসিকিউশান ও ডিফেন্স দুই পক্ষেরই সওয়াল—জবাব সারা, সেদিন জজ এবার চার্জ দেবে, জুরিরা টানটোন হয়ে বসেছে, এমন সময় একটা স্ত্রীলোক হাতে একটা দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত।

সরসীলাল বললে, 'এতক্ষণে সরস্বতী দাসী এসেছে।'

# গল্পের সন্ধানে

প্র. না. বি.

এই মাত্র সম্পাদক মশায় কয়েকখানা নোট পকেটে গুঁজে দিয়ে বের হ'য়ে গেলেন। আপত্তি করেছিলাম, তাঁর আপত্তি ; এবারে মাথায় গল্প আসছে না, মাপ করবেন। তিনি বলেছিলেন, বিলক্ষণ, আপনাদের মাথা নাড়া দিলে আস্ত উপন্যাস বেরিয়ে পড়ে, তায় কিনা একটা ছোট গল্প! বিস, কাগজ কলম নিয়ে ব'সে যান, আচ্ছা আমি চল্লাম, কালকে এই সময়ে লোক পাঠিয়ে দেবো।

এই বলে তিনি বের হ'য়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? সম্পাদকের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না ভেবে বার কয়েক মাথা ঝাড়া দিলাম, বেশ জোরেই, পাগড়ী থাকলে খ'সে পড়তো। কিন্তু উপন্যাস দূরে থাক, একটা ছোট গল্পও বের হল না। তবে দেখা যাচ্ছে যে সম্পাদকের কথাও সব সময়ে সত্য হয় না।

এবারে সত্য সত্যই মাথায় অসুখ, কলম কিছুই নাই। অথচ ওদিকে সম্পাদকীয় টাকা নিয়েছি। অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, জোর ক'রে পকেটে গুঁজে দেওয়া হ'য়েছে। তা হোক—তবু একই কথা। টাকার বিলম্ব নীতি অনুসারে ও আমার স্বেচ্ছাতেই গৃহীত। আবার যদিকতক মাথা ঝাড়া দিলাম, শেষ মুহূর্তে কিছু বের হলেও হতে পারে। গৃহিণী ঘরে ঢুকেছিলেন, বল্লেন, মাথা ধরেছে নাকি? মনে মনে বললাম, হুঁ, সম্পাদকে ধরেছে। তিনি বল্লেন, তাহলে যাও, একটু বাইরে ঘুরে এসো, হাওয়া লাগলে ছেড়ে যেতে পারে।

গৃহিণীর কথা শুনে মনে হ'ল, এ বোধ করি শাপে বর হ'ল, বাইরে একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। তখনি মনে পড়লো একটি বেদবাক্য। কলকাতার পথে টাকা ও গল্প ছড়ানো, কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা মাত্র। ভাবলাম পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ কলিযুগে বেদবাক্য ফলে কিনা কিম্বা কতটা ফলে কিম্বা কি ভাবে ফলে। সম্পাদকীয় পত্রপুট ভরাবার মতো এক অঞ্জলি ছোট গল্পের মাল মশলা মিল্লেও মিলতে পারে।

তখনি উঠে পড়লাম, সম্পাদকীয় মোট কখানা পকেট থেকে বের ক'রে মানিব্যাগে রাখলাম। দেখলাম মানিব্যাগের মধ্যে 'মানি' নাই আছে তাঁর পূর্ব লিখিত পত্রখানা, গল্পের পারিশ্রমিক নিয়ে যাচ্ছি, আপনার গল্প না পেলে এবারে পূজায় 'ধন-সারথি' প্রকাশিত হবে না মনে রাখবেন।

গৃহিণী চাবি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ডাকতে সাহস হল না, পাছে তিনি শুধু খোলা হাওয়ার উপরে ভরসা না করে আর কিছুর ব্যবস্থা করেন। দেরাজ খুলতে না পারায় মানিব্যাগ পকেটে ফেলে চাবির টেনে নিয়ে পথে বের হয়ে পড়লাম। কল্‌কাতার পথে নাকি টাকা ও ছোট গল্প ছড়ানো থাকে। হায়, তখন কে জানতো যে এ বেদবাক্য এমন ভাবে সত্য হয়ে উঠবে আমার জীবনে।

ঘণ্টা দুই রাস্তায় ও পার্কে ঘুরে যখন বাড়ী ফিরলাম পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটি অন্তর্হিত। বেদবাক্য কখনো মিথ্যা হওয়ার নয়, এমন কি এই ঘোর কলিকালেও নয়। কল্‌কাতার

পথেই আমার টাকা খোয়া গিয়েছে।—কিন্তু গল্প! তখনি বিদ্যুৎবেগে মাথায় খেলে গেল—এই ব্যাপারটাই গল্পাকারে লিখে ফেলা যাক না কেন? গল্পটা অবশ্য নিতান্ত মামুলী হবে, তার আর উপায় কি? যে টাকা পেয়েও পেলাম না তার মূল্যে এমন আর কি অভিনব গল্প হবে। পরের দিনে ডাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি তখন হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। দরজা খুলে চমকে উঠ্‌লাম—একি অবিনয় যে।

স্যুট ও নমস্কারের মাঝামাঝি একটা মুদ্রা করে মৃদুলাস্যে অবিনয় বল্‌ল, হাঁ, স্যর।

অবিনয় এক সময়ে আমার কাছে কলেজে পড়তো, তারপরে পুলিশে ঢুকেছে বলে শুনেছিলাম। গায়ে তার পুলিশ অফিসারের পোষাক বটে।

তা এখন কোথায় আছ?

আজ্ঞে এই থানাতেই অফিসার ইন চার্জ।

এসো, এসো, ব'সো। তারপরে কি মনে ক'রে?

স্যার, আপনার মানিব্যাগ হারিয়েছে কি? এই বলে সে একটা মানিব্যাগ, আমারটাই, টেবিলের উপরে রাখলো। (মামুলী গল্প ক্রমে জমে উঠ্‌ছে দেখছি, দেখা যাক আর কতদূর গড়ায়)

এই তো আমার মানিব্যাগ। কাল বিকালে খোয়া গিয়েছিল। পেলে কি ক'রে?

কাল রাতের বেলায় ব'সে আছি, উঠ্‌বো, উঠ্‌বো করছি, এমন সময় হঠাৎ জানলা দিয়ে কি একটা জিনিষ এসে পড়লো। তুলে দেখি মানিব্যাগ, খুলে দেখি চিঠিতে আপনার নাম। ভাবলাম কাল দিয়ে আসবো, আজ সকালেই উঠে চলে এসেছি। দেখুন সব ঠিক আছে কিনা? (গল্প ক্রমেই আরও জমে উঠ্‌ছে)

খুলে দেখি নোট ক'খানা আছে, চিঠিটাও।

বল্‌লাম, চোরের এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হ'ল কেন?

অনেক সময়ে চুরি করবার পরেই অনুতাপ হয়, বিশেষ পাকাচোর যদি না হয়। এমন কেস আরও দেখেছি।

অনেক ধন্যবাদ অবিনয়। কিন্তু আবার কোর্টে যেতে হবে না তো।

না স্যার, ডায়েরী করি নি। আচ্ছা, এখন আসি।

অবিনয় চলে যেতেই মানিব্যাগ উপুড় করে ঢেলে ফেল্‌লাম। বের হ'য়ে পড়লো সম্পাদক প্রদত্ত পাঁচখানা দশটাকার নোট, সম্পাদকের চিঠি। কিন্তু এখানা কি? আর কিছু তো ছিল না। এ যে আর একখানা চিঠি। দেখা যাক কি আছে। (গল্পও ক্রমেই জটিল ও জমাট হয়ে উঠ্‌ছে) চিঠিতে আছে—স্যার, আমিও একজন গল্প-গবেষক, সম্পাদকের তাগিদের তাড়নায় গল্পের উপাদান সন্ধানে বের হয়েছিলাম। আপনি একাকী রবীন্দ্রসরোবরের একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন আপনার পাশে গিয়ে একজন লোক বসলো, মনে পড়ে কি? আমি সেই গল্পার্থী ব্যক্তি। তখন কি জানতাম আপনিও আমার মতো একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আপনার তখন ভাবের (নিশ্চয় তখন গল্প ভাবে ছিলেন) সুযোগ নিয়ে আপনার মানিব্যাগটা তুলে নিলাম। কেন; চুরির উদ্দেশ্যে নয়, গল্পের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, চুরি করবার সময়ে চোরের মনস্তত্ত্ব কি রকম হয় জানবার উদ্দেশ্যে। তারপরে বাড়ী গিয়ে, মানিব্যাগ খুলে সম্পাদকের চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম, আপনি আমার সহ ব্যবসায়ী, না, তারও

বেশি, সমান চাহিদা তাহিত। তখন বুঝতাম কি তুলই না করেছি। কাকে কাকের মাংস খায়না আর আমরা লেখকেরা কি কাকেরও অধম। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের অতিটাও ভেবে দেখবার মতো। টাকা খোয়া গেলে গল্প না লিখবার নৈতিক অধিকার আছে—খুব সম্ভব 'বঙ্গ-সারথি' আর গল্প আর লিখবেন না। তাই স্থির করলাম, কোন এক সুযোগে খামার দিয়ে মানিব্যাগটা ফেলে দিয়ে আসবো। আর এটা ফেরৎ পেলে ( খামের অধিকাংশরা আজকাল তত্ত্বতোক, ফেরৎ দেয়ও ) সদ্য একটা গল্পের উপাদান হাতে পাবেন—বঙ্গ-সারথি নিয়মিত সময়ে গল্প পাবে। কি লেখেন দেখবার জন্যে পূজা সংখ্যা বঙ্গ-সারথি কিনবো। আমার বর্তমান অভিজ্ঞতা ধুন্দুমার কাগজের পূজা সংখ্যায় বের হবে, আপনার ঠিকানায় পাঠাবো, পড়ে দেখবেন, তবে টিমতে পারবেন না, কেন না ছদ্মনাম ব্যবহার করবো। নমস্কার, তার। ইতি বুধবার ( গল্পে এই নামটিই থাকবে, নইলে বুঝবেন কি করে ? )

চিঠিখানা পড়া শেষ হতেই গল্পের বাকি অংশটুকু লিখে ফেললাম, বস্তুতঃ চিঠিখানাই গল্পের শেষাংশ। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমার গল্পের পারিশ্রমিকের কিয়দংশ তাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু না, প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, কাজটা ভালো করে নাই, হাতে নাতে ধরা পড়লে অর্ধ-তৎক্ষণের পরিবর্তে বুধবারকে কারাবাস করতে হতো।

সেখানে পূজা সংখ্যার পাঠকেরা বদলু 'বঙ্গ-সারথি' ও 'ধুন্দুমার' পত্রের দুটি গল্প যেন একই অভিজ্ঞতার এপিঠ-ওপিঠ। লেখকেরা কি পরামর্শ করে লিখেছে নাকি !'

দ্বিতীয় — বর্ষ পত্রিক
১২নং এ... লেন, ...পাড়া,
কলিকাতা-৯

# মিস্টার ডি'কষ্টা

বিমল মিত্র

পৃথিবীতে মানুষের মত দুর্জ্ঞেয় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, অন্তরীক্ষ, মহাব্যোম—সব কিছুর রহস্যের কথা আমাদের শেষ নেই। কিন্তু যাদের কাছের সব চেয়ে নিকটতম মানুষটিকেও আমরা চিনতে পেরেছি বলে দাবী করতে পারি কি?

এই যেমন মিষ্টার ডি'কষ্টা!

এতদিন পরে ডি'কষ্টা সাহেবের কথা মনে পড়ার একটা কারণ আছে।

ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটটা যেখানে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এসে মিশেছে, ঠিক সেই সাহেবকে আবার দেখতে পেলাম!

সে-চেহারা আর নেই ডি'কষ্টা সাহেবের, অন্ততঃ ডি'কষ্টা সাহেবকে দেখে আমারই একটু সন্দেহ হয়েছিল। আর কাউকে দেখছি না তো! ছেঁড়া কোট ঝুলঝুলে প্যাণ্ট জুতো মোজা সবই নোংরা ময়লা। মোড়ের মাথার এক কোনে পোটাকতক নেড়িকুত্তা নিয়ে বসে আছে। হাতে রোবহয় পাঁউরুটি। সেই পাঁউরুটি নিজেও এক একবার কামড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কুকুরদেরও খাওয়াচ্ছে। রাস্তার লোকজন, গাড়ি, ট্রাম্বি, ট্র্যাফিক, কোনও দিকেই খেয়াল নেই। একমনে কুকুর-ভোজন করাতেই ব্যস্ত।

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম।

তারপর কাছে গিয়ে ডাকলাম—মিষ্টার ডি'কষ্টা—

ডি'কষ্টা সাহেব বোধহয় শুনতে পেলে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে—গিভ্ মি এ্যান আনা প্লিজ—আমাকে এক আনা পয়সা দাও তো বাবু—

বলে আবার কুকুরগুলোকে পাঁউরুটি খাওয়াতে লা

অথচ ডি'কষ্টা সাহেব এককালে কী দৌর্দণ্ড মানুষ ছিল সে তো আমি জানি। এক সঙ্গে এক ঘরের মধ্যে তিন দিন তিন রাত কাটিয়েছি এককালে। সে কি আজকের কথা! প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। অবশ্য চল্লিশ বছর আগে আমিই কি এ-রকম ছিলাম। না, ডি'কষ্টা সাহেবই এ রকম ছিল!

ডি'কষ্টা সাহেবকে আমি প্রথম এবং শেষ দেখা দেখি আড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। ওয়েটিং রুম ঠিক নয়, রিটায়ারিং-রুম। প্লাটফর্মটা যেখানে শেষ হয়েছে ওয়েটিংরুমটা সেইখানেই। তার পাশে কয়েক জোড়া রেল-লাইন এঁকে-বেঁকে সোজা ফাঁকা মাঠের দিকে চলে গিয়েছে।

আমি আর ডি'কষ্টা সাহেব দু'জনেই সেই ওয়েটিং-রুমে গিয়ে উঠেছি একই দিনে।

আমি গিয়েছি চাকরি খুঁজতে।

আমার কোল্-ম্যানেজারের অফিস। কোল্-ম্যানেজারের এক বন্ধুর চিঠি ছিল আমার সঙ্গে। চিঠিটা দেখানেই একটা ছোট-খাটো চাকরি হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু গিয়ে শুনলাম কোল-ম্যানেজার সাহেব টুরে বেরিয়েছেন। তিন দিন পরে ফিরবেন।

অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ওয়েটিং-রুমে আর একজন এসে উঠেছে সেখানে। বেশ সুট, টাই, পয়সা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

পরিচয় হলো। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি?

মিষ্টার ডি'কষ্টা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে—মিষ্টার গ্যাব্রিয়েল ডি'কষ্টা। পিয়ানো টিউনার—

পিয়ানো-টিউনার কথাটা আমার জানা ছিল। পিয়ানো কিনলে মাঝে মাঝে সেটাকে পিয়ানো-টিউনারকে দিয়ে সারিয়ে নিতে হয়। হারমোনিয়াম বা কনসোলিন কোম্পানি নিজে গিয়ে সারানো চলে। কিন্তু পিয়ানো ভারি জিনিস। নাড়া-চাড়া করলে খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই পিয়ানো-টিউনারকে ডেকে এনে মাঝে-মাঝে সুরটা ঠিক করে নিতে হয়। একাজ সবাই পারে না। সুর-জ্ঞান থাকা চাই, কান খুব তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। একটা পিয়ানো টিউন করতে দু'তিন দিন কি চারদিন সময় লাগে। খাওয়া-দাওয়ার খরচার সঙ্গে মজুরিও দিতে হয় মোটা রকম। সেই জন্যেই লোকে বলে পিয়ানো কেনা মানে হাতি কেনা।

সেই দিন সন্ধ্যে বেলাই ভালো করে পরিচয় হলো মিষ্টার ডি'কষ্টার সঙ্গে।

আমি কলকাতা থেকে আসছি শুনে মিষ্টার ডি'কষ্টার খুব আনন্দ।

—আপনি মিষ্টার হালদারকে চেনেন? 'ম্যাকানিক্স'-এর মালিক?

বললাম—খুব চিনি—

তখন যুদ্ধের আগে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউতে 'ম্যাকানিক্স' নামে একটা বিলিতি-মালের দোকান খুলেছিল আমার বন্ধু হরিহর হালদার।

—মিষ্টার হালদার আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড! তার কাছে আমার নাম করবেন!

চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম মিষ্টার ডি'কষ্টার দিকে। দামী সিগারেট, দামী সুট, দামী জুতো মোজা আর দামী নেক-টাই। সবই দামী। আর তার পাশে আমার মধ্যবিত্ত পোষাক। মধ্যবিত্ত চেহারা, মধ্যবিত্ত আয়।

সাহেব বললে—এ-চাকরিতে কত টাকা মাইনে দেবে?

আমি বললাম—যদি চাকরিটা হয় তো থার্ড ক্লাশ স্টার্টিং-পে—বেড়ে বেড়ে শেষ বয়েসে নাইনটিতে পৌঁছোবে!

সাহেব খুব সহানুভূতি দেখালে। ভেরি পুওর পে। দিনকাল বড় খারাপ। দেখো না, আমি মাসলি হাজার টাকা আর্ন করি। কোনও মাসে টু-থাউজ্যাণ্ডও হয়। কিন্তু তবু চালাতে পারি না। দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে।

তারপর হঠাৎ বললে—উড ইউ মাইণ্ড্ ড্রিঙ্কস্—?

আমি বললাম—আপনি খেতে পারেন, আমার ওটা অভ্যেস নেই—

সাহেব বললে—কিন্তু আমি একলা-একলা কী করে খাই; আমি ড্রিঙ্ক করবো আর তুমি চুপ করে বসে থাকবে?

বললাম—তাতে কী হয়েছে? আমার কোনও আপত্তি নেই—আমি সামনে বসে থাকছি। তুমি খাও না—

সাহেব মাথা নাড়তে লাগলো। বললে—না, তা হয় না—তুমি মিষ্টার হালদারের ফ্রেণ্ড আমারও ফ্রেণ্ড। তুমি না খেলে আমি কী করে খাই?

বললাম—তাতে কী হয়েছে, আপনি কিছু মনে করবেন না—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়লে না ডি'কষ্টা সাহেব। ডি'কষ্টা একলা মদ খেতে পারে না। সঙ্গে একজন কেউ খাওয়া চাই-ই।

বললাম—এ তো ভারি বদ্ অভ্যেস আপনার!

সাহেব বললে—ভেরি ব্যাড্ হ্যাবিট্ কিন্তু কী করবো? আমি যে একলা খেতে পারি না—

শুধু ড্রিঙ্কই নয়, খাবারেও এল। মাংস আর পরোটা। এক গ্লাস শেষ করার পর আমার গ্লাসে আবার ঢেলে দিলে সাহেব। সেটাও অনেক আপত্তির পর শেষ করলাম।

কিন্তু যখন আবার গ্লাসে নতুন করে ঢালতে এল, তখন উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম—আর কিছুতেই খাবো না আমি মিষ্টার ডি'কষ্টা।

সাহেব চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার দুটো হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো।

—খেতেই হবে নইলে আমি খেতে পারবো না।

বড় মুশকিলে পড়লাম। শেষে যখন দেখলাম সাহেব বেশ টলছে, চলে চলে পড়ছে, তখন নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরের প্লাটফর্মে চলে গেলাম। পালিয়ে বাঁচলাম। এ কী লোকের পাল্লায় পড়লাম আমি। অথচ এর হাত থেকে পালাতেও পারি না। এরই সাথে এক ঘরে কদিন ধরে রাত কাটাতে হবে। অন্ততঃ যতদিন না কোম্পানীর হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসে।

অনেকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরির পর ভাবলাম জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি সাহেবটা কী করছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম ডি'কষ্টা সাহেব তখনও একমনে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মাংসের হাড় চুষছে। তখনও অনেকটা মাংস প্লেটের ওপর রয়েছে। বোতলও পুরো খালি হয়নি।

হঠাৎ দেখি সেই অবস্থাতেই সাহেব উঠলো।

আমি অবাক হয়ে গেলাম! সাহেব আবার উঠলো কেন? দেখি গায়ের ওপর কোটটা চড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরোল। হাতে সেই আধখাওয়া মাংসের প্লেট। মাংসের প্লেট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সাহেব?

আমি আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলাম।

সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে হাজির হলো। তখন রাত হয়েছে বেশ। লাইনে কোনও ট্রেণ নেই। অনেক দূরে ইয়ার্ডের ভেতর মালগাড়ির শান্টিং হচ্ছে। কুলিরা গড়া গড়া শুয়ে পড়েছে লম্বা প্লাটফর্মের ওপর দেয়ালের গা ঘেঁষে। বোধ হয় কিছু ট্রেণ তখনও আসতে বাকি। তারও ওদিকে বুক-ষ্টলটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে।

দেখি ডি'কষ্টা সাহেব যেখানটা প্লাটফর্ম চালু হয়ে গিয়েছে সেইখানে গিয়ে কাকে ডাকতে লাগলো। আর পাঁচ ছ'টা কুকুর লাজ নাড়াতে নাড়াতে সাহেবকে ঘিরে দাঁড়ালো।

সাহেব তাদের সামনে নিচু হয়ে মাংসের প্লেট থেকে এক-একটা করে মাংসের টুকরো নিয়ে সকলকে খাওয়াতে লাগলো। কুকুরগুলোরও যত উল্লাস, ডি'কষ্টা সাহেবেরও তত উৎসাহ।

সেই রাত দশটার সময় ডি'কষ্টা সাহেব সেদিন কুকুরগুলোকে মাংস খাইয়ে কী আনন্দ পেয়েছিল আমি তা বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম ও-ও মাতালের এক বিচিত্র খেয়াল।

তারপর অনেক রাত্রে যখন ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন ডি'কষ্টা সাহেব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ডি'কষ্টা সাহেব আবার সেজে-গুজে ফিটফাট্ ভোর বেলা আমাকে গুড্-মর্ণিং করেই কাজে বেরিয়ে গেল।

এমনি প্রত্যেক দিন।

প্রত্যেক দিন ভোর বেলা ফিট-ফাট্ হয়ে সাহেবী পোষাকে সেজে-গুজে পিয়ানো টিউন করতে বেরিয়ে যেত ডি'কষ্টা সাহেব, আর তারপর ফিরে এসেই হোটেল নিয়ে বসতো। আর যখন বেলাটা চড়ে উঠতো তখন সেই রেল-লাইনের ধারে গিয়ে কুকুরগুলোকে মাংস খাওয়াতো।

শেষকালে তিন দিনের দিন ডি'কষ্টা সাহেবের কাজ শেষ হয়ে গেল।

যাবার দিন ডি'কষ্টা সাহেব বললে—ক্যালকাটায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হবো—

বললাম—মিষ্টার হালদারকে বলবেন আমার কথা—

এর বেশি আর কিছু কথা হয়নি। এর বেশি আর কিছু জানতুমও না। কে ডি'কষ্টা সাহেব, কী তার ঠিকানা, কোথায় তার বাড়ি, কে কে আছে তার সংসারে, সে-বিষয়েও কোন কথা হয়নি। আমিও জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি, আর সাহেবও বলেনি।

পরের দিন রাত্রে দেখলাম সেই কুকুরগুলো রোজকার মত রেল-লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাংস খাবার লোভে। কিন্তু তখন ডি'কষ্টা সাহেবই বা কোথায় আর সেই মাংসই বা কোথায়! হয়ত ট্রেণের কামরার মধ্যে তখন সাহেব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এর পরদিনই কোল ম্যানেজার সাহেব হেড্-কোয়ার্টারে ফিরে এল। আর সেই দিন থেকেই আমার চাকরি হয়ে গেল আত্রার রেল-অফিসে।

এর ছ'মাস পরে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে হরিহরের সঙ্গে দেখা। হরিহর হালদার। হরিহরের বাবার অগাধ পয়সা। সেই পয়সায় সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউএ মদের দোকান করেছিল। হরিহরকে বললাম ডি'কষ্টা সাহেবের কথা।

ডি'কষ্টা সাহেবের কথা উঠতেই হরিহর বললে—ডি'কষ্টার খবর জানিস না তুই?

বললাম—কী খবর?

—আরে ডি'কষ্টার তো ফাঁসি হবার কথা। বোধ হয় ফাঁসিই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত—মামলা চলছে—

—কেন?

—সাহেব নিজের বউকে খুন করেছে যে—

বললাম—সে কি? কেন?

হরিহর বললে—সাহেব বাইরে গিয়েছিল কাজে ফিরে এসে দেখে সাহেবের কুকুরগুলোকে ঘউ ভাল করে খেতে দেয় নি। সাহেবের ভীষণ কুকুর পোষার সখ। একটা কুকুর না খেতে পেয়ে মারাও গেছে, সাহেব আর রাগ সামলাতে না পেরে মেমসাহেবকে গুলি করে মেরে ফেলেছে—

আমি সব শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

হরিহর বললে—কুকুরগুলো হচ্ছে সাহেবের প্রাণ ভাই। সাহেব যা টাকা উপায় করে সব ওই কুকুরের পেছনে খরচ করে ফেলে। বাকি টাকাটায় কোনও মদ খায়। মেমসাহেবের কী দোষ? ছেলেমেয়ে তো কিছু নেই।

এরপর খবর পেলাম শেষ পর্যন্ত সাহেবের ফাঁসি হয়নি। জজসাহেব ডি'কষ্টা সাহেবের কুকুর প্রীতির কথা ভেবে ফাঁসিকাঠ থেকে সাহেবকে বাঁচিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দিয়েছে।

তারপর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে। আমিও সেই রেল-অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আসা ছেড়ে বিলাসপুরে গিয়েছি অন্য চাকরি নিয়ে। কত ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে আবার এই কলকাতায় ফিরে এসেছি। সেই হরিহর হালদারের 'ম্যাকানিজ'ও উঠে গেছে। শেষ পর্যন্ত হরিহরও একদিন মটর-এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। মোট কথা বলতে গেলে সারা পৃথিবীটারই ওলোট-পালোট হয়ে গেছে এই ক'বছরে। এতদিন পরে এই স্ত্রী-মূল ষ্টীটের মোড়ে ডি'কষ্টা সাহেবকে এ-অবস্থায় দেখবো ভাবতে পারিনি।

আমি আবার ডাকলাম—মিষ্টার ডি'কষ্টা—

ডি'কষ্টা সাহেব আবার আমার দিকে চেয়ে বললে—গিভ্ মি এ্যান্ এ্যানা স্লিপ—

আমি পাশের দোকান থেকে একটা একপাউণ্ড পাউরুটি কিনে সাহেবকে দিলাম। মনে হলো পাউরুটিটা দেখে সাহেব যেন খুব খুশী।

বললে—থ্যাঙ্কিউ বাবু—

তারপর নিজে একবার পাউরুটিটাতে কামড় দিলে, আর তারপর বাকিটা কুকুরগুলোকে খাওয়াতে লাগলো। এর পর আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেল না। আমি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।

# বিপরীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সারেঙ্গ একটু তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ ট্রেন একটা পথের ইঁয়ার যেন আচ্ছন্ন চেতনার গুরু অন্ধকার বিদীর্ণ করে চলে গেল।

অসীমের ঘুমটা ভেঙে গেল তৎক্ষণাৎ।

ট্রেনটা মাঝ পথে কোথায় দাঁড়িয়ে পড়ে অবিরাম হুইসিল বাজাচ্ছে।

কামরাটা একেবারে অন্ধকার। রীণার অসুবিধে হয় বলে রাত্রের ঘুমাবার নীল আলোটাও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অসীম ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল। হাতড়ে হোল্ডঅলের মাথার দিক থেকে সোয়েটারটা বার করে পরতে ভুলল না। রাত্রি দশটা নাগাদ যখন ওপরে উঠে শুয়েছিল তখন কম্বলটা গায়ে টেনে দিতে ইচ্ছে হয়নি। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকের পক্ষে বেশ গরম মনে হয়েছিল। তারপর গভীর ঘুম না এলেও ছাড়াছাড়া তন্দ্রার মধ্যে ঠাণ্ডাটা বাড়ছে টের পেয়েছে। কম্বলটা পায়ের কাছ থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছিল। তারপর মাথাটা পর্যন্ত ঢাকা দিতে ইচ্ছে হয়েছে।

মাথা ঢাকা দিয়ে শোয়া তার এক রকম স্বভাব। সেই ছেলেবেলা থেকে। সেটা গায়ত্তপক্ষে অভ্যেস করবার চেষ্টা করে। অন্ততঃ রীণার চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে।

রাত্রে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে নিলে এমন কিছু ভয় ছিল না। রীণা নিচে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম বরাবরই অত্যন্ত গভীর। সেই গভীর ঘুম ভেঙে তার হঠাৎ জেগে ওঠবার সম্ভাবনা নেই। আর জাগলেও এই অন্ধকারে অসীম তার বাঙ্কে কিভাবে ঘুমোচ্ছে তা লক্ষ করতে উঠে দাঁড়াবে না নিশ্চয়।

ওপরের বাঙ্কে কোথা থেকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কামরার ছাদের ভেন্টিলেটর থেকেই সম্ভবতঃ। বেশ একটু লোভ হলেও অসীম কম্বলটা মাথায় টেনে নিতে পারেনি। মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে শুয়েছিল।

কেন তার এই নিজের মনের দুর্বলতা, তখনই ভেবেছে। রীণাই বা কেন তার প্রতি এই সব ছোটখাট মনোযোগগুলো এখনো ছেড়ে দেয়নি। শুধু কি অভ্যাস না কর্তব্যবোধ?

তাদের সম্পর্কটা কি শুধু কর্তব্য পালনের নিষ্প্রাণ চড়ায় এসে এখন ঠেকেছে।

উত্তাপ আবেগ অবশ্য কোনদিন তাদের সম্পর্ককে আলোড়িত করেনি। তবু একটু উত্তাপ বুঝি ছিল প্রথম দিকে।

অসীমের দিক দিয়ে যতটা না হোক রীণার দিক থেকে বেশ কিছুটা।

ছোটখাট নানা ব্যাপারে তার প্রমাণ পেয়েছে।

অসীমের চিরকাল একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে। একটু ঘুমের মধ্যে থাকলেই অ্যালার্জি না কিসের বকম নাক দিয়ে জল পড়া সুরু হয়ে যায়।

তখন আরো বেশী হ'ত।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই নিজের ঘরের বই কাগজগুলো গুছোতে গিয়ে ওই রকম সরি লেখেছিল। এ রকম ঠাণ্ডা লাগা তার গা সওয়া। দুএকদিন থেকেই সেরে যায়। ওষুধ পত্তরের দরকার হয় না।

অসীম তাই এ নিয়ে রীণাকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেনি। রাতে নাকটা বন্ধ হয়ে যাবার দরুন ঘুম না আসায় শুধু বিছানা থেকে উঠে ঘরের কোণের চেয়ারটায় গিয়ে বসেছিল।

রীণা যে অত্যন্ত ঘুমকাতুরে তা ফুলশয্যার রাত থেকেই টের পেয়েছে। সে ঘুমোচ্ছে মনে করে স্থিরই ছিল।

তখন নতুন পরিচয়ের আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ কাটেনি। অবশ্য তা কাটলেও আর রীণা সে আছে জানলেও তার সঙ্গে সর্দি লাগা সম্বন্ধে সহজ আলাপ করতে পারত না। অসীম সেভাবে গড়া নয়।

চেয়ারে খানিক বসে থাকবার পর অসীমের মনে হয়েছিল, ঘুম যখন আসছেই না তখন একটা বই-টই পড়লে হয়। কিন্তু টেবিল ল্যাম্পটা সন্তর্পণে জ্বালতে গিয়ে অন্ধকারে হাত লেগে টেবিলের ওপরে রাখা একটা অ্যাসট্রেই পড়ে গিয়েছিল বুঝি।

টে'বল ল্যাম্পটা জ্বেলে অ্যাস্‌ট্রেটা মেঝে থেকে কুড়োতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। রীণাই মেঝে থেকে সেটা কুড়িয়ে তুলছে।

কুণ্ঠিত স্বরে অসীম বলেছিল—তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম!

না, আমি জেগেই ছিলাম। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল রীণা।

জেগেছিলে; সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল অসীম।

হুঁ, তোমার ঘুম আসছে না দেখলাম। রীণা যেন জেগে থাকার অপরাধের কৈফিয়ৎ দিয়েছিল লজ্জিতভাবে।

অসীম আর কিছু বলেনি। কিন্তু সত্যি অবাক হয়েছিল। অবাক হয়েছিল তার নিজের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই হয়ত। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে গভীরতার হয়ত ধারাই এই যে উভয়ে উভয়ের জন্যে ব্যাকুল হবে। কিন্তু সে গভীরতাতে কি তারা পৌঁছেছে! সে নিজে অন্ততঃ তা টের পায়নি। - রীণার এরকম কিছু হ'লে সে এমন জেগে কাটাতে পারত না তখনই। তাছাড়া এমন নিঃশব্দে ত নয়ই।

রীণার এই নীরব আকুলতায় অবাক যেমন হয়েছিল তেমনি একটু অভিভূতও।

পরে আরো ছোটখাট ব্যাপারে রীণার হৃদয়ের উত্তাপটুকু সে অনুভব করেছে। তাতে কিন্তু ক্রমশঃ অস্বস্তিই বোধ করেছে বেশী। অস্বস্তি তার নিজের দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত কোন সাড়া তার নেই বলে। কর্তব্যবোধের সঙ্গে মমতা একটা আছে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বিয়ের আগে প্রথম যৌবনের সেই রঙের ঘোর চোখে লাগাই কি এ ঔদাসীন্যের কারণ?

না, তা যে নয়, তা অসীম অন্ততঃ ভালো করেই জানে। সে ত সাময়িক একটা ছেলে খেলা ব্যাপার। মনে কোথাও একটু আঁচড়ও রেখে যায়নি।

তার মনই যেন একটু অন্যভাবে তৈরী। আবেগের ঢেউ ওঠবার মত তরলতাই তার নেই। কলেজে পড়বার সময় বন্ধুর দুই হৃদয়ের চাঞ্চল্য বলে যা মনে হয়েছিল তা বোধহয় ওই বয়সের অনুকরণ-প্রিয়তা ছাড়া কিছু নয়। বন্ধুবান্ধবের দেখে শুনে ও রোম্যান্টিক গল্প উপন্যাস পড়ে সখ করে নিজের মনে

একটা কৃত্রিম আবেগ এনেছিল। ভোরের পাৎলা কুয়াশার মত বেলা বাড়ার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে তা মিলিয়ে গেছে।

না, রীণা সম্বন্ধে সে রকম কোন উত্তাপ সে কখনো হৃদয়ে অনুভব করেনি, সে তার মনেরই বিশেষ গড়নের ধরন। একটা নিলিপ্ত প্রশান্তি যেন তার সহজাত।

তবু—

হ্যাঁ তবু একটু আছে। এই নিলিপ্ত প্রশান্তিটি একবার কেমন দুলে ওঠেনি কি?

কিন্তু ট্রেনটা যে এখানে শিকড় গজিয়ে ফেলল মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? কোন দুর্ঘটনা গোছের কিছু নাকি!

খুব সাবধানে যতদূর নিঃশব্দে সম্ভব অসীম নিচে নামল। অন্ধকারে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে রীণা অসাড়েই ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আন্দাজ করে সুইচটা খুঁজে পেয়ে অসীম রাতের নীল আলোটা জ্বালল। হ্যাঁ, রীণাকেও ইচ্ছে করলে এবার একটু খোঁচা দেওয়া যায়। অসীমের বেলা টিকটিক করলেও রীণা নিজে মাথা পর্যন্ত কম্বলে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

সুবিধে থাকলেও খোঁচা দেবার ইচ্ছে কিন্তু হবে না। আগেকার দিনে যদি বা কখনো হ'তে পারত, এখন আর হয় না। তাদের সম্পর্ক এখন শুধু যান্ত্রিক সহজতায়।

তার জন্যে কোন ক্ষোভও অসীম মনের মধ্যে টের পায় না। এই ত বরং ভালো। নিত্যদিন একটা দৈনন্দিন প্রবাহ। শতকরা নব্বই জনের দাম্পত্য জীবনই ত' এই ভাবে বয়। দুরন্ত উদ্বেলতায় যাদের সুরু তাদেরও শেষ পর্যন্ত। পরস্পরের সংসর্গ থাকার একটা অভ্যাস। চেউ নেই ঘূর্ণি নেই, শুধু একটা গতানুগতিক ছন্দ। যে যার নিজের মধ্যে নয়, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের শুধু একটু আধটু সংযোগ। তার অতিরিক্ত মাঝে মাঝে রীণার ওই অভ্যাসগত মনোযোগের সামান্য ব্যতিক্রম।

অসীমের নিজের দিক থেকে তাও নয়। আজকালকার দিনে একটা 'কুপে' পাওয়া নাকি অনেক সৌভাগ্যের কথা। চলমান ট্রেনে নিশ্চিন্ত নির্জন ঘনিষ্ঠতার একটা নতুন স্বাদের কথা কেউ কেউ হয়ত ভাবত। অসীমের মনে সে কথা ওঠে নি। অনেক আগেও উঠত কি না সন্দেহ। সন্ধ্যের পর একটা স্টেশন পার হবার পর জানলার ধারে বসে বাইরের অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির মেলা দেখে বড় ভালো লেগেছিল। রীণা তখন সীটের অন্য প্রান্তে বসে একটা বই পড়ছে। একবার তাকে ডেকে দেখাবার কথা মনে হয়েছিল সত্যিই। কিন্তু উৎসাহ হয় নি।

ট্রেনটার সত্যি হল কি! একটা জানলার কাঠের পাল্লাটা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে নামিয়ে দেবার পর কাঁচের পাল্লার ভেতর দিয়ে নিচে একটা আলোর মতাচড়া ও কিছু মানুষের জটলা যেন দেখা গেল। দরজার লক্ দুটো খুলে একবার বাইরে বেরিয়ে দেখলে হয়।

অসীম হুক থেকে জামাটা নামিয়ে গায়ে দিল। কিন্তু তবু দ্বিধা হল দরজাটা খুলতে গিয়ে। নিচের লকটা খোলবার সামান্য একটু শব্দ হয়েছে। না, রীণা তাতে জাগে নি।

জেগে উঠলে অবশ্য কি বলত তা অসীম যেন জানে। নিরুত্তাপ যান্ত্রিক কণ্ঠে শুধু বলত, —দরজা খুলছ কেন?

ট্রেনটা কেন এতক্ষণ থেমে আছে একটু দেখি।—বললে সেই এক সুরে বলত, তুমি দেখে'ত আর ট্রেন চালাতে পারবে না। এই ঠাণ্ডায় বাইরে বেরিও না।

হয়ত তাতেই অসীম নিরস্ত হ'ত। না হ'লেও রীণা আর কিছু বলত না। যেন কর্তব্য পালন হিসাবে সাবধান করার বেশী আর কোন দায় তার নেই।

এই রকমই চলছে সেই দিনের পর থেকেই বোধহয়। যেদিন অসীমও যেন ক্ষণিকের জন্যে একটা অপ্রত্যাশিত নাড়া অনুভব করেছিল মনের কোনো গভীর স্তরে। সেটা হয়ত বিস্ময়েরই একটা রকমফের বলে নিজেকে অবশ্য বুঝিয়েছিল।

তাদের বাইরের সম্পর্ক তখন আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে
আর ব্রীড়াবনতা নববধূর ন্যায় কুণ্ঠা আড়ষ্টতা নেই। তবে তখনও শান্ত অনুজ্জ্বল।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে অসীম অবাক হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাত। পশ্চিমের জানলা দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। পাশের বিছানায় কিন্তু রীণা নেই। কলঘরের দরজাটা খোলা কি না দেখতে গিয়ে উত্তর দিকের জানলায় চোখ পড়েছিল। রীণা সেখানে জানলার গরাদে ধরে অচল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

রীণার গাঢ় ঘুমের কথা ভালো করেই তখন সে জানে। রাত্রে বালিশে একবার মাথা দেওয়ার পর ভোরের আগে তার আর ঘুম ভাঙে না। রীণার পক্ষে এ রকম বিনিদ্র হয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ একটু অস্বাভাবিক।

অসীম তার স্বভাব অনুযায়ী সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন কিন্তু করে নি। বেড সুইচটা টিপে আলো জেলে কাছের টিপয়ে রাখা জলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। গ্লাসটা হাতে নিয়ে খেতে গিয়ে কিন্তু একটু দ্বিধা করেছিল। জলে কি যেন একটা ভাসছে।

দাঁড়াও, বদলে দিচ্ছি। রীণা জানলা থেকে সরে এসে গ্লাসটা অসীমের হাত থেকে নিয়ে ঘরের কোনের কুঁজো থেকে নতুন করে জল গড়িয়ে এনে দিয়েছিল। তারপর অসীমের জল খাওয়া শেষ হ'লে গ্লাসটা টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে অসীমের বিছানারই পায়ের দিকে উঠে বসেছিল তাকে একটু বিমূঢ় করে।

রীণার মুখের দিকে তাকিয়েও বিস্মিত হয়েছিল অসীম। রীণার সাধারণতঃ শান্ত স্থির মুখে কী যেন ভাবছে একটা চাপা উত্তেজনার আভা।

তোমায় একটা কথা আমার বলা দরকার। রীণার কণ্ঠস্বরে তার মুখের উত্তেজনার কোন ছাপ না থাকলেও কেমন অদ্ভুত শুনিয়েছিল অসীমের কানে।

এখনই বলতে চাও।—অসীমের গলায় আগ্রহ যেমন ছিল না তেমনি ঔদাসীন্যও নয়।

হ্যাঁ এখনি। রীণার স্বর এবার অস্বাভাবিক রকম দৃঢ় কঠিন, তোমার কাছে এ কথা অবশ্য আগেই বলা উচিৎ ছিল। বিয়ে যখন আমাদের হয়েছে তখন পরস্পরের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা আমাদের অন্যায়।

ব্যাপারটা স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরে অসীম চিন্তিত ভাবে রীণার দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল।

রীণাই আবার কথা বলেছিল। আর সেই মুহূর্তেই কি অসীমের হঠাৎ মনে হয়েছিল তার মনের কঠিন নিশ্চিন্ততায় কোথায় যেন চিড় খেয়েছে?

রীণা যা বলেছিল তা কাহিনী হিসেবে বিস্ময়কর কিছু নয়, তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে রীণার কি ভাবে ভালবাসা হয়েছিল আর দুজনের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও কেন যে বিয়ে তাদের হয়নি, তারই মামুলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রীণার কথা শেষ হবার আগেই অসীম নিজেকে সামলে নিয়েছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রীণাই আবার জিজ্ঞাসা করেছে, কিছু বলছ না যে?

অসীম একটু হেসে এবার বলেছে,—বলবার কি আছে? বিয়ে ত তার সঙ্গে হয় নি।

শুধু এইটুকুই তোমার বলবার? রীণার স্বর একটু যেন রুক্ষ।

হ্যাঁ। আর কিছু নয়। বলে অসীম সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু প্রায় সমস্ত রাত কেন যে ঘুমোতে পারেনি নিজেই তা ঠিক জানে না।

এই আলাপের দিন কয়েক পরেই বোধহয় রীণা সেদিন সন্ধ্যায় অসীম কাজ থেকে ফেরবার পর চা দিতে এসে হঠাৎ বলেছিল, আজ মার্কেটে সেহলাম। কার সঙ্গে দেখা হ'ল জানো।

অসীম জানবার কৌতূহল প্রকাশের বদলে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিল।

রীণাই নিজে থেকে আবার বলেছিল,—তোমাদের সুতপা সেনের সঙ্গে।

অসীম ভেতরে যদি একটু চমকে উঠে থাকে বাইরে তা প্রকাশ করে নি।

নিরুৎসুক ভাবেই চোখ তুলে বলেছিল—ও।

আর কিছু সে বলে নি। আশ্চর্যের বিষয় রীণাও এ প্রসঙ্গ আর বাড়ায় নি।

অসীম মনে মনে চমকে উঠেছিল শুধু রীণার মুখে সুতপার নাম শুনে নয়, মার্কেটে তার সঙ্গে রীণার দেখা হওয়ার কথাতেও।

রীণার কানেও সুতপার কথাটা কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী তাহলে পৌঁছে দিয়েছে? না দেওয়াই আশ্চর্য। কিন্তু মার্কেটে তার সঙ্গে রীণার দেখা হওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতপা সেন মাত্র দুদিন আগে বিদেশের বদলীর্শিপ পেয়ে প্লেনে রওনা হয়ে গেছে। খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়লে রীণার এ ভুলটা হত না।

রীণার মিথ্যা বলা কিন্তু এই প্রথম নয়। এর আগেও ছোটখাট ব্যাপারে কারণে অকারণে তার মিথ্যা বলা অসীম ধরে ফেলেছে।

ধরে ফেললেও সকলের মতই তা নিয়ে কিছু অবশ্য বলে নি। রীণার মত মেয়ের পক্ষে মিথ্যে বলার এই ঝোঁকটা তার কাছে অবশ্য অদ্ভুতই লেগেছে আগে। মতই উদাসীন নির্বিকার হোক কোথায় যেন একটা ব্যথাও পেয়েছে তাতে।

রীণার মিথ্যাগুলো অবশ্য নির্দোষ।

কি রকম ঠাণ্ডা লেগে একটা চোখ তার ফুলে অত্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল সেবার।

অসীম যথাকর্তব্য ডাক্তার এনে দেখিয়েছিল। ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অমনি অবাক হয়ে বলেছিল,—ওটা কি করছ?

বীণা প্রেসক্রপশনটা ছিঁড়ে ফেলেছে তখন। মুখে তার রাগ কি বিরক্তির বদলে কিন্তু মৃদু একটু হাসি।

বীণা হাসিমুখেই বলেছিল। আমার চোখ মাঝে মাঝে এরকম হয়। তার জন্যে ঔষধ লাগে না।

তবু লাগলে লাভ বই ক্ষতি ত নেই।—একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছিল অসীম।

না ক্ষতি আছে। ডাক্তারী ওষুধে বাড়ে।—বলে বীণা ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

অসীম খানিকটা বিরক্তির বশেই শ্বশুর মশাইকে ফোন করেছিল তৎক্ষণাৎ। তার শ্বশুর নিজেই ডাক্তার। তিনি এ ডাক্তারের প্রেসক্রপশনে যা ছিল সেই ওষুধের নামই করেছিলেন। বীণার চোখের এ রোগ মাঝে মাঝে হয় একথাটা সত্য। ডাক্তারী ওষুধে ক্ষতি হওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে।

আগে যেখানে এ সব মিথ্যার প্রমাণ পেয়ে সামান্য একটু ব্যথা পেয়েছে সুতনা সম্বন্ধে মিথ্যা কথাটা জেনে তার বদলে যেন একটু তৃপ্তিই পেয়েছিল। অবজ্ঞা করবার সুযোগ পাওয়ার তৃপ্তি। সে রাত্রে সেই স্বীকারোক্তির এটা প্রতিক্রিয়া কিনা অসীম তলিয়ে দেখবার চেষ্টাও করে নি।

জানলার বাইরে যা ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ কিছু একটা গোলমাল হয়েছে মনে হয়।

অসীম এবার আর দ্বিধা করলে না। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে আর'র সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে নেমে দাঁড়াল।

গোলমালটা সামনে বয় পেছন দিকের একটা গাড়িতে হয়েছে। তারই কাছে লোকজনের ভীড়।

অসীমকে সেই দিকেই একটু এগিয়ে যেতে হ'ল।

মিনিট পাঁচেক বাদে ফিরে আসবার সময় একটু অনুদ্বিগ্নেই হ'ল নিজের কামরাটা চিনে বার করতে।

পর পর এক সঙ্গে অনেকগুলো কাট ক্লাস কামরা। তার মত উৎসাহ নিয়ে কেউ সেখান থেকে নামে নি মনে হয়। অন্ধকারে নিচে থেকে জানলা দরজা বন্ধ করা আলো নিভানো কামরা গুলো চেনা বেশ কঠিন। শুধু ওই একটা আলো জ্বালান কামরার দরজায় কে যেন মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি, ঠিক যেন বীণাই মনে হচ্ছে!

আর দু'পা যাবার আগেই মুখটা ভেতরে সরে গেল। আলোটাও সেই সঙ্গে গেল নিভে।

কাছে এসে দাঁড়িয়েও অসীমের একটু দ্বিধা হল কামরায় উঠতে। সে ভুল দেখেনি ত!

সাহস করে উপরে উঠবার পর নিশ্চিন্ত হ'ল। ঠিক কামরাতে উঠেছে। বীণা কিন্তু তার বার্থে গলা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের নীল আলোটা শুধু জ্বলছে। অসীমই জ্বেলে গেছল।

অসীম দরজা বন্ধ করে ওপর নিচে 'লক' করে ফেরবার পর বীণার গলা শোনা গেল—ব্যাক্‌গারটা নিয়ে যাও নি কেন?

'ভুল হয়েছে।' বলে অসীম নিজের 'বাঙে' উঠছিল, রীণার প্রশ্নে তাকে থামতে

কি হয়েছিল কি ?

থার্ড ক্লাস থেকে একটি মেয়ে পড়ে গিয়েছিল।—অসীম সংক্ষেপে সারল।

কি করে ?—রীণার কৌতূহল কি একটু বেশী !

জানলায় ভয়ানক ভীড়। অসীমকে বিদায় করতেই হল, অনেকে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে ওই মেয়েটিও ছিল তার স্বামীর সঙ্গে। কি ভাবে অন্যমনস্কতায় পড়ে গেছে।

একটু থেমে অসীম আবার বললে, দু একজন বলছে এমনি পড়ে নি। মহৎটাই নাকি ঠেলে দিয়েছে।

রীণা হঠাৎ এমন হেসে উঠবে অসীম ভাবতে পারে নি। বেশ একটু উচ্চ স্বরেই অসীম বললে,—হাসছ কি ? মেয়েটা হয়ত বাঁচবে না।

না বাঁচাই ত ভালো।—রীণার স্বর এখনো যেন তীব্র কৌতুকের,—কিন্তু থার্ড ক্লাশে যাওয়ার কি সুবিধে বলত !

অসীম এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি ঘরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে !

আমি !—রীণা যেন অবাক। আমার ত এই সবে ঘুম ভেঙেছে। বিছানা ছেড়েই উঠিনি।

মিথ্যে, মিথ্যে, আবার সেই অকারণ মিথ্যে কথা !

সেই মুহূর্তে অসীমের মনের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল।

মিথ্যে ঠিকই কিন্তু অকারণ কি ?

সব মিথ্যেই কি একই সূত্রে জড়ানো গভীর কোনো রুদ্ধ কান্নার উল্টো পিঠ ?

সে রাত্রের সেই স্বীকারোক্তিও কি এইরকম মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়। সুতপার সঙ্গে অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে সত্য মিথ্যা যা রীণা শুনেছে তাই কি এসব মিথ্যার মূল ?

---

# বন্ধু

রামপদ মুখোপাধ্যায়

রেলের চাকরিতে ভ্রমণের নেশা জন্মেছিল। এই জন্য কম মাইনে পোষাতে হত না। এবার দেশভ্রমণের পূর্বে স্থির করেছিলাম—যথাসম্ভব হাল্কা হয়ে কাজটা সারব। অর্থাৎ যেটুকু না নিলে নয় সেই জিনিসগুলি একটা ঝোলার মধ্যে পুরে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে আসব। গা-ঢাকা একখানা চাদর ছাড়া বিছানা পর্যন্ত নেব না—টুকিটাকি জিনিসভর্তি ওই ঝোলাটাই বালিশের কাজ করবে। ঝোলার মধ্যে থাকবে—একটি গেলাস—শুধু জল পানের জন্য নয়—সর্বকার্যে ব্যবহারার্থ। থাকবে আর এক প্রস্থ কাপড় জামা বিকল্পে গেঞ্জি পাঞ্জাবী, একখানা গামছা আরও দু' একটি জিনিস; যেহেতু ভদ্র সমাজ হতে খণ্ডিত হয়ে না পড়ি এই আশঙ্কায় ওগুলি নিতেই হবে। ঝোলাটা কাঁধে ফেলে যে কোন জায়গায় নির্ভাবনায় চলে যাব। পায়ে থাকবে টায়ার সোলের সস্তা একজোড়া চটি যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে-কোন জায়গায় পড়ে থাকলেও স্থানচ্যুত হবার ভয় থাকবে না। ঠিক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সজ্জা নয়—অথচ সর্বস্ব ত্যাগের ইঙ্গিতটুকু ওরই মধ্যে থাকবে।

সঙ্কল্প মত হাল্কা হয়ে বা'র হয়েছি দেশভ্রমণে। পথ দীর্ঘ—একেবারে ভারতবর্ষের শেষ স্থল-বিন্দুতে যাত্রা শেষ। রাজ্যের পর রাজ্য পার হয়ে চলেছে রেলগাড়ী—আনন্দের আবেগে কাঁপছে সর্বদেহ—মন বিস্ফারিত।

একটা দিন আর রাত্রি কেটেছে গাড়ীতে—আরও একটা দিন কাটিয়ে বড় মত একটা শহরে পৌঁছব। ইতিমধ্যে গাড়ীর মধ্যে মুক হয়ে গেছে কামাকামি। আর সেটা আমাকে লক্ষ্য করেই।

আমার সামনে বসেছিলেন রোগাসত এক ভদ্রলোক। সাজ-পোষাকে অতি সাধারণ। মুখখানা নিরীহ নিরীহ দেখালেও—চোখ দু'টি অতিশয় চঞ্চল। আমাকে বেশ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে এক সময়ে সবিনয়ে শুধোলেন। আপনি কি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন স্বামীজী? চমক-লাগার মত সম্বোধন—পুলকিত হবার মতও। তবু যথাসাধ্য সংযত থাকো উত্তর দিলাম, হাঁ—দেশ দর্শনে। ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন, দেশদর্শন তো বটেই। তা আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?

প্রশ্নের ধরণটা বিরক্তিকর মনে হ'ল। ইচ্ছা হ'ল ব্যঙ্গ করে বলি—মানুষ সম্প্রদায়। কিন্তু আরও সংযত হয়ে ব্যঙ্গোক্তিকে মনের মধ্যে রেখে নিজের পানে চাইলাম একবার। আমার বেশভূষা কি স্বামীজীদের মত? পরনে গৈরিক বসন? কণ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষ কি তুলসীর মালা? ললাটে ফোঁটা তিলক-কিংবা ত্রিপুণ্ড্র রেখা? মাথায় জটাভার—বিভূতি বিচিত্রিত সর্বদেহ?

মনে মনে হেসে নিলাম। বিরক্তিকে আমি আমার বর্জন করেছি—প্রধান একটি কারণে—বেশি রকম মালপত্র নিয়ে বিব্রত হব না পথে। অতিরিক্ত মালপত্র অনেক সময় অশান্তি সৃষ্টি করে—অসহায় করে মানুষকে। মজুরেরা অন্যায় দাবি তুলে মনোপীড়া ঘটায়। আবার এই মাল কোথাও রেখে সুস্থির হওয়া যায় না। দেবদর্শনে কিংবা নিসর্গ শোভা উপভোগের ক্ষেত্রে এরা সদাই হারাই হারাই ভাব নিয়ে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে মনে।

মনে মনে হাসলাম কারণ আমার সহযাত্রী—সর্বত্যাগের এই সাময়িকতম নমুনা দেখে যাকে নিয়েছেন আমি ধূর্তস্যাপি—কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। আরও একটা কারণে ওঁর ধারণা দৃঢ় হয়েছে হয়তো। অযত্ন বর্ধিত শণগুচ্ছ আর পারিপাটীহীন কেশরাশি। এটাও ক্ষৌর কর্মের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস মাত্র।

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লাম এমন ভাবে যার অর্থ খুশিমত ধরে নিতে বাধা নেই।

লোকটির মুখে অমায়িক হাসির তরঙ্গ উথলে উঠল। নড়েচড়ে বসে আমার দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললেন, আমি দেখেই বুঝেছি আপনি মহাত্মা। কিছু ধর্ম-প্রসঙ্গ ··করুন।

সর্বনাশ! ভেক নিইনি—ভিক্ষাও চাইনি, তবু ধর্ম-প্রসঙ্গ!

সবিনয়ে বললাম, ধর্ম জিনিসটা খুব সোজা নয়।

উনি সোৎসাহে মাথা নাড়লেন, যথার্থ বলেছেন স্বামীজী। সাধারণ মানুষের ধারণা তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঠাকুর দেবতা দেখে বেড়ালেই ধর্মকর্ম হল! তিলক কোঁটা কেটে আচার নিয়ম পালন করলেই ধার্মিক হয়।

বললাম, আমি ওসব কিছুই বুঝি না।

লোকটি তাড়াতাড়ি বললেন, ওসব বাইরের জিনিস, সাধারণ মানুষকে ভোলাবার কলাকৌশল। নয় কি স্বামীজী? আসলে ধর্ম হল ভিতরের জিনিস। মহাজনেরা বলেছেন—ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গোপন গুহায় লুকোনো থাকে।

বললাম গুহার মধ্যে কিন্তু অন্ধকার।

উনি বেঞ্চিতে একটা চাপড় মেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, এক্সাক্টলি! রাশি রাশি অন্ধকার। সেইজন্যেই তো সাধারণ মানুষ হাতড়ে মরে অন্ধকারে—আসল নকল খুঁজে পায় না। আপনি বলুন স্বামীজী সেই গোপন কথা—

ফ্যাসাদ আর কি! তীব্র দৃষ্টিটা ওর মুখের উপর বুলিয়ে নিলাম একবার। বুঝতে চাইলাম—কিসের আগ্রহে ও উত্তেজনায় এমন একটি লঘীণ মুহূর্ত সৃষ্টি করতে চাইছেন উনি? সত্যই কি জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহলে উদ্গ্রীব ওঁর মুখ, না পরীক্ষায় ছলনায় মুহ্যমান? কিছুই বুঝলাম না। মনে হল—গুহার মত অন্ধকার ওঁর মুখমণ্ডলে ঘনীভূত হয়েছে। কৌতূহলের সঙ্গে কৌতুকরসও হয়তো আছে। যাই হোক—আপাতত প্রসঙ্গ বাড়াব না স্থির করে বললাম, শরীরটা ভাল লাগছে না—বিশ্রাম করব খানিক।

উনি বললেন, ট্রেনের ঝাঁকুনি আর কয়লার গুঁড়ো—শরীর ভাল থাকে না। তা ছাড়া··· আচ্ছা বিশ্রাম করুন। আপনি তো আজই নামছেন না—আমিও নামছি না। পরে আলাপ হবে।

চোখ বুজেও অস্বস্তি ঘুচল না। কেন জানি না—মনে হল—উনি একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন। যেমন মনে হল—চোখ চাইলাম। আশ্চর্য—কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলে গেল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করলাম। অস্বস্তি কিন্তু বেড়েই গেল। এমনিতে তো কত লোক মুখের পানে চেয়ে থাকে—অস্বস্তি হয় না। কিন্তু সেইমাত্র একটি মানুষ সম্বন্ধে আর একটি মানুষ কৌতূহলী হয়ে ওঠে—অমনি কি নানান সন্দেহ অস্বাচ্ছন্দ্য আসে মনে! সেই চাউনির তখন নানা অর্থ আবিষ্কার করার নেশা জাগে। কেন ও আমার পানে অমন করে চাইল? আমাকে কি ওর ভাল লাগছে? কোন

পরিচিত প্রিয়জনের কথা মনে পড়ছে? কিংবা কোন অভিজ্ঞতার মর্ম কর্মের দৃষ্টি উন্মেষ হয়ে উঠছে? লোকটি প্রতারক কি না—কে জানে? কোন দুরাশাত ছলের অন্তরে হতে পারে। এমনি নানান সন্দেহের ছায়া গাড়ীর ভেতর লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলতে। কিন্তু উনি যে যথার্থ ধর্ম-পিপাসু হতে পারেন—এই অনুমান একবারও মনে এলো না।

এমনভাবে কতক্ষণ আর চোখ বুজে থাকা যায়—আবার চোখ চাইলাম। আর আশ্চর্য, দেখলাম—উনি সেই একভাবে আমার পানে চেয়ে বসে আছেন।

এবার আর চোখ বন্ধ করলাম না। মনের বিরক্তি ভাব যথাসম্ভব গোপন করে একটু হেসে বললাম, আপনি দেখছি—ঠায় একভাবেই বসে আছেন। সত্যিই কি আশা করেছেন—আমি ধর্ম-কথা বলব?

উনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, নিশ্চয় আশা করছি।

বললাম, দুঃখের অন্যায়ের কথা আসছে না,—কিন্তু আপনার আশা কোথায় গেলেন?

উনি বললেন, আপনার মুখের ভাবেই তা পেয়েছি। আমি বেশ বুঝেছি—আপনি একজন সর্বত্যাগী মহাত্মা। আপনার মধ্যে ভান নেই। তাহলে আপনি গেরুয়া পরতেন, টোটা টিলক কাটতেন, শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াতেন। ধর্ম আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ জিনিস—যেমন সহজে আমরা নিশ্বাস নিচ্ছি, আলো বাতাস ভোগ করছি।

বললাম, আসলে ধর্ম কোন কালেই কঠিন বস্তু নয়—হেঁয়ালি নয়। শাস্ত্রকারের অনেক বিধান চাপিয়ে জিনিসটাকে আমরা অতিশয় দুরূহ করে ফেলেছি।

উনি বললেন, মনটা যেহেতু জটিল—আপনি ভাল ভাল কথা বললেও আমি ভাবব ওসব আপনার মনের কথা নয়। মান সম্মান আদায় করার জন্য এমন আড়ম্বর করছেন—কথার চুবড়ি কাটাচ্ছেন। কেমন ঠিক কিনা?

দ্বিধায় সায় দিলাম না। কথায় আছে—অজ্ঞাত কুলশীলস্য। আবার সন্দেহ জাগল—আমায় দেখে ওর মনে সহসা ধর্ম-চেতনার উদয় হল কেন? একি শুধুই কৌতূহল—না—

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আপনার মত এমন করে ভাববার অবকাশ আমার হয়নি—কিন্তু ভাল ভাল কথা শুনতে ভালবাসেন—এমন মানুষও তো আছেন। যেমন আপনি। আবার এমন মানুষও তো আছেন—ভাল ভাল কথা বলে নিছক আনন্দ লাভ করেন—লোকেও নিজেকে চুনে ধরার ইচ্ছা যাঁর আদৌ থাকে না।

ভদ্রলোক হাসলেন। মাথা নাড়লেন দু'চার বার। বললেন, তেমন দৃষ্টান্ত আমার সামনেও পাচ্ছি। পাছে সকলের থেকে আপনাকে উঁচু মনে করি সেই ভয়েই মুখ খুলতেই চাইছেন না! বিশ্বাস করুন—আমি সেই ধর্মের কথাই শুনতে চাইছি—যা মানুষের জীবনকে সুস্থ রাখে—মনে শক্তি সঞ্চার করে—শান্তি এনে দেয়।

বললাম, পৃথিবীতে এই অবস্থাগুলি প্রতিটি মানুষের কাম্য। তবু বেশির ভাগ মানুষই এই পথের পথিক নয়। বলছেন—সুস্থ দেহ কে না কামনা করে? কে না চায় মানসিক শান্তি? কথাটা ঠিকই। কিন্তু সব জেনেশুনেও এ পথে পা বাড়াবার প্রবৃত্তি কেন আসে না—সেই তো আশ্চর্য।

প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বুদ্ধি প্রবৃত্তি আর বিবেচনার দাগ কাটা পথ আছে—সেই ছক কাটা পথে চলতেই সে ভালবাসে। যে সব ভাল ভাল কথা তার কানে যাবে—সেগুলির সঙ্গে প্রবৃত্তির যদি আপোষ রফা হয়—কথা মনের মধ্যে রয়ে যায়; যদি না মেলে বলবে—এমন উপদেশ বাস্তব ক্ষেত্রে অচল। বাস্তব ক্ষেত্রটা তার নিজেরই বিরোধী মানসিক সাজানো গোছানো তো।

বাঃ চমৎকার বলেছেন তো। সুন্দর! তবে যে বলছিলেন—ধর্মের কথা আপনি জানেন না?

এ কি ধর্মের কথা হল? বললাম।

হল না! উনি হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। কামনা-বাসনার খোলস ছেড়ে বাইরে আসা কি সহজ কথা! বুঝে শুনেই বলুন—মন মানবে কেন! ধরুন রাজনীতিতে আপনার একটা মতবাদ আছে—, মানে সক্রিয় অংশ—

হঠাৎ মনে হল আলোচনা বাঁক ঘুরতে চাইছে! মানে উনি প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইছেন। আমার মনের প্রবণতা পরীক্ষা করতে চাইছেন। আর একথাও ঠিক—আজকালকার দিনে রাজনীতি নিরাসক্ত মন ক'টা মানুষেরই বা আছে! তর্ক জয়ের ইচ্ছাতেও অন্তত একটা দিক অবলম্বন করতে হয়—। এটা হয়তো বা মানসিক দুর্বলতা। তবু টেন কামরার তর্ক বিমুখ মনকে আমি সংযত করলাম। ভাবলাম—দেশভ্রমণে এই প্রসঙ্গ নিরর্থক। আমি নিসর্গ শোভা উপভোগ করব—দেবমন্দিরের শিল্পকর্ম দেখব, দেবতাকে প্রণাম জানাব—আর নানা মানুষের সঙ্গে মিশব। আর সেই সঙ্গে—বুঝি আর নাই বুঝি—দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির চেহারাটা চিনে নেবার চেষ্টা করব। ইতিহাসের পটভূমিকায় এত বিচিত্রবেশী মানুষের আনাগোনা হয়েছে দেশের মাটির উপর দিয়ে তাদেরও কীর্তি কাহিনী শুনব। রাজা, রাজবংশ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ—মন্দির ঘিরে যশ খ্যাতির প্রতিষ্ঠা কল্পনা সবকিছুর আস্বাদ নেব। কিন্তু রাজনীতি—দলীয় মতবাদ? ভ্রমণ-ক্ষেত্রে ওটা অপ্রাসঙ্গিক।

বললাম রাজনীতির ধার আমি ধারি না।

উনি অতিশয় আশ্চর্য দৃষ্টিতে এক মিনিট কাল চেয়ে রইলেন আমার পানে। পরে মৃদু হেসে বললেন—বলেন কি! কিন্তু তার ভাবটা নিশ্চয় অস্বীকার করেও কাঁধ থেকে ঠেলে ফেলতে পারবেন না। এই যেমন ধরুন গতবারের কথা। চীনাদের আক্রমণে ভারতবর্ষে যে দুর্দৈব ঘনিয়ে এসেছিল—ভারতবাসী হয়ে নিশ্চয় আপনি চুপ করে থাকতে পারেন নি? তখন কি চীনাদের বিরুদ্ধে আপনার মনোভাব—

বললাম, ওসব আলোচনা করতে এখন ইচ্ছা করছে না। আপনি বরঞ্চ এই দেশের মন্দির আর দেবদেবী সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উনি হাসতে হাসতে বললেন, দেবদেবীর পরিচয় নতুন কি দেব—সারা ভারতবর্ষে ওদের একই গোত্র। বেঁচে থাকুক আমাদের বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কথাগুলি—

সবটা না শুনেই হাত দুটি বাঁকিয়ে আলস্য ত্যাগের ভঙ্গি করলাম—একটা হাই তুললাম—চোখ দুটি খানিক বন্ধ করলাম। এতগুলি ইঙ্গিত সত্ত্বেও উনি আমার পানে চেয়ে বসে রইলেন। অবশেষে ভাবলাম—থাকুন উনি দীর্ঘক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে। হোক অস্বস্তি—কোন মতেই আর চোখ চাইব না। এই অবাঞ্ছিত আলাপের সূত্রটা আর কিছুতেই টানব না।

টিকেট প্লীজ।

চেকারের কণ্ঠস্বরে চোখ চাইতেই চমক। পাশখানা দেখিয়ে ওর পানে চেয়ে দেখি—উনি তখনো পাকে চোখ বুজেছেন। চেকার ওঁর পানে ফিরে চাইল না—অন্য যাত্রীদের টিকিট দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। পুরাতন সহযাত্রীরা অনেকেই নেমে গেছেন—নতুন যাত্রী বিশেষ ওঠে নি। সব চেয়ে স্বস্তির কথা—সেই ভদ্রলোককেও দেখলাম না। বাইরে চেয়ে দেখি—আকাশ কি সুন্দর নীল। রুক্ষ বন্ধ্যা মাঠের উপর গভীর ভালবাসায় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সে আকাশ। বহুক্ষণ চেয়ে রইলাম মুগ্ধ চোখে।

বিরাট মন্দির অলিন্দ—প্রাঙ্গণ—গর্ভগৃহ আর স্তম্ভশ্রেণী। অনিন্দ্য শিল্পকর্মে মোড়া তার আগাপোড়া। অনুরক্ত বিস্ময়ে প্রদক্ষিণ করে চলেছি, কিন্তু শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত নই বলে—স্মৃতির আলোতে বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না সেই সৌন্দর্যকে। মন্দির দেখা শেষ করে সমুদ্রের ধারে এসে বসলাম। এখানে নূতন দৃশ্যপট—নূতন দৃষ্টিপাতে নূতন আনন্দের সঞ্চয়। ইতিমধ্যে অনুভব করলাম—আমার দর্শনে আরও কয়েকটি চক্ষুর তীক্ষ্ণ বিস্মিত আলো এসে পড়েছে। এই বিস্ময়বোধ আমি বিদেশী বলে নয়—কারণ বেশ বিদেশের যাত্রীদল এখানে আসে বলেই বেশ যাত্রাস্থা এত প্রবল। আমার অদ্ভুত বেশবাসই কি ওদের বিস্ময়ের হেতু? হয়তো তাই। একটি বস্ত্র কাঁধে ঝোলানো ঝুলির মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ভ্রমণ-বস্তুকে সঞ্চিত করে কোন পর্যটকই এমন ভাবে বেশ বেশান্তর ঘুরে বেড়াক না। পরণে গেরুয়া থাকলেও অর্থটা পরিষ্কার বোঝা যেত—কিংবা দেবতার ভোগ পূজা প্রণাম প্রার্থনাতেও যদি কিছু সময় দিতে পারতাম তাহলে এটা হেয়ালি থাকত না। হট্টমন্দিরে শয়ন—এবং যত্র-তত্র ভোজন এই বৃত্তও দেখছে না ওরা। সময় যত যায় আমার চ, চ, কৃচি অনুযোগ চলছে দিবা—অতএব কে এই দুরাচারী এই সংশয়-দ্বৈন ভঙ্গিতে ওরা আমার চালচলন লক্ষ্য করছে।

খুব কাছে দাঁড়ানো লোকটিকে হাত ইসারায় ডাকলাম। রাষ্ট্রভাষায় প্রশ্ন করলাম, কিছু বলবে?

ও কথা বলল না—শুধু মাথা নাড়ল। ভাষা পাল্টে প্রায় পরিত্যক্ত রাষ্ট্রভাষায় আলাপ করতে চাইলাম—ফল একই দাঁড়াল। ইসারা ইঙ্গিতেই প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল।

ওর প্রশ্ন: কেন এসেছ এখানে?

আমার প্রতি প্রশ্ন: কেন লোক আসে এখানে?

ওর উত্তর: দেবদর্শনে।

আমার উত্তর: মনে কর আমিও তাই এসেছি।

ওর প্রশ্ন: মনে করব কি করে! তুমি দেবদর্শন করলে বটে—দেবতাকে প্রণাম করলে না—পূজো দিলে না—বিভূতি নিলে না।

উত্তর: দেবতাকে পূজো করেছি মনে মনে। কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে আমি পূজো করিনি? তুমি কি সর্বক্ষণ আমাকে অনুসরণ করছ?

উত্তর : আমি কেন—অনেকেই তোমার চালচলন লক্ষ্য করছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, তাই নাকি! কিন্তু কেন?

ও বলল, তুমি কি জান না—আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রী আজ এখানে আসছেন?

বললাম, কৈ—নাত!

ও বলল, দেখছ না—কত সরকারী লোক-লস্কর ঘুরে বেড়াচ্ছে? কত শান্তিরক্ষক—

বললাম, আমি মন্দির দেখতে এসেছি—সমুদ্র দেখতে এসেছি, রাজপুরুষকে দেখে কি লাভ!

কিন্তু রাজপুরুষরা তোমাকে দেখছেন। আমরাও দেখছি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। ট্রেন থেকে এই সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। অমনি অখণ্ডবিবোধ করতে লাগলাম।

ইচ্ছা ছিল স্নান সেরে আর একবার মন্দিরের মধ্যেটা ঘুরে দেখব। সেই ইচ্ছা আপাতত পূর্ণ হবে না বুঝছি। মন্দিরের দুয়ারে চত্বরে শস্ত্রপাণি শান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। মন্দির প্রবেশে অবশ্য বাধা নাই—কিন্তু যাওয়া আসার পথটি সুনিয়ন্ত্রিত। মূলাধার রাজপুরুষটি দেবদর্শন করে যতক্ষণ না মন্দির ত্যাগ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বেড়ার বাধা ভাঙছে না। দাঁড়িয়ে রইলাম—মন্দিরের প্রবেশপথে।

অবশেষে সেই উত্তম পুরুষ—যাঁর জন্য এত সতর্ক রক্ষণার আয়োজন—মন্দিরে প্রবেশ করলেন। বহু যাত্রীও সেই সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। বেশ ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। যাত্রীদের অবশ্য আলাদা একটি নিয়ন্ত্রিত পথে চালান করে দেওয়া হলো। উত্তম পুরুষটির আগে পিছে সিপাই শান্ত্রী দারোগাই ছিল,—সাধারণ পোষাকের—অনাকরেক অসাধারণ পুরুষ ওঁকে ঘিরে পথ চলছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজনের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল—তিনি আগে পাশে চাইবার কালে আমাকে দেখলেন। ঈষৎ হাসি ফুটল ওঁর মুখে। হাত ইসারায় আমাকে বললেন—কাছে যেতে। হাত ইসারায় জানালাম—বেশ আছি এদের মধ্যে।

ওঁরা এগিয়ে গেলেন—আমি হারিয়ে গেলাম জন-সমুদ্রে।

তবু একেবারে হারিয়ে যাইনি।

সেইদিন অপরাহ্নে ট্রেন-কামরায় ওঁর সঙ্গে দেখা হলো।

আমাকে সমাদর করে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বললেন, নিবিঘ্নে দেবদর্শন হলো?

বললাম, আপনিও তো দেবদর্শনে গিয়েছিলেন।

উনি হেসে বললেন, বলতে গেলে দেবতার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছি।

বললাম—তা বটে জাগ্রত দেবতা।

বললেন—কিন্তু মহাত্মা—দেবতাকে চেনা খুব শক্ত নয়—মাঝে মাঝে মুশকিল হয় আপনাদের মত মহাত্মাদের নিয়ে।

কেন—আমরা কি অপরাধ করলাম?

উনি হেসে বললেন, অপরাধের কথা বলছি না। আপনারা মহাত্মা—অপরাধ আপনাদের কিন্তু পুরোপুরি একটা পথ যদি আপনারা ধরেন আমাদের হয়রানিটা কম হয়।

যথা?

বুঝলেন না—যেমন আপনার বেশবাস। এটা না পরলে—না যাইলে। বেশ খানিকটা এনিমেশন সৃষ্টি করছে না কি? তবে আপনি গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলুন—নতুবা পোষাক বদলে নিন—আমরা তাহলে নিশ্চিন্ত হই।

বললাম, আমার পুরো পরিচয়টি পেলে এসব উপদেশ দিতেন না।

উনি হাসলেন। পুরো পরিচয়টা না নিইয়ে কি ছেড়েছেন মনে করেন? না হলে সেদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যেতে পারতাম!

বিস্মিত হয়ে বললাম, কখন পেলেন পরিচয়!

উনি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। বেশ করে ভেবে দেখুন তো!

এমন সময় চেকার উঠল গাড়ীতে। যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করতে করতে চেকার ওঁকে কিন্তু পাশ কাটিয়ে গেল।

যাবার সময় ওঁর পানে চেয়ে হাসল—মানে চলে আমার অভ্যেস আছে ইতিমধ্যে।

এতক্ষণে অন্ধকার তরল হয়ে এলো। এবার আর বিদ্যুৎ চমকাবে না মুহূর্ত কালের জন্য—চল্লিশ ওয়াটের বিদ্যুৎ-বাতিকে আশ্রয় করে স্থির হ'ল।

রাজাজোড়া বিস্তীর্ণ একটি জলের এলাকাকে প্রত্যক্ষ করলাম।

আমার সংশয়যুক্ত মনোভাবটি বুঝে নিয়ে উনি হাসলেন। বললেন, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি বন্ধুভাবে। অবশ্য বন্ধুই আপনি—কথায় বলে এক সঙ্গে সাত পা বাড়ালেই বন্ধু। তা আপনার সঙ্গে একই ট্রেন কামরায় পুরো দেড়টা দিন তো কেটেছে। হ্যাঁ—কথাটি বন্ধুভাবেই। বলছি—আর কখনও এমনভাবে দেশভ্রমণে বা'র হবেননা—কিছু সঙ্গেসঙ্গে সঙ্গে রাখবেন—ভ্রমণটি নিরাপদ হবে।

ট্রেন তখন একটি জংশনে এসে

বললেন, নমস্কার। কথাটা মনে রাখবেন।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

**সতর্কীকরণ :—**

কিনিবার সময়
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি
পিলফার প্রুফ ক্যাপের
উপর **R.C.M.** মনোগ্রাম
ও প্রস্তুতকারক
এম, এল, বসু এণ্ড কোং
দেখিয়া লইবেন।

# লক্ষ্মীবিলাস তৈল

**এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ**
**লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা—৯**

# ভেজাল

## আশাপূর্ণা দেবী

'ভেজাল! ভেজাল!'

ননী বক্সি রেগে বলেন, শুনে শুনে কান পচে গেল! যেন কী এক নতুন ঘটনা! যেন ওই 'ভেজাল' শব্দটা অভিধানে ছিলনা, তোরাই নতুন সৃষ্টি করলি! বলে কত ভেজালই দেখলাম জীবনে!

খড়দার নাতবৌ বলে, 'সে কী দাদু, আপনাদের আমলেও ভেজাল ছিল?'

'ছিল না?' ননী বক্সি রেগে উঠেন, 'কেন, থাকবেনা কেন? তোদের এ যুগেরই যেন আছে? আমাদের যুগে ছিলনা? বলি কী বা ভেজাল দেখাচ্ছিস তোরা? বড় জোর চালে কাঁকর তেলে শেয়াল কাঁটা, ময়দায় সোপস্টোন্, কেরোসিনে জল, চায়ের পাতায় চালতার ছাই, কি না হয়—ওষুধে ডিষ্টিলড্ ওয়াটার! এই তো? এর বেশী তো নয়?…না হয় ওই রকমই। শুনেছিলাম বটে সাগুতে সাগু, বালিতে বালি, এসব আর থাকে না আজকাল।…তবু ঝিনিসে ভেজাল তো সোজা যে, আমাদের শ্বাশুড়ী একজন মানুষে এমন ভেজাল দিয়েছিল, শুনলে বুঝবি! কিরকটি পার্সেন্ট ভেজাল!

খড়দার নাতবৌ বলে, 'কর্সা মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বুঝি?'

'উঁহু! ও নয়। ও তো আকছারের ঘটনা। এ আর এক কায়দা। তা' হলে শোন গোড়া থেকেই বলি। গল্পের রস পাবি।…

আমাদের গ্রামের জমিদার হরসুন্দরবাবু অল্পবয়সে বিপত্নীক, ছেলেপুলেও ছিল না। কিন্তু আর বিয়ে করেন নি, গোটা তিনেক ভাইপো ছিল, তাদের সংসার নিয়েই সংসার।…তা ছিলেন খুবই ডাঁটের ওপর। চাকর বাকর, নায়েব গোমস্তা, আমলা পাইক থেকে সুরু করে, ওই ভাইপো ভাইপোবৌরা পর্যন্ত সব তটস্থ, জোড়হস্ত। বচেৎ পান থেকে চুণ খসলে গর্জান নেবেন জেঠামশাই।

তা' ভাল কি বাসেন না তিনি এদের?

বাসেন। বরং একটু বেশীই বাসেন। বুড়ো হাতী ভাইপোগুলো যে একটা কাজ করে না, অথচ মনের খুশিতে সংসার বাড়িয়ে চলছে, এ তিনি তাকিয়েও দেখেন না। একেবারে স্বোপার্জিত অর্থে হরসুন্দরের এই জমিদারী, কিন্তু ভাইপোদের অবাধ্যর ভাবেন না। তবে ওই বাইরের মূর্তিটি বেশ 'রুদ্র রুদ্র'!

তাই বৌমারা শুধু সেবার মূর্তি হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, ধারে কাছে আসেন না। অন্য কেউও না। কাছে আসে শুধু ছোট ভাইপোর মেজ মেয়েটা। মেয়েটাকে তিনি 'সুয়োরাণী' বলেন।

সুয়োরাণীর দাপটও তত, আবদারও তত। হরসুন্দর বলেন, 'এই একটা মেয়েই যা মানুষের মেয়ে। আর সব মাটির পুতুল! দূর দূর!'

অথচ সুয়োরাণীর মা আড়ালে মেয়েকে শাসন করে, 'দাদুর কাছে অন্ততঃ একটু শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতে পার না? এই তো বাড়ীতে এতগুলো ছেলে মেয়ে রয়েছে দেখে শিখতে পারনা?'

সুযোরাণী অবজ্ঞাভরে চলে যায়।

গিয়ে বলে, 'দাদু তুমি সবাইয়ের কাছে এত রাগী দেখাও কেন?'

হরসুন্দর হেসে বলেন, 'রাগী দেখাই কি রে? অবর রাগী তো আমি!'

সুযোরাণী মাথা নেড়ে বলে, 'কক্ষণো না। তুমি শুধু রাগী দেখাও।'

হরসুন্দর মেয়েটাকে কাছে টেনে বলেন, 'এ কথা তোকে কে বললে রে সুযোরাণী?'

'বলবে আবার কে?' বছর ছয়ের মেয়েটা রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'আমি নিজেই সব বুঝতে পারি। তা' দেখাও কেন বাপু, মা বড়মা মেজমা কত নিন্দে করে!'

হরসুন্দর হেসে বলেন, 'নিন্দে করে? কি বলে রে?'

সুযোরাণী সোৎসাহে বলে, 'বলে, কী জ্বালাই হয়েছে বাবা! আর ভালো লাগেনা! খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল! মেজমা আবার বলে, গিন্নী নেই, তাই এত মেজাজ!'

'বটে! এই সব বলে তারা?'

হরসুন্দর একটু গুম্ হয়ে যান। বোধকরি ঠিক এ ধরনের রিপোর্ট আশা করেননি। সুযোরাণী আরো উৎসাহে বলে, 'বলেই তো! আরো কত কী বলে! তুমি এক ঘণ্টা ধরে ভাত খাও, বসে বসে পাখা নাড়তে হয়—তা' রাগী হওয়াটা ছেড়ে দাওনা দাদু?'

'ছেড়ে?'

হরসুন্দর বলে ওঠেন 'ছেড়ে দিলে তোর ওই বাবা জ্যেঠা আর মেয়েরা এই বুড়োর টাকের ওপর নেত্য করবে বুঝেছিস?'

মেয়েটা দাদুর কথার তত্ত্বে ঢুকতে পারে না, বলে উঠে, 'তুমি বুড়ো? ইস!'

হরসুন্দরের মেঘাচ্ছন্ন মুখে ঈষৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলেন, 'বুড়ো নই?'

'মোটেই না। বড় জ্যেঠু তোমার থেকে অনেক—অনেক বুড়ো!'

মেঘ কেটে সূর্য উঠলো।

বললেন, 'দূর পাগলী!'

বললেন, 'তবু মনের মধ্যে পুরোপুরি একটা কাঁটা-গাছের ঝাড় পুঁতে রইলো! যে বৌমাদের ভক্তির প্রতিমূর্তি আর যে ভাইপোদের গরুড়ের অবতার বলে মনে হতো, তাদের মধ্যে অনেক ভেজাল দেখতে পেলেন। কাঁটা মানেই ফোটা! কাঁটা ফোটে, চোখও ফোটে।

এখন দেখতে পান ভাতের কাছে পাখা নিয়ে বসেন বৌমারা পালা করে। এক একদিন এক একজন। এটা আগে চোখে পড়েনি। তারপর দেখেন, ওই এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘোমটার মধ্যে একশোটা হাই উঠছে।

আর একদিন দেখলেন ভাতে বান।

একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে।

সংকল্প স্থির করে ফেললেন সেদিন।

খাওয়ার পর বৌমাদের ডেকে কাছে বসিয়ে, বেশ কিছুক্ষণ গড়গড়া খেয়ে বেশ একটু স্নেহের স্বরে বলেন, 'মা জননীদের বোধহয় এই শ্বশুর ব্যাটাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধে হচ্ছে?'

মা জননীরা শিউরে উঠলেন।

তবে হরসুন্দর তাতে দৃষ্টিপাত করলেন না। বলতে লাগলেন, 'হতেই পারে। মা ষষ্ঠীর কৃপা তো বৃদ্ধিই পাচ্ছে, কাজেই সময় কমছে। তাই ভাবছি—।'

বৌমারা কথা শেষ করতে দিল না। হৈ হৈ করে উঠলো, কাঁদো কাঁদো হলো, ভাতরাঘা রাঁধুনীটার মাইনে কাটবে প্রতিশ্রুতি দিল।

অতএব হরসুন্দর সেদিন আর, কি যে ভাবছেন, সেটা আর ব্যক্ত করতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন। বৌমারা অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

কিন্তু মা জননীদের কপাল নিতান্তই ভেঙেছে। ক'দিন পরেই দেখা গেল হরসুন্দরের অন্ন গ্রাসে ঘুণো ভাসছে।

হরসুন্দর সেদিন আর মাদের ডাকলেন না, ডাকলেন বাবাদের। বললেন, 'তোমাদের সংসার বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে, মা জননীরা আর শ্বশুরের সেবা পেয়ে উঠছেন না বুঝতে পারছি, তাই ভাবছি— এতদিন পরে আবার কেঁচে গণ্ডুষই করতে হবে।'

কেঁচে গণ্ডুষ!

সেটা কি বস্তু!

ভাইপোদের তিন জুগুপে ছটা চোখ নীটোল গোল হয়ে উঠল। সেই চোখ দিয়েই তারা এই গোলমেলে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলো। তা' বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হরসুন্দর কথা শেষ করলেন, 'অসুবিধা নিবারণার্থেই আর একবার দারপরিগ্রহ করবো ঠিক করছি!'

ঠিক করছি!

তার মানেই 'করে ফেলেছি!'

ভাইপোরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না। তবু 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' নীতিতে গলোমেলো বলে উঠলো, 'কে বলেছে অসুবিধে? আপনার জন্তে অসুবিধে? বলে সেবা করে মরে যাচ্ছে। কারুর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না!'

হরসুন্দর বললেন, 'ওদের না হোক, আমার অসুবিধে হচ্ছে। সরকারকে বলে দিও ঘটক মশাইকে একবার খবর দিতে।'

ঘটক এল।

পরামর্শ হল।

উঠে-পড়ে কনে খুঁজতে লাগল। সুন্দরী কনে চাই, বয়েস বেশী হ'লে চলবে না। বুড়ো বিদ্যে দোষ মানবে না।...

ভাইপো ভাইপোবৌরা মাথায় হাত দিয়েই রইল।

সুয়োরাণী এসে বললো, 'দাদু, ভীমরতি মানে কি ?'

দাদু বলেন, 'ও একটা বদ্যি ! কেন এ কথা কে বলেছে রে ? তোর মামণিরা বুঝি ?'

সুয়োরাণী সহোৎসাহে বলল, 'হাঁ !' মেজমা বলল, 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।'

এখন আর হরসুন্দর শুম হলেন না। হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'তোর মেজমা সব ঘরে ফেলে কি করে বল দিকি ?'

'কি জানি দাদু ! বললে, 'আমাদের জব্দ করতে বিয়ে করছে তোর দাদু !'

'ঠিক ঠিক ধরেছে।' হরসুন্দর আবার হাসেন, 'তা' বিয়ে করায় তোর কি মত বল্‌তো সুয়োরাণী ?'

সুয়োরাণী বলে, 'আমার তো খুবই মত। অনেক ঘটা হবে দাদু ?'

'দূর পাগলী !'

সুয়োরাণী মুখ ভার করে, 'ঘটা হবে না ? তবে কি ছাই বিয়ে ? ঘটা হবে লোক নেমন্তন্ন হবে, কতো আলো জলবে সামাই বাজবে, তবে তো বিয়ে !'

হরসুন্দর বলেন, 'তাইতো ! সাধে কি বলি সুয়োরাণী ! সত্যি বটে, লোকে ভোজ না খেলে আবার বিয়ে ! লাগিয়ে দাও ঘটা !'

খড়দার নাত-বৌ বলে, 'বয়েস কত বুড়োর ?'

'তা' চৌষট্টি-ছেষট্টি। হলে হবে কি ? সোজা শালগাছ ! বিয়ের ঘটাতেও বেমানান নয় !'

'তা' হলে সত্যি বিয়ে করলেন ?' নাত-বৌ চোখ কপালে তুলে রাখে, নামায় না, 'কনে জুটলো ?'

ননী বক্সি বললেন, 'নিশ্চয়ই ! জুটবে না কি রে ? যদি শুধু এই পোড়া বাংলা দেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশে পয়সাওলার কনে জোটে না রে ? আলী হলেও জোটে।···হরসুন্দরের তো আসীর অনেক দেরী !'···

বিয়ে হল।

হরসুন্দর আর নাপিত-পুরুত-ঘটক ! মেয়ে গরীবের, বেশী বরযাত্রী পারবে না। না পারুক, হরসুন্দর তো এ-পক্ষে প্রচুর ঘটা করছেন ! মনে ফুর্তি কত ! গরীবের মেয়ে হলে কি হবে, বিবি সুন্দরী ! টুলটুলে চোখ, টুলটুলে মুখ, হাত-পা নরম-কচুপাতার মত !

'তা' বক্সি হলো।

প্রকাণ্ড বক্সি। গ্রাম কে গ্রাম, পাশের গ্রামে পর্যন্ত নেমন্তন্ন। হরসুন্দর নিজে দাঁড়িয়ে—প্রজা পাঠকদের সব খাওয়ালেন। 'আরো নে আরো নে' করে দিয়ে, বলতে লাগলেন, 'অনেক বিয়ের ভোজ তো খেয়েছিস, বাবার বিয়ের ভোজ খেয়েছিস-কখনো ? খাসনি। খা ভাল করে। পেট পুরে খা !'

লোকে খেলো, হাঁদা বাঁধলো, আর বলতে লাগলো, 'বুড়ো দুচি-মণ্ডা ঠেসে নিজের মুখ বন্ধ করলো!'

মা জননীরা আর বাবাধনেরা ম্রিয়মান মুখে বজ্জির কারেল' ঠেলতে লাগলেন। হাজারো তো কম হল না? এদিকে ওদিকের দূর আত্মীয়রা এসেছে, বেশ কিছুদিন ধরেও যাবে বোঝা যাচ্ছে। অতএব—! তারপর তোষার গিয়ে জিনিসও তো এসেছে এখান-ওখান থেকে? মাটোরের কাঁচাগোল্লা—গুপ্তি-পাড়ার খেদো-মণ্ডা, কেটনগরের সরভাজা, মোল্লার চকের দই। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। যারা সে সব এনেছে তারা তিন দিন ধরে খাচ্ছে যাবছে, একেবারে রাজসূয় কাণ্ড!

এরা ঘরে ঘরে বলাবলি করছে, 'বিয়ের নামেই এত বেহায়াপি! এরপর বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে আমাদেরই ঘাস ওঠাতে হবে।'

কিন্তু ঘাস ওঠানো কথাটা বলা যত সহজ, কাজে তো তত সহজ নয়। কাজে কাজেই ভাইপো-বৌরা জ্যেঠ-শ্বশুরের ফুলশয্যের পালঙ্কে ফুলের তোড়া রাখতে, আর বিছানায় 'খোসবু' ছালতেও ত্রুটি করল না।

কিন্তু ধৈর্য রাখা যায় হলো কনে সাজানোর সময়। এদিকে কনে এসে অবধি ঘোমটার মুখ ঢেকে বসে আছে, কিন্তু ফুলশয্যার সাজসজ্জার সময় হঠাৎ বিয়ের কনে আগ্রহী মহিলাদের হাত থেকে শাড়ী গহনা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, 'আমি নিজে সাজবো—' বলে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল!

এ কী!

এ কোন ধরণের অসভ্যতা!

বুঝতে বাকী রইল না, বাপের বাড়ীর শিক্ষার ফল। নির্ঘাৎ তারা বলে দিয়েছে 'তুই গিন্নী, তুই সর্বেসর্বা, তুই কারো কথা শুনবি না।'

বৌরা কপালে ঘা মেরে বললো, 'কপালে এতও ছিল!'

কিন্তু কপালে যে আরো কত ছিল, তা তখনও জানে না তারা। জানলো মাঝরাতে।

মাঝরাত্তিরে ফুলশয্যার ঘর থেকে মেয়েলি আর শিক্ষিত সুরেলা গলায় গান উঠলো!

কে!

কে!

কার গলা!

বাড়ীর এরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর—গ্রামের গভীর-রাত্রির শুব্ধতা ভেদ করে সে সুর বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছল, সবাই উৎকর্ণ হল! এ গলা এর আগে কে শুনেছে জমিদার-বাড়ী থেকে? মেয়ে-গলায় গানই বা কে শুনেছে?

সন্দেহ থাকে না কে গাইছে।

ছাপাই বস্ত্র পরিষ্কার
১২নং [illegible] লেন [illegible] কলিকাতা-১২

নিজ নিজ শয়ন মন্দিরে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকলো ওরা, কারণ সুর ক্রমশঃ সপ্তগ্রামে উঠছে ; ঝনঝন করে বাজছে !

'নবদিনী বোলো নগরে নগরে !
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী—
কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে !'

বুঝতে আর বাকী রইল না কারো, বিয়ের ছল করে জ্যাঠামশাই এই বৃদ্ধ বয়সে একটা বাইজী ছুঁড়িকে ঘরে এনে তুলেছেন !

মায়েরা বললেন, 'আমরা এ কীর্তি সইতে পারবো না !'

বাবারা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পারবে না তো যাবে কোথায় ? পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে সতেরটি মিলে রাম রাজত্ব করে চলেছি, কত ধানে কত চাল, তা টের পাইনি। এখন কি মুটে-গিরি করতে বেরোবো ? ঠাকুর্দার সম্পত্তি নয় যে তাদের দাবী করবো। দোষ তো তোমাদেরই ! তিন তিনটে মেয়ে মানুষে মিলে একটা মাত্র বুড়ো শ্বশুরের সেবা করছো এতটি পাওয়ার বিনিময়ে, তাতেও তাতে ঘুন পড়ে, জলে ধুলো পড়ে। তা ছাড়া নিত্য অসন্তোষ করছো। ঠিক হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর !'

পতিদেবতাদের এহেন সহানুভূতিহীনতায় তাদের বুকে মুগুর পড়ে, আর সেই মুগুর পড়া বুক ছুরি দিয়ে কাটতে থাকে। ধারালো ছুরি !

'আমার কুহে যাওয়া
হলনা রে সই !'

ছি ছি ছি !

ভদ্রঘরের মেয়ের মুখে এই গান ! তাও কি না লুকিয়ে মেয়ে মহলে নয়। ফুলশয্যার ঘরে বরের কাছে !...ধরণী কেন দ্বিধা হচ্ছেন না !

পরদিন থেকেই নতুনবৌ ঘরের সেবাযত্ন বুঝে নিতে থাকে। বলে, 'বৌমারা, ঘরে যাও বাছা তোমাদের শ্বশুর কখন কি খান।'...বলে, 'ভাত খাবার সময় তোমাদের আর কাছে বসতে হবে না মা ! আমিই বসবো।' বলে, 'ভাঁড়ারের চাবিতে আমার দরকার নেই বৌমা, শুধু পতি-সেবাটুকু করতে পেলেই ধন্য হবো।'

ছোট বৌ আর থাকতে পারে না।

বলে, 'তবু যদি না ঠাকুর্দার বয়সী পতি হতো !'

বৌ মাথা নীচু করে হাসে।

বলে, 'হরগৌরীরও বয়সের তফাৎ আকাশ পাতাল !'

এমনি পাকা পাকা কথা বৌয়ের।

অথচ সংসারের কাজের দিকে উঁকি নেই। সারাদিন চোখে সুর্মা, ঠোঁটে রং, আর আটাঁসে অলঙ্কার পরে ঘরের মধ্যে বালিশ কোলে করে বসে থাকে, দুবেলা শুধু কর্তার খাওয়ার সময় ঘন ঘন্টি বাজিয়ে ছুটে এসে কালঘাম পাখা নেড়ে বাতাস করে। এবং নিজে পাশে বসে চব্য চোষ্য খায়।

নতুন খাওড়ীর খাওয়া দেখেও এরা গালে হাত দেয়। সন্দেহ নেই বেহাৎ আদেখলে ঘরের মেয়ে!

মানুষের সবই সয়।

মানুষ মানে মহাশয়।

তবু সবই কি আর সয়?

সন্ধ্যেরাত্তির থেকে মাঝ রাত্তির অবধি কর্তার শয়নঘরিয়ে উপস্থিতি।

হরেক রকম গান, গাগল করে তোলে এদের।

তাই কি শুধু গান?

এপাড়া ওপাড়া তরঙ্গ তুলে গান ছোটে,

'আমি যমুনাতে জল আনিতে
যাবো কেমনে···এ!
সখীরে এ···এ···এ
পথে পা ফেলিতে
আমার, ঘরে শমনে।'

খড়দার নাওবৌ ছেলে কুটিকুটি হয়ে বলে, 'তা' বাপু পাগল হওয়া তাদের অন্যায় নয়।'

'তা' নয়!' ননী বস্তি বলেন, 'ভাইপোরা পাগলই হয়ে ওঠে। নতুন জ্যেঠির গলার সুরটা পর্যন্ত বাইজীদের মত চাঁছা ছোলা ধারালো, আর নাকী নাকী!···এ কখনোই ভদ্রঘরের মেয়ে নয়!

ঘটক ব্যাটার খোঁজ করে, পাত্তা নেই।

হঠাৎ একদিন তিনভাইয়ের দুই ভাই যাচ্ছিল হাটের পথে, সামনে সেই ঘটক।

আর যায় কোথা। চেপে ধরলো দুই ভাই, বললো, 'গলায় গামছা মোড়া দিয়ে শেষ করবো তোকে, বল ব্যাটা কোন লক্ষীছাড়া ঘর থেকে মেয়ে এনে দিয়েছিস!'

ঘটক প্রথমে হাতজোড় করে বলে, 'আজ্ঞে বাবু মশায়রা উত্তম ঘর, নৈকষ্ঠ কুলিনের ঘর, মেয়ে সুশ্রী সুলক্ষণা—' কিন্তু সত্যি যখন গলায় উড়ুনির পাক পড়তে লাগলো তখন প্রাণের দায়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়ল, আজ্ঞে প্রাণে বধ করবেন না বাবু মশায়রা, বলছি···বলছি···! মেয়েই নয়, আসলে ছেলে।'

ছেলে!

ছেলে।

খড়দার নাওবৌ গালে হাত আটকে ফেলে বলে, 'ছেলে!'

ননী বস্তি বলেন, 'হ্যাঁ ছেলে! যাত্রার দলের ছেলে। দেখলে ঘরে কার সাধ্যি! বৌদের বশ করতে ঘটকের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্র বুড়োর। যাত্রার দলের ওই ছোঁড়াটাও ধুরন্ধর, বলেছে, কেষ্টর রাধিকা সেজে যা পাই জমিদার বাবুর রাধিকা সাজতে তার ডবল চাই কিন্তু!'

কর্তা তাতেই রাজী।

ঘটককে বলেছেন, 'দ্যাখ ব্যাটা, আমার মা জননীদের মাথার ওপর একটা লজ্জাল যাওড়ী এনে বসিয়ে দিতে পারলেই উত্তর হবে, কিন্তু সাপ মারতে তো আর লাঠিগাছটা ভাঙতে পারিনা আমি? ···লাঠি আস্ত রেখে সাপ মারার কৌশল আবিষ্কারের দরকার—।

সেই আবিষ্কারের ফল ওই যাত্রার রাধিকা। কর্তা দেখে শুনে পছন্দ করে বলেছেন, 'দেখ্, তোকে সারা দিনমান আমার গিন্নী সেজে থাকতে হবে, বৌমাদের একটু কুটুল কায়দা দিতে হবে, আর সন্ধ্যে তোর আমাকে উত্তম উত্তম গান শোনাতে হবে, এই তোর চাকরী! আমার নহলে বেলাই ঘর বারান্দা আছে, রাতের বেলা কোনোখানে পড়ে থাকবি, কেউ টের পাবে না।'···

যাই হোক বাবু মশায়রা, আমি একথা প্রকাশ করেছি, কর্তা মশাই যেন ঘুণাক্ষরে টের না পান। উনি আমাদের এমনি তো শিব, রাগলে ভৈরব!'

ভাইপোরা রেগে বলল, 'সব সময়ই ভৈরব!'

ঘটক বললো, 'সে কি কথা? কত আমুদে মানুষ! বললেন, 'দেখ ঘোষাল, এই উপলক্ষে বেশ একটা ভোজও লাগানো যাবে। অনেকদিন বাড়ীতে তেমন কাজ কর্ম হয়নি, গাঁয়ের লোক নির্ঘাৎ ভোজের আশায় এই বুড়োর মরণ চাঁকছে। তা' আবার ওই কচুস ভাইপোগুলো তো আঠার ছেরাদ্দর—আঁ · আঁ···আঁ···ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, আমি বলিনি কর্তা মশাই বলেছেন!'

ভাইপোরা বলে—'

খড়দার নাতবৌ অধীর হয়ে বলে, 'শেষটা কী হলো আগে বলুন মামা! ওরা বাড়ী ফিরে কী করলো?'

'ওরা?'

ননী বক্সি হেসে ওঠেন 'করবে আবার কি, আঠার সামনে চাঁ্যা ফোঁ করার সাধ্যি আছে? কীল খেয়ে কীল চুরি! বৌয়ের পর্যন্ত বলতে সাহস পেলনা। জানে মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকেনা।

বৌরা বলে, 'যাই বলো, নতুন জোঠির সবই কেমন বিটকেল! কিছুতে কারো সামনে চুল বাঁধেনা। ঈশ্বর জানেন পরচুল নাকি। হয়তো 'কেশবতী' ছিলেন কন্যে—।

ভাইপোরা বলে, 'হুঁ'!'

বৌরা বলে, 'ওই! ওই হলো মুস্কু! উঃ এত পাপও ছিল আমাদের!'

বৌয়ের কথা শোনা যায়না, জোঠশাশুড়ীর গলা বেজে ওঠে—

'আমি যমুনাতে জল আনিতে
যাবো কেমনে?
সঈরে এ···এ···এ—
পথে পা ফেলিতে
আমার ঘরে শমনে।'

ভাইপোরা বলে 'হুঁ।'

খড়দার নাতবৌ হেসে পড়ায়, 'তারপর ?'

'তারপর' ?'

মনী বক্সি হেসে ওঠেন, 'তারপর আর এক নতুন পালাগান।···একদিন কর্তার স্নানের বাটিতে পিপড়ে। ঘাস কর্তা রেগে উঠে তরুণী ভার্যাকে এই মার তো সেই মার।···'সেবা বড়র ঘাটতি ঘটেছে বলে তোমায় আনি ঘরে এনে, তাই কাপড় দিয়ে পুষছি, আর এই সেবার ছিরি তোমার ? যাও ত্যাগ দিলাম !'

আসলে সবই সাজানো ব্যাপার। ছোড়া আর বড়নে থাকতে চাইছিল না। তবে এখন তাকে নিখুঁৎ করতে পায়ে পড়ে বললো, 'আর এমন হবেনা মাগো ! দাসীরে চরণে ঠেলিবেন না !'

হরসুন্দর বলেন, 'উঁহু আমার সে কথা সেই কাজ ! ত্যাগ যখন দিয়েছি, তখন আর না ! যাও বাপের বাড়ী চলে যাও। মাস মাস মাসোহারা পাবে।··· তবে গানটা বেশ গাইতে, মাঝে মাঝে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পালকী চড়ে এসে দু পাঁচটা গান শুনিয়ে যাবে, ব্যস।·· কাউকে দরকার নেই আমার। কাল থেকে সুরোরাণী আমায় খাওয়া দাওয়া দেখবে।··· কী রে পারবি না ?'

সুরোরাণী একগাল হেসে বললো 'খুব ! পাখা নাড়া আবার কাজ নাকি ?'

খড়দার নাতবৌ বলল, 'ওমা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ তাহলে হলোনা ?'

'না না ! পুরোপুরি উদ্ঘাটিত আর হলো কই ?' মনী বক্সি বলেন, 'তেজালের যা স্বধর্ম, 'ঢাকে ঢোলে কাঠি, উনু দিতে নারা !' ঘরে ঘরে হাসাহাসি, সামনা সামনি ফাঁস নেই। কার মুখ থেকে প্রকাশ 'পেয়েছে ?' বলে সন্ধান নেতে স্তব্ধ ?··· অতএব কি মাসের পয়লা তারিখে গোমস্তা হিসেব লেখে, 'গিন্নীমার মাসোহারা বাবদ এতটাকা !' আর মাঝে মাঝেই জমিদারের পালকী যায় গিন্নীমাকে আনতে। পালকী দেখলেই গাঁয়ের লোক মুখটিপে হেসে বলে, 'ওই যে জমিদার গিন্নী আসছেন, কেত্তন গাইতে।'

আট অঙ্গ অলঙ্কারে ঢেকে, ঘোমটায় মুখ ঢেকে গিন্নী পালকী থেকে নেমেই ওপর মহলে উঠে যান, আর মাঝা চাছা গলায় গান ধরেন,

'সখী বিরহ দারুণ জ্বালা
হানিল নিঠুর কালা,
ব্রজ ছেড়ে—
গেল মধুরায়,
বংশিল কালির সর্প,
ভাঙিল রাধার দর্প,
প্রাণ তার যুক্তি-হার যায়।'

আর অবিপ্তি কারো বুক ছুরি দিয়ে কাটেনা, হেসে লুটোপুটি হয় বৌরা ! আর জ্যেঠ শ্বশুর হেঁকে হুকুম দেন, 'মা জননীরা খাণ্ডড়ীকে মুংকরে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছেড়ো ! গরীবের ঘেয়ে, ছুটো ভাল মন্দ খেয়ে যাক তোমাদের ঘর থেকে।'··

শুনলি তো তেজালের গল্প ? একে বলি তেজাল।

মনী বক্সি হেসে ওঠেন।

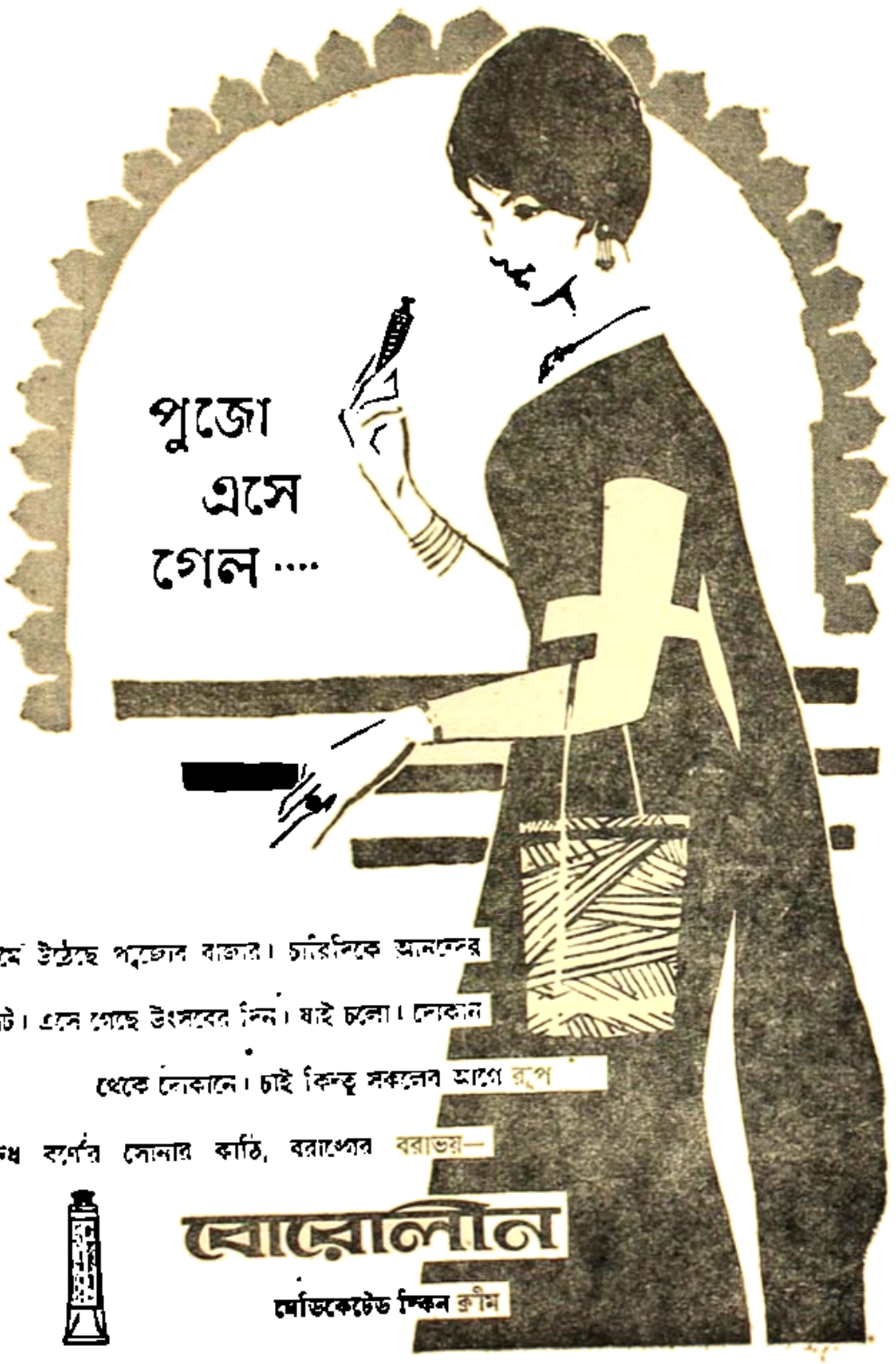


জমে উঠেছে পুজোর বাজার। চারদিকে আনন্দের হাট। এসে গেছে উৎসবের দিন। যাই চলো। দোকান থেকে দোকানে। চাই কিন্তু সকলের আগে রূপ গন্ধ বর্ণের সোনার কাঠি, বরাভয়ের বরাভয়—



# বোরোলীন

মেডিকেটেড স্কিন ক্রীম

# কবিকথা

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান বুদ্ধদেব একদিন বলেছিলেন—সহকারক হিতৈষীদের—এই গৃহকারক আমি তোমাকে দেখেছি,—তাহার মধ্যে দেখেছি, দুঃখের মধ্যে দেখেছি, অনিত্যের মধ্যে দেখেছি—সেই গৃহকূটের সকল স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে তোমায় দেখতে চাই সন্ন্যাসের যোগিতে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এ শুধু মহাসাধকের কথা নয়, কবিমনীষিদেরও কথা। আমি দেখবো, আমি জানবো, আমি বুঝবো, আমি রস উপলব্ধি করবো, আমি এক আমি বহু হবো, সৃষ্টিকে করবো আনন্দময়, জগন্নাথস্বামী, তুমি দেখা দাও, নয়নপথগামী হও—

গগনের থালায় রবিচন্দ্রদীপক জ্বলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতিরে আসল রবীন্দ্রনাথ ত সেইখানে, তিনি দেখছেন, তিনি শুনছেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে, বিস্ময়ে তাঁর প্রাণ জেগে ওঠে। তাই কবিকে দেখতে গেলে জানতে গেলে শুধু তাঁর কাব্যে গানে, সাহিত্যেই পাবনা, পাবো আরো গভীরে, তাঁর জীবনের সামান্যতম ছন্দেও, তাঁর পরিক্রমার প্রতিটি রেণুতে। তাই 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্মীভাবে জড়িত। অবশ্য তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই—সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা তিনি দিয়েছেন ছন্দোবদ্ধ অপূর্ব কাব্য তিনি দিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান যে তিনি আমাদের মনকে বড়ো করে দিয়েছিলেন। জলধর সেন একদিন বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সবই যেন এই বাহু—আগে কহ আর।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদেরই জীবিতকালে তিনি কিছুকাল সমকালীন ছিলেন, তাঁকে আমরা দেখেছি, তাঁর কথা আমরা শুনেছি, তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস, তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি শুধু সেটা হচ্ছে দূর থেকে একটা অস্পষ্ট ধূসর কিরীটি দেবতাকে দেখা, যেন তুঙ্গ ত্রিভুবনারায়ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন

ঠাঁড়ি রহো নবা আঁখনকা আগে

যাঁকে প্রণাম করেছিলে, যেখানে হাসিকান্না হীরাপান্নার জগতে ঘুরে যায়। তবু আজও বহু জ্ঞানীগুণী বয়স্কমহাশয়রা বেঁচে আছেন যাঁরা কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, খেলেছেন, তাঁকে দেখেছেন, সঙ্গ পেয়েছেন, সঙ্গ দিয়েছেন। সাহিত্যের আবরণ খসিয়ে, ধ্যানের নৈঃশব্দ ঘুচিয়ে, কল্পনার অলংকার মুছিয়ে, মননের জটিলতা দূর করে; দার্শনিক কুহেলির অন্তরালে এমন কি গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন যে রসিকরঞ্জন পাঠক পুরুষটি তাঁর কথা আরো আরো শুনতে ইচ্ছে করে—টুকরো টুকরো ছড়ার বা পদ্যের মত যা ছড়িয়ে আছে আশী বছরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, মুনিমুক্তোর মত ঝলমল করে।

তারই দুএকটি যা শুনেছি যা পড়েছি উদাহরণস্বরূপ নীচে দিলুম, অতিরঞ্জন বা অতিভাষণের দোষ থাকলেও, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারবোনা। তবে আজও আছেন ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রভাত মুখুয্যে, সৌরীন মুখুয্যে, কেদার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অমল হোম (এখন অসুস্থ), সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, নির্মলকুমারী

মহলানবীশ, সীতা দেবী, শান্তাদেবী, মৈত্রেয়ীদেবী এবং আরো বহু প্রবন্ধের এবং প্রবন্ধকার, যাঁরা এ বিষয়ে বই ও খণ্ড প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও করবেন। 'গল্পভারতী' এই অবশ্য কর্তব্য ভারটির সূচনা করেছেন মনীষিদের জীবনীর টুকরো টুকরো কথা তুলে দিয়ে। তাঁদের সাধুবাদ দিই। সাধারণ মানুষের কাছে তাত্ত্বিক বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার চেয়ে এই সব ছোট ছোট কাহিনীরই ( তবে সাবধানে হবে সেগুলি যেন আজগুবী বা অতিরঞ্জিত না হয় ) মূল্য বেশী।

এ যেন কবির ভাষায়—

নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি

স্বদেশীযুগের সময়—নাটোরের মহারাজার কন্যার বিবাহ—মহারাজ বললেন—কবি, আমার কন্যাদায় কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন, তা না এতো দেরীতে এলেন। কবি উত্তর করলেন —রাজন্, আমার মানুষার, দুআয়গায় সভা করে আসতে হ'ল।

নাট্যনিকেতনে মোরার অভিনয় হচ্ছে—কবি উপস্থিত, বললেন—অবিনাশ ও হলধর যে গানটি গাইলে, সে গানের সবটা কি আমরা শোনা? খবর পাওয়া গেলো, গোড়ার ছ লাইন কবির, পরের ছ লাইন যোগ করে দেওয়া হয়েছে। কেমন হয়েছে স্যার—খাসা—কবি বললেন।

স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন—রাতে বৈঠকখানায় শুয়েছিলাম, একটা কাঁকড়া বিছে কামড়ালে। অসহ্য যন্ত্রণা! তখন মনে মনে ভাবলুম, যাকে কামড়েছে সে অন্য এক রবিঠাকুর, আমি নই। যন্ত্রণা চলে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। গীতালীতে চারিটি কবিতা আছে—পাখী তুমি পাঁচজনের সখা হে, জীবন আমার যে অদ্ভুত—সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি, পদ্মের সাথী নদি বারংবার—সেথা নাকি অদ্ভুত কন্যাকে নিয়ে স্টেশনে যেতে যেতে। অবশ্য দুর্ঘটনার সঙ্গে বেদনার সঙ্গে কবির পরিচয় সাধকের অনুভূতি দিয়ে। দুঃখের আঁধার রাত্রিই যে তোমার সৃষ্টির পথ। সাহিত্য তাইতো বৈশ্ববাণী। " কাব্যের জগৎ সৎও নয়, অসৎও-নয়। অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞাই যে তার নিদর্শন।

আবার দেখি—ব্রাইটন, কাল ১৮৭৬ কবির বেজবৌঠানের হাতে কত, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, দীর্ঘ কেশপাশ অনাদরে বিস্রস্ত। তাঁর সপ্তদশবর্ষীয় দেবর ছিল কাছে, সে বৈজ্ঞানিক নয়, সে কবি। ছন্দোবন্ধনে তার অভিজ্ঞতা ছিল এই আশ্বাসে বউঠাকুরাণী তাঁর বেণীতে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যা ফল হয়েছিল সেটা গীতিকাব্যের মত সুঠাম নয়, কতকটা মডারন্ কবিতার মতো। চুল বাঁধা যেমনি হোক্, খোলা শক্ত হয়েছিল এই মনে আছে, মডারন্ কবিতা বোঝা যেমন শক্ত। কবি নিজেই একথাগুলি বলেছেন তাঁর এক চিঠিতে, সঙ্গে একটা ছড়াও লিখে দিয়েছিলেন—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু মানবুঝখানি কাঁদুনিক্
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, ছন্দটা নির্বাধুনিক্।
পাঠকেরা বলে এতো নয় সোজা
একটি বর্ণ যায় না যে বোঝা
কবি হেসে কন, তাহার কারণ আমার কবিতা আধুনিক

আমরা কিন্তু একজন আধুনিক কবির ভাষাতেই বলবো—

ফরবী মেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীবকুল বধূরা বেণীসংহার হরনি।

আর একদিনের গল্প—রাঁচিতে পৌঁছলেন হাওড়া স্টেশনে ( ১৩২৬ সালের আশ্বিন ) বোলপুর থেকে। "এসে শুনি হাওড়া ব্রিজ খুলে দিয়েছে, সবে জোয়ার এসেছে, একটা নৌকা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চললো। নৌকোর কাছে এসে আমাকে শুদ্ধ খপাস করে পড়ে গেল··· কাদায় লুটোপুটি·····গঙ্গাস্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলাভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে পৌঁছনো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছা করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।"

সেকালে ওঁদের জোড়াসাঁকো সভার বর্ণনা দিচ্ছি—

স্থান—জোড়াসাঁকো। বিষয়বস্তু—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুষ্ঠান—শ্রীযুগেন্দ্র নাথ কর্তৃক 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' আবৃত্তি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'কুষিত পাষাণ' ও 'মানভঞ্জন' নামক গল্প পাঠ। গোসাইজীর গান ও তাঁহার দাদার সঙ্গত। পীতবাস। আহার। ধূপ ধূনা বকুলচৌকি সহযোগে তাকিয়ে আশ্রয় করিয়া রেশমবস্ত্র মণ্ডিত জলচৌকিতে অধিষ্ঠান।

জি, এল্, রায়ের পূর্ণিমা সম্মেলনের একটি বিবরণে এক কবি আর করছেন—

আমাদের এই সাধু মতলবে
রবিবাবু আপনার যোগ দিতে হবে

তাছাড়া সেকালের "বিরজন সমাগমের" কতো গল্প, 'বিচিত্র সভার' কতো কাহিনী ইতস্তত: ছড়ানো আছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন পিতার সামনে ডালহৌসীতে বক্রোটার শৈল শিখরে এ ছবি আমরা দেখেছি, শুনেছি তিনি ঐ "বিদ্বজ্জন" সমাগমেও গান গাইতেন "ও আমার গোলাপবালা"। আবার এও শুনেছি যে তিনি 'আমায় বলো না গাহিতে গান' এ গানও শুনিয়েছেন।

আবার পড়ি, কবি বলছেন, রবীন্দ্রোত্তর কাব্য কী—না, রবীন্দ্রধুত্তোর কাব্য'। আরো পড়ি—আহা, শুনলেও রোমাঞ্চ হয়,···শান্তিনিকেতনে আমার মাসি একটা কাচের ঘর আছে, রাত্রিবেলায় শুয়ে থাকি সেখানে—রাতের তারা দেখা আমার খেয়াল। ভোর বেলা সুন্দরী মৈত্রেয়ীর গান শুনে আমার ঘুম ভাঙে—আর স্নানের আয়োজন—সোনার গামলায় জল ভাতে আতর থাকে ১০০৲ টাকা ভরি আর ডালিম বেদানা খাই বলে রং আতো ফরসা আর ব্রেকফাষ্টের পর একটু স্প্যানিশ ওয়াইন···পার্কলিং বার্গণ্ডি—হা হতোস্মি—শেষকালে কিনা ডালকুনড়া রস।

তিনসঙ্গীর ল্যাবোরেটরীতে আমরা পড়ি আগুনী ক্লাবের কথা, অনেকেই জানেন না যে এর কিসটা পড়েছে কোথায়—চক্রবেঠক লেকের ধারে আজও বসে, আমিও তার মুলতা সদস্য একজন, কবি ঠাট্টা করে এঁদেরই লক্ষ্য করে বলেছিলেন—হে স্বাতন্ত্রাসকাশনরথের সারথি, হে ছিন্ন পৃথল পরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ—ইত্যাদি।

"পরওরাণ সম্বন্ধে লিখলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে—আপনার ব্যাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিক পত্র বলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যসেবী হতে পারত তৃণগুচ্ছ মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির মুখে আপনার বোতাবিলার গালাগুলি দেন তিনি রচনা করেন···আমি রস বাঁচাইএর

বিকারে ঝাঁড়ু দিয়ে দেখলেন
সাফ্ মন, টনি খাঁটি সোনা।

শেষ করি সেই গল্পটি বলে, সেই সময় ব্রহ্মবান্ধব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুশয্যায় একটি বিশেষ অঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ তখন লাইটহাউস ছেড়েছেন, শান্ত চিত্তে একলা বসিয়া লিখেছেন—

The time has come when badges of make our shame glaring in their incongruous context of humiliation.

বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমেছিল—উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দর কবির মুখে তাঁর চিঠিটি শুনলেন, পড়লেন, বিস্মিত হলেন এবং সহানুভূতি করলেন—তাঁর হৃদয় সুন্দর, বাক্য সুন্দর, হাস্য সুন্দর বলে কিছুদিন আগেই অভিনন্দন কবি জানিয়েছিলেন। এই রামেন্দ্রসুন্দরই একদিন রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি যখন কবি লিখলেন।

বল খোকা বাজা তাড়াতাড়ি
মায়ের লাগি বেলবিহনে মরি
আলবালে জল সেচন করি
উচ্ছ্বাস বর্ষাধারার গানে
পরিমল আর চলতে সবার পানে।

কতো গল্প, কতো কথা, কতো কাহিনী আছে। পরে সময় ও সুযোগমত আরো কিছু পরিবেশন করা যাবে। তাছাড়া যাঁরা কবিকে অন্যরূপ ভাবে জানতেন তাঁদের উচিত আরো শোনানো। প্রতিজন সে সুধা দান করে ধন্য হোক্।


আপনাকে স্বপ্নবিভোর করে তুলবে...

যে মনোলোভা সুরভি প্রিয়া-র প্রতিটি টিপেই আপনাকে আত্মহারা করে তুলবে, মনে জাগাবে কতদিনের কত সুখের স্মৃতি। সেই মধুময় প্রিয়া আপনাকে সারাদিন সুখের মত স্নিগ্ধ রাখবে

প্রিয়া-র মধ্যে উষ্ণ কুসুম উদাসী এক মাইয়ার মনকে প্রলোভন নিমুক্ত থাকে। দুই সুখকে ভরা এই বস্তুর সে ছন্দ বন্দনা ও জোয়ার আনে, অন্তরালের দুখের ভার বাঁধনের ও বাধকের দুখের বোঝাকেও লঘু করে

প্রিয়া

সেন্ট ও স্নো

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

# বিবেক

শক্তিপদ রাজগুরু

যাত্রার দল এসে পৌঁচেছে।

সারাগ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। ছোট গ্রাম—বৎসরান্তে ক'দিনের জন্য জমে ওঠে আশপাশের সীমার বাইরে গ্রামখানা। একটা লাল কাঁকুরে রাস্তা বনের দিক থেকে এসে এইখানেই মন্দিরের সামনেই শেষ হয়েছে।

একটু আগেই লালডাঙার মধ্যে হাসপাতাল, হাসপাতাল নামেই।
টিনের শেড একদিকে ডাক্তারের কোয়ার্টার, ওপাশে ইস্কুল, বোর্ডিংও আছে।

রাস্তাটার দুদিকে এই ক'টা দিন লোকান পসার বসে, ডাঙার বসে সার্কাস। যাত্রার গানও হয় দুরাত্রি। বাবা রতনেশ্বর শিবের গাজন এবার বেশ জেঁকেই উঠেছে।

মহীতোষ মোহন এসেছে স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। ইতিমধ্যে সেও এখানের গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে মিশে গেছে। ক'দিনের জন্য খালি বোর্ডিংএই উঠেছে যাত্রার দলের অধিকারীরা।

কলকাতার দল, এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, আজ রাতে এখানে একপালা গেয়ে আবার ছুটতে হয় তাদের অন্যত্র, দাঁড়াবার সময় নেই।

মুখে পানে রংএর আবছোপা দাগ, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা; সঙ্গে এক একটি ছোট পুটিয়ার মত বিছানা, আর সাজের বাক্স।

...ছেলেরা ভিড় করে দেখছে।

মহীতোষও দাঁড়িয়েছিল, তদারক করছিল ওদের থাকার জন্য ঘরদোর সাফ আছে কিনা, কুয়োর দড়ি বালতি ঠিক রয়েছে কিনা।

ক্লান্ত লোকগুলো নামছে, ছেলে যুবক প্রৌঢ় আধাবয়সী সব রকমই আছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কুলীন, কেউ বা বংশজ আবার কেউ বা তাদের থেকে অনেক নীচে। লোকজন টহলী বহুইদের আসর সজ্জাকর সবাই আছে। একটা ছোটখাট পাঁচমিশেলী জনতা বলা যায়।

একজন ম্যানেজারই হবে,বোধ হয় চারিদিক চরকীর মত ঘুরে সব ব্যবস্থা করছে। যাত্রাদলের রাজা উজীরদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেল, বাকী সবের ব্যবস্থা হ'ল হলঘরে। টানা করাস পাতা হয়েছে সেইখানেই গড়ান দেবে তারা।

ম্যানেজারবাবু মহীতোষের সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে।

—আপনিও মশায় কলকাতার লোক? নইলে অত পাড়াগাঁয়ে মানুষের মান খাতির বোঝে? আমরা যৌবাজারে থাকি—থাকা আর হয় কই বলুন, এই দেশদেশান্তরে খপরদারী করেই দিন কাটাচ্ছি, একেই বলে বরাত।

ওদিকে রান্নার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সঙ্গে ঠাকুর চাকর বাসনপত্র সবই আছে।

ম্যানেজারবাবু! আমার খোরাকিটা—

হোঁস করে ওঠে ম্যানেজারবাবু। মহীতোষ চমকে ওঠে। একটুকু সময়ের মধ্যে মানুষ যে বেমালুম এমনি সাংঘাতিক বদলে যেতে পারে তা কল্পনাই করেনি। গর্জন করে ওঠে—

—কাজের বেলায় নেই খোরাকি ওর রোজ চাই। বলেছি তো দল ছেড়ে দাও। তুমি বাঁচো আমি ও বাঁচি। যাও। এখন খোরাকি মলপানি হবে না।

মহীতোষ লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। ধমকানি খেয়ে বেচারার মুখ কালো হয়ে গেছে। কোটরাগত চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরনে একটা আধময়লা পায়জামা আর পাঞ্জাবী। এককালে আদ্দির পাঞ্জাবীই ছিল, হাতের উপর—বোতামের ঘরের দুই পাশে চিকনের অনুপম বিবর্ণ কাজ; কাঁধের কাছটা ঘামে ভেজে বিবর্ণ হয়ে কেঁসে গেছে। এককালে ওর মালিক যে বেশ সৌখীন এর চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

লোকটা মাথা তুলে একবার চাইবার চেষ্টা করে। মহীতোষ ওকে দেখছে, কর্সাই ছিল—তাপের দুটো ভাবহীন চোখের চাহনিতে কি অসহায় বেদনা ফুটে ওঠে।

হঠাৎ মহীতোষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে সেও ওর দিকে চেয়ে থাকে! হঠাৎ সেই নীরব মুখে বেদনা আর নীরব জ্বালার আভাস ফুটে ওঠে। ম্যানেজার ধমকে ওঠে,

—গেলে এখান থেকে?

লোকটা সরে গেল কোন কথা না বলে।

মহীতোষ ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। ওই পায়ের মুখ অসহায় চাহনি ওই গতিভঙ্গী, কেমন যেন মহীতোষের খুব চেনা চেনা বলে বোধ হয়। ম্যানেজার তখনও গজগজ করে চলেছে।

—মরণও হয় না আপদের। যত ঘাটের মড়া এসে জোটে এইখানে। ওদিক জলের মূল অভিনেতা, কর্তাব্যক্তিদের জন্য চা জলখাবারের আয়োজন করতে হবে। ম্যানেজার চলে গেল।

—পরে দেখা হবে মাষ্টারমশাই। নমস্কার। আসছে যাচ্ছেন তো? মাথা নাড়ে মহীতোষ। যাবে সে।

সহর থেকে অনেক দূরে প্রায়ান্ধকার এই গ্রামের স্কুলে আজ মহীতোষ মাষ্টারী নিয়ে এসেছে কিন্তু অতীতের তার স্বপ্ন ইতিহাস ছিল অন্য।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় জমতো, মাঝে মাঝে কফি হাউস, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী না হয় গোলদীঘির ধারে আড্ডা জমতো।

সাংস্কৃতিক চেতনা আর সমাজ নিয়ে অনেক কথাই উঠতো। ওদের দেখে সেই বহুদিনের কলকাতার কথা মনে পড়ে, কেমন যেন একটা অতীত স্মৃতির মত। আজ সেই আলো ঝলমল জীবন। সেই আনন্দ স্বপ্ন থেকে সে নির্বাসিত হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবরা আর কে কে সেখানে টিকে আছে তা ও জানে না।

বৈকালের বাড়ন্ত আলো শালবন সীমার হলুদ সোনা রোদের আভায় এনেছে। এদিক ওদিকে ছড়ানো মেঘগুলো নানা রঙের ফুলকো তুলে আসমানে হারিয়ে যায়। ওরা যেন সেই স্মৃতির আকাশে আজ সাড়া জাগিয়েছে।

চেনা চেনা মুখ। পায়জামা পরা সেই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে।

হাতে সিগারেটের টিন, পায়ে সাদা চটি, পরণে কস্কাবার চিকণের কাজকরা রানী পাঞ্জাবী, আলো আর গান সুর কত মুগ্ধ অবসর সব মিলিয়ে একটা ছবি মনে ভেসে ভেসে আসে।

কিন্তু আজকের দেখা সেই মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করতে পারে না, কোন পরিবেশেই এই মানুষটাকে মিলে মিশে ফেলতে পারে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। ওই শালবনসীমা, লাল কাঁকুরে ডাঙা, পাখিডাকা বিপন্ন কোথায় হারিয়ে যায়। তবু মনে পড়ে আজ মহীতোষের অতীতের সেই হারানো দিনগুলো।

দুর্বাকেও ভোলেনি সে, জীবনের অনেক স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নাম, শ্যাম বর্ণ তার রং—দুচোখে বিপন্ন বিস্তৃত হলুদ বাসবনের স্বাদলিমা আর পাখির ডাক যেন কোন সুর।

ওদের বাড়ীও প্রায় যেতো মহীতোষ, কলেজের মধ্যে এ নিয়ে কথা হতো, বন্ধুরা নজরও করতো—

—দুর্বা খায় ভালো,

কে যেন ফোড়ন কাটে চায়ের টেবিলে,

—দেখতেও মন্দ নয়। হাজার হোক মহীর চয়েস্ আছে বলতে হবে।

কয়েকটা বছর কি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছিল মহীতোষ। দুর্বা বি-এ পাশ করেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। বলতো,

—গানই আমার সব।

মহীতোষ দেখেছিল দুর্বাকে। অনেক স্বপ্ন কল্পনাও করেছিল তাকে কেন্দ্র করে। তারা দুজনে ঘর বাঁধবে। সুখী হবে।

কিন্তু দুর্বার দিক থেকে সেই সাড়া ছিল না। সে মেতেছিল তার গান নিয়ে। সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন গেছে। দুর্বাও এসেছে বাইরের ঘরে।

মহীতোষ নীরব দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনেক কথা বলবে বলেই এসেছিল। কিন্তু সব যেন ওর সামনে এসে হারিয়ে যায়। বলে ওঠে দুর্বা,

—গানের মাষ্টার মশাই এসেছেন। আমি যাচ্ছি।

অর্থাৎ আজ সে এড়িয়ে গেল মহীতোষকে। চুপ করে একাই দাঁড়িয়ে আছে মহীতোষ। বন্ধ দরজার ওদিক থেকে একটা সুর উঠছে অচেনা কণ্ঠস্বর। তবু কেমন যেন মধুর—একটা স্বপ্নময় সেই সুর। মহীতোষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওই বলিষ্ঠ মাধুর্যমণ্ডিত সেই সুরটার পাশে পাশে দুর্বার সুরেলা গলার বিস্তার চলেছে। কেমন যেন আর ছায়া দুটো মিলে একটা নিটোল আনন্দময় সেই স্পর্শ।

এই মধুজগতে তার ঠাঁই নেই।

সেই সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল মহীতোষের দুর্বার কুলনাথ সে অনেক নিম্নে ; তার কোন সম্পদ নেই যা দিয়ে দুর্বার শিল্পী মনকে সে পূর্ণ করে দিতে পারে।

মহীতোষ আজ অনেক বছর আগেকার কথাগুলো অবারণেই ভাবে। কি যেন একটা হারানো সূত্র ধরে আবার সে অতীতের সেই স্বপ্নজগতে ফিরে গেছে আনেমা।

—মাষ্টার মশাই আসবে যাবেন না ?

সেকেণ্ড মাষ্টার হরবিত বাবুর ডাকে একটু চমকে ওঠে মহীতোষ।

রাত হয়ে গেছে। মেলায় জ্বলে উঠেছে ডেলাইট, পাকসাইটগুলো। নানা কলরব কোলাহল ওঠে হাজারো কণ্ঠের।

গরুর গাড়ীতে করে দলে দলে হেসেহেসে লোকজন আসছে। সার্কাস দলের তাঁবুর সামনে ভিড় জমেছে। ওদের ব্যাণ্ডএর শব্দ ওঠে।

মহীতোষ এসব পরিবেশ থেকে কোথায় কোন অতীতের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

যাত্রার দলের আলামীরা যাচ্ছে মেলার আসরের দিকে। সাজের বাক্স চলে গেছে আগেই। হরপার্বতিও যাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা আলোয় সেই ভদ্রলোককে যাচ্ছে দেখে চাইল মহীতোষ। একফালি হারিকেনের আবছা পড়েছে ওর শীর্ণ মুখে—নাকটাই সার। পরণে সেই পাঞ্জাবী পায়জামা, টিকটিকে গলায় বিবর্ণ একটি মাফলার জড়ানো। মাথায় উস্কোখুস্কো চুলগুলো একটু সামলাবার চেষ্টা করেছে মাত্র।

ওর চোখে চোখ পড়তেই লোকটা সরে গেল।

মহীতোষের মনে হয় ও তাকে চিনেছে। কেমন ইচ্ছে করেই তাই এড়িয়ে গেল। সরে গেল মহীতোষের কাছ থেকে।

তার পরিচয়টা জানতে দিতে চায় না। নিজেকে অপরিচয়ের অন্ধকারেই রাখতে চায়।

মহীতোষ যেন অকূল নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে তীরে ওঠবার বৃথা চেষ্টা করছে। ঠিক কিনারা পায় না। ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেমন স্রোতের টানে আবার ভেসে চলেছে।

ওই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে! যাক্ গে।

তবু ওর জন্ত কেমন দুঃখ হয়। এই পরিবেশে যে অবস্থায় রয়েছে তা মোটেই যে সুবিধার নয়—এটা বেশ বুঝেছে মহীতোষ। সারাদিন হয়তো খাওয়া জোটেনি—কি হয়তো অপরাধ করেছে তাই আজ খোরাকিও জুটবে না। এদলে নেহাৎ অবাঞ্ছিতের মত পড়ে আছে। অন্তত্র গেলে আশ্রয়ও জুটবে না। তাই শত অপমান লাঞ্ছনা সয়ে এই অপেরাতেই রয়ে গেছে।

মুখে চোখে সেই নীরব বেদনার ছায়া।

ওই বেদনাকাতর দৃষ্টিটি ভোলেন নি মহীতোষ। ভোলা যায় না। ওর চোখে কোথাও অন্ত দৃষ্টি সে দেখছিল। দেখছিল ওর মুখ চোখে অন্ত কোন আশাময় জীবনের স্বপ্ন। আজ ওর ধ্বসে-পড়া রূপটাকে দেখে সহসা তাই হয়তো চিনতে পারছে না।

শত তৈল দারিদ্র্য অপমান সব মুছে গেছে। লাল শালু দিয়ে মোড়া আসরের খুঁটিগুলোর ফুলের তোড়া টাঙানো হয়েছে। চারিদিকে বসেছে হরীর দল—অধিকারী মশায় স্বয়ং। হুমনি হারমোনিয়াম, ঢোল কর্ণেট ফ্লুট এর সমবেত সুর ওঠে।

রাতের আঁধারে ফুটে ওঠে কোন অতীতের সুখ সমৃদ্ধ রাজ্যের ছবি। রাজার ভুলেই সব যেন ছত্রখান হয়ে যায়।

…রাজ্য গেল সম্পদ গেল।

একটা করুণ সুর ওঠে বেহালায়।

…তার সঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে আসে একটা কণ্ঠস্বর। সুরেলা মলাটা রাতের আঁধার ভরে তুলেছে—উঁচু পর্দায়। উঠছে ধীরে ধীরে। …সা থেকে একটি ধাপ উঠছে। পরদা যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে পঞ্চমের দিকে।

আসর শুদ্ধ মনুষ্যের মত হয়ে গেছে।

চমকে ওঠে মহীতোষ।

এ স্বর তার চেনা!…হ্যাঁ!…এইবার তার অঙ্কটা মিলেছে।

ওই গায়ককে সে চেনে! কিন্তু এখানে তাকে দেখবে কল্পনাও করেনি।

ওকে দেখেছে কলকাতায়, অনেক আসরে ওর গান শুনেছে। সেদিন ও ছিল আরও অনেক সুন্দর; যৌবনের ছোঁয়া ছিল ওর দেহে। কণ্ঠে ছিল অফুরান সুর। সুরের সেই মায়া আজ অনেক কমে গেছে। যা আছে তা অতি সামান্য, কণামাত্র।

দুর্বাদের বাড়ীতেই প্রথম দেখেছিল তাকে। দুর্বা ওর কাছেই গান শিখতো। মহীতোষের মনে পড়ে ওই সুরের মাধুর্যে সেই অতীতে মহীতোষও কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

কাশছে লোকটা!

…গানের দীর্ঘ তানে আর সাপট মারবার ক্ষমতা তার নেই, বাজে না বাজে, বেহালা আর কুট ওয়ালা সেই কাকটাকে চাকবার জন্য চেষ্টা করছে।

গলের মানে তার মুখ কঠিন করে, কটমট দৃষ্টি মেলে লোকটার দিকে চাইছে।

মহীতোষের মনে হয় হাঁপাচ্ছে লোকটা। দম রাখবার ক্ষমতাও তার নেই। বেসম্ ঠেকছে। কোনমতে গেয়ে যেয় হয়ে গেল।

মহীতোষ শুদ্ধ হয়ে বসে আছে। চোখের সামনে দেখেছে তিলেতিলে ওই মানুষটার অপমৃত্যু। জীবন ওকে একদিন অনেক দিয়েছিল, রূপ, কণ্ঠ, সুর সব কিছুই।

দুর্বাও ওকে ভালবেসেছিল, তাই বোধহয় মহীতোষও সরে এসেছিল সেদিন অনেক বেদনায়।

কিন্তু আজ! জীবন ওর সবকিছু কেড়ে নিয়ে নিংড়ে ছোবড়া করে পথের ধারে ফেলে দিয়েছে। পরে শুনেছিল দুর্বার নাকি অন্য কোথায়, ভাল পাত্রে বিয়ে হয়ে গেছে।

কি ভেবে উঠে গেল মহীতোষ। আসরে তখন ঐকতান বাদন চলছে।

আঁধার আলো ঢাকা তেঁতুল গাছের নীচে একটা লম্বা চালায় সাজঘর হয়েছে। বাইরে কতকগুলো বাঁশ গাছের ঝটলা জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। ওরই মাঝে ছিটকে এসে পড়েছে হেজাকের এক ফালি আলো।

…চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাঁপাচ্ছে তখনও। গলাটা ঘুসঘুস করছে। দীর্ঘ বুকটা হাপরের মত ওঠা নামা করছে। আজ সারা মনে তার হতাশার অন্ধকার। মাথায় সেই বিবেকের বাবরীও নেই, কপালের টিপটা মুছে ফেলেছে।

# ১৮০ বছরেরও বেশী ভারতের সেবায় নিযুক্ত মার্টিন বার্ন

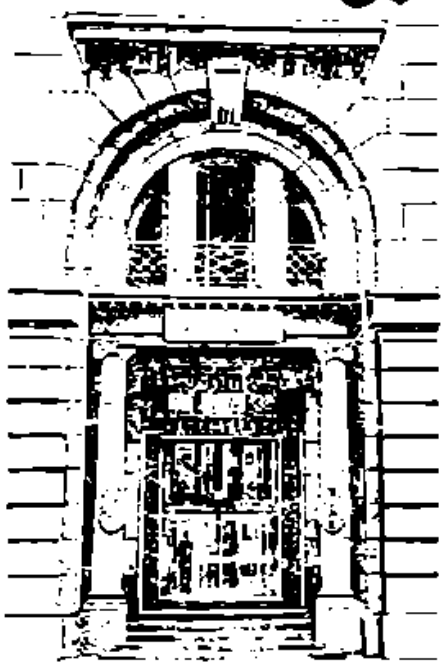

ভারতবর্ষে মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী শিল্পপ্রয়াসের পরিমাপ বছরের হিসেবে না করে যুগের হিসেবে করাই সঙ্গত। এই দীর্ঘকাল একাগ্র সাধনায় বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিনীয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্প উদ্যোগের সম্ভারভারে মার্টিন বার্ন ভারতের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করেছে। মার্টিন বার্নের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রিত সাফল্যের মূলে রয়েছে দূরদর্শিতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আজ অগ্রণী তো বটেই, তাদের কোন কোনটি গত শতাব্দীতেও ছিল সবার আগে। আজ তাই মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠান পিছন দিকে তাকিয়ে শুধু যে অতীত কীর্তির জন্যই গর্ব বোধ করে তা নয়, আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণাও পায়।

*মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঃ*

**দি ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড :** কারখানা বার্নপুর। লৌহ-ইস্পাতের সকলরকম কাজের এক সঙ্গে দি ইণ্ডিয়ান ইংলণ্ড হয়। দুর্গাপুর কারখানার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহের ভার গ্রহণ করেছে।

**বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া :** ১৮৭৩ সনে। ভারতের বৃহত্তম নির্মাণ কারখানা—রেলওয়ে ইঞ্জিনি ব্যতীত যাবতীয় লৌহের সরঞ্জাম এবং শিল্পের যা কিছু লাগবে ইঞ্জিনি প্রস্তুতকারক।

**বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড : ক্রিকারীয়ি গোষ্ঠী :** ভারতের সর্বপ্রথম কাটা কারখানা—বর্তমানে ক্রিকারীয়ি সরঞ্জাম ১২টি কারখানায়। বিশ্বের কারখানা, বিদেশী ইঞ্জিনের যেমন, লোকো—এক কারখানা, যেখানে ইঞ্জিনের কারখানা ছাড়া যা যেখানে তার কোম্পানির ক্রিকারীয়ির সুযোগ।

**দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিমিটেড, মাত্রা :** একক ওয়াগন কারখানা বিশ্বের মধ্যে সুপরিচিত। বছরে একশো কারখানা বিদেশ বিক্রয় সুযোগ ইংলণ্ডের কাজ করে। কারখানা একক ওয়াগন ছাড়া ও লোকো ক্রেনের ও ক্রেন বিল্ডার্স, ফোর্জিং, কার্বনিক সুপরিচিত ইত্যাদি।

**দি ইণ্ডিয়া অক্সিজেন অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড :** ১৯১৯ সনে সুপরিচিত। বিশ্ব বিখ্যাত ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইতালির কারখানার সহযোগিতায় কারখানা তৈরি ও রেলওয়ের কারখানে।

**ব্রাণ্ট হাডসন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড :** ব্রেক ব্রেক কারখানি কারখানা সুপরিচালনার সুপরিচালনার কারখানা। বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বের সব বিখ্যাতের ব্রেক।

**ব্রেকওয়ে কোম্পানি :** কারখানা ব্রেক ব্রেক সুপরিচালনার কারখানা—ব্রেক ব্রেকের ব্রেক ব্রেকের সুপরিচালনা।

**ইনকস্ট্রিক কারাই কোম্পানি :** বিশ্বের উৎপাদন ও কারখানার কারখানা কারখানা সুপরিচালনা। ইঞ্জিন ও কারখানার ২১৩ পাকে বিশ্বের উৎপাদন ও কারখানা করে।

**দি ভল্ বার্ন ব্রেক কোম্পানি লিঃ—** কারখানার ভল্ ব্রেক কোম্পানির কারখানার সুপরিচালনা। কারখানার ও বিশ্বকারখানার কারখানার ব্রেকের ব্রেক এবং ও কারখানা ব্রেক।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড কলিকাতা কারখানা ব্রেকের কারখানা কারখানার কারখানা

দলের ম্যানেজার আজ শেষ কথা শুনিয়েছে তাকে, চরম অপমানই করেছে। সাফ জবাব দিয়েছে তাকে কাল থেকে।

—এসব গান চলবে না। গাইতে পারবে না—চং গাওয়া কেন?

বিবেকের পার্ট এই সিন থেকে করবে রাখাল। তুমি সাজ-পোশ খুলে—এইবার স্যামন দাও দিকি।

মহীতোষ ঠিক শোনেনি কথাগুলো, জানেনা সে একদিন যার এত নাম ডাক ছিল কলকাতার আসরে কনকারেন্সে গেয়েছে পাকা ওস্তাদের মত দুরুহ রাগ ঠুংরী সে আজ জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও হারালো।

…ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পদচ্যুত বিবেকরূপী সেই বাতিল মানুষটা, মুখে পড়েছে একফালি আলো, কেমন পাণ্ডুর ছায়া নেমেছে তাতে।

আজ তার সব হারিয়ে গেছে। হারাতে সুরু করেছে সে অনেকদিন আগে থেকেই, কোন নারীকে অনেক আশা দিয়েই দিখোতে চেয়েছিল,…সেদিনের খ্যাতিমান গায়ক ক্রমশঃ সব হারাতেই সুরু করেছে।

জীবনের সে সব আনন্দমুখর স্বপ্নময় কতদিন সব হারিয়ে গেছে। আজ কোথাও কোন পথ নেই দুর্বার লজ্জায় ঘৃণায় মহানগরের জীবনকে সে ছেড়ে আঁধারে সরে এসেছিল অপরিচিতের ভিড়ে বাঁচতে চেয়েছিল তার সব বেদনা ব্যর্থতা গোপন করে।

তাও বাঁচতে পারেনি সে।

—মাষ্টার মশাই!

হঠাৎ লোকটা চমকে ওঠে। একদালে ওই ডাক তার অতি পরিচিত ছিল, অনেকে ডেকেছে ওকে ওই নামে; কত সুর স্মৃতি মিশানো সেই ডাক।

একফালি আলোয় সে মহীতোষের মুখের দিকে চেয়ে থাকে একটুখন! মহীতোষকে যেন চিনেছে সে। মহীতোষ বলে ওঠে—

—কলকাতায় শ্যামপুকুরের দুর্গাকে গান শেখাতেন—ওদের বাড়ী যেতাম। সেদিন কি চমৎকার গানই না শুনেছি আপনার কাছ থেকে।

লোকটা কথা বললোনা। মহীতোষ ওর জরাজীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে থাকে। কাপছে লোকটা থর্ থর্ করে। বেশ জানে মহীতোষ—ওর আজ খোরাকিও বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানেজার ওকি সব আবার শুনিয়ে গেছে।

একটি লোক—সেদিন কত আশার আলো দেখেছিল তার মুখে ওর কথায়, আজ সে সব নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

মহীতোষ অবাক হয়। আসরে গান সুরু হয়েছে। বিবেকের গান। কিন্তু এ অন্ধ বিবেক। বেশ বুঝেছে মহীতোষ ওর জবাব হয়ে গেছে।

সাজগোজ খুলে ওকে আজ বাতিল করে দিয়েছে ম্যানেজার। মাইনে খোরাকী সব বন্ধ হয়ে গেছে।

লোকটি আঁধারে বাসার দিকে ফিরছে, মহীতোষের মনটা খারাপ হয়ে যায়।

—শুনছেন ?

দাঁড়াল লোকটি মুখচোখে একটি কাঠিন্য ফুটে উঠে।

দশটাকার নোটটি বের করে ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—যদি কিছু না মনে করেন, এইটা রাখুন।

লোকটা একবার ওর দিকে চাইল বেদনার্ত কঠিন চাহনি মেলে। বিষণ্ণ মলিন একটু হাসি ফুটে ওঠে।

—দয়া করছেন ? ওটার আর দরকার নেই। থাক।

মাথা নাড়ে সে। দাঁড়াল না—আঁধারেই বাসার দিকে এগিয়ে যায়, আসরের দিকে আর ফিরেও চাইল না।

মহীতোষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অরাজীর্ণ লোকটার দিকে। কাশছে—তখনও বেশ খানিকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

কি ভেবে মহীতোষ এগিয়ে যায়।

লোকটা কুণ্ঠিত মনে প্রশ্ন করে।

—দুর্বার খবর জানেন ? দেখা হয় তার সঙ্গে ?

একটু অবাক হয় মহীতোষ। লোকটার বুকের ভেতর একটু আগুনের উত্তাপ এখনও আছে। সেই মনটা বোধ হয় আজও মরেনি।

মাথা নাড়ে মহীতোষ।

—না। ওর কোন খবরই জানি না।

লোকটা দাঁড়াল না। আঁধারে লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেল। আর দেখা যায় না তাকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মহীতোষ, লোকটা এমনি করে ওর সব কিছুকেই হারিয়ে—নিজেই কোথায় হারিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে ওকে খুঁজেছিল মহীতোষ, লোকটাকে আর দেখা যায় নি। এতদিনের পুরোনো দল ছেড়ে সে কোথায় আজ হারিয়ে গেছে।

কেউ তার কোন খবরই রাখে না।

ওদের খবর কেউ রাখে না ; ওরা বার বার হারে জীবনের ভিড়ে হারিয়ে যায় নিঃশেষ বেদনা বুকে নিয়ে।

---

# গুরুশিষ্য কথামৃত

পরিমল গোস্বামী

শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, গুরুদেব, স্বর্গে আর নরকে যে প্রভেদ ছিল, এখনও কি তাই আছে?

এ প্রশ্ন কেন বৎস?

আমার মনে সন্দেহ ঢুকেছে, গুরুদেব। শুনুন বলি। ও পাড়ার বিখ্যাত ব্যবসাটা ধনঞ্জয় ভঞ্জ চালের চোরাকারবার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আরও নানা রকম দুষ্কার্যের নায়কত্বপে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সবই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটেছে সেদিন। কিন্তু দেখছি মৃত্যুর পর থেকে তার নামের আগে স্বর্গগত লেখা হচ্ছে। এই আমার সন্দেহের কারণ, গুরুদেব। স্বর্গগত কেন?

শিষ্যের এই কথায় গুরুদেব বললেন, বৎস, তা হ'লে সবটা কাহিনীই বিবৃত করি, তুমি শ্রবণ কর।

শিষ্য মনোযোগ ঘনীভূত করল।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, শোন, বেশ কিছু দিন আগে থেকে নরকে আর ভারতীয় আত্মাদের —মানে দুরাত্মাদের, স্থান হচ্ছিল না। নরকের যত কর্মী ছিল তারা সবাই ধর্মঘট করবে এমন ভয় দেখা দিয়েছিল।

তুমি তো জান, নরকের একুশটি বিভাগ। কিন্তু তার কোনোটাতেই পাপের তারতম্য বিচার ক'রে ওদের স্থান করা যাচ্ছিল না। এঞ্জিনিয়ার বরখাস্তদের সাহায্যেও অনেকগুলি নতুন এস্টেবলিশমেন্ট করা হল। সেও কম নয়। প্রতি বিভাগে প্রায় শ'খানেক ক'রে। সবই নতুন সাত আট তলা বাড়ি। টেম্পিরেচার্ড প্যাটার্নের। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। এত পাপাত্মার স্থান কোথায়?

তা হলেই বুঝে দেখ, এত পাপাত্মাকে আগুনে পোড়ানো, পাঁকে ডোবানো, মাথায় ডাণ্ডা মারা, ও অন্যান্য যাবতীয় শাস্তি দেওয়ার কাজ নির্দিষ্ট সংখ্যক মজুরদের দিয়ে সম্ভব হ'তে পারে কি?—পারে না।

শাস্ত্রে তো জান, নরকের স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে, নরকের উপরে অথবা নিচে। মৃত আত্মাদের বিচার করা হয় এইখানে। বিচারক, যমরাজ। কিন্তু তুমি শুনে থাকবে দক্ষিণ মেরুর নরকে অনেক দিন হ'তে জীবিত মানুষদের আনাগোনা চলছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমুণ্ডসেন যেদিন প্রথম দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই দিন থেকে যমের দুর্ভাবনার আরম্ভ। তারপর যখন একের পর এক অভিযান চলল সেখানে, তখন তাঁর বিচারালয়কেই নরকের নিচের রাজ্যে শিফ্‌ট করতে হয়েছে। রেওয়ানি ফৌজদারি সব একসঙ্গে চলছে।

তাও একরকম সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭ থেকে পাপাত্মাদের সংখ্যা প্রবল বেগে বাড়তে থাকায় হ'ল সমস্যা। এক একটা ডবল বেডের ঘরে পনেরো ষোল জন ক'রে রেখেও কুলানো যাচ্ছিল

না। আর শুধু কি তাই? আসল সমস্যা হচ্ছিল মজুরদের নিয়ে। তারা এত খাটতে রাজি নয়। মানে এত ওভারটাইম, এবং বিনা মজুরিতে। এর অর্থ অতি সহজ। মানে, নরকের গৌরপ্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যাচ্ছিল। যারা এখানে মজুর, তারা চিরকাল মজুর। তাদের হ্রাস বৃদ্ধি নেই। কিন্তু পাপাত্মাদের বৃদ্ধি অতি দ্রুত। এ দুয়ের সামঞ্জস্য হবে কি ক'রে? মজুররা বলছিল, তাদের কাজ, প্রতিদিন সাত ঘণ্টা পাপাত্মা-পীড়ন—মাঝখানের একঘণ্টা টিফিনের ছুটি সমেত। এর বেশি তারা খাটতে রাজি নয়।

যম উদ্‌ভ্রান্ত। কারণ মজুররা যদি সময়ের হিসাব ঠিক রেখে go slow পদ্ধতিতে কাজে শিথিলতা দেখাতে থাকে, তবে আইনত কিছু করবার উপায় নেই। যম, যেখানে পঞ্চাশ ঘা ডাণ্ডা মারার কথা, সেখানে সংখ্যাটা ঠিকই রাখেন, কিন্তু আঘাতের জোর একেবারে কমিয়ে দিল। তখন? তাতে অপরাধীরা তাকে স্বর্গে আছি। এমন অবস্থায় নরক চালানোর কোনো মানেই হয় না। এখন যেমন ভারতীয় জেলখানার কয়েদীরা বেশি সুখে আছে, অনেকটা সেই রকম।

যম চিন্তায় বসলেন।

( ২ )

এদিকে স্বর্গের অবস্থা যে আরও খারাপ। বরং নরকে সব রকম নায়কীয় ব্যাপার চলতে পারে, কিন্তু স্বর্গ তো পবিত্র স্থান। এখানে যা ঘটছে সেও খুব চিত্তাকর্ষক নয়। শোন মন দিয়ে। এখানে ব্রহ্মার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। দূরে নারদ ব'সে আপন মনে বীণা বাজাচ্ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে যাচ্ছেতাই ক'রে বকলেন। বললেন, এখন ওসব রাখ।

নারদ প্রশ্নমাত্র না ক'রে বীণা নিয়ে দূরে প্রস্থান করলেন।

ব্রহ্মা তখন চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। উদ্দেশ্য, কোনো সমাধান আবিষ্কার করা যায় কিনা, দেখা।

মন্দাকিনীর ধারা কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে পায়ের কাছ দিয়ে। পারিজাত অরণ্য থেকে ফুল ঝরে পড়ছে। দূরে কামধেনু মাঝে মাঝে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে পারিজাত ফুল দু'একটা খাচ্ছে। তারও মন বিশেষ প্রফুল্ল নয়। স্বর্গের সব জায়গায় একটা থমথমে ভাব।

ব্রহ্মার মনোযোগ থাকছে না। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে একটা অজানা ভয় এসে উৎপাত করছে। মনোযোগ ঘনীভূত করতে পারলে ভবিষ্যৎটা অনেকখানি স্পষ্টই দেখতে পেতেন।

অবশ্য ভয়টা একেবারেই যে অজানা ছিল, এমন নয়। যেটুকু জানা ছিল, তা হচ্ছে—স্বর্গের মজুরের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। তাদের প্রায় সবারই কাজ ছিল মহাজাগতিক ধুলো ঝাঁট দেওয়া। এও প্রায় সাত ঘণ্টার কাজ—মাঝখানে একঘণ্টার টিফিন।

কিন্তু কিছুকাল ধরে স্বর্গে পুণ্যাত্মার আগমন এমন অসম্ভব রকমের হ্রাস পেয়েছে যে, শত শত মাইল ব্যাপী ধুলো ঝাড়ার কোনো দরকারই হচ্ছে না আর। তাই সম্প্রতি পঁচিশ হাজার মজুরকে ছাঁটাই করতে হবে। অথচ দেখ, এদের কাজ স্থায়ী কাজ, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েই নানা গ্রহ থেকে এদের সংগ্রহ ক'রে এনে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। বুঝতে পারছ, সমস্যাটা কত কঠিন?

এখন এই ছাঁটাই-ভীত কর্মীরা স্বর্গে ভূবন দখলোল বাধাবার চেষ্টায় আছে। বলছে, চলবে না, চলবেনা।

ব্রহ্মা এখন কি করবেন? ওদের দাবী অন্যায় নয়। স্বর্গে কাজ নেই, যা অকারণ কাজ, সে তো ওদের জন্য নয়। এখন ওরা যাবে কোথায়? এজিটেশন তারা নিতান্ত বাধ্য হয়েই করছে। বুঝতে পারছ কি ব্যাপার?

ব্রহ্মার আর বসে থাকা চলল না। তিনি প্রায় পঁচিশ জন দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ ইনস্পেকশনে বেরুলেন। দেখলেন ইতিমধ্যেই মহাজাগতিক ধুলোয় স্বর্গের চেহারা প্রায় মরুভূমির মতন হয়েছে। অর্থাৎ স্বর্গের সেই বিস্তীর্ণ এলাকা, যেখানে ভারতীয় পুণ্যাত্মারা এসে বাস করতে পারতেন। এই এলাকার বর্তমান বিরল বসতি দেখে ব্রহ্মা দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর নিশ্বাসে সামনের জমি থেকে অনেকখানি ধুলো উড়ে গেল। যে সব পুণ্যাত্মা আগে এখানে এসেছিল, তাদের ভারতবর্ষেই পুনর্জন্ম ঘটানো হয়েছিল, কিন্তু তারা পরে সবাই প্রায় নরকে ফিরে এসেছে, এখানে আসার অনুমতি আর তারা পায়নি। সদাচার সমিতি গঠিত হলে দূর ভবিষ্যতে হয় তো দু'চার জন আসতেও পারে। কিন্তু সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। ব্রহ্মা প্রায় ক্ষিপ্ত।

এমন সময় স্বর্গে বিপজ্জনক ঘণ্টা বেজে উঠল। ও তাঁর সহচর দেবতারা কর্মীদের বিদ্রোহ আশঙ্কা ক'রে ফিরে দাঁড়ালেন। কোথায় লুকোবেন ভাবছেন, এমন সময় একজন দূত ছুটে এসে খবর দিল, যমরাজ এসেছেন স্বর্গে।

যমরাজ! স্বর্গে কেন? কোটি কোটি বছর ধ'রে ধীরে স্বর্গে আসবার দরকার হয় নি, তিনি কেন স্বর্গে? যাই হোক, এখানেই নিয়ে এসো তাঁকে। কোনো রকম অসম্মান ক'রো না। মহা ঝামেলার ব্যাপার, দেখছি।

যমরাজ এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। তাঁর এক মুখ থেকে আশীর্বাণী উচ্চারিত হ'ল, অন্য তিন মুখে সন্দেহের ছায়া।

যমরাজ বুঝতে পারলেন সেটা। মনে মনে ভাবলেন, সব শুনলে বোধ হয় আরও ভয় পাবেন। বললেন, দেব, আমি বড়ই বিপন্ন। আমাকে বাঁচান।

ও! তবে ভয়ের কিছু নয়। আক্রমণ করতে নয়, ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

ব্রহ্মার চারটি মুখই খুশিতে ভরে উঠল। ভাবলেন, যমের বিপদ, তাতে আমার কি? বললেন, বল সব, দেখি কি করতে পারি।

যমরাজ তাঁর অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। বললেন, সেখানে এখন যথার্থ নারকীয় অবস্থা। মজুর কম, কাজ বেশি। বাড়তি মজুর আনিয়ে খাটাবার জায়গা নেই, যারা আছে, তাদেরই এখন দাঁড়াবার জায়গা হচ্ছে না। আমার প্রাসাদের শোবার ঘরখানা ছাড়া সমস্ত ঘর পাপাত্মারা দখল করেছে। বারান্দায় বেরোবার উপায় নেই, শত শত প্রেতদেহ গিজ গিজ করছে।

ব্রহ্মা বললেন, ওদের পুনর্জন্মের জন্য ভারতে পাঠাচ্ছ না কেন? ওরা সেখানে গিয়ে কুকুর জন্ম গ্রহণ করুক।

তা কি করিনি চতুর্মুখ? কয়েক হাজারকে কলকাতা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার কর্পোরেশন সবগুলোকে মেরে ফেলেছে। তাদের আত্মা আবার ঘুরে এসেছে আমার কাছে।

বেআইনি ক'রে মানুষ বানিয়েও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষ হয়ে এবারে তারা আরও বেশি পাপ ক'রে ফিরে এসেছে।

ব্রহ্মা একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, তোমার প্রস্তাব আছে কিছু?

আছে, চতুরানন।

কি, বল।

আমি স্বর্গের কিছু অংশ লীজ নিতে চাই। তা হ'লে আপনার ঐরা স্বর্গে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হবে, আমিও বেঁচে যাব।

ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন, স্বর্গের সকল কর্মীদের এবারে কাজ ছুটবে, কাউকে আর ছাঁটাই করতে হবে না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না ক'রে বললেন, বেশ তো, তোমার যদি তাতে সুবিধা হয়, তবে লীজ নাও। আর তাই বা কেন? স্বর্গ নরক ভেদ তুলে দিলে ক্ষতি কি? এখন তো সবই একাকার হয়ে যাচ্ছে, এখানেই বা সেটা বাদ থাকে কেন?

যমরাজ এ প্রস্তাবে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমি আপনার চিরসেবক। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করব না, এখুনি ছুটে পালাই।

যমরাজ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাও নারদকে ডেকে পাঠালেন, এবং এসে বললেন, এবারে তোমার বীণা বাজাতে আরম্ভ কর। যত জোর পার বাজাও। যে সুর ইচ্ছা, বাজাও। গজল হ'লে আরও ভাল।

নারদ বীণার সুর বাঁধতে লাগলেন।

( ৩ )

স্বর্গের চেহারা একেবারে পালটে গেছে। আরও মজার কথা, প্রায় ত্রিশজন বাছাই করা দেবতা, মানে ওঁদের মধ্যে যাঁরা ডি-আই-পি, তাঁরা কিছুদিনের জন্য মনের আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। নিজেরা কিছু পরিমাণ নারকীয় ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এলেন ইচ্ছা করেই।

এসে দেখেন স্বর্গ আর স্বর্গ নেই। বহু জাতীয় অদ্ভুত চরিত্রের সব দুরাত্মা স্বর্গ দখল করেছে। যারা প্রকৃত স্বর্গবাসী তারা এখন কোনঠাসা। কোনো রকমে চোরের মতন ছোট্ট একটা অংশে দিন কাটাচ্ছে। কারণেরটা একটা প্রভাবশালী দলের দখলে গিয়ে পড়েছে। তার দুধ, এবং তার কাছ থেকে অন্য যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনের আনন্দে ভেজাল মেশাচ্ছে। কল্পতরুর পেটেন্ট নিয়েছে একদল। মন্দাকিনীর জলে মাছ ধ'রে অন্য গ্রহে চালান দিচ্ছে একদল। কোটি কোটি দুরাত্মা স্বর্গে কালোবাজার খুলে বসেছে।

তারপর শোন, দেবতারা যে অমৃত পান করতেন তাতে ভেজাল, যে সোমরস পান ক'রে স্বর্গীয় আনন্দ পেতেন, তার জন্য কিউতে দাঁড়াতে হচ্ছে। কি মর্মান্তিক অবস্থা ভেবে দেখ।

কত যে হোটেল খোলা হয়েছে তার সংখ্যা নেই। মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, এই সব হোটেলে নাচের তাড়া খেটে বেড়াচ্ছে। খাঁটি অমৃতের জন্য বিশেষ লাইসেন্সের ব্যবস্থা হয়েছে। আরও কত রকম লীলা।

গুরুদেব বললেন, আমার গল্পের শেষ। এখন বুঝতে পারছ, এখন যে-কোনো পাপী মারা গেলে তার নামের আগে কেন স্বর্গগত লেখা হয়?

শিষ্য বলল, বুঝতে পেরেছি, গুরুদেব।

# মাতাল হাওয়া

দক্ষিণারঞ্জন বসু

গ্রীষ্মে নিদারুণ জলকষ্ট।

সে-দূরে সারা দ্বীপ জুড়ে জলের জন্ত হাহাকার।

থেকে আকাশ ভরতি জল এনে এনে ভরে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি।

উঃ কী বুকফাটা সে তৃষ্ণা! কী অসীম আকুলতা এক ফোঁটা জলের জন্তে, একটু প্রেমের জন্তে!

অথচ চারদিকেই জলে ঘেরা বৃটিশ ক্রাউন কলোনী এই হংকং। বিরাট এশিয়ার মানচিত্রে সামান্ত একটি বিন্দু মাত্র, তাহলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনীতির বাইরেও হংকং বোধহয় আরো মনোরম! তা' নিয়ে কত গল্প কত কাহিনী পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে মুখে মুখে। তার অনেক কথা তাঁরও জানা।

সেই মনোহারিণী হংকংকে দেখার বাসনা তাঁর বহুদিনের। সে ইচ্ছেকে পূরণ করতেই তাঁর এখানে আসা। এখন জুলাই মাস। জলের জন্তে এখনো হা-হুতাশ! মাতাল হাওয়ায় একই সুরের ব্যঞ্জনা—জল চাই, প্রেম চাই, প্রাণ চাই!

জলের জন্তে হাহাকার দু'তিন মাসের ব্যাপার, কিন্তু প্রেমের জন্তে হাহাকার সেতো চিরন্তন—সর্বদেশের সর্বকালের। তবু হংকং নিয়ে এত কথা কেন? সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়ে একা একাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন মিঃ ইয়ং।

সে বোধহয় হংকং-এর অভিনব পরিবেশের জন্তে। তার অদ্ভুত আবহাওয়ার জন্তে। এই পরিবেশ, এই আবহাওয়াই বোধহয় নারী পুরুষ সবার মনে একটা তীব্র পিপাসা জাগিয়ে দেবার পক্ষে অনুকূল। মাত্র একদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধারণাই হয়েছে মিঃ ইয়ং-এর।

জোসান!

সাগর বেলায় বেড়াতে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন মিস হুড পো-শান। হঠাৎ নতুন পরিচিত মার্কিনী কণ্ঠে ক্যান্টোনিজ-ভাষার শুদ্ধ ধ্বনি শুনে তিনি চমকে ওঠেন।

আরে আরে আপনি মিঃ ইয়ং এখনো রয়েছেন এখানে! ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে। —দাঁড়িয়ে উঠে মিস হুড সেকহ্যাণ্ড এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মিঃ উইলিয়ম সি ইয়ং-এর সঙ্গে। তারপর পাশাপাশি বসে দু'জনে আলাপ আলোচনায় ডুবে যান। সামনে সমুদ্র-বুকের তরংগের মতোই কত চিন্তা কত কথা তাঁদের দু'টি মনে দুলে দুলে ওঠে!

মিস হুড-এর সঙ্গে ইয়ং সাহেবের পরিচয় মাত্র দু'দিন আগের। তাও মাত্র ঘণ্টা দু'-একের আলাপ। টোকিও থেকে একই সঙ্গে ওরা ফিরেছেন হংকং-এ আপান এয়ার লাইনস্-এর বিমানে। পাশাপাশি আসনে বসার সুযোগ পেয়ে সেই সময়টুকুর মধ্যে অনেক কথাই নিজেদের মধ্যে বলতে পেরেছেন ওরা।

হংকং নাইট ক্লাবের বিখ্যাত নর্তকী মিস হুড। একমাসের চুক্তিতে তিনি গিয়েছিলেন টোকিওতে নাচ দেখাতে। মস্ত টোকিওকে আরো মাতিয়ে দিয়ে এই তো সেদিন তিনি ফিরে এসেছেন।

বিমানে পাশের ভদ্রলোকটিকে চেনা চেনা মনেই হচ্ছিলো মিঃ ইয়ং-এর। কিন্তু সে নিয়ে আলাপ শুরু করতে খুব সংকোচও বোধ হচ্ছিলো তাঁর। তবে সংকোচের চেয়ে ঘনিষ্ঠ হবার লোভ যেখানে বেশী প্রবল, সেখানে আর কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা সম্ভব?

আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে বলুন তো?—খানিক ভাবনা চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ ইয়ং সোজাসুজি জিজ্ঞেসই করে বসলেন মিস হুডকে।

বিমানের শার্সির ভেতর দিয়ে আকাশে অনেক দূর অবধি দৃষ্টি উড়িয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই মুচকি হেসে পার্শ্ববর্তিনী বল্লেন—আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। হংকং-এও থেকে থাকতে পারেন কিংবা টোকিও থেকে যখন দু'জনেই আসছি সেখানেই দেখেছেন এমনও হতে পারে।

কিন্তু টোকিওর কোথায় তাই ভাবছি।

কেন, নিচিগিকি রিটজিক হলে। একমাস ধরে সেখানেই নাচ দেখিয়ে ফিরছি আমি।

আপনিই তা'হলে মিস হুড গো-শাম!

তাই যদি হই তাতে কোনো আপত্তি নেই তো আপনার?

সে আবার কি কথা? আপনি মিস হুড, আপনার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া সে তো আনন্দের ব্যাপার, আপত্তি হবে কেন? আচ্ছা, কোথায় ছিলেন আপনি টোকিওয়?—এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ইয়ং-এর দুইর মধ্যে কী রকম একটা তীক্ষ্ণতা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেশির ভাগই আমি সদলবলে কাটিয়েছি গিন্জা টোকিও হলে। তবে শেষ দিকের কয়েকটা দিন আমি নিজে গিয়েছিলাম নিউ জাপান হোটেলে।

এই যাঃ, আমারও তো আস্তানা ছিল ঐ নিউ জাপানেই! পুরো একটা রাত আমি সে হোটেলে কাটিয়ে এলাম। আগে আপনার সঙ্গে আলাপ হলে কী মজাই না হতো!

কী আর মজা হতো! যে ব্যস্ততায় দিন কেটেছে, কথা বলার আর সুযোগ পেয়েছি কতটুকু! —হাসতে হাসতে উত্তর দেন মিস হুড।

তবু তারই মধ্যে……।

এবার আর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ইংগিতপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে মিস হুড বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নেন তাঁর চোখ দু'টোকে।

এর পর কিছুক্ষণ ধরে দু'জনেই ওরা নির্বাক ছিলেন।

হঠাৎ একবার আসন ছেড়ে উঠে যান মিস হুড। আর ঠিক সেই সময়েই এয়ার হোস্টেস মিস ফুজু সাদা কিমোনো এবং স্লীপার দিয়ে যায় এক এক করে সব যাত্রীদের। জাপান এয়ার লাইন্স-এর একটি করে সুন্দর পাখাও উপহার দেয় সঙ্গে সঙ্গে। একেবারে সব শেষে আসে ইয়ং সাহেবের কাছে। তাঁর সঙ্গে হেসে হেসে দু'চারটে কথাও বলে। মিঃ ইয়ং অনুরোধ জানান সাদাকে মিস হুড-এর খালি আসনে বসার জন্যে। সাদা এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে জানায় যে, যাত্রীদের পাশে বসে গল্পকরার নিয়ম নেই তাদের, কোন যাত্রীর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা বেআইনী।

শুনেই ইয়ং সাহেব থমকে যান এবং সামনের 'বুক'-পকেট থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে তা পড়ার উদ্যোগ করেন।

মিস সামা তৎক্ষণে ফুড-এর আসনে তাঁর কিমোনো, স্লীপার এবং উপহারের পাখাটি রেখে কোথায় যেন উধাও হলেন, অনেকক্ষণ তাঁর আর পাত্তাই মেলেনি।

মিস ফুড পো-শানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এসেছেন। এসেই কিমোনো রেখে খুব খুশি হয়েছেন। যে গরম!

জুলাই মাসেও দুপুরের মুখে সূর্যের বেশ কড়া মেজাজ। গরমে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল মিস ফুড-এর। পুলওভারটা খুলে রেখে কিমোনোটা গায়ে জড়িয়ে নিতেই খুব আরাম বোধ হলো তাঁর। তারপর জুতো জোড়া ছেড়ে স্লীপার পরে আরো হাল্কা হয়ে নিলেন তিনি। তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জাপান টাইমস-এর খবরের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

উপহারের সুন্দর পাখাটি খুলে নিয়ে নিজেকে তখন বাতাস করছিলেন মিঃ ইয়ং। মিস ফুডও পাচ্ছিলেন সে বাতাসের কিছু কিছু ভাগ। তাঁর মনে হলো ইয়ংও গরমে কষ্ট পাচ্ছেন। তাই তাঁকে তিনি বললেন—পোষাক খুলে রেখে কিমোনোটা পরে নিতে। তাতেই খানিকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিঃ ইয়ং। কৃতজ্ঞতা জানালেন পার্শ্বচরিনীকে। বল্লেন, উম কয়! অর্থাৎ ধন্যবাদ!

এরপরে দু'জনেই পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছেন। লাঞ্চের ডাক পড়লে দু'জনেরই ঘুম ভেঙেছে। মিস ফুড-এর যে খ্যাতির কথা তিনি শুনে এসেছেন জাপানে, মিচিশিতির নাচের আসরে একের পর এক নাচে যেভাবে তিনি অভিনন্দিত হতে দেখেছেন তাঁকে তাতে তাঁর পাশে এমনিভাবে ঘুমানোর সুযোগ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে মনে ভাবেন মিঃ ইয়ং। আর ঘুমের ঘোরেই মিস ফুড ভাবছিলেন, এদিকে তো যথেষ্টই হলো, এবার একবার মার্কিন মুলুকটা ঘুরে আসতে পারলেই কিস্তিমাৎ।

খেতে খেতে সে নিয়েই গল্প আরম্ভ হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে এবং খাওয়ার শেষে মিস ফুডই নিজে থেকে প্রকাশ করেন তাঁর মনের ইচ্ছেটা। আমেরিকার একবার নাচ দেখাতে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর, সে কথা জেনে পুলকিত হয়ে ওঠেন মিঃ ইয়ং এবং তাঁকে তারিফ করেন তাঁর সেই ইচ্ছের জন্যে। আর সেই তারিফ করতে গিয়েই উচ্ছ্বাসের আধিক্যে নিজের ডান হাতে হাতলের ওপর রাখা মিস ফুডের বাঁ হাতটাকে চেপে ধরেন সাদরে।

উত্তপ্ত সে হাত। আর সে উত্তাপ যথার্থভাবেই ধরা পড়ে মিস ফুড-এর উপলব্ধিতে। কিছুক্ষণ ধরে দু'জনেই নির্বাক। এবং সেই সময়েই কখন যে তাঁদের বিমানখানি পথ শেষ করে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ওপরে কাইটাক এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে, তা তাঁদের মোটে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ মাটিতে নামার ঠোক্কর খেয়ে মিস ফুড একেবারে পড়েই যাচ্ছিলেন মিঃ ইয়ং-এর কোলের ওপর। চিলে করে হলেও কোমরবন্ধে বাঁধা থাকায় আর ইয়ং সাহেব নিজে দু'হাতে পার্শ্বচরিনীকে ধরে ফেলায় তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, তা' না হলে অন্য কিছু না হোক হাস্যরসাত্মক একটা কোনো ব্যাপার যে ঘটতে পারতো তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরে এক এক করে যাত্রীরা নেমে পড়েছেন। কাস্টমস-এর বেড়াজাল পেরিয়ে যে যার জায়গায় চলে গিয়েছেন। মিস ফুডও তাঁর হলদে রিয়ে কখন কোথা দিয়ে যে দৃষ্টির অগোচরে ঘরে

নেবেন তার কিছুই টের পেলেন না ইয়ং সাহেব। সে না হয় হলো, কিন্তু মিস হুড-এর ঠিকানাটা জেনে নিতে তাঁর এমনি ভুল হয়ে গেল, সেটাই বড্ড আপশোসের কথা। লিমোজিনে চেপে কৌস্তুভের পেনিন্সুলা হোটেলে যেতে যেতে সেই আক্ষেপের আঁচই তাঁর মনে বার বার ওঘরে ওঘরে উঠছিল।

তবে এও অবশ্য ইয়ং সাহেবের মনে হয়েছে যে, নর্তকী হিসেবে মিস হুড-এর যে খ্যাতি তাঁকে খুঁজে বার করা মোটেই এত কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু না খুঁজেই যে তাঁকে পাওয়া যাবে এবং আপনা থেকেই যে তিনি এমনিভাবে ধরা দেবেন তাও এখনোই ভাবতে পারেন নি মিঃ ইয়ং।

তাই সমুদ্র তীরে এই আকস্মিক সাক্ষাতে দু'জনেই সমানভাবে অবাক।

আমি তো ভেবেছিলাম আপনি এখানে একরাত কাটিয়ে দেখে ফিরে গেছেন।—মিস্ হুড বলেন উইলিয়ম ইয়ংকে।

না, অত তাড়াতাড়ি কি করে যাবো! হং ং নাকি স্বপ্নপুরী। সেই স্বপ্নপুরী ভালো করে দেখবার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি। আমার দলের আর সবাই টোকিও থেকেই স্বদেশযাত্রী হয়েছেন শুধু আমি ছাড়া।—ইয়ং উত্তর দেন। বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি হলেও তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যেই নাম-মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিস হুড প্রতি উত্তর দিতে যাবেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ ইয়ং তাঁর নিজের কেটি না-বলা কথা বলবার জন্যেই যেন একেবারে ঝুঁকিয়ে পড়েন।

হ্যাঁ, শুনুন আরেকটা কথা। সেদিন টোকিও থেকে আসবার পথে বিমানে আপনার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা হলো তারপর আপনার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি হংকং ছেড়ে চলে যাবো, তা কি হয়?

ইয়াও সুম (সাধু, সাধু)! সঙ্গে আপনার যদি প্রচুর ডলার থেকে থাকে তা'হলে তার বেশীর ভাগটা আপনি এখানে বেশ ভালো চাবেই ব্যয় করে যেতে পারেন। খুবই ভালো কথা। —ইয়ং সাহেবকে সাধুবাদ দেন মিস হুড এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানান সে রাত্রে হংকং নাইট ক্লাবে তাঁর সঙ্গে নাচবার জন্যে।

উঃ কত! আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যান্টোনিজ ভাষায় মিস হুডকে ধন্যবাদ জানান মিঃ ইয়ং। হংকং-এ আসবার আগে যে কটা ক্যান্টোনিজ শব্দ তিনি শিখে নিয়েছিলেন এক এক করে তার সবগুলিই এভাবে কাজে লেগে যাচ্ছে, ইয়ং সাহেবের তাতে ভারি আনন্দ।

চলুন না একবার আমার হোটেল হয়ে যাবেন।—পাল্টা ভদ্রতা করেন মিঃ ইয়ং।

চলুন, তাতে আর কিসের আপত্তি।—মিস হুড সো-সান রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক পা এগুলেই হোটেল পেনিন্সুলা। ঘরে ফিরতে এই হোটেল পেরিয়েই তো নাথন রোড ধরতে হবে তাঁকে এবং ফেরবার সময়ও হয়ে এসেছে। তাই সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায় মিস হুড চলে আসেন ইয়ং সাহেবের হোটেলে।

হোটেল লাউঞ্জে বসেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ-আলাপ হয় দু'জনের মধ্যে। সিগ্রেটের পর সিগ্রেটের ছাই-এ এবং সিগ্রেটের টুকরোয় এ্যাসট্রেটা ভরে ওঠে, কিন্তু মন যেন কিছুতেই ভরে না —দু'জনেই অতৃপ্ত।

গল্পে গল্পে দু'বার করে চা-ও হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। সময়ের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন মিস হুড। বলেন, দশটার মধ্যে একজন সেট আসবেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, এখন যে দশটা বেজে দশ।

আর এক মুহূর্তও দেরী না করে মিস হুড বেরিয়ে পড়েন এবং ফুটপাতে নেমেই একটা ক্যাব ধরে উধাও হয়ে যান। কিন্তু যাবার সময় গাড়ীর ভেতর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি যেভাবে বিদায় নেন সেই দৃশ্যটি মিঃ ইয়ং-এর বুকের ভেতরে যেন সারা দিন ধরে হাতড়াতে থাকে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় স্পেশাল গেষ্ট-কার্ড নিয়ে হংকং নাইট ক্লাবে উপস্থিত হয়ে তবে ইয়ং সাহেবের শান্তি। ওঁকে অভ্যর্থনার জন্যেই ক্লাব-গেটে মিস হুড পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই দু'টি মনের খড়ই শান্ত হয়ে আসে।

ইয়ংকে নিয়ে মিনিমিনি একটা কোণায় গিয়ে বসেন মিস হুড। আগে থেকেই বোধহয় এ ব্যবস্থা করে নেওয়া। তা' নাহলে সব টেবিলেই মুখোমুখি দু'জোড়া করে নরনারী। এঁদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তার কারণ হংকং নাইট ক্লাবে মিস হুডের বিশেষ আধিপত্য। ওঁর ইচ্ছাকে সব সময়েই একটা বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাইতো যখন তখন বিদেশের আমন্ত্রণ গ্রহণে ওঁর কোনো অসুবিধে হয় না এবং ওঁর মন রাখার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয় ক্লাবের পরিচালকদের।

নাচ শুরু হয়েছে। নৃত্য-মঞ্চের দিকে সব চোখ। টেবিলে টেবিলে ফিসফাস কিছু কিছু কথাবার্তা। মাঝে মাঝে মদের গ্লাসের টুং টাং শব্দ এদিকে ওদিকে, তা' ছাড়া মোটা দাগ মুটেই মোটামুটি শুব্ধতা।

তারই মধ্যে মিঃ ইয়ং একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাচ কখন শুরু হবে?

কেন আপনি এত ব্যস্ত আমার নাচ দেখবার জন্যে। হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বিস্ময়ের সুরে পাল্টা প্রশ্ন তোলেন মিস হুড।

সত্যি তাই, মিনিমিনি বলে আপনি যে নাচটি প্রথম নেচেছিলেন তা' আমি ভালো দেখেছিলুম আমার। সেই ক্লাওয়ার ড্যান্সটি আরেকবার দেখতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আজকে নাচবেন সে নাচটি?

সে দেখা যাবে খ'ন। কিন্তু এ নাচটিও তো ভালোই হচ্ছে, সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। সাদার ভ্যাম্প, এক সঙ্গে এত কটি মেয়ের নাচ—ভালো না লেগে পারে কখনো? কি বলেন?

যতই ভালো হোক এ পুরনো ধরনের ভ্যাম্প। আমার অনেকবার দেখা। আপনার ফ্লাওয়ার ভ্যাম্পের সঙ্গে এর তুলনা? ছ্যাঃ!

আপনি খুবই সমঝদার লোক দেখছি। সঙ্গে জন মার্কা ব্লাক হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাস ভেলে নিতে নিতে ইয়ং সাহেবকে একটু বাহবা দেন মিস হুড।

তা আপনার যা ইচ্ছে তাই আমাকে বলতে পারেন। আমি বলবো আপনার সে নাচটি সত্যি সত্যি অপূর্ব। একটি গোলাপফুলের কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে। তারপর তার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলছে নিরাভরণা নিরাবরণা এক প্রকৃতির দুলালী! কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝরে পড়ে যায় ফুলের সব পাপড়ি। আর সেই পরিবেশে অতুলনীয় নৃত্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে উধাও হয়ে যায় সেই ফুলদুলালী। বাস্তবিকই আমি অকপটেই স্বীকার

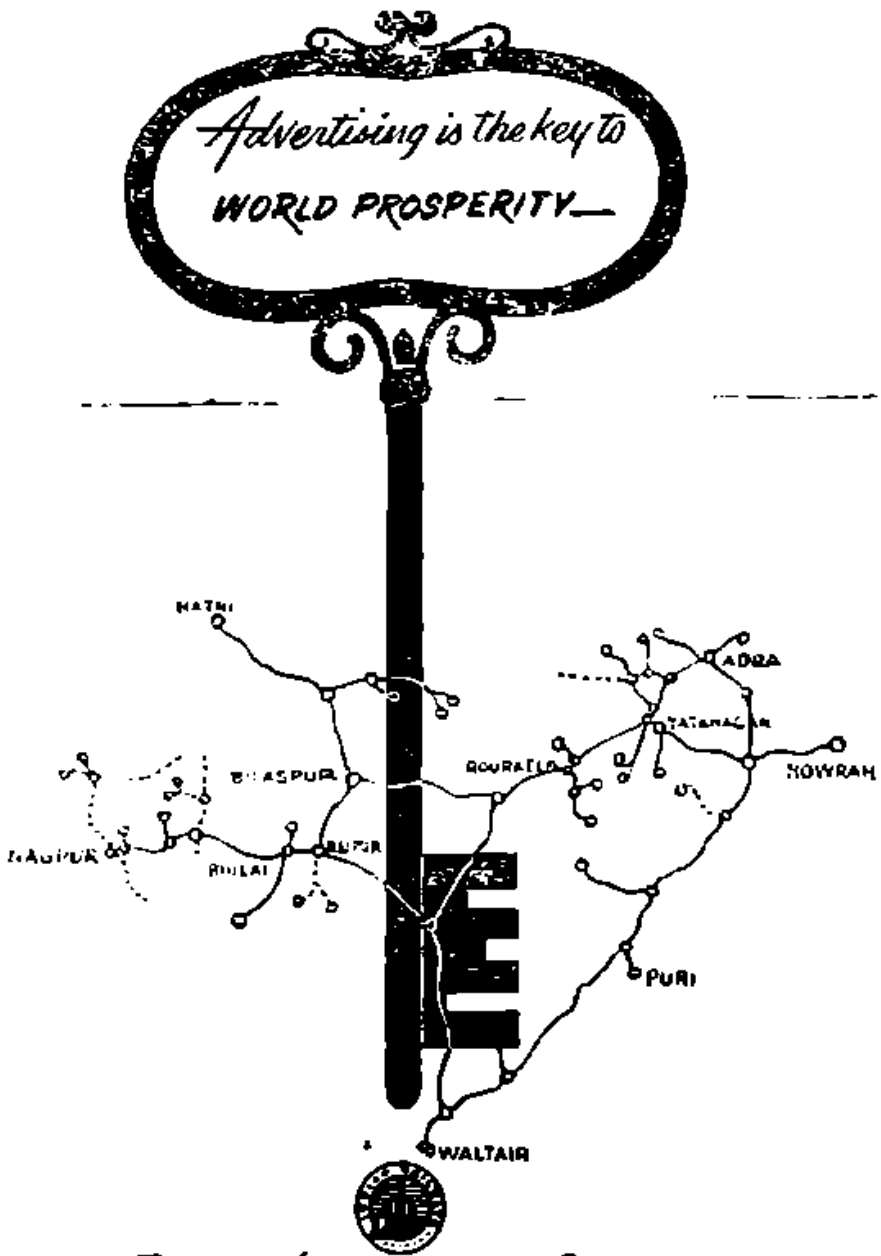


*For your Advertisements Contact*

THE COMMERCIAL PUBLICITY OFFICER

**SOUTH EASTERN RAILWAY**

11, GARDEN REACH ROAD, CALCUTTA-43

Phone: 45-2232/45-5349 Telegram: CPUOSER

CPUO-1-64.

করবো সেদিন টোকিওর দেখবার আগে এমন চমৎকার নাচ আর কোথাও দেখিনি আমি।—এই বলতেই ইয়ং সাহেবকে ঘুরাতে জড়িয়ে ধরে এক চুমুতে নেশা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেন মিস ফুড।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় নাচটিও শেষ। বলনাচের ডাক পড়তেই জোড়ায় জোড়ায় সব নরনারী ছুটে আসেন নৃত্যমঞ্চে। মিস ফুডও ইয়ং সাহেবকে টেনে তুলে নিয়ে আসেন সেখানে।

নাচ শুরু হয়ে যায় বাজনার তালে তালে, ক্রমেই বেড়ে ওঠে উত্তেজনা। বাজনার গানটি অনেক কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে—নার্ভাস মাস্ট স্টার্ট·····ইত্যাদি। সেই উত্তেজনার মধ্যেই নাচতে নাচতে একবার জিজ্ঞেস করে বসেন মিস ফুড, আপনি আরো দু'চার দিন হংকং-এ থাকছেন তো মিঃ ইয়ং?

তা' আপনি যদি চান নিশ্চয়ই থাকবো, তবে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই দেশে ফেরবার ইচ্ছে। এই ইচ্ছে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ মিস ফুডের দেহস্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ইয়ং সাহেব, তবে মুহূর্তের মধ্যেই আবার নিজেকে সামলে নেন।

মিস ফুড একটু হেসে ফেলেন। দুষ্টুমিভরা সে হাসি। ঠোঁট ছুঁড়ে সে হাসি থাকতে থাকতেই তিনি বলেন, আসছে কাল তাঁর ছোট বোন আনা ফুড-এর বিয়ে। সে বিয়েটা তিনি দেখাতে চান ইয়ংকে।

তাই বলুন। কিন্তু ও পথটা আপনি বুঝি এড়িয়েই চলেছেন?

তেমন মনের মতো পুরুষ আর পেলাম কোথায়?—মিস ফুড-এ কথায় আহত হয়ে গর্জে ওঠে ইয়ং সাহেবের পৌরুষ। তিনি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখুনি নাচটা শেষ হয়ে যায় আর ওরা মঞ্চ থেকে নেমে এসে যে যার আসনে এসে বসে পড়েন।

এখানকার বীয়ারের খুব নাম। টেস্ট করেছেন?

হুইস্কিতে ডুবে থাকতে যে ভালোবাসে তার কাছে কি আর অন্য কিছু ভালো লাগে? তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই একবার চেষ্টা করব।—বলেই দু' গ্লাস বীয়ারের অর্ডার দেন মিঃ ইয়ং এবং দু'জনের ফুডেরও।

খেতে খেতে ওরা দুজন বেশ ভালো করে জেনে নেন পরস্পর পরস্পরকে। চীনা হলেও মিস ফুড খৃষ্টান বাপ-মায়ের সন্তান। দু'পুরুষ ধরে ওরা খৃষ্টান। ছোট বেলা থেকেই নাচের দিকে খুব বেশী ঝোঁক ছিল মিস ফুড-এর। বহু মালা, বহু হাততালি এবং মেডেল ইত্যাদি বহু পুরস্কার শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্থানীয় নাইট ক্লাবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্তকীর সম্মান দিয়েছে। অর্থের অভাব কোনো সময়ই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, প্রাচুর্যই বরং পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাঁর কাছে সময় সময়। এসব কথা মিস ফুড কথায় কথায় বলে ফেলেছেন ইয়ং সাহেবকে। ছোট বোন আনা। তার চেয়ে অনেক বেশী সুখী, সে-কথা বলতে গিয়েই নিজের অসুখী জীবনের বহু কথাই প্রকাশ করে ফেলেছেন তিনি।

ছোট বোনের কথা বলতে গিয়ে মিস ফুড বলেছেন, আনা ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকতে খুব ভালবাসতো। বড়ো হয়ে সে চাইনিজ আর্টের সেরা শিল্পী মিসেস ক্যারী নেবাজির ছাত্রী হিসেবে হংকং-এর সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে। ওর এক চিত্র প্রদর্শনী দেখেই তো মুগ্ধ হয়ে এক ধনী বৃটিশ ব্যবসায়ীর ছেলে আসছে কাল আনাকে বিয়ে করতে চলেছে।

এই বলার পর বীয়ারের গ্লাসটা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিস ফুড-এর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস

যেন মিলিয়ে যায় বাতাসের মধ্যে। এ যে আর কিছুই নয়, সংসারের স্বাদ আস্বাদনের আকুতি' তা' বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না হেং-এর। তাই তিনি নাচের আলোচনাতেই চলে যাবার চেষ্টা করেন।

মিঃ ইয়ং গম্ভীরভাবে কথাটা তোলেন। বলেন, পর পর আরো দু'খানা নাচই তো হয়ে গেল। দু'টো নাচই ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পর আপনার সেই ফ্লাওয়ার ড্যান্সটা হলে ভারি সুন্দর হতো।

আচ্ছা দেখা যাক কি করা যায়, বলে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন মিস হুড। তারপর একটু বাদেই ঘুরে এসে বললেন, বিখ্যাত গায়ক মিস লান ফুনের একখানি গানের পরেই তাঁর ফ্লাওয়ার ড্যান্স দেখানো হবে।

সে কথা শুনে মিঃ ইয়ং-ই শুধু নয়, আশপাশের অনেকেই খুশি হলেন তা' জেনে। আসলে মিস হুড পো-শানের নাচই তো এ নাইট ক্লাবের মূল আকর্ষণ।

মিস লান ফুনের কোকিল কণ্ঠের গানে একটা অদ্ভুত রকমের প্রশান্তি বিস্তৃত হয়েছে সারা হল ঘর জুড়ে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জোড়া জোড়া সমস্ত চোখের দৃষ্টি গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে একটি গোলাপ কুঁড়ির থেকে মঞ্চের মাঝখানে। কুঁড়িটির আকস্মিক আবির্ভাব। তারপর ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তার পাপড়ি ঝরা সুরু। তারপর মিস হুডের অতুলনীয় নিরাবরণ নৃত্য! যেমনি তার সৌষ্ঠব, তেমনি দেহ-ভঙ্গিমা! ফ্লাওয়ার ড্যান্স দেখে আরেকবার মুগ্ধ হলেন মিঃ ইয়ং।

তারপরেও ওরা আরো অনেকক্ষণ ছিলেন ঐ নাইট ক্লাবে। আরো নাচ আরো করেছেন। আরেকটা বলনাচে মিশে হয়ে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরেছেন।

পরদিন ছোট বোন আনার বিয়ের আগের নতুন বন্ধুকে নিয়ে যাবার জন্যে মিস হুড নিজেই ইয়ং সাহেবের হোটেলে এসে উপস্থিত। তেমনি কথাই অবশ্য ছিল তবে তিনি একটু আগেই এসেছেন।

মিঃ ইয়ং-ও এক রকম প্রস্তুতই ছিলেন। রিসেপশন রুমের টেলিফোন পেয়েই কোটটা গায়ে চড়িয়ে, চুলটা ব্রাস করে নীচে নেমে আসেন।

দেখা হতেই দু'জনের মধ্যেই কেমন যেন একটা সলজ্জ ভাব। কাল রাতের বিদায় মুহূর্তটি দু'জনেরই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, তাই!

লজ্জা ভেঙে মিস হুড-ই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাভ ইউ স্লিপ্ট নাইট?

ও ইয়েস! আপনার?—এবার পাল্টা প্রশ্ন আসে মিঃ ইয়ং-এর দিক থেকে।

আমার ঘুমও মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তবে আজ আমার নিয়ে তাঁদিয়ে এক আধটুকু চিন্তা-ভাবনার কারেন্সা ছিল। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।—এই বলে বাইরে এসে দাঁড়াতে ওঠেন মিস হুড মিঃ ইয়ংকে সঙ্গে নিয়ে।

গীর্জায় আমন্ত্রিতদের মধ্যেই ভীড় জমে গেছে এরই মধ্যে। আনন্দে উল্লাসে প্রার্থনার হলটি সরগরম। তারই মধ্যে মিস হুড খালি জায়গায় খুঁজে নেন দুজনের জন্যে। কিন্তু পাশাপাশি বসেও আজ আর তেমন খোলাখুলিভাবে তিনি কথা বলতে পারছেন না কেন মিঃ ইয়ং-এর সঙ্গে? মনের হাত দিয়ে নিজের মধ্যে একটু হাতড়ে দেখেন মিস হুড। একি তার ঈর্ষা-জনিত কাতরতার ফল?

সে যাই হোক, বিয়ের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ।

হংকং-এ বিয়ে, কিন্তু সব কিছুতেই পশ্চিমী ছোঁয়া। কনের গায়ের দামী গাউন আর ওড়না, হাতে দামী ফুল বেহাই কাছে বরের জন্যে অপেক্ষা। তার সাথী মেয়েরাও ফুল হাতে দাঁড়িয়ে কনের এপাশে ওপাশে।

বর নির্দিষ্ট সময়ে কনের পাশে এসে দাঁড়াতেই পবিত্র বিবাহবন্ধনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ করে যেন প্রধান ধর্মযাজক প্রার্থনা পাঠের মধ্য দিয়ে। সকলের শুভ কামনায় আমোদিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। সেই পরিবেশ থেকেই ধীরে ধীরে সবাই বিদায় নেন সুশৃঙ্খলভাবে।

অবশ্য এই-ই সব নয়। বিয়ে উপলক্ষে চীনাদের কতগুলো চিরাচরিত রীতিও পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে সব চীনা খৃষ্টান হয়ে গেছেন তাঁরাও এসব রীতি বর্জন করেন নি। সে সবই মিঃ ইয়ং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছেন আনার বিয়ের বিরাট ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে।

মিস হুড কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে যাবেই তিনি এটা ওটা বুঝিয়ে যেন মিঃ ইয়ং-কে আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তো বটেই, বাড়ির সবাই হাজির ভোজসভায়। একেবারে বুড়ি ঠাকুরমা থেকে শুরু করে বৌদির কোলের ছেলেটি অবধি এ আনন্দের অংশীদার। বাড়ির এবং বরপক্ষের আসল আসল লোকদের সঙ্গে মিস হুড-ই ডাকে ডাকে মিঃ ইয়ং-কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ভোজ উৎসবে সারা হল ঘরটি জুড়ে লালরঙের ছড়াছড়ি—বাতির ঢাকনা দেওয়ালের কাগজ টেবিল ক্লথ এমন কি শিশু এবং মেয়েদের গায়েও লাল রঙ। লাল হলো চীনাদের আনন্দের রঙ কিনা তাই!

সবার চোখই অবশ্য নববধূর দিকে। এই বাকি যারা চলে আসছে—বধূকে খুশি দেখাবে, কিন্তু উচ্ছল নয়। তার ঠোঁটে হাসির রেখার বিদ্যুৎ খেলবে, কিন্তু কখনো চোখে ধারা চলবে না। এতদিন ঘরে বাড়িতে বাপ-মা এবং আর সব গুরুজনের কাছে যে সব আচার-আচরণ সে শিখে আসছে বিয়ের উৎসবেই যে তার পরীক্ষা!—এসব কথাই একটু একটু করে মিস হুড বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর অতিথি বন্ধুকে।

প্রধান খাবার টেবিলের ঠিক মাঝখানেই বসেছে আজ তার স্বামীর পাশে। আর ওকে ঘিরে শ্বশুরবাড়ির সব লোকজনেরা। ধীরে ধীরে খাওয়া চলেছে। শার্কফিনস্-এর ডিস না আসা পর্যন্ত এমনি ধীরে খাওয়াই নিয়ম। তারপর এক সময়ে নবদম্পতি ঘরের বাপ-মায়ের সঙ্গে উঠে এসে এক একটি টেবিলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বসবার জায়গা সব অতিথিদের এবং শুভ কামনা প্রার্থনা করে। সব শেষে পোশাক বদলে 'শ্বশুরবাড়ি যাবার পোশাকে' সজ্জিতা হয়ে আবেগভরা আসরে এসে উপস্থিত হয় নববধূ। সে পোশাক হয়তো বিখ্যাত 'মোরনে'র কিংবা কোন ফরাসী শিল্পির বানানো। মুহূর্তের জন্যে সে দিকেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু আবার বিদায় প্রার্থনা সবার হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করলে যে পরক্ষণেই প্রত্যেকের মন থেকে মুছে গেল পোশাকের উজ্জ্বলতার কথা।

কিন্তু এত বিষয়তার ছায়া কেন মিস হুড-এর মুখখানি জুড়ে? ভোজসভা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এই একটি প্রশ্নই মিঃ ইয়ং-এর মনকে কেবলি দোলা দিতে থাকে। চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, বেলা পড়ে আসছে, মিস হুডকে নিয়ে তাঁর হোটেলে ফেরে খানিক আড্ডা জমানো বন্ধ হয় না।

৺পূজার বাজারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

* রেশমী বস্ত্র *

ও

অন্যান্য কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ রেশমশিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

( পশ্চিমবঙ্গ শিল্পবাণিজ্যের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন ও খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন দ্বারা প্রমাণিত )

১২/১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ :

(১) ১২/১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১
(২) কুটীরশিল্প বিপণি—
১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
(৩) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
(৪) ১৫৯/১এ, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
(৫) ১৫৬, বিধান সরণি, কলিকাতা
(৬) ৪৪, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
(৭) বাচন রোড—বেনাচিতি দুর্গাপুর-৪

রেশম বস্ত্রে রিবেট ২০%
খাদি বস্ত্রে রিবেট ৫%

গাড়িতে উঠে ইচ্ছেটা প্রকাশই করে ফেলেন মিঃ ইয়ং। তাতে কোনো আপত্তি নেই মিস হুড-এর। আজ যে ছুটির দিন, ঘরে ফিরে তো একা একাই কাটাতে হতো! তার চেয়ে বরং একটু আড্ডা দেওয়াই ভালো। মনটাও হয়তো তাতে খানিক প্রফুল্ল হবে, আর এক বিদেশী ভদ্রলোককেও কিঞ্চিৎ খুশি করা যাবে।

এ সব ভেবেই সম্মতি দেন মিস হুড এবং মিঃ ইয়ংকে নিয়ে নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে গোটেল পেনিন্সুলায় চলে আসেন। এবার আর লাউঞ্জে গিয়ে বসা নয়, সিকটে চড়ে সটান একেবারে টপ্‌ ফ্লোরে—রুম নাম্বার ৭৩৪-এ।

ড্রিঙ্ক! অর্ডার করা মাত্র 'ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক!—কুশনে বসেই হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েই এই অনুরোধ জানান মিস হুড। আর তাঁর ইচ্ছে জেনে নিয়ে বেয়ারা সেই মতোই অর্ডার দেন মিঃ ইয়ং।

বয় এসে মদের আসর জমিয়ে দিয়ে যায়।

আপনি কিন্তু আজ বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করছেন মিস!—এই বলে বেয়ারা মিঃ ইয়ং একটু সাবধান করেই দিতে চাইছিলেন হুড সাহেবাকে। কিন্তু সে বেয়ারা একেবারে নাছোড়বান্দা!

নেভার মাইণ্ড মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আই লাইক টু ফরগেট এভ্রি থিঙ!—বলেই মিস হুড আরেক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিলেন গ্লাসে।

তার পরেও সে আড্ডা চলে অনেকক্ষণ ধরে। বেয়ারাকে বোতাম টিপে বেল দিয়ে আরো দু'বার অন্তত মদ আনতে হয় বয়কে ডেকে। শেষবার যখন বয় আসে তখন আর কোনো নতুন অর্ডার দিতে হয় না তাকে। মিস হুড তখন মিঃ ইয়ং-এর স্কন্ধোপরি সটান।

কর-তে, মাই টার্ন নাই!—ক্যাপ্টোরিক ভাষায় বয়কে বিলটা নিয়ে আসতে বলেন মিঃ ইয়ং। আর সে কথা কানে যেতেই টলতে টলতে উঠে বসেন মিস হুড

ও নো নো, নট নাউ। এ কিউ মোর ড্রিঙ্কস প্লিজ!—জীবন একটা যন্ত্রণা, একটা দুঃখের সুর ফুটে উঠে মিস হুড-এর কণ্ঠে। সেই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি চান তিনি। সেই জন্যেই তাঁর আরো মদ চাই, আরো নেশা। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে তাঁকে শান্ত করেন ইয়ং সাহেব এবং বিলের টাকা দিয়ে বয়কে বিদায় করে দেন।

আজ থেকে আমি কত সুখী! নিজের স্বামী, নিজের সংসার নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর কল্পনার জাল বুনে চলবে সে।—নেশার ঘোরে বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যান মিস হুড। মিনিট দুই পরেই আবার নিস্তেজ স্বরে বলতে আরম্ভ করেন—আমারও জীবনে কম পুরুষ আসেনি, কিন্তু একটাও পুরুষের মতো পুরুষ পাই নি; আই ওয়াণ্ট এ টাইগার, ইয়ং অর ওল্ড আই ডোণ্ট মাইণ্ড, মাই ম্যান মাস্ট বি এ টাইগার।

মিস্ হুড-এর কথা শুনে চমকে ওঠেন মিঃ ইয়ং। তবে কি তাঁকে লক্ষ্য করেই বলছেন তিনি। জড়িয়ে জড়িয়ে আরো অনেক কিছুই বলে চলেছেন মিস হুড। কখনো থামছেন, আবার হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠছেন। তবে অনেক অসংবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর সুখসুখী মন সে সব কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ মাসটা সেপ্টেম্বর হলে তারি ভালো হতো। সেপ্টেম্বরের বড় তারিখে আরো অনেক লোকের সঙ্গে কিংবা আমরা দু'জনেই অনেক অনেক দূরে সেই পাহাড়ের চূড়ায় একেবারে সেই ভিক্টোরিয়া পিকের ওপরে চলে যেতাম যেখানে কোনো বিপদই আমাদের কখনো স্পর্শ করতে পারতো না। জানেন না

বোধ হয়, দু'হাজার বছর আগে এক দূরদর্শী চীনা পরিবার আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ঐ পাহাড় চূড়ায় আগে থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। সেই থেকেই তো প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে আমাদের চেউং ইয়েউং উৎসব অর্থাৎ আত্মরক্ষার উৎসব চলে আসছে। চলুন, আত্মরক্ষার জন্যে আমরাও অনেক অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।—ভাবে ভাবেই একটানা এতগুলো কথা বলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান মিস ফুড। চোখ দুটো আর যেন মেলতে পারছেন না তিনি। অতিরিক্ত নেশার ফল। সেই ভোজ-সভার টেবিল থেকে শুরু আর এই হোটেলে অবিরাম সহবৎ-সাধনা! তার জের যাবে কোথায়? মিস ফুড তাই অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছেন এখন।

ইয়ং সাহেবের চোখে তাঁকে সুন্দর লাগছে ওঁকে এই অবস্থায়। একটা অব্যক্ত কামনার দৃষ্টি দিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলেছেন মিস ফুডের সর্বাঙ্গ। ডিভোর্সের আগে মিসেস ইয়ংকেও সময় সময় তিনি এমনিভাবে দেখতেন,এর চেয়েও নিবিড়ভাবে দেখতেন। সহসা সেই সব ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর তিনি ঘামতে থাকেন।

রাত আটটা নাগাদ মিস ফুড ফিরে আসেন তাঁর নিজের ঘরে। ছুটির রাতে আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর কেবলি আকাশ-পাতাল চিন্তা।

ঘরের নেশায় এমন কতগুলো কথা তিনি বলে ফেলেছেন ইয়ং সাহেবকে যার জন্যে এখন ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছে মিস ফুড-এর।

আরে কী মুস্কিল ওখানে আপনি এত ভাবছেন কেন? আমারও তো তা' হলে লজ্জা পাবার অনেক কারণ রয়েছে, কিন্তু সে সব নিয়ে আমি তো মোটেই কিছু ভাবছি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে যে পর্বারের কথাবার্তা হয়েছে তারপর আর এ ধরণের কর্মালিটি অবান্তর? মাথার কাছে কোনটা হঠাৎ ক্রিং করে উঠতেই মিস ফুডকে ভুৎসই জবাবে চুপ করিয়ে দেন মিঃ ইয়ং। রাত তখন প্রায় বারোটা। ইয়ং-এর কথায় ক্লান্তির সুর ধরতে পেরে আর কথা বাড়াতে ভরসা পান না মিস ফুড,—'গুড্ নাইট্, হ্যাভ গুড্ স্লিপ' বলেই ফোন ছেড়ে দেন।

এর পরে আর একদিন মাত্র তাঁর অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করেছেন মিস ফুড হংকং নাইট ক্লাবে। তারপর?

তারপর বেশ কিছুদিন বাদে ক্লাব-ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি এলো নিউইয়র্ক থেকে। পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট করে ব্রডওয়ের কি-কি থিয়েটারে মিস ফুড যোগ দিয়েছেন, এই সংবাদ। আরো সংবাদ আছে ঐ চিঠিতে. খুব শীগ্‌গিরই মিস ফুড মিসেস ফুড ইয়ং হতে যাচ্ছেন এবং মিঃ উইলিয়ম সি ইয়ং নিজেই কিনিয়া থিয়েটারের প্রোপাইটার, এ খবরও লিখে জানিয়েছেন হংকং-এর প্রেষ্ঠ নৃত্য-পটিয়সী স্বয়ং।

চিঠিখানি পড়া শেষ হতেই ম্যানেজার তাঁর উপলব্ধিতে যেন দেখতে পেলেন ভয়ঙ্কর রকমের একটা অহঙ্কারের মত্ততায় প্যান আমেরিকানের একখানি বিমান ফাইটাক এয়ারপোর্ট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হংকং নাইট ক্লাবের বিজ্ঞাপনে অবশ্য ফুড সো-শানের নামটা এরপরেও চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু ক'দিন আর লোককে ফাঁকি দেওয়া চলবে?

---

উপন্যাস

# বায়ু বয় পূর্বদিকে

বাণী রায়

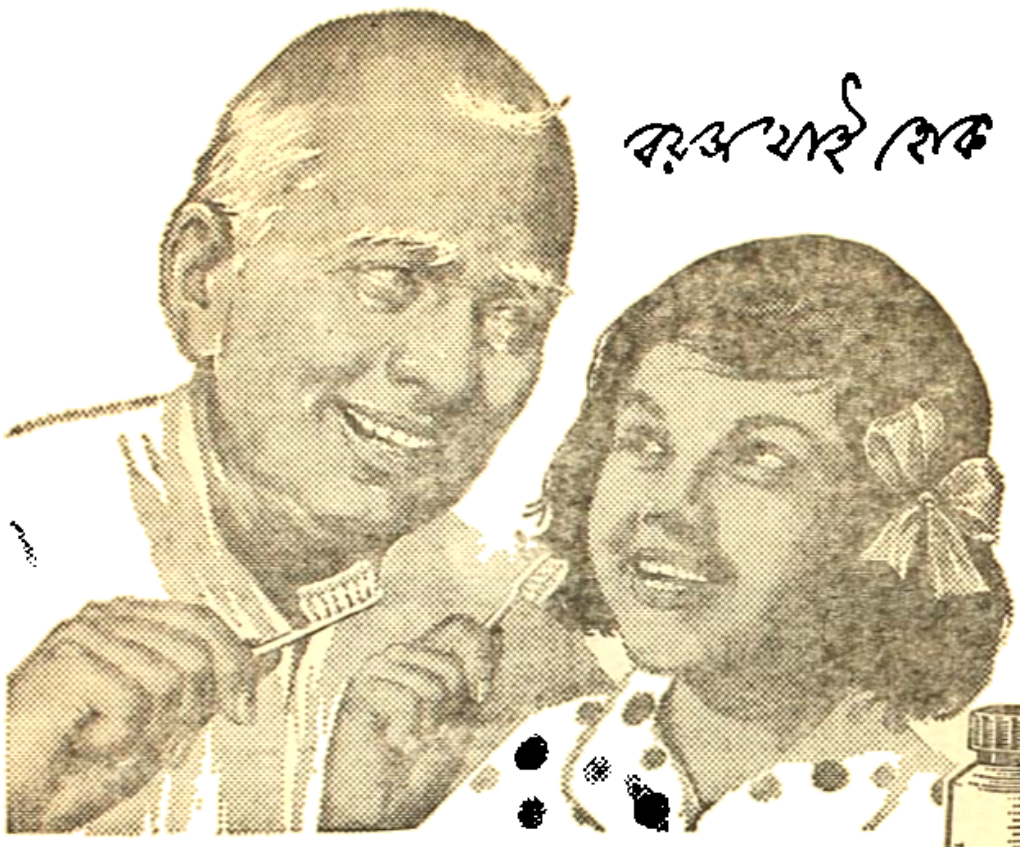


নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।

নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, কেভিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

**নিম-এর তুলনা নেই।**

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

# নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ কলিকাতা—২৯।

NTP/251 •

## প্রস্তাবনা

দক্ষিণ সাগরে আগে সহস্রদল বাসনার পদ্ম।

যে পথে জীবনে কখনও যাব না, বর্ণবহুল সেই পথের উপর বয়ে যায় দক্ষিণ বাতাস। ফুল ফুটে ওঠে, নানা বর্ণে। সমগ্র পৃথিবী ফুলে ফুলে ওঠে দুলে। রোদুষ্কি নিঃস্বত নীলধারা পার হয়ে দক্ষিণ সাগরের অবগাহনে চলে।

উপত্যকা সমৃদ্ধ হয়। নদীর তীরে তীরে ফুল ফোটে। তৃণে ফুল, মাটীতে ফুল, পাথরে ফুল, জলে ফুল।

গাছে নূতন হরিৎ পাতার কুঞ্জ, সেখানে গান গাওয়া পাখী। কত পাখী!
মাটী একসূত্রে গেঁথে তোলে।

মেঘ ভাসে আকাশে। হাল্কা সাদা-সাদা মেঘ। নীলের বুকে ভাসায় গভীর সাদার ব্যথা। রামধনুর রংএ সাজে আকাশ। কমলাকুমারী রংএ ভেসেছে আলো।

দক্ষিণা বাতাস বয়। তাই তো ফুলে সঞ্চিত হয় সৌরভ। পাখীর গানে জাগে তান। আলোতে রং জাগে।

জানিনা কোন সে নদী, বিপাশা, বেত্রবতী কিনা, সেখানে এই অনন্ত দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিণ্য আমার জীবনে বিপুল সম্ভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করবে। আমার মনে আঁকা সেই পথ, সেখানে দক্ষিণ বাতাস চির বসন্ত। সেই পথ আমি কি খুঁজে পাবো?

এদিকে বয়ে যায় পূবালী হাওয়া।

আবার বয়ে যায় পূবে বাতাস। দক্ষিণ বাতাসের বুকের ওপরে হত্যা করে যৌবনকে।

সুমেরু পার হয়ে কঠিন হিমতীব্র বাতাস বয়ে আসে। আহতী ধারা রোদুষ্কির ধারে হিমবাহ হয়ে যায়। উপত্যকায় বরফ পড়ে ঢেকে দেয় তৃণশ্যামলতা।

হু-হু করে পূব বাতাস বয়ে যায়। ঝরে পড়ে ফুল। একে একে পাখী উড়ে যায় আবার দক্ষিণ বাতাসের দেশের সন্ধানে। গাছের পাতা আস্তে হলদে হয়। ঝরে পরে ধুলোয়। নিষ্পাণ্ড-বিবর্ণ গাছ নিঃস্ব দাঁড়িয়ে থাকে।

মাটি মমতা বিহীন রুক্ষ-ধূসর হয়ে ওঠে। পাথরে পাথরে কাঁটাভরা ফণীমনসা জেগে নাম ছেঁলে।

সমস্ত হারা নীল-সাদা আকাশ কালো আলো হয় নিষ্প্রভ।
সমগ্র পটভূমিকায় শুধু পূবালী বাতাস বয় অবিরাম।

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য ভরে যায় তুষারকাঠিন্যে। দক্ষিণা বাতাস গতি পরিবর্তন করে পূবে বয়। দক্ষিণ বাতাসের স্রোতের উপর স্রোত ভাসিয়ে তীক্ষ্ণ ধারে দ্রুতগতিতে পূব বাতাস রাজত্ব করে।

যৌবন স্থবির হয় সেখানে। অদেখা পথ কুয়াশাস্তরে ঢাকা পড়ে। দক্ষিণ সাগর উত্তাল বরফ জমানো মহাপারাবার হয়ে মৃত্যুর মত শিকারের অপেক্ষায় থাকে। সুমেরুর বাতাসে শীত, শীত

যৌবন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মাথা নামায়, ঝরা হয়ে যায়।
পূবালী হাওয়ায় দক্ষিণকে ডাকাই আমার সাধনা।

## প্রথম কাণ্ড

গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিচ্ছিলাম।

এখনি জলের হোজ চালিয়ে মামা গাছগুলোয় জল দিয়ে যাবেন। গাছ কাটা কাঁচি হাতে, পেছনে নৃত্যগোপাল এসে যাবে। মামা গাছের যত্নে ত্রুটী হতে দেন না। তবু ভাগ্যি মন্দ বলতেই হবে, গাছে ওঁর ফুল ফোটে না, পাতাগুলো ভাল করে সবুজ পাখনা মেলার আগেই কুঁকড়ে যায়। ফুলের কলি এক-আধটা ধরলে মামার কি হর্ষ! কিন্তু তারাও শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

সহরতলীর অংশটাতে ছোট ছোট নূতন বাড়ী। জমি সস্তা বলে সকলেই অবসরের জমি রেখেছেন বাড়ীর আগে পিছে। অবসরপ্রাপ্ত লোকগুলির বাগান রচনায় উৎসাহ প্রবল।

আমি ভেসে এসেছি এখানে। চাকুরি নেই, বেকার তরুণ আমি। মামাকে দেখবার লোক নেই, মামা তো চিরকুমার। তাই এখানে কিছুদিন থাকতে এলাম মামার আহ্বানে। এখানে যদি কিছু জুটে যায় দেখি।

কিন্তু এখানকার তরুণ-তরুণীরা গেল কোথায়! তরুণীকুল না হয় বিবাহ যাত্রা পরবাসিনী, কিন্তু তরুণেরা কোথায়? চাকুরি নিয়ে শহরতলীর বাইরে শহরে তারা চলে গেছে। তারা কোন না কোন প্রকার ও প্রণালীতে এখান থেকে চলে গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়া, বিধবা বা চিরকুমারী, বেকার বৃদ্ধ এদের দ্বারাই পূর্ণ এই স্থান। জ্যোৎস্না সন্ধ্যায় ছোট ছোট কমল-বাগানে ডেকচেয়ার পড়ে, রাংচিতের বেড়ার ওপার দিয়ে এ ওর দিকে গলা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ভাব বিনিময় করে থাকেন। কৃষ্ণপক্ষ হলে কোন ঘরের কয়াসে বসে তাসের আসর জমানো হয়। কখনও বা ছিটকে কোন তরুণ-তরুণী দেখা-সাক্ষাতে এলে তাদের কেন্দ্র করে উৎসব হয় এক-আধটু। বেতারে ভাল নাটক থাকলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এক বাড়ী বসে সকলেই শোনেন, তারপর প্রবল উৎসাহে তাই নিয়ে আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। খবরের কাগজটা দারুণ উত্তেজনার বস্তু। বাইরের জগতের একমাত্র নিয়মিত খবর সেই এনে দেয়। কাগজ হাতে এলেই চাকরবাকর থেকে সুরু করে বন্ধু-পরিজনকে ডেকে ডেকে বলা হয়।

সকলেরি দেখা কোন ব্যাধি আছে। রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস, বাত, বহুমূত্র ইত্যাদি। তার জন্য প্রায়ই সকালে ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়া হয়। সেখানে খবরের কাগজের সংবাদের তীব্র সমালোচনা হয়। তরুণের যেমন দেখা-সাক্ষাতের স্থান চায়ের দোকান, এঁদেরও সাক্ষাতের স্থান ডাক্তারবাবুর চেম্বার। দুই-তিনটি ডাক্তার আছেন বার্ধক্য কলোনীতে। তাঁরা স্নানাহারের সময় পান না।

দাঁত ও চোখ নিয়ে যা অন্য ব্যাধি বাড়লে কদাচিৎ শহরে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। রীতিমত ভ্রমণযাত্রা সেদিন। ছেলে-বৌ বা মেয়ে-জামাই অথবা অন্য পরিজন গাড়ী নিয়ে আসে, কিম্বা ট্রেনে করে নিয়ে বাকীটা ট্যাক্সি চালায়। ফিরে এসে দিন রাত গল্প চলে দু-একদিন।

ছেলে-বৌ বা নাতি-নাতনী থাকে না কাছে। আমতা আমতা করে বলা হয়, "আমি আবার শহরে খাঁচায় থাকতে পারি না—নিজের বাড়ী, গাছপালা ছেড়ে—ওরাও কাজ করে খাবে—ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আছে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য কেউ কাউকে সন্তানী প্রশ্ন করেন না। পুরুষেরা অধিকাংশই বিপত্নীক বা চিরকুমার। মহিলারা বিধবা বা চিরকুমারী। দুই চারজন ভাগ্যবানের বোটানোটা বা রোগা খিটখিটে অথর্ব স্ত্রী আছে অবশ্য। তাঁরা গার্ডেট বা মাইগ্রেনের রুগী। বিধবা বা চিরকুমারীদের কখনও বা আমার মত কাদাচু আত্মীয় থাকে একটা করে, কখনও বা তা-ও না। প্রতিবেশীরাই দেখাশোনা করেন। চিরকুমারীদের এক-আধটা বলিষ্ঠ কুকুর থাকে, পুরাণো দাসী থাকে। বিধবাদের থাকে জপের মালা, গুরুদেবের ছবি।

এমন একটা পরিবেশে এসে পড়লাম। এখানকার অলিখিত আইনে নেতা হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ হরর হাজরা। ওঁর টেলিফোন আছে। সকলেরি কাজে লাগে। আগে রিসিভারটি তুলে টেলিফোন সেরে শব্দ না করে নামিয়ে রেখে আসেন সকলে। অপ্রতিভ ভাবে একটি সিকি টেলিফোনের বই-এর নীচে গুঁজে রেখে আসেন তাঁরা। হরর হাজরা অমায়িক হস্ততায় বলেন, "সেদিনও মানুষ, ভাই। তোমাদের মত ভবিষ্যতের ভরসা ছেলেমেয়েও নেই। তাই বাধ্য হয়ে খরচটা নিতে হচ্ছে। যখন খুশী এসো। তোমারেরি টেলিফোন।"

কনট্রাক্টর পঞ্চাননের প্রায়াধিকের চিরকাল গাড়ী চালিয়ে অভ্যাস। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও গাড়ী চালিয়ে ফেরা চাই। পুরাণো মাদ্ধাতাকালের বাধারী কোর্ড। তবু সকলেরি বল ভরসা। দরকার হলে "পঞ্চাননের গাড়ী আছে" বলে ভরসা পাওয়া যায়। বাস্তবিক যত বছর রতিকান্তবাবুকে তৎক্ষণাৎ শহরে হাসপাতালে গাড়ী করে না পৌঁছে দিলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ফেটে মারাই উনি যেতেন। ভাগ্যি, পঞ্চাননের গাড়ী ছিল। তেমন তেমন ক্ষেত্রে পঞ্চানন পৌঁছে যেন, তবে "রিটায়ার করেছে, পেট্রলটা দিয়ে যেই—।" এ ব্যবস্থায় সবাই প্রীত; পঞ্চাননের খিটখিটে স্ত্রী ছাড়া। বেশ গাড়ী চালিয়ে স্বামী তাঁর মাছ খাওয়া ঘুচিয়ে দেবেন এই চিন্তায় মাথা ধরে ওঠে পঞ্চানন-গৃহিণীর।

কবিরাজও আছেন একজন। ঔষধ তৈরির খরচ ভিন্ন তিনি দর্শনী নেন না। তাঁর মেয়ে সংসার দেখে, কলোনীর প্রাথমিক স্কুলটাও চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আধ বুড়া মহিলার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানে কোথায়?

সকালে আসে দোয়ালা গরু নিয়ে। দু'একজনের গরু আছে, যথা রিটায়ার্ড সহ-স্কুল-পরিদর্শিকা মিস বরাটের দুধতানী গরু। যাঁদের নেই গরু, তাঁরা হাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নেন। ফেণার পরিমাণ বেশী দিচ্ছে দোয়ালা বলে খেচা-খেচি করেন। নির্বিকার দোয়ালা দুধ মাপে। শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে ওর। এসব বলে সময় না কাটালে এঁদের চলবে কেন?"

ডিমওলা আসে। অনেকের হাঁস-মুরগী আছে, যেমন আমার মামার। বাকীরা দরকার মতন ডিম রাখেন। বাজার একটা থাকলেও মাছওলা একটা আসে দরজায়। আনাজ তরকারী প্রায়ই কিনতে হয় না কারুর। বাড়ীর পেছনে প্রায় সকলেরি কিচেনগার্ডেন আছে।

পিয়ন ঘুরে যায় অবহেলায় একবার। কারুরই তেমন চিঠি আসে না, এক ডাক্তারবাবুদের ছাড়া। তবু সাড়ম্বরে অনেকেই সেটার-বাক্স খুলিয়ে রাখেন, পিয়নের সাড়া পেলে উৎকর্ণ হন। মাঝে মাঝে অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের পরলোক গমনের সংবাদ আসে। তখন সকলে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন। কখনও নাতি-নাতনীর কৃতিত্বের খবর আসে। সগর্বে সানন্দে সকলে শোনেন।

পাকিস্তানাগতা বিধবা জমিদার গৃহিণীর কাছে যা-যাস-খেদানো মরকুটে বোনপো থাকে। এ

অঞ্চলে প্রফেসার-গিন্নীর ছেলেমেয়ে ছাড়া ছোট মানুষ নেই। কবিরাজ কন্যার পাঠশালায় পড়ে সে। জমিদার গৃহিণীর তাকে আদর যত্নের সীমা নেই। তাঁর উপরে নির্ভরশীল একজন আছে এ যেন অনুভবে তিনি গর্বিতা। সর্বদাই যেখান যেন তাঁর আহার নিদ্রার সময় নেই এই মনোহর রক্ষণা-বেক্ষণের কর্মে। দশ বছরের ছেলে, তবু কোথাও গেলে বলে ওঠেন একটু পরেই, "যাই ভাই, পিন্টু একা আছে। আমাকে না দেখলে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।'

পিন্টুকে দেখেছি। বোকার মত ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে পথ চলে। সকলেই নিজেদের মধ্যে ছোট ছেলেটাকে পেয়ে খুশী। বল বেলুন কিনে দেন 'হে-আমা' ফেরিওলার কাছ থেকে। কিন্তু মা-আদরেও পিন্টুর মনে সুখ আছে বলে মনে হয় না। চারপাশে বুড়ো দেখে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

মোড়ের হলদে বাড়ীর লাহিড়ী-গিন্নী অনমোহিনী প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ করে থাকেন। ছেলে বিদেশ থেকে মোটা টাকার অর্ডার পাঠায়। তাই পাড়ার লোককে প্রসাদ বিতরণ চলে। সেদিনটা উৎসব। সকাল থেকে এ ওকে বলেন, "আজ সন্ধ্যায় লাহিড়ী বাড়ী যেতে হবে।"

কখনও সেখানে গান হয়। তাঙা-বসা গলায় অবর মুখার্জি গান ধরেন :—

"সময় আসিয়া কয়ে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে—"

কখন বা মিস বরাট বিস্তর অনুরোধের পরে কাঁপা গলায় গান ধরেন,—"আমারও বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়?" আমার মা গান শুনে নিঃশ্বাস ফেলেন। পরে আমাকে ডেকে বলেন,—"রবি, ওই ক্যাটালগে যে সারের কথা কাল পড়লাম, সেটা নিতে চিঠি লিখে দে। সত্যিই বাগানে আমার ফুল ফুটল না।"

উক্ত সার এলেও মামার বাগানে ফুল ফোটে না। মামা হা-হুতাশ করেন, "এতদিনের সখ আমার, নিজের ফুলের বাগান নিয়ে জীবনের শেষটা কাটাব। এখানে ফুটবে ক্রিসেন্থিমাম ওখানে ফুটবে চাঁপা। গোলাপের বেড়ের পাশে চেয়ারে বসে থাকব। ফুলের গন্ধে ঘুম পাবে। মৌমাছির আনাগোনা দেখব। তা, তাগ্যে আমার হল কই? এত করে তোকে আনালাম চিঠি লিখে লিখে। যদি তোর হাতের গুণে গাছপালার উন্নতি হয়। তা হ'ল কোথায়?"

আমি যেহেতু ছড়নি বা পি, পি, সরকার নই সেজন্য আমিও হা হুতাশ করি।

এরি মধ্যে গাছের ফুলে না হোক মনের ফুলে রং ধরল।

কিছুদিন থেকেই দেখছি মিস বরাটের প্রাতঃভ্রমণে বেড়োবার পথটা মামার বাগানের সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। মামাও সকালে উঠেই পড়ি-মরি করে বাগানের কাজে লাগেন। নোংরা হয়ে যাবে জেনেও রোজ দুবার ট্রাউজার বা'র করেন। কাঁচাপাকা চুলে কাটেন বাঁকা সিঁথি। মিস বরাটের গতিটা বাগানের ধারে এলেই কেমন মন্থর হয়ে যায়, মামারও বেড়ার ধারে ধারার দরকার পড়ে।

একদিন সোটাকিসে যাচ্ছি খাম কিনতে, মাকে চিঠি লিখব। আর এখানে ভাল লাগছে না। কেমন ঝিমনো আবহাওয়া, আরতিএর ঘুমন্ত উপত্যকার মত। এখানে কোনদিন প্রাণস্পর্শ পাওয়া যাবে না। এখানে কোন পাখী গান গাওয়া ভুলে গেলে তবেই এই সব হনুমেটে পাতাগাছে বসতে আসে। কুকুরগুলো এখানে মোটা হবে কেবল রোদ পোহায়। ছাই রংএর বিড়ালটা বছরজন্মের

পরে ঘাস খেয়ে অসুস্থতার জন্য এখানে আসে মাত্র। জমিদার গৃহিণীর কাকাতুয়াটা বুড়ো হয়ে চোখে দেখে না। এখানে থেকেই বা কি করবে?

মিস বরাটের বাড়ীর কাছে এলাম। তিনি এ অঞ্চলে মাটিতে ফুল ফোটানো বিষয়ে নিরাশ হয়ে বিশুদ্ধ শহর থেকে কয়েকটি গাছ এনে লাগিয়েছেন। অতএব ফুলের বনে তিনি ধনী।

কাল চুড়িদার শাড়ী-পরা মিস বরাট কাইহীল চটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাগানে। শুকনো চামড়া, পাকা চুল, রোগা গড়ন। আমাকে দেখে পায়ে পায়ে বেড়ার কাছে এগিয়ে এলেন।

"কি রবি, বাজারে যাচ্ছ নাকি?"

আমি বিস্মিত হলাম, "বাজার তো নিত্যগোপাল করে রোজ। আমি ডাকঘরে যাচ্ছি।"

"ও! বেশ। আমার দুখানা টিকেট এনে দেবে? দাঁড়াও পয়সা দিচ্ছি। ভেতরে এসো না।"

একটি পর্চ সামনে। এক কোণায় সেলাই-এর কল বেতের টেবিলে বসানো, বেতের সোফা পাশে। আমাকে সেখানে বসিয়ে মিস বরাট ঘরের মধ্য থেকে নিয়ে এলেন পয়সা। কিন্তু সোজাসুজি আমার হাতে না দিয়ে হাতে রেখে কিছু দ্বিধার পরে প্রশ্ন করলেন, "আজ কি রান্না হচ্ছে? রান্না বলে দেয় কে?"

আমি আবার বিস্মিত হলাম। ছোট আয়গাটির মধ্যে সবাই সকলকে চেনে। অতএব এ ধরণের কথার কোনই থাকে না। উত্তর দিলাম, "নিত্যগোপালই নিজেই সমস্ত ঠিক করে। মামার কিছু খাবার ইচ্ছে হলে তিনি অবশ্য ব্যবস্থা করতে বলেন। এতদিন থেকে থেকে নিত্যগোপাল গিন্নী হয়ে গেছে।"

ইতস্তত করে মিস বরাট বললেন, "তোমার মামা কি খেতে ভালবাসেন?"

"মিষ্টি-টিষ্টি বেশ খান।"

চকিত হয়ে মিস বরাট বললেন, "এই নাও পয়সা। যাবার পথে দিয়ে যেও কিন্তু। খুব দরকার।"

ফেরবার পথে টিকেট দিতে এলাম। মিস বরাট আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো এনে হাতে দিলেন, "আমার সকর দুধে কোকো মিশিয়ে চকোলেট করেছি। তুমি খেও—মামাকে দিও।" কৌটো নিয়ে ফিরে এলাম। মামা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। চামচের তুলে মুখে দেন আর বলেন, "চমৎকার করেছেন তো। হবে না? অত উচ্চ শিক্ষিতা যে।"

উচ্চ শিক্ষিতাদের গৃহস্থালী সম্পর্কে আমার ধারণা উচ্চ নয়। আমি চুপ করে রইলাম। মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "এখন আমি কি খেব বলদি, বাঁ? ইয়াং লেডিদের ফুল খেওয়া উচিত কোন পুরুষের। তা, আমার বাগানে ফুল কোথায়?

"ইয়াং লেডি কে, মামা?"

মামা বিরক্ত হলেন,—"আরে, আমার চেয়ে অনেক ছোট তো। বেচারীর হার্টের অসুখ আছে বলেই না এত তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছে।"

আমি হাসি গোপন করে বললাম, "ফুল যখন নেই-ই মামা, তখন ডিম থাও তুমি। তোমার সেসহর্ষগুলো চমৎকার ডিম পেড়েছে। বীটসেদ্ধ তুলে রেখেছি। তাই থাও।"

মামা খুশী হয়ে উঠলেন, "যা বলেছিস। ইয়াং ম্যান না হলে কি ইয়াং লেডির কি—মানে কোন লেডির কি উপহার—এই ছোটোটাতেই দেই? না, শোন গত সপ্তাহে শহর থেকে কেকের বাক্সটা এসেছিল—বেশ ফুল আঁকা—ওটাতেই না হয়—"

ফুল মামার অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা কেকের বাক্স বার করে ঝেড়েমুছে গুছিয়ে দিলাম ডিমের সারি। মামা বললেন, "যা দিয়ে আয়।"

আমি বললাম, "তুমিই যাওনা, মামা। চকোলেটের সঙ্গে বস্তুবাদও দিয়ে আসবে অমনি।"

"যেতে পারি। তাহলে জামা-কাপড়টা একটু—"

মামা কাপড় ছাড়বার ঘরে অন্তর্হিত হলেন। আধঘণ্টা পরে রীতিমত বিয়ে বাড়ির সাজে

বস্তুবাদ ও ডিম নিয়ে, ফিরে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। খাবার টেবিলে মামা সংবাদ দিলেন, "কাল তোকে আমাকে মিস বরাট নেমন্তন্ন করেছেন রে, রবি। বলেছেন আমারি ডিম আমাকে ভেজে খাওয়াবেন। হাঃ—হাঃ! চমৎকার কথা কিন্তু ওঁর।"

"কিন্তু আমাদেরও খাওয়াতে হবে, মামা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুই না থাকলে আবার অবিবাহিতা মহিলার সঙ্গে বেশী মেলামেশার কথা ভাল্লি তুই ছিলি।"

আমি ভাবলাম মামা চিঠি লিখে আমাকে আনিয়েছেন সে কি শুধু সাহেবের ফুল কোটাতে?

নেমন্তন্নের দিন সকাল থেকে মামার দিকে আর চাওয়া যায় না। দুইবার শেভই করলেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরে যাবেন। সেগুলো দেখে বেছে দিতে হল আমাকে। বারবেসে পাটির বদলে মহিষ-শিঙের ছড়ি বার হল। চুলে অন্ততঃ দশবার ব্রাশ-চিরুনী পড়ল।

মিস বরাটও সেদিন প্রাতঃভ্রমণে বার হননি। সুতরাং ওদিকেও প্রস্তুতি চলেছে। চায়ের পার্টি হয়েছিল মিস বরাটের পর্চে। ফুলের টবগুলি এসেছিল সেখানে। সামনে তারে জানালা খচিত। ঘুরে কলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

মিস বরাটকে প্রাক্ত বেখানেও বয়সটা যেন কমে গিয়েছিল, মনে হচ্ছে। সাদে সালিবার ছোপ। ঘোপদোস্ত চওড়া খয়েরী পাড় শাড়ী ও সাদা ব্লেসের জামায়, ব্যস্ত চল্লিশের বয়সে আর যাহোক রিটায়ার করা মহিলা মনেই হচ্ছিল না। হি-হি করে কেমন সরু গলায় তিনি হাসছিলেন তরুণীর মত কথায় কথায়।

তাঁর দাসী খবর দিল যে, দিদিমণির কাল বুকে কষ্ট হয়েছিল।

মামা অধীর হয়ে উঠলেন, "ডাক্তার দেখান নি? ওষুধ খাওয়া উচিত।"

মিস বরাট বললেন, "ডাক্তার আবার কি দেখাব? পুরাণো ব্যাধি। দুটো পিল খেয়ে রাত্রে ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মামা বললেন, "না, না অবহেলা করা উচিত নয়। কাল সকালেই দেখাবেন। আজ কেন এত খাবার-দাবার কষ্ট করে আমাদের জন্যে করলেন, বলুন তো!"

"কষ্ট আবার কি? আমার গরুর দুধের মিষ্টি, পায়েস করেছি মাত্র। একা-একা খাকি। লোকজন এলে কত ভাল লাগে।"

মামার মুখেও লালের ছোপ। কাঁচা-পাকা চুল বাতাসে উড়ছে। মামা হা-হা করে হাসছেন। মামার বয়সও যেন অনেক কম মনে হোল।

চা-খাওয়ার পরে হাসী জিনিষপত্র সরিয়ে নিলে মা কে মিস বরাট বললেন, "এবার আপনার পাইপ চলুক।"

"কিন্তু, দেভিরা আবার ধূমপান সহ্য করতে পারেন না, জানি। গন্ধ লাগে।"

আবদেরে খুকীর ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে মিস বরাট বললেন, "না, না। আমার গন্ধ লাগে না।"

"তবে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এবার একটা গান—অবশ্য যদি শরীরে কুলোয়,—"

মামা সবিধানে কাশে বললেন।

"শরীরের কিছু হয়নি," হেসে মিস বরাট জানালেন, "কিন্তু আমি আবার কি গান গাই একটা।"

আমিও অনুরোধে যোগ দিলাম। অবশেষে ধরোধরো কাঁপা গলায় মিস বরাট ধরলেন—

"আমার মল্লিকা বনে যখনি ধরেছে কলি
আমি তোমারি লাগিয়া তখনি বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি।"

এর পরে হয়তো মামা আবার ফুলগাছের পেছনে লাগবেন।

যেখানে দক্ষিণা বাতাস বয় না সেখানে ফুল ফোটে কি করে? মামা হয়তো আবার নূতন সার এনে ঢালবেন।

রাত্রি গভীর হল। অবশেষে চায়ের আসর ভঙ্গ করে প্রত্যাবর্তন জানাবার পরে—আমরা পথে নামলাম।

শুনলাম নবীন প্রেমিকের গলায় মামা বলছেন "কাল যেন ডাক্তার যেখাতে ভুল না হয়।"

সকালে উঠেই প্রি-অ্যাক্সল্ শুরু হল। পরশুদিন নেমন্তন্ন করা হয়েছে মিস বরাটকে। যদিও মিস বরাট আগেও বহুবার এসেছেন, তবুও মামা গোটা বাড়ীকে চেলে সাজাতে মন দিলেন। আমাকে বললেন, "রবি, তুই না হয় চট্ করে শহরে চলে যা, খাওয়া-দাওয়া সেরে। একটা টি-সেট, ভাল টেবল-ক্লথ নিয়ে আয়। কিছু মিষ্টিও নিয়ে আসিস।"

আমি বললাম, "কাল না হয় বেয়ে টাট্‌কা মিষ্টি আনব। আজ থাক।"

মামা ঘাড় নাড়লেন, "নারে। কাল তুই আগাগোড়া না থাকলে নার্ভাস হয়ে পড়ব।"

"অবাক করলে, মামা। মিস বরাট তোমাদের এতদিনের চেনা। তিনি এলে আবার নার্ভাস হবে কি?"

"নারে! বিয়ে-টিয়ে করিনি তো, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা অভ্যাস নেই তেমন। ঘরদোর যা হয়ে রয়েছে। লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী তো। মেয়েদের হাত না পড়লে কি ঘরদোরের শ্রী হয়? রেণুকা, মানে মিস বরাটের বাড়ী যেখানি কেমন কাল? একেবারে টিপ্-টাপ্!"

"তা মামা, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছই বা কেন? একটা বিয়ে করে ফেল না। খুব সোজা কাজ।"

মামা হেসে ফেলেন, "কি যে বলিস তুই? এত বয়েসে, হুঁ।"

"তাতে কি, মামা? বয়স্কা পাত্রীও তো পাওয়া যেতে পারে।"

মামা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, "যা, যা, বকবক করিস না। খাওয়া-দাওয়া সেরে সাড়ে দশটার লোক্যালে চলে যা। আর শোন, সেই সঙ্গে তোর একজোড়া জুতো কিনে আনিস। জুতোটা তোর ছিঁড়ে গেছে বড্ড। আর,—একটা ভাল সেটও আনিস।"

মামার ফরমাসী জিনিষপত্র কিনে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম: মাকে চিঠি লিখে দেই আপাততঃ আমার আর তাড়াতাড়ি ফেরা হবে না। মামার প্রয়োজনে আরও কিছুদিন থাকা দরকার। বার্দ্ধক্য-কলোনীর একটা ভাল। সকলে বিশ্বতযৌবন, তাই কেউ নিজেকে বুড়ো বলে মনে করতে পারে না। ছোটখাটো জিনিষ এদের জীবনে দারুণ উত্তেজনা, বড় কিছু এরা পায় না বলে। কিন্তু এই সব মধুর নিশ্চিন্ত আরাম-করা দিনগুলো ভুলিয়ে রাখে এদের যে ঘরে মৃত্যু। হঠাৎ পাকা ফল যদি বোঁটা থেকে খসে পড়ে, তাহলে এরা বিস্ময় বোধ করে, ক্ষুব্ধিত হয়। তাদের কারুর যে মরবার বয়স হয়েছে এই বোধ তাদের নেই। তাই ব্যবহার অনেক সময় শিশুজনোচিত।

বাড়ীতে ফিরে এলাম। সারাদিন মামা বাগানখানায় আগাছা নিড়ে সাফ করেছেন।


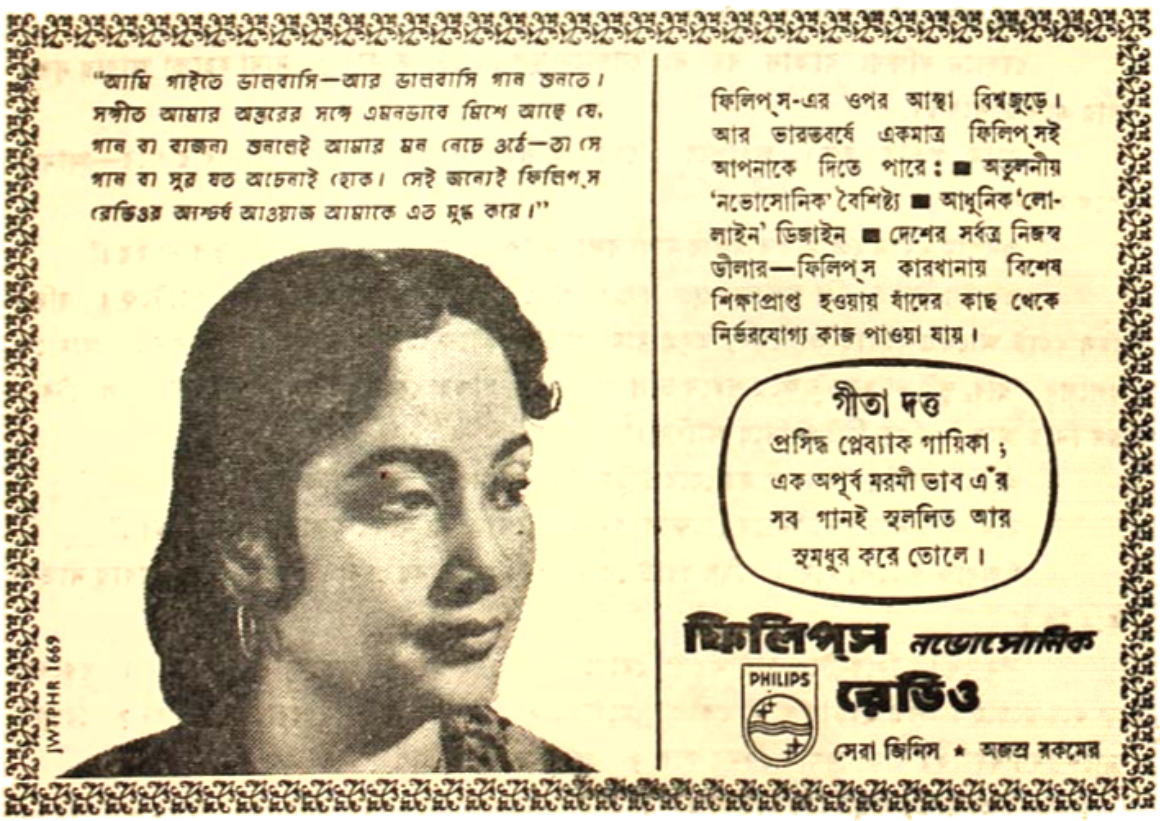

ধুলো-কাদা-মাখা মূর্তি। আমাকে দেখে বলে বলে উঠলেন, "দেখতো রবি, ঠিক হয়েছে কি? ওঃ; কটা ফুল যদি ফুটতো। কাল দেখলি না রেণুকা, আই মীন, নিম বরাটের কত ফুল ফুটেছে।"

"ও তো টবের ফুল, মামা। এখানকার মাটী খারাপ, ফুল ফোটে না। যাই হোক, আমি যাবার আগে নিশ্চয়ই তোমার গাছে ফুল ফুটিয়ে যাবো। তোমার দুঃখ থাকবে না।

নিত্যগোপাল চা নিয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে মামা-ভাগ্নে বসলাম চা-খেতে। আগামী দিনের পার্টি নিয়ে মামা নানা আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন।

হঠাৎ আমি চুপ করে গেলাম। বাইরে কেমন গোলমাল, ছোট রাস্তায় লোকের শব্দ। নিত্যগোপাল দেখতে গেল। তক্ষুনি এসে খবর দিল ও!

"বরাট-বিভিমনি মারা গেলেন। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন।"

"মারা গেলেন?" আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ, আজ সকাল থেকেই হার্টের ব্যারাম বেড়েছিল। ডাক্তারবাবু দুপুরবেলা বসে চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন বহুৎ। এই মাত্তর মারা গেলেন।"

মামার দিকে তাকালাম। বিস্ময় ছাড়া সে মুখে কিছু নেই। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। দেখতে দেখতে সারা মুখ তাঁর ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। মামা আস্তে আস্তে টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোবার ঘরের দিকে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি বহুরের বৃদ্ধের মত টেনে টেনে চলা মামার!

বাইরে মামার বাগানের গাছের মধ্যে পুবালী হাওয়া বয়ে যেতে লাগল।

## দ্বিতীয় কাণ্ড

আমাকে পুবালী হাওয়ার দেশ ছাড়ানো গেল না।

মামা রেণুকা বরাটের মৃত্যুর পরে এতটাই ভেঙে পড়লেন যে আমাকে বাধ্য হয়ে সেই বার্দ্ধক্য কলোনীতে কিছুদিন থেকে যেতেই হল।

সেদিন মামার ফুলের গাছগুলোর কাছে ঘুরছি। একটা লার্কস্পার যেন ফুটি ফুটি করছে, আর একটায় ধরেছে কলি। মনে মনে ভাবলাম: এখন ফুলে মামার আর কি প্রয়োজন?

এত সার ঢালা হল, এত মালী ডাকা হল। এতদিনে ফুল ফোটেনি। পুবালী বাতাসে গাছগুলো নাড়া গেল কেবল।

এই স্থানটির সর্বত্র যোগে পুবালী হাওয়া খেলা করে যায়। কখনও পাতা ঝরায়, কখনও ফুল

সারা কলোনীময় এই পুবালী হাওয়ার উৎপাত। কিন্তু যখন প্রয়োজন ফুরোয়, ঈশ্বর কি তখনই ফুল ফোটান?

এই ফুল, যতই ফুটে থাক, যতই ফোক, সত্যি ফুল। হয়তো তুলে নেব, জলে রেখে দেব। কিন্তু মামা তুলে দেবেন কার হাতে?

বহুদিন আগে পড়া একটি কবিতার অংশ মনে ভেসে এল :—

বর্ষায় ফোটেনি ফুল, বসন্ত ব্যাকুল
শরতেনি ফলের মুক্তি, বীজের মোচন ;
হিমানীর হিমঘুমে দিল কি জীবন ?
লাগল না সে ফুলের বীজ কি মুকুল।

কবি উপমা দিয়েছেন মনগড়া ফুলের। আমি তো জানি মামার ফুলের জন্য কত বীজ, কত সার লেগেছিল। তবু অবসরপ্রাপ্ত সহ-ফুলপরিদর্শিকা রেবতী বরাটের প্রসারিত হাতে সে ফুল পৌঁছবার আগেই হাতখানা মৃত্যুশীতল হয়ে গেল।

আমার মাকে মামা চিঠি লিখলেন আমাকে তাঁর কাছে রাখতে কিছুদিন। আমার চাকুরী করার দরকার নেই। মামার যা আছে ; মামা না থাকলে সবই আমার হবে।

বার্ডকা কলোনীতে থেকে যেতে হবে ভেবে আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। মামা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, "বাংলায় এম. এ-টা পড়ে তৈরী হয়ে নে। ততদিনে আমিও সেরে উঠব। শহরে পরীক্ষা দিয়ে একটা বাড়তি যোগ্যতা হবে তোর। দেখছিস তো চাকুরির বাজার কত শক্ত। শুধু বি. এ পাশে হবে না। অসুবিধাও নেই। প্রফেসার মাইতি আছেন। আমি না হয় বলে দেব।"

আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে একবোঝা বই এসে উপস্থিত হল—বাংলা এম, এর পাঠ্য। আমার উদ্দেশে মামা আনিয়েছেন।

দিন পুরণো চালে চলে। মামা বুড়ো হয়ে যান। জীবনে যে কণ রসস্ব জেগেছিল অমৃত হয়ে গেছে। মামা বই আনান, বই-এর সমুদ্রে ডুবে থাকেন। নৃত্যগোপাল ও আমি ফুলের বাগানে খাটি। ফুলের বাগানের সব আমারি স্কন্ধে চাপিয়ে মামা বইএর প্রাচীরের আড়ালে সমাধি গ্রহণ করেছেন।

শহরে যাই। মায়ের কাছে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাই। মা মাথা নাড়েন। আমারও মন সায় দেয় না মামাকে ফেলে রেখে চলে আসতে। ধূসর সন্ধ্যাবদ্ধ কোটরগা মামার মূর্তি যেন অসহায়, বড় অসহায়। মনের পাতায় ফুটে ওঠে। মামা একা, কত একা। মামা যেন বলছেন, "রবি, এত করেও তোকে আপন করতে পারলাম না। আমি মামা না হয়ে বাবা হলে তুই কি এত অকরুণ হতে চাইতিস ?"

স্থির করি, না অকরুণ হব না। মামা সামলে উঠলে তবেই আমি ফিরে আসব শহরে। আমার বয়স কম, দু'চার বছর গেলেই বা ক্ষতি কি !

সুতরাং শহর থেকে দেখাশোনা সেরে, জিনিষপত্র কিনে আবার উপকণ্ঠে ফিরে আসি। বৃষ্টি নেমে ধুয়ে গেছে উপকণ্ঠের মাটি। ভিজে মাটি সোঁদা গন্ধ শহর ফেরতের কাছে অন্য জগতের গন্ধের মত লাগে। খাটো-খাটো সাদা ডাঁটির ফুল ফুটেছে বুধিখানার পাশে। হালকা গন্ধ মিশেছে মাটির সৌরভে।

হলধে বাড়ী বাদলায় আলো জেলে বসে আছে। লাহিড়ী গিন্নী জয়মোহিনীর আজ পূর্ণিমার সত্যনারায়ণ। ছেলের চাকুরী স্থলে প্রোমোশন হয়েছে। আজ প্রসাদের ঘটা বেশী বেশী। কিন্তু ফুল পড়া দেখে জয়মোহিনী চিন্তিতা। কৃষ্ণ ও প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রৌঢ় কলোনীর বাসিন্দারা যদি ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে না আসেন ?

কিন্তু যথাকালে দেখা গেল সকলেই ছুটছে, বর্ষাতির ভরসায় ঠুকঠুক চলছেন। ওখানে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মিলবেন। ওটা ওঁদের সিনি ক্লাব।

দেখা হল পিন্টু সহ জমিদার গিন্নী যাচ্ছেন। পিন্টুর গলা জড়িয়ে বিনা কারণে চক্রবাকরা দুটী গলাধক্কা। শ্রাবণের পূর্ণিমা কখন দুই থামিয়ে দিয়ে রজনীগন্ধার ঝাড়ে হাসি বিলিয়ে দিয়েছে। তবু জমিদার গিন্নী সাবধান।

দেখলাম রতিকান্তবাবু আস্তে আস্তে লাঠি ভর করে চলছেন। অপারেশনের পর থেকেই কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন।

আমাকে দেখে হাসলেন, "কি রবি, শহরে গেছিলে বুঝি, না? হালচাল কি, শুনি?"

এখন হালচাল শোনাতে বসলে মাঝ আমার দেরী দেখে চিন্তিত হবেন। ভাববেন হয়তো বা পাখী উড়ে গেল।

তাই হাসিমুখে বলি, "কাকা, পরে বলব। অনেক খবর।"

রতিকান্ত অনুজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, "তাই নাকি? যাও, ভাই, জামা কাপড় ছেড়ে লাহিড়ী বাড়ী তাড়াতাড়ি চলে এস।"

অধর মুখার্জি চলছিলেন গলা খাঁকর দিতে দিতে। যেন এখন থেকেই গানের আসরে বসছেন। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা ব্যর্থ যেতে দেবেন না উনি। আজ নিশ্চয় গান ধরবেন—

"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে—
কি এনেছিস, বল, বল, বল—"

অনেক লোককেই দেখলাম যেতে ধীরে ধীরে লাহিড়ী বাড়ী। সোনালী রংএ সোনালী আলো জ্বেলে পথ চেয়ে বসে আছে।

রাস্তায় এখনও আলো বসেনি, যদিও বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে। কলোনী প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে। 'হবে হবে' আশ্বাস পায়, কিন্তু হয়ে ওঠে না। তাই রাস্তায় টর্চ বা লণ্ঠন নিয়ে সাবধানীরা পথ চলে রাত্রের গভীরে।

কিন্তু আজ হাল্কা চাঁদের আলো সাদা মেঘের আস্তরণ ভেদ করে ক্ষীণ দীপ্তিতে পথঘাট প্লাবিত করে দিয়েছে। গৌরবর্ণার দীপ্ত বর্ণ মসলিনের চাদরে ঢাকা। আচ্ছাদনের বাইরে অনন্য বর্ণ প্রভাবমান। তবু যে আজ পূর্ণিমা। তাই রং লুটে যায় বেশী।

চওড়া পীচঢালা বড় রাস্তাটি দুইভাগে কলোনী চিরে চলে গেছে। ছোট ছোট অন্যান্য রাস্তাগুলি মোরাম মাটীর মোলায়েম লালে নয়নসুখকর। অসংখ্য ছোট বড় বাড়ী। প্রায়ই নূতন বাড়ী উঠছে। বেড়ে যাচ্ছে জমির দাম।

কিন্তু যাব বয় পুবদিকে।

যারা আসে, এই শান্তির খাঁচায় যে পাখী বসে, সে হয় ছিন্নপক্ষ। বিস্ময়জনক এ লোকবৃদ্ধি বিগত যৌবন। মোড়ের দোঁয়াটে বাড়ীখানা সদ্য নির্মাণ হয়েছে। তখন দেখেছিলাম কয়েকটি তরুণ মালপত্র বয়ে বাড়ীখানা সাজাচ্ছে, লরী থেকে মাল নামাচ্ছে, দরজার পাশের রোয়াকে বসে চা খাচ্ছে সবুরে।

আশা জেগেছিল মনে। পুবের হাওয়া নিশ্চয় এখন দক্ষিণে বয়ে যাবে। আমার সঙ্গী

মিলবে। নিরন্ন দিনে আর শুধু মামার বাগানের জমি খুঁড়ে কি নিতান্তোপায়ের সঙ্গে মুরগী পালন করে দিন কাটাতে হবে না।

মামা আগামে সিভিল সার্জন ছিলেন। অত দূরে থাকার জন্যই হোক, কিম্বা বিয়াগেই হোক বিবাহ ঘটে ওঠেনি।

রিটায়ার করে মামা এলেন। দুই বোনের মধ্যে আমার মা ছোট। মামার বিশেষ প্রিয় বোন। কিছুদিন পূর্বে বাবা গেছেন। নৈত্রিক বাড়ীখানির খোপে খোপে ভাড়া বসিয়ে চালাচ্ছি আমরা। বাবা বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে, সংসারের ভারে দাদা ভারাক্রান্ত। মায়ের আলোচালের খরচটা কোনমতে চালিয়ে দেন। কিন্তু আমার খরচ বাড়তি।

তাই বি. এ. পরীক্ষা দেবার পরেই চাকুরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময়ে উপকণ্ঠ থেকে মামার চিঠি এল মায়ের কাছে, আমাকে কিছুদিন ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার কথা লিখে।

বছর দুই আগে ওখানে মামা বাড়ী করেছেন। অবসর নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছাকাছি থাকবেন বলে চলে এসেছেন মামা।

প্রবাসী লোকের মত, ওঁর শহর অসহ্য অনাকর্ষ প্রতীয়মান হল। ফিরে এসে স্বদেশকে বিদেশ ভ্রম হল। এখানে বারমাস থাকা ওঁর চলবে না।

তাছাড়া প্রচুর জায়গা নিয়ে থাকা ওঁর অভ্যাস। অকৃতদার জীবনে গাছপালার সখ আছে। শহরে অত মূল্য দিয়ে জমি সামান্য কিনতে পারবেন।

তাই মামা, শহর বর্জন করে উপকণ্ঠে অনেক জমি নিয়ে ছোটখাটো করলেন। পেনসন আসে, হাতে টাকা আছে। চমৎকার দিন কাটতে লাগল। বছর সাতাশের মামা বাগানে ফুল ফোটাতে উদ্যোগী হলেন।

মাঝে মাঝে যাতায়াত ছিল। মামার ছবির মত বাড়ীখানি, লন, বাগান কলকাতাবাসীর চোখে অভিনব লাগে। পরীক্ষার পর কর্মহীন দিনে মামার আহ্বান যেন আমার দেবতার বর।

কিন্তু, কতদিন ভাল লাগে? ওই নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রার অবসাদ, নিঃসঙ্গতার ব্যথা কত বহনকরি?

রেণুকা বরাটের মৃত্যুর পরে মামাও বদলে গেছেন। চুপচাপ বসে থাকেন। বাগানে ফুল ফুটেছে। ফিরেও দেখেন না। বেরিয়োজ ফুটে ওঠে, দীর্ঘ কাণ্ডে ভর করে শাদা পাউডারের তুলীর মত। নামী নার্সারী থেকে বীচি এনে লাগানো হয়েছে। তবু কেমন জীর্ণ জীর্ণ ভাব। এত সার কিনে আনলাম, শহর থেকে কেমিক্যাল সার, গোবর পচিয়ে কম্পোষ্ট সার করলাম। কিছুতেই ফুলগুলো পুষ্ট পেল না। যেন সারি সারি বামনবীর। রোদে নির্জীব মাথা ঝুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নার্কিসাস এধারে ফুটেছে। রঙের আভায় এখানে ওখানে ছড়ানো ছোটখাটো ফুলের ডালা। অ্যানিমোনি ফুলের শাদা কাঁকার গায়ে সাজানো জেরানিয়াম। বেগুনী রং তার। একজন নিপুণ মালী যেন ফুলের দোকানে ডালায় ফুল সাজিয়ে বসেছে। পপির নীলও কিছু আছে। গ্রডোড্রেনড্রনের বাহার নেই, অতিকষ্টে বিলিতি সারে কোটালাম।

আরো আলোছায়ার বাড়ীর পথে পা দিলাম। প্রাচীরের ধারে হলদে ফুলে ভরা কেঁকে গাছটি যেন সোনার গয়না পরে সেজে আছে। সাদা মল্লিকা ফুলের রেখা কটকের ধারে। লাল গোরামের

পথ নেছে লাল রংয়ের রাংলোয়। ঘোর সবুজ ঘাসে জল ছাওয়া। গাছের পাতাগুলোর সবুজে আকাশের মেঘেরা যেন ধূত হয়েছে। জোতাদার ছেলের মুখে মামা সখ করে লোহার চাকীর মাথা বসিয়েছেন। সেখান থেকে বর্ষণক্লিক্ত মেঘের ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

হঠাৎ যেন স্বপ্নরেখা বলে মনে হয়ে গেল।

এইমাত্র উত্তর কলিকাতার গলি দেখে এলাম। কাদা গচগচ করছে। নোংরা, ময়লা, দুর্গন্ধ। মনে হল এতক্ষণে নিজের নিঃশ্বাসে ফিরলাম, শহরে আমি প্রবাসী। এই ঘর আমার ঘর।

বারান্দায় অন্ধকারে আলো জ্বালানো। মামা বসে আছেন।

"একি, আলো জ্বালাওনি, মামা?"

প্রান্তকণ্ঠ হেসে এল, "আয় রবি, ওরা সকলে কেমন আছে? তাই অন্ধকার করে দিয়েছি।"

"চা খেয়েছ ঠিকমত?"

"হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বোস এখানে। খবর কি?"

আমি হাতের সওদাপত্র নামিয়ে একটু বসলাম। আহা, সারা দিনটা মামা একা আছেন

পারিবারিক কুশলাদির সংবাদ অন্তে আমি প্রশ্ন করলাম, "দাদিকী বাড়ী চল না, মামা। একা বসে কি লাভ? তুমি না গেলে আমিও যাব না

"নারে, আমি আজ যাব না। বড় ক্লান্ত লাগছে। ডিনারের আগে একটু শুয়ে নেব। তুই ঘুরে আয়।" আলো জ্বালালাম।

মামার একজোড়া মোজা আনবার কথা ছিল, এনেছি। আলো জ্বালিয়ে রেখেছি সামনে।

"একী, মামা, তোমার হাতে রং লাগলো কেমন করে? হাত ধোওনি?"

মামা অপ্রতিভ হলেন "না, হ্যাঁ—ওই পুরণো জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতে রংয়ের বাক্সটা—। হাত ধুয়েছি তো। ওঠেনি দেখছি।"

মনে পড়ে গেল ডাক্তার হ'বার আগে মামা না কি আর্ট স্কুলে কয়েক মাসের জন্ত ভর্ত্তি হয়ে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু দাদামহাশয় বড় ছেলেকে ভদ্র কোন কাজ না করিয়ে ছাড়লেন না। রং মাখা আর্টিষ্ট তাঁর মতে অপাংক্তেয়।

আমি কথাবার্ত্তা না বলে জিনিষপত্রগুলো তুলে আমার ঘরে চলে এলাম।

মাত্র ঘণ্টা দুই-তিন আগে যেখানে ছিলাম, সে স্মৃতির তুলনায় কত সুন্দর মামার দান আমাকে —এই ঘরখানি।

খাসা নেবারের খাটে নরম বিছানা, ধবধবে চাদর, বালিশের ওয়াড়। আয়নার সম্মুখে টেবলে চিরুনী-ব্রাশ, স্নোপন সাজানো। আলমারী ভরা মামা-কাপড়, আলনায় তাকে সাজানো জুতো। ঝকঝকে দেওয়াল, জানালায় নতুন রং। সমস্ত কিছু কত পৃথক পূর্ব্ব পরিবেশ থেকে।

সেখানে মামার প্রাচুর্য্য নেই, নেই সৌন্দর্য্যবোধ। তেলচিটে বালিশের ওয়াড়-চাদরে সাবান দেবার এনাপি থাকেনা বৌদির, এতগুলো লোকের রান্না করার পরে। ছোটমামা বিছানায় থাকেন। ওঁর ছেলেও এখানে কাজ করে আমাদের বাড়ী থেকে। অফিসে ঘণ্টা পাঁচটা।

## নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন !

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

# ভাইনো-মল্ট

TCP/BLS

ছায়ার [illegible] বসু [illegible]
১৯নং [illegible]



মা নিজের রান্নাটা নিজে করে নেন। বৌদি আটমাসের বাচ্চা নিয়ে অত কাজ পেরে ওঠে না। হবিষ্যি রান্নার অন্ধকার ঘরে বসে ভাত ডাল শুক্তনি রান্না করে মা অনেক বেলায় খেতে বসেন।

বাচ্চা ছেলেমেয়ে সারা বাড়ী নোংরা করে রাখে। সারাদিন ভিজে কাঁথা শুকোয়। সরুগলির রোয়াকে আজ্ঞা বসাই পাড়ার বেকার তরুণ। তখন মনে হত বেশ আছি।

কিন্তু মামা অন্য জগতের স্বাদ এনে দিলেন। এখন আমার সামনে টেবলে মাটি পরে, কাঁচের গ্লেটে খাদ্য আসে। নানা সুখাদ্য, যা কেবল বাড়ীতে উৎসবের দিনেই রান্না হত, সেগুলো হয় নিত্য এখানে। বেশ আছি। তবু আলস্যের শ্যাওলা দেহমনে স্তরে স্তরে। নাগরিক পালিশ হয় অদৃশ্য। আরাম-আলস্যে ভরা দিনগুলো বিনা কাজে প্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আরডিংএর 'ঘুমন্ত উপত্যকা' থেকে পালিয়ে যেতে চাই।

যেতে চাই সেই গলির রোয়াকে সেখানে জীবন ধরস্রোতা বয়। রাস্তার মোড়ে ট্রাম-বাসের ঘরঘরানি ভেসে আসে। পাশের বাড়ী প্রেস চলে ঝক্কর-ঝক্কর। ঘন্‌ঘন্ করে ঘরে ঘরে ঠিকে ঝি বাসন মাজে আর বাকা ছড়ায়। সুর করে ছেলেরা দুলে দুলে ক্লাসের পড়া করে। উল্টোদিকের মেয়ে হারমোনিয়ামে গান শেখে তারস্বরে। আলো জ্বলে রাস্তায়, দীপ্ত হয়ে ওঠে পথঘাট। সঙ্গে সঙ্গে তপসে মাছওলা, ফুলওলা ডেকে যায়। 'গরম মুড়ি'র হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে আইসক্রীমের গাড়ী চলে।

নানা সুরে ভরা গলির বুকে দূর থেকে আসা পশ্চিমা বাতাস তাদের গাথা মেলে। পাঁচ ছুড়িয়ে যায়। আকাশ কোমল হয়ে তারার তারায় ভরে ওঠে। প্রত্যহ ইট কাঠের জঙ্গল শহরে শেষবেলা। রাতের ময়ূর নামার আশ্চর্য অনুভূতি।

নানা শব্দে ভরা সেই গলির বুকে নানা স্বাদে ভরা জীবন ছিল অফুরন্ত, শুধু তার সুর কড়ত হত দিনরাত্রির বীণার তারগুলো ঝোপে। আজ আকাশ আনত নূতন দিনের আশা।

এখানে সন্ধ্যা স্তিমিত। তারার আলোয় ভরা আকাশ আনে অসহায়তা। রাত্রি এখানে বিশ্রাম শুধু, দিনের ক্রমশঃ ধারা নয়।

সেখানে জীবন, এখানে সৌন্দর্য্য। কিন্তু, আমি কি করে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেব জীবনের বিশ্রামাগারে? না হয়, আমার গলির জীবনে থাকবে সংগ্রাম, কিন্তু সেখানে আছে উত্তেজনা। ঝিমিয়ে পড়া দিনে মুক্তি তবে কি পাব?

জানালার ধারে দাঁড়ালাম। নীলপদ্ম টানা। একটা পদ্মরাজের গাছের চারা রেণুকা দিয়েছিলেন। আজ সে ফুল ফোটাচ্ছে। ফুল কাকে দেবেন মামা?

অন্ধকার ভেদ করে চাঁদের আলো ওই সাদা পদ্মরাজের মত ফুল বিস্তার করেছে। পূর্ণিমা, শ্রাবণের পূর্ণিমা। পাহিড়ী বাড়ীর নারায়ণশিলা আজ ঝুলনের ঘোলা সাজ করেছেন।

বাইরের পোষাকে এলাম। মামা তখনও অন্ধকার বারান্দায়।

"মামা, শুয়ে নাও একটু। আমি ন'টার মধ্যে আসবো।"

"দেরী হয় হোক। রমজনের মধ্যে যাচ্ছিস যখি, গল্পগুজব করে ফিরিস। না হয় খাওয়াটা দেরী করেই হবে ডিনারের।"

অগমোহিনীর কি চিত্তচাঞ্চল্য ভঙ্গিতে ঘরদোর পরিষ্কার করল। এতক্ষণে আজ অধরবাবু সুযোগ পেলেন।

প্রথমে তিনি ধরলেন আবার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বটে, কিন্তু হায়, সে যুগে শ্রাবণী পূর্ণিমার কদর ছিল না। তিনি গাইলেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

আমি ভাবলাম, ভাগ্যি গানেও ভাবগত অর্থ গায়কে আরোপ করার রীতি নেই। অধরবাবু বিপত্নীক, মেয়েজামাইএর আশ্রয়ে বেকার জীবন যাপন করে চলছেন। এককালে গানের মাষ্টার ছিলেন। বয়সকালে গলা ছিল, আদরও ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর নগরী নিজের বেগে চলে। যে এক পা পিছিয়ে যায়, তাকে ভুলে যায়। ভাঙা মাটীর পুতুলের মত সে হয় বিসর্জিত। অধরবাবু সেই ভুলে-যাওয়া ভাঙা মাটীর পুতুল। এখানে ঘুষ-উপঢৌকনের আশ্রয়ে মাথা গুঁজে জামাইয়ের কৃপাদত্ত অন্নে দিনাতিপাত করে যাচ্ছেন। জীবনে এখন একমাত্র বাঁচা অগমোহিনীর পূর্ণিমার আসর। সেখানে আবার তাঁর গানের আদর হয়। আবার কেন্দ্রস্থলে তিনি মনোযোগের পাত্র হয়ে ওঠেন।

পূর্ণচন্দ্রের আগমন—নির্গমন অধরবাবুকে লক্ষ্য করলে বিনা পঞ্জিকায় ধরা যায়। তিনি নগগ্রামের পঞ্জিকা। পূর্ণিমা এগিয়ে এলে মুখে হাসি, গলায় গুণগুণ, রাস্তায় উৎসাহে চলা মাথা তুলে। আগের দিন বিওয়াজ। মেয়ে বিছানা থেকে বিরক্ত মাথা তোলে, "কি করছো, বাবা এত ভোরে? তোমার বয়সে গলা সেধে আর কি হবে? এর চেয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করোনা কেন?"

অধর বলেন, "রিওয়াজ, মা, সদাসর্বদা করে যেতে হয়। গান কণ্ঠে ধারণ করে না রাখলে ক্ষয়। সাধনা না করলে সিদ্ধি হয় কি?"

"তোমার সিদ্ধির কোন লক্ষণ দেখি না। যত বুড়ো হাবড়ার মধ্যে মেয়ে গলাবাজী।" মেয়ে মহা বিরক্ত হয়।

অধর গা করেন না। গা করলে চলে না তাঁর। ত্রিভুবনে এই আশ্রয়টুকু ছাড়া নেই।

কাল পূর্ণিমার আসরে কি কি গান হবে মনে মনে ভেঁজে নিয়ে বাজনায় তোলেন একবার।

আবার এক পূর্ণিমা ছেড়ে অন্য পূর্ণিমার মধ্যের বন্ধ্যা দিনগুলি ওঁকে দেখলেই চেনা যায়। মাথা নীচু করে মেয়ের বাজারের থলি টানছেন।

এ হেন ব্যক্তির কি আর অহঙ্কার থাকতে পারে, এবং সেটি ঘোচাবার প্রয়োজন হতে পারে? মাথাই বা নুতন করে কতদূর নত হবে?

অধরবাবুর একগানের শেষে দ্বিতীয়গান ধরার মধ্যে ডাক্তার নারায়ণ মিত্র এসে হাজির হলেন। তাঁর পক্ষে আসা শক্ত, এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার বিড়িক। কিন্তু আজ বিশেষ করে বলা হয়েছিল।

ডাক্তারকে দেখে সকলেই সম্ভ্রম দেখালেন। নিজের দিনযাত্রায় তাঁদের ডাক্তারবাবুর চটপটে চলাফেরা ও কর্মব্যস্ততা যেন মহাসমুদ্রের এক জোয়ার, বাঁধা নালার জলে।

ডাক্তারবাবু সিঁড়িতে জুতো খুলে খালি পায়ে উঠে এলেন। চেয়ারখানা টেনে দেওয়া হ'ল।

ডাক্তারবাবু আলগোছে বসে প্রসাদের সাজানো থালা থেকে সন্দেশটা তুলে নিলেন, "না, আর খেতে পারব না। এক্ষুনি ছুটতে হবে। কুচো বাংলোর মল্লিকবাবুই আবার পড়েছেন।" সকলে সংপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর কর্মচাঞ্চল্য অভিনন্দিত করল।

সন্দেশ চিবিয়ে জলের গ্লাস ধরে ডাক্তারবাবু সন্দেশ বিতরণ করলেন, "শুনছেন, এদিকে কাত। কানাডার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিনে নিল প্রায় অর্ধেকটা কলোনীর।"

সকলে খাড়া হয়ে বসলেন। অধরবাবু পর্য্যন্ত হারমোনিয়াম ছেড়ে তেড়ে এলেন,

"অ্যাঁ! বলেন কি?"

ভদ্রতা রক্ষা সেরে ততক্ষণে ডাক্তারবাবু উঠেছেন, "হ্যাঁ, কথাবার্তা হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরেই সইসাবুদ হয়ে যাবে। এখানে লোহার মস্ত কারখানা বসবে। আর কি? জমির দাম হু-হু করে বেড়ে উঠবে। আপনারা সকলে লক্ষপতি হয়ে যাবেন।"

"আর রাস্তার আলো?" সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, লক্ষপতি হওয়ার চেয়ে বিজলিবাতিতে পথচলা তাঁদের আরও আকর্ষণীয় বস্তু।

"রাস্তার আলো? জলের কল বসে যাবে। দোকানপাট, বাজারহাট, সিনেমা সমস্ত বসবে, মায় ফরি-হাউস পর্য্যন্ত। আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। পরে কথা হবে।" পকেটে হাত পুরে ডাক্তারবাবু যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিলেন তেমনি বেড়িয়ে গেলেন। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ স্থানটির হৃৎপিণ্ড এতবড় একটি আঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ হল। সকলেরি মুখ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। অতি বৃদ্ধ পেনসনী সার্জ্জনটীর খুড়ো হাত বুকে রেখে নীরিক্ষিত নেত্র। বোধহয় মনোচক্ষে ভবিষ্যৎ রূপের ধ্যান করছেন। দুই একজন ছিলেন অতিবৃদ্ধ, তাঁরা এ যেন উত্তেজনা সহ্য করতে পারবেন কিনা ভেবে ভয় হল।

রাতকানা বহু লাহিড়ী হাতিয়ে জলের গ্লাস ধরতে যেয়ে উল্টে ফেলে একাকার করলেন। সড়িয়ে এসে ঠেকল অধরবাবুর হারমোনিয়ামে টং করে। অধরবাবু ওঁকে সরালেন ঘরটা। এদিকে জলের ধারা গড়ালো যেখানে অন্য লোকেরা সরু-লম্বা ভাঁজকরা সতরঞ্চি পেতে বসে আছেন। কলরব করে ওঁরা উঠে সতরঞ্চি গুটিয়ে ফেললেন। হৈ-চৈ থেমে গেল।

চিত্রতারকাসুলভ ভঙ্গিতে লাহিড়ী-গিন্নি এল স্নাতা বোসেতে। সকলেই উত্তেজনাবাষ্পের একটা পথ পেয়ে উল্লসিত হয়ে বেঁচে গেলেন। স্তম্ভিতাহত হয়ে তাঁরা এতক্ষণ বসেছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বহু লাহিড়ী গদ্গদ স্বরে বলতে লাগলেন, "হাজারবার বলি যে দিনের বেলা বিটিয়ে দিলে হয়, তা না ঘুটঘুটে রাত না হলে পুজা হয় না। আরে, রাতে দেখা যায় না কি?"

রাতে যে অন্য সকলে পরিষ্কার রূপে দেখতে পান, এ তথ্য বহু লাহিড়ী কিছুতেই মেনে নেন না। যেহেতু তিনি দেখেন না, অন্যে দেখবে কেমন করে? তিনি যে চোখ মেলে দেখছেন দেখা যায় না।

লাহিড়ীগিন্নী অপ্রতিভ হলেন। স্বামী রাতকানা প্রচার হলে সম্ভ্রমবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ জলস্যাত স্বামী বস্তুটিকে অবাঞ্ছিত গৃহসজ্জার মত পাচার করা চলে না। সুতরাং স্বামীকে সরিয়ে বসিয়ে উনি প্রসাদের পথ এগোতে চান।

সঙ্গীতের ছোঁয়ে অমরবাবু মনোক্ষুণ্ণ হয়ে গলার চাদরে বারম্বার মার্জন করছিলেন। আদিযুগ থেকে ধুতির সঙ্গে চাদর ব্যবহার সভায় চলন, তিনি দেখে আসছেন। অতএব গুমোট গরম হলেও গলদেশ উত্তরীয় পরিশোভিত।

অমরবাবু বললেন, "অমরভায়া, গোটা দুই গান গাও। তারপরে উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।"

অমরবাবু আবার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ষোলকলা প্রাপ্ত হলেন।

সমবেত অনুরোধ এল, "আজ এমন আনন্দের দিন। তার একটা অমর খবর এল। জমাট গান হবেন, দাদা। প্রাণটা ঢেলিয়ে দিন।"

অমরবাবু প্রস্তুত। শুধু আরম্ভের আগে একপাত্র চা ভিক্ষা করলেন।

লাস্যিকী-শিল্পী তটস্থ হয়ে উঠলেন, "বিনো, বিনো এসো। যে যে চা খাবেন বলুন।"

"বিনোদিনী নামক সমর্থা ঝি আবার হাজির হল। বন্যা কলোনীর তরুণী সে অতএব হাবেভাবে ঠিক ঝিয়েটার। স্বাস্থ্যসম্পন্ন কালদেহে ঘাঁট ব্লাউজ, ছাপা শাড়ী পরা। প্রকাণ্ড তেল-চকচকে খোঁপায় তারিণী বেলফুলের মালা জড়ায় নি। চলাফেরা, হেলে দাঁড়াবার ভঙ্গি সমস্ত দেখেই মনে হয় যেন ও কোন সিনেমায় দাসীর ভূমিকায় অভিনয় করছে, আসলে দাসী নয়।

মনে মনে ভাবি: তোমার এমত চং কে দেখবে এখানে? ঠাকুর চাকরও এখানে বুড়ো হয়ে তবেই আসে। যৌবন সোজায় ওরা শহরে।

এখানে বয় পুরাণো হাওয়া।

চা-পানান্তে অমরবাবু গলা খাঁকিয়ে গান ধরলেন। এবার 'ভানুসিংহের পদাবলী'র অ'ওতায় চলে এলেন।

"আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু
কুঞ্জবনে দুহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়। ••••
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ উন্মাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী
শিথিল ভই লাজ।"

আবেগে অমরবাবুর গলা থরথর করে কাঁপছে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শিথিল পেশী দুলিয়ে কৃষ্ণের নবযৌবনের গান হাতকর।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সকলে ভাবে ভোর। গায়ক এবং শ্রোতা কতখানি হাস্যকর ভেবে দেখার লোক নেই। কেউ চোখ বুজে, কেউ গায়কের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে শুনছেন। কেউ হাতে তাল দিচ্ছেন, কেউ গুণগুণ করে কর্কশ বেসুরো গলায় আনান দিচ্ছেন।

এই গান সফল হবে কেমন করে? নগরগ্রামে নয় দু'চারটে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু মানুষ আছে বহু। একমাত্র মামার ক্ষেত্রে কলোনীর একমাত্র রোমান্সটি সফল হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু পুব হাওয়ার সুর বদলে গেছে। আলো ঝলমলো আনন্দমুখর গানের আসর। সহসা

অনন্ত অভিশাপে জরাগ্রস্ত যযাতি হয়ে গেছে। হঠাৎ পুবের বাতাস যেন হঠাৎ ঝটিকা বেগে বয়ে গেল। চুরমার হয়ে গেল আসর। বাসর বাঁধা হ'ল না। ফুলদের মেলা দুলল না।

এরা কত বৃদ্ধ, জ্ঞান নেই এদের। প্রতিদিনের তুচ্ছ আবর্জনা জড়ো করে ভুলে আছে নিজেরা, অন্যকেও ভুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু কাল ভোলে না।

একদিন আসে সে। নিঃশেষে মুছে আনে। আমি দেখব—এক এক করে। দেখতে আমি এসেছি। আমার জরা নেই, মৃত্যু নেই। অনন্ত পথ চলার পথিক আমি, এসে পড়েছি এখানে। অনন্ত দেখার তৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখব আমি, এক এক করে কেমন বোঁটা থেকে পাকা ফল খসে যায়, ধুলোয় মেশে। ফুল ঝরে যায়, বাতাসে ওড়ে। আমি দেখব।

হু হু করে পুবালী বাতাস শ্রাবণপূর্ণিমার প্রতি রন্ধ্র আচ্ছন্ন করে বয়ে চলল।

তানসিংহের প্রেমাভিমানিনী অভিসারিকা রাধা নীলাম্বরে সোনার নূপুর পায়ে দেখা দিলেন না, কুঞ্চিত কেশে বেণী বেঁধে মুখমণ্ডল অলকা তিলকা পরিশোভিত করে।

আলোয় আলোময় আসরে রাতকানা চোখে থাকে অন্ধকারের চির ব্যাপ্তি চিহ্নিত জগতে। আলো নিভে যায় পুব বাতাসে।

"বাদু বহী পুরবৈআ,
নীদ নহীঁ দিন সৈআ।"

## তৃতীয় কাণ্ড

আমি কেবল জীবনটা দেখেই গেলাম, না? আমার সুখ হল না।

আমি তাই যেতে চাই হিমালয়ে। পাহাড়ের চড়াই ধরে পৌঁছব অলকানন্দার তীরে। পুল পেরিয়ে দেব মন্দিরে প্রণাম রেখে এগিয়ে যাব।

ছোট ছোট কুঠিরা পাহাড়ের বুকে ছায়াঢাকা উপত্যকায়। সেখানে বাস করব। শাদা-সহজ জীবন। হরিতকী-আমলকী ছায়ায় আমার সংক্ষিপ্ত সেবা যন্ত্র গুছোবে। গাছের ছায়ায় বসে শাস্ত্রপাঠ করব। নিজের হাতে খাদ্য প্রস্তুত করব। নিজে খাবো, তারপরে পালিত কুকুরটির মুখে রুটী ধরে দেব। আমি দেখেছি কেদার বদরী যেতে এমনই শান্তসৌম্য আশ্রম। পায়ে পায়ে গাছ। গাছের তলায় তলায় সাধু।

কোন সাধু নীলধারার তীরে কৃচ্ছ্রসাধনে রত। অগ্নির কুণ্ড জেলে চোখনায় ভুলছে আগুনের দারুণ প্রীষ্মে তপস্যা করছে।

মেয়েরা এমনি তপস্যা করে ঘরে ঘরে। আগুনের উত্তাপে বিপ্রহরে খাদ্য প্রস্তুত করে। সেকালে খড়ির উনুন ছিল। খোলা মুখে খড়ি ঠেলে সাধনা ছিল মেয়েদের। কে বুঝছে?

কিন্তু মেয়েদের কথা থাক। সন্ন্যাসী জীবনে কেন গৃহস্থের স্বপ্ন?

তারপরে শোন। একদিন একঘেয়ে লাগবে। বিরস দিন বিষণ্ণ হয়ে উঠবে। চারদিকে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে মেঘোদয় হবে। এক বোঝা কাশফুলে যেন মৃদাত মেঘের সঞ্চিত আসার প্রতীক্ষায়।

আমি বেরিয়ে পড়ব।

ছেড়ে যাব আশ্রম, ছেড়ে যাব সামান্য তৈজস। পালিত কুকুরের মায়া বাঁধতে পারবে না। আমি আরও উর্ধ্বে চলে যাব, সমতল উপত্যকা ছেড়ে।

বাতাস স্পর্শ মিলিয়ে যাবে দূর তুঙ্গ শিখরে। আঁকাবাঁকা চড়াইএর পথে ঠেলে উঠব। হঠাৎ দেখব গ্লেসিয়ার। সবুজের মত পাংলা তুষারে নদী জমাট বেঁধে আছে। আস্তে পার হয়ে আরও উপরে উঠলাম! পাশ দিয়ে নেমে আসছে পাহাড় গলানো সর্পিলবাহ আভালাঞ্চ। তুষার প্রপাত এড়িয়ে গেলাম। এবার নীলধারা গঙ্গা অদ্ভুত ছন্দির বেগে হিমালয়ের কন্দর থেকে নেমেছে। আরও উর্ধ্বে চিরতুষার রাজ্যের অনির্দ্দেশ পথ।

আমি আরও উর্ধ্বে উঠলাম, জানিস? কাঁপ পুষ্প সৌরভ আমার বিশ্বাস। সেই সৌরভ ক্রমে উগ্র হয়ে উঠল। পদক্ষেপ করলাম শেষ তুষারশিখরের বাঁকে। চমকে উঠলাম।

উগ্র পুষ্প-সৌরভ আকুল করে রেখেছে একখণ্ড সমতল ভূমি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া যেন বাংলার গুহাদেন। সাদা সাদা ফুল লম্বা ডাঁটায় ফুটেছে স্তবকদল তারা। অজস্র পদ্মফুলের পাশে অসংখ্য অজ ফুল—নাম জানা, নাম না-জানা। লাল রডোড্রেনড্রন, নীল পপি, হলদে ডেজি, সাদা অ্যানোমিনী। অসংখ্য পাখী ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সেখানে প্রহীপ জ্বলছে একটি ছোট কুটীরে।

ভাওলার মানে করা আপনে কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে? —সে।

আমাকে বললো, "এসো।"

আমাকে বললো, "তুমি আসবে জানতাম।"

পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর হাল্কা হয়ে গেল সেই অদ্ভুত ফুলের গন্ধে, ফুলের বনে আর একটি ফুলের স্নিগ্ধ স্পিষ্ট আমি দাঁড়ালাম আমার চিরকালের চাওয়ার দরজায়।

আমি বলাম, "এখানে তুমি? আশ্চর্য্য! কী করে চলে তোমার এত উঁচুতে, একা একা?"

সে বলে উঠল, "এখানে আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তুমি কোথায় এসেছ বুঝতে পারছ না?"

আমি তার দিকে চেয়ে কথা হারিয়ে ফেললাম, রবি।

রবি, রবি, রবি!'

উঠে বসলাম। রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম মামা আমাকে কথাগুলো বলছেন।

এই দীর্ঘ মনোযোগ মামা আমাকে অবশ্যই স্বপ্নের মধ্যে বলেন নি। আমি যুদ্ধে যা দেখেছি, স্বপ্নে যা শুনেছি, সাজিয়ে লিখলাম।

মামা কাল রাত্রে যা বলেছেন, বিশ্লেষণ করলে এটাই হয়।

বিছানার বালিশ ভিজে গেছে আমার চোখের জলে।

মামাকে নিয়ে করি কি।

বছর দুয়েক এখানে এসেছেন মামা। প্রথম থেকেই বোধ হয় প্রেম জমেছিল। ভাগ্যেরণবিহীন দিনগুলোয় বুঝি পরস্পরের সঙ্গে বাড়ী-যাওয়াতে লেগে গেল আমাকে।

কিন্তু তার আগে এতকাল মামা করলেন কি? বিদেশে! চাকুরি-জীবনে কর্মভারে বড়ই

ব্যস্ত থাকেন উনি, প্রেমের অবকাশ ঘটেনি কেন? পাত্র হিসাবে যে কোন নারীর প্রার্থিত বস্তু ছিলেন আমার মামা।

মরুভূমির উটের প্রথায় মামা জল সঞ্চয় করে মরুপথে চলেছিলেন বুঝি। ওয়েসিস পেলেন। সঞ্চিত জলের বোঝা একস্থানে ঢেলে দেবার পূর্বেই ওয়েসিস মিলিয়ে গেল।

এখন কি উপায়?

একজন অতি আনন্দে উত্তেজনায় প্রাণই দিলেন। অন্যজনের অবস্থা দেখে চিন্তা হয়।

বৃদ্ধবয়সে মামা এত আকুল হবেন, ভাবতে পারিনি কখনও।

মাকে বলেছিলাম। মা পুরোপুরি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিরহ যেন একমাত্র তারুণ্যেরি সম্পত্তি।

তাহলে নিজে মা বৃদ্ধবয়সে স্বামীশোকে এত মুহ্যমান্ কেন?

আঁকড়ে ধরার বস্তু কমে যায়, শেষ কামড় পড়ে। তাই বৃদ্ধকালে হারাণো এতটাই হৃদয়স্পর্শী।

খাবার ঘরে মামার মুখে দেখলাম বাইরের পার্টি মামার কাছে কে এসেছে।

সকালবেলায় মামার কাছে সাধারণতঃ ডাক্তারবাবুরা অথবা রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা আসেন। মামা প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিলেও প্রকাণ্ড ডাক্তার ছিলেন। তাই পরামর্শ নিতে অনেকেই এসে থাকেন।

আমি নিত্যগোপালের মুখে শুনলাম, আমার দেরী দেখে মামা আগেই চা খেয়ে নিয়েছেন। আমিও উদ্যোগী হয়ে চা-পানাদি সেরে নিলাম। এখন আমার মামার হাতিতে বসে পড়াশোনা করবার কথা। মামা প্রচুর বই কেনেন ও যত্ন করে রাখেন। এমন কোন বিষয় নেই যে বই নেই।

বই খুলে বসেছি। মামা প্রবেশ করলেন।

মামা বল্লেন, "রবি, কুচো বাংলোর মল্লিকদাদাইএর অবস্থা খারাপ। ডাক্তার মিত্র বা সিম্পটম্ বল্লেন, তাতে আমার মনে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, নিমোনিয়া হয়েছে। তুই একবার দেখে আয়।"

"তুমি চলো না, মামা। একবার চোখে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে।"

"বাবে, না।" মামা অস্থির হয়ে উঠলেন, "আমি প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়েছি একেবারে। দেখা মানেই মতামত দেওয়া। মতামত দেওয়া মানেই দায়িত্ব নেওয়া। আর—চোখে দেখলেই আমি বুঝতে পারি? তাহলে চোখে দেখেও কেন বুঝিনি?

"মানে? কাকে আবার চোখে দেখে তুমি বোঝনি?"

"যে লোক পরের দিন মারা যাবে, আগের দিন রাত্রে দেখে কেন বুঝিনি? ডাক্তার হয়ে এত বড় ভুল করেছিলাম? প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়েছি বলে নির্লিপ্ত হয়ে না থেকে তখনই ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল।"

মামার প্রেমের সঙ্গে অনুশোচনা যুক্ত হয়েছে। ডাক্তার কেন ভুল করেছেন? তাই মামা এতটাই ভেঙে পড়েছেন?

মামা আমার কিছু বলার আগে চাপা বিষণ্ণ স্বরে আবার বলে চললেন, তখনি ঔষধ দিলে

আনিয়ে জোর করে খাইয়ে দিলাম না কেন? প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি বলে কি জ্ঞানবুদ্ধিও ছেড়ে দিয়েছিল? আমার ডাক্তার হয়ে এমন অপরাধ করা অন্যায়। ভারী অন্যায়! সে হয়তো আজও বেঁচে থাকত। ছিঃ, ছিঃ!"

মামা ধপ্ করে চামড়া ঢাকা আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। এতদিনের মধ্যে কোনও দিনই উনি মিস বয়াটের সম্পর্কে খোলাখুলি এমন আলোচনা করেন নি। প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ প্রিয়বিয়োগব্যথার যোগ হয়ে মামাকে ভেঙে দিয়েছে।

যাহোক, মামা কথা বলে যাতে হাল্কা হতে পারেন তদনুযায়ী আমি কথাটা চালাবার প্রয়াস পেলাম। "তুমি কি করবে, মামা? দেখে কি বোঝা গিয়েছিল? আমিও তো ছিলাম। অত হাসিখুশী, গান"—

মামা শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে মুখের কাশচে বিষণ্ণতা কেটে গেল। উদ্দীপ্ত সরস ছায়া পড়লো। বুঝলাম অতীতে আনন্দের সেই শেষ মুহূর্তটিতে ফিরে গেছেন মামা। আবার নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিলেন শঙ্খের মত। শুধু জেনে নিয়েছি আমি, মামার গোপন বেদনার স্বরূপ।

ঘরের বার হয়ে সুখিয়াকে ডাক দিলাম। সুখিয়া সাঁওতালী গ্রাম থেকে এসেছে। কয়লাখাদের শ্রমিক ছিল, বাঁ হাতের দুটি আঙুল খসিয়ে কয়লার কাজে বীতস্পৃহ হয়ে বাংলো বয়ের কাজে নেমেছে। বিকলাঙ্গ হলেও অপটু সে নয়। কাজেকর্মে দক্ষ।

সতকাল মামা আমি না থাকায় আমার সংক্ষেপে করেছিলেন শুনেছি। আমি সকালে চা খেয়েই চলে গেছিলাম। মায়ের হাতের রান্না কতকাল খাইনি। ফিরে এসে শুনলাম মামা নাকি সেদ্ধ ভাত খেয়ে রয়েছেন। সারাদিন ঘরে দোর দিয়ে বসে ছিলেন।

আজ মুর্গী করতে বললাম। মামার মুর্গী কেবল পোষার জন্যে। ডিম খেতে পারেন, ওদের গায়ে হাত উঠবে না। তাই সুপিয়াকে বাজার থেকে একটা মুর্গী কিনে কেটে কুটে নিতাগোপালের হাতে দিতে আদেশ দিলাম।

আজ সকালে লেখাপড়া হবে না। কুচো বাংলোর খবর নিতে হবে।

মৃগেন মল্লিক পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী। এককালে চিত্তরঞ্জনের বন্ধুস্থানীয় হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে দেশ খেটে বেড়াতেন। রক্তচাপ মন্দীভূত হওয়ায় অবশেষে বিবাহ করে সংসারী হন। ইংলণ্ডীর হাত ছিল। শহরের আবহাওয়া সহ্য হচ্ছিল না। একটি মেয়েও আছে। ভবিষ্যৎ দেখা দরকার। তাই বসবাসের ভেতে বার্কিংহামলোনীর জমি কিনলেন। জমি কেনার পরে বাড়ী তুলতে অনটন দেখা দিল। একখানি প্রকাণ্ড ঘর করলেন টালীর ছাদ পাতা। সেখানার মধ্যে তিন ভাগ। মধ্যে বড় একখানা লিভিং রুম। দুপাশে ছোট-ছোট দুটো অংশ। পেছনে-সামনে টানা পাকা বারান্দা। পেছনের বারান্দায় রান্না ও খাওয়া একদিক ঘিরে। সামনের বারান্দায় কয়েকটি বেতের মোড়া ও ছোট টেবল একটি। বসার ঘরের কাজ করে। মৃগেন মল্লিকের একমাত্র কন্যা রেবেকা এম. এ. পড়ে কলকাতায়। হষ্টেলে থাকে। টিউশন করে খেতে হয় তাকে। পিতা বেকার। সরকার থেকে কিছু টাকা পান। এটা-ওটা করে চলে। জমি খানিকটা বেশীই তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু ফলফুলুরি ফলানো আজো হয়নি। শরীর বাধ সেধেছে। অল্পবয়সে জেলে-জেলে নানা ঘাটের জল খেয়ে আজ তিনি ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গম। ওড়ার সাধ্য নেই।

একখানি ঘর যোগে, মল্লিকগিন্নীর বাড়ীখানি সবাই 'কুচো বাংলা' নাম দিয়েছিল। মল্লিক-বাড়ীর কর্তাগৃহিনী কিছু অসামাজিক। কলোনীর পক্ষে সেটা বিচিত্র। যেখানে ইলিশ মাছ বা মাটন কবে কোন ঘরে আসে জানা যায় সহজে, সেখানে নিজেরা নিজেদের নিয়ে থাকা দুষ্কর। অবশ্য কেউ হানা দিলে ওঁরা আতিথ্য করেন, কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে আসেন কই?

অবশ্য কলোনী আসরনের সময় ওঁদের বেশী নয়, কয়েকটা মাস মাত্র।

হয়তো উন্নতির উদ্রেক হবে।

এখানে একটি আধো আলোছায়া ঘেরা স্বতন্ত্র জগৎ। ছেলেবেলায় বাড়ঘরে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর গড়া মাটীর গ্রাম, শহর দেখে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম। বিরাট পৃথিবীর একটি কোণে কাঁচের বাক্সে সুরক্ষিত একখণ্ড পৃথিবীর অংশ। কত ছোট, কিন্তু কত সম্পূর্ণ। সমস্ত আছে এইটুকুর মধ্যে। তেমনি ছোট একটি জগৎ এখানে। নিনিয়েচার। এখানে, মনে হয় বৃহৎ জগত ছুটে চলেছে উর্দ্ধে। নীচে সুরে সুর মিলিয়ে অনেক ছোট একটি এপিটোম ছুটছে। স্নান আভায় এখানটা উদ্দীপ্ত, সূর্য্যর প্রাখর্য্য নেই।

রাস্তার ধার হয়ে এলাম। লালটুকটুক লোহার গেটটি সবুজ লনখানির শেষে। এই যে ফুটেছে লার্কস্পার, ওই যে আলো করে আছে বল্‌কে। এখানে বাঁধা হবে হাসোক। রেণুকা বসে আছেন,

হাতে উলের বোনা, কোলের কাছে মাসিক খোলা। আস্তে আস্তে দুলছেন একটু। বাতাস টপ্‌টপ্‌ করে ঝরছে আমার, কাপড়ে, চুলে। হাসছেন, গলায় গুণগুণ গান—

"আমার বাগানে এত ফুল
তবু কেন চলে যায়,
যে আছে আমি পানে,
সে তো ফিরে নাহি চায়।"

ফুলে ফুলে ঘউনাছি, উন্মনা ভ্রমর গানের সুরে দিক ভুল করে, রডোডেনড্রন গুচ্ছে মাথা ঠুকে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে ভ্রমণ করছে। সেখানেও অন্ত এক গানের সৃষ্টি।

লোহার দরজাটা ঠেলে মামা এলেন। হাসিখুশী, স্বাস্থ্যদীপ্ত প্রৌঢ় মূর্তি। হাসতে হাসতে মাথা উঁচু করে দোলনার দিকে চাইলেন। দুচোখ উজ্জ্বল, আলোজ্বালা চোখ দুটি একবছর আগের মত।

আমার ক্যামেডাসে পুরানো হাওয়া গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণদিকে বইতে লাগল। সমস্ত পট-ভূমিকায় এখন দক্ষিণা বাতাসের খেলা। দুলছে দোলনা বাতাসে।

ঈশ্বর কেন এমন একখানি ছবি চিরস্থায়ী রঙ এঁকে রাখলেন না? কেন হৃদয় ভরা দুঃখ নিয়ে পূব বাতাস বয়ে গেল?

আমার মনে মামার বাড়ীতে ওই চিরন্তন দোলনার দোলা সাজিয়ে রাখলাম। পথে নেমে এলাম।

কুচো বাংলো বেশী দূরে নয়। পথটা বেঁকে ডানদিকে গেছে। সেখানেই বাংলোর অবস্থান: আমাদের রাস্তা থেকে দেখা যায় না, এই যা।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম, একখানি সাইকেল-রিক্সা থেকে নামছে কেউ। কুচো বাংলোর বুড়ো চাকর ঘুরে ঘুরে বাক্স আর বুড়ি একটা বেতে বোনা, নামিয়ে নিচ্ছে।

এবারে নামল সওয়ারী। মাথায়-গলায় ছাপা সিল্কের রুমাল বাঁধা। তির্যক দৃষ্টি আমার উপর একবার ফেলে অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল নির্বিবাদে।

বুঝলাম মৃণেন মল্লিকের মেয়ে এসেছে শহর থেকে বাবাকে দেখতে। ক্যাসান করার সময় পায়নি আর? উগ্র আধুনিক পোষাক, অথচ শুনি মেয়ে পড়িয়ে খরচ চালাতে হয়।

আমাকে দেখে অবজ্ঞাই বা কেন? আমি কুলি না মজুর? তুই এম. এ. পড়িস, আমিও পড়ি।

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম ফিরে যাই। অমন একটা ঢ্যাকারে মেয়ের বাড়ী যাব না। আমি শান্তি-নিকেতনী সাজগোছ ভালবাসি। উগ্র আধুনিক সিনেমা অভিনেত্রীর চংএ মাথায় রুমাল বেঁধে কল্প বাবাকে দেখতে নেমেছে, দেখ!

কিন্তু মনে এখন ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণার প্রশ্ন ওঠে না। ওই মেয়েটির পিতা অসুস্থ, হয়তো মারাত্মক অসুস্থ। মামাকে খবর দিয়ে দিতে হবে।

একটুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, নবাগতাকে সময় দিতে চাই গুছিয়ে নিতে আগমনকে। তারপরে দরজায় ঘা দিলাম। দরজা খোলাই ছিল।

ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন মল্লিকগিন্নী। এককালে কত রূপসী ছিলেন, মুখে চোখে এখনও লেখা। কিন্তু সর্বদা অসহিষ্ণু—সন্দিগ্ধ ভাব।

আমাকে দেখে কাষ্ঠহাসি হাসলেন, "ও, তুমি এসেছ।

একটু বিব্রতভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি। ধারাবার রোগের মোড়ায় কি বসবার অনুমতি দেবেন না?

আমি ওঁর ধরণধারণ দেখে বলেই ফেললাম, "মামার কাছে সকালে ডাক্তার মিত্র গিয়েছিলেন। মামা খবর নিতে আমাকে পাঠালেন।"

"ও:", নিমেষে মল্লিকজায়ার মুখের কালিমা উবে গেল, সারের আপ্যায়ন ফুটল গলায়, "এসো, এসো। ভাল করে দেখে মামাকে বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করো। আমাদের ভাগ্যি, এত বড় ডাক্তার এখানে আছেন।"

"মামা তো প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তা হোক। উনি কানে একবার শুনে যা বিধান দেবেন, ছোট ডাক্তার সারাদিন ধরে বসে থেকে তাও পারবে না। এসো, ওঁর কাছে এসো। আমার মেয়ে আবার এক্ষুণি এসে খবর পেয়ে।"

আমি দারুণ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠলাম মামার মূল্যে। মল্লিকগিন্নী বড় ঘরখানির ভেতরে আমাকে নিয়ে গেলেন।

দু'দিকে দু'খানা খাট। ঘরখানা বড়। দুদিকে খাট দু'খানা যেন দুখানা আলাদা ঘর। এক খাটে অসুস্থ মুগেন মল্লিক শুয়ে রয়েছেন। মাথার শিয়রে টেবলফ্যান বসানো, একটা লম্বা টেবিলের এক পাশে। অন্যদিকে ওষুধপত্র সজ্জিত। কয়েকখানা বইও আছে। পায়ের দিকে একটা আলমারী।

দেয়ালের দিকের টিপয়ে পানের ডিবে ও পত্রিকা। সোকেস্ প্যাটার্নের আলমারী ভরা কিছু কিছু বাসন, পুতুল ও সৌখীন দ্রব্য। মিছুকের পাহাড় একটা চোখে পড়ে, আঁসের গোলাপ ফুলের তোড়া। ওপাশের ঘরটায় ড্রেসিং টেবল ও আলনা চোখে পড়ে। ওদিকের খোপ দেখা যায় না, ওখানেই বোধ হয় শ্রীমতী জিম্পি।

মুগেন মল্লিককে বহুদিন দেখিনি। আজ দেখে চমকে উঠলাম। স্ত্রী যতটা সুন্দর, তিনি ততটা কুশ্রী। আজ কাল রং এ, শীর্ণ দেহে বিছানায় দেখা তিনি রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে সজাগ করে দিলেন দেখা মাত্রে।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম। খানদুই চেয়ার ঘরে ছিল।

"কেমন আছেন?" মল্লিকবাবুকে 'কাকা' কি 'দাদা' বলব ভেবে পেলাম না। আমার স্বর্গগত পিতা অদ্যাপি জীবিত থাকলে ইনি তাঁর কে হ'তেন কে জানে?

"আছি কেমন দেখতেই পাচ্ছ।" হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মল্লিকবাবু বল্লেন, "এখন যেতে পারলেই হয়।"

মল্লিকগিন্নীর সম্মুখে এ হেন বাক্যে আমি অপ্রতিভ হয়ে বল্লাম, "এ আর কি এখন? সর্দিকাশী ঘরে ঘরেই হচ্ছে। শীগ্‌গির ভাল হয়ে যাবেন।"

মল্লিকগিন্নী মুখখানা গুটিয়ে স্বামীর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলে উঠলেন, "তুমি বাবা, একটু বুঝিয়ে-বাঝিয়ে তোমার মামাকে একটি বার এনে দাও। উনি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। বাড়ীতে দেখার কেউ নেই। আমি, আর ওই মেয়েটি, এখন এস। সে-ও ছেলেমানুষ।"

এমন সময়ে মেয়েটি ঢুকল ঘরে এবং বিরস মুখে ঠক্ করে এককাপ চা আমার সামনে একটা ছোট টিপয় টেনে বসিয়ে দিল। এখনও মুখে বিতৃষ্ণা ও বিরাগ, কিন্তু আটপৌরে একখানা লাল ডুরে শাড়ীর ফলে গৃহস্থ মেয়ের মত লাগছে। মাথায় ঘোমটা যদিও নেই বলেই চলতো।

আমি বললাম, "এ কি? চা কেন? আমি এক্ষুণি বাড়ী থেকে চা খেয়ে এলাম। অসুখের বাড়ী, লৌকিকতা—"

বাধা দিয়ে তীব্রস্বর এল, "অসুখের বাড়ী চা তৈরি হয়, চা খেতে হয়। তখন কোন অজা থাকলে এককাপ দেবার ভদ্রতা সকলেরি থাকে।"

কথার ঝাল যেন ছুরীর ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোলা।

আমি কথা বাড়ালাম না। যে-কোন কারণেই হোক মল্লিকগৃহিণী আমার প্রতি প্রসন্না নন।

মল্লিক গৃহিণী তাড়াতাড়ি মেয়ের কথার ধার চেকে দিতে বললেন, "রবি, তুমি নিশ্চয় পাপড়িকে চেনো। পাপড়ি তুই রবিকে—"

"খুব চিনি। এখানেই তো দিনরাত থাকেন।"

অবজ্ঞামাখানো কথায় ও শ্লেষকী ওরকে পাপড়ির মুখভাবে বোঝা গেল বহু তথ্য। আলোকপাতে আমার চোখের সম্মুখের ঘন অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল।

আমি ওর মত শহরে পড়াশোনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যোগ নেই। ও ধরে নিয়েছে, আমি মামার স্থাবকতায় নিষ্ক্রিয় বেকারের জীবন যাপন করে থাকি। লেখাপড়ার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। পরমুখাপেক্ষী পরগাছা, পুরুষ হ'লেও বেকার। তাই ও এতটা অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে করে।

আমি কোন মতে চা-টা শেষ করে মল্লিকবাবুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্নাদি জেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পাপড়ি ভেতরে চলে গেছে। মায়ের সুন্দর মুখে বাবার কাল রং মিশে মিশে সে এক দ্যুতিহীনা শ্যাম অপরাজিতা। কিন্তু গন্ধহীনা।

মল্লিকগিন্নী আবার মামাকে এসে দেখার সবিশেষ অনুরোধ জানালেন।

আসবার আগে একটি সংবাদ দিলেন মল্লিকগৃহিণী। রেণুকা বরাটের খালি বাড়ীতে আসছেন ওঁরি বৌদি। বিধবা হয়ে একা-একা তিনি আছেন বহুদিন। তিনকুলে কেউ নেই। ছোট ননদ রেণুকা একমাত্র আত্মীয়া ছিলেন এতদিন। খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন মহিলা। শহরে ভাল লাগছে না। এখানে এসে থেকে যাবেন কয়েকটা দিন।

রেণুকা বরাটের একমাত্র দাদার বদখ্যাতি ছিল। রেণুকার জমিটি কিনে বাড়ীটাও তিনি নাকি করে দিয়েছিলেন।

খবরটা শুনে ভাবলাম, মামাকে না জানি কতটা নাড়া দেবে? শূন্য বাড়ী আবার ভরে উঠবে। যাতায়াতের পথে রিক্ত শূন্যতা আর শীচা দেবেনা। দরজা-জানালা খোলা হবে, আবার মালী ঘাস ছাঁটবে, মাছওলা উঁকি দেবে। কিন্তু যে চলে গেছে সে কখনও ফেরে না।

আকাশে ভাদ্রের ভরা সোনার ফসলে মেঘ। নীল আকাশ হঠাৎ মেঘে ফুলে উঠল। সাদা তুলো-তুলো মেঘ, নীলের বিস্তৃতি মুছে গেল। গাঢ় কালচে নীল শরতের হাল্কা নীলকে ঢেকে দিয়ে গেল। কৃষ্ণচূড়ার গাছের ঝালরঘার পাতা আরও সবুজ, ঘোরালো সবুজ হয়ে উঠল।

ভাবলাম, স্বর্গের পৃথক অস্তিত্ব কোথায়? এই যে লক্ষ দিনে হাসি অশ্রু ভরা পুরাতন পৃথিবী, এখানেই অলকার স্বাদ পাই আমরা। এমন রঙে রসে বিচিত্র পৃথিবী গড়ে ঈশ্বর আমাদের তোমা স্বর্গকে মনে করিয়ে দেন।

বার্ষিকী কলোনীর আর একটি তরুণ মুখ পেছনে কুড়ো বাংলোয় ফিরে এলাম। কিন্তু এ মুখ আমার মত থাকার মুখ নয়। এ ক্ষণঅতিথি। এতদিনে যদি একজন তরুণী এল, যদি তার সঙ্গে আলাপ হল, তবু সে বীতরাগা।

আকাশ আরও কালো হতে লাগল। জামের মত কালো। রসভারে গোছা-গোছা কালো জাম যেন ঊর্ধ্বে জলছে। এখনি রসের বৃষ্টি নামবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন ভিজে গেলাম।

মামাকে মৃণেন মল্লিকের বাড়ী যেতেই হ'ল।

ডাক্তার মিত্র, ডাক্তার ব্যানার্জি কুল পেলেন না। মামার অনুমান সত্য করে নিমোনিয়া ধরা পড়ল।

হাসানী রোগীর অবাধীর দেখে প্রকোপ যথেষ্ট রুদ্র।

ঔষধপত্র পাওয়া গেল মোটামুটি। বুড়ো বয়সে যা যা রোগ হতে পারে, ডাক্তারখানার সেই ঔষধগুলো মজুত করে রাখেন ডাক্তারেরা। তাছাড়া কম্পাউণ্ডার সপ্তাহে একদিন শহরে যায়। মেডিক্যাল রেপ্রেসেনটেটিভ আসে।

ক্রাইসিস চলছে রাত্রে। বাড়ীতে সেবার লোক না থাকায় আমি ঘাবড়াতে করতে লাগলাম। কলোনীর অন্যান্য যারা, তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ। সেবার লোক খুঁজে মেলে না। কবিরাজ নথাইএর মেয়ে নিজের অনার্থক পাঠশালা চালিয়েও দু'একরাত জেগে গেল। পাপড়ি ও মায়ের ওপর ভরসা করে অত বড় রোগী রাখা যায় না। অথচ ভাড়া নার্স আনারও রসদ নেই। কাজেই আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হল।

মামাকে আমার অনেক বুঝিয়ে অনুরূপে উপস্থিত করাতে হল। মামা প্রথমে প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন অনুযোগে দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত ছিলেন।

আমি বোঝালাম, "মামা, প্র্যাকটিস্ না করলেও তুমি অনেক ডাক্তারকে শিখিয়ে দিতে তুমি এখানে থাকাতে যদি ভুল চিকিৎসা হয়, তুমি কি শান্তি পাবে?"

মামা রাজী হতে চান না, "নারে রবি, একবার যখন কিছুই করিনি, নিস্ফিরারে লোকটাকে মরে যেতে দিলাম, তখন আর যাব না এবারে।"

আমি তর্ক চালালাম, "কিন্তু মামা, তাই তো তোমার বিশেষ করেই যাওয়া উচিত। তোমার দোষে না হলেও সেই ঘটনায় তুমি যদি মনে আপশোষ করে থাকো, আবার কিছু ঘটলে তো আরও আপশোষ হবে তোমার। তাছাড়া, ধরো একটা প্রায়শ্চিত্ত—"

মামা চুপ করে রইলেন। আমি হাত ধরলাম, "মামা, চলো। এ সময়ে কি করে সরে থাকতে পারো? পারো তুমি?"

মামা আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। আমি ভাবলাম আর মৃণেন মল্লিকের বাঁচা হল না।

শহর থেকে প্রখ্যাত ডাক্তার আনবার ক্ষমতা নেই ওঁর। অথচ এখানকার ডাক্তার দু'জন হালে পানি পাচ্ছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে ওঁদের।

মামা নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপচাপ বারান্দায় যাবার উদ্দেশে প্রস্তুত হলাম। ওঁরা কত আশা করে বসে আছেন মামার পথ চেয়ে। আমাকে একা দেখে ভাববেন কি?

মামা বেড়িয়ে এলেন। হাতে এতদিনের তুলে-রাখা, পুরনো কালো চামড়ার ডাক্তারী ব্যাগ।

দিন যেন থমকে রয়েছে।

খুঁড়িয়ে চলা দেখতে দেখতে একটা দিনে দশটা দিনের দেখা দেখি।

মামার হাতে রোগী অনিবার্য পরিণতির পথে গড়িয়ে যেতে পারল না, কিন্তু জরাজীর্ণ হাপানীর রোগীর দেহ ফুটো নৌকোর মতন। ভাসিয়ে রাখা শক্ত, বড় শক্ত।

মামার সঙ্গে পাপড়ির ঘনিষ্ঠতা দেখলাম। মামাকে যত্ন করা, মামার সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা দেখে খুশী হয়েছিলাম। বিনা পারিশ্রমিকে এত বড় ডাক্তার পেলে কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক।

মামাকে খাওয়া মাত্র চা করে দেওয়া, হাতপাখার বাতাস, ঘর করে বসানোর মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা। মামারও কাজে জড়িয়ে পড়ে পরিবর্তন এসেছে। মামা আগের মত গম্ভীর উদাস নেই। উৎসাহ, জীবনকে নূতন করে দেখার ইচ্ছা যেন ফিরে এসেছে চলনে-বলনে।

একটা ঘুণের শুষ্কতার কুয়াশা-আসন আস্তে মামার চোখের দৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে মুখের ভাষাহীন পাণ্ডুতা থেকে। একাগ্র মনোযোগে একজনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকটি ফিরে এসেছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি সাম্রাজ্য চালনার মত ডাক্তার দু'জনকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ওঁরা সাগ্রহ বিনয়ে পালন করছেন।

ভাবলাম, ভালোই হল, বাইরের ছোট ঘরটায় একটা চ্যারিটি ডিসপেনসারি খুলে দেব। একঘণ্টা করে মামা পরোপকার করবেন। অতি উৎসাহী মামার ঘরবাড়ী জীবনে হঠাৎ যে একটা বালিশের বাধা তুলেছে, সেখানে জোয়ার না লাগলেও অন্ত ধারায় প্রবাহিত করা চলবে জীবনতটিনী। কলোনীর লোকগুলিরও উপকার করা হবে।

শেষ প্রহরের চরম পিপাসার শেষ বারিসপ্তক মামার হাতে থেকে কঠিন ভাগ্য ছিনিয়ে বালিচড়ায় শুকিয়ে দিয়েছে। পরএবারে বাতাসে মনী সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

তাই মামার প্রাণচাঞ্চল্য দেখে সুখী হই। মামাকে পাপড়ি সমাদর করছে এবং মামার সেটা ভাল লাগছে দেখে আমার আনন্দ হয়। আহা, বঞ্চিত মামা সুধার প্রাস কোথাও পান যেন।

এরি মধ্যে ভাদ্র আকাশে শেষ বর্ষণপালা সুরু হ'ল। রবীন্দ্র কাব্যে শেষ বর্ষণের যতটা আদর থাকুন না কেন, রোগীর জীবনে প্রমাদ ঘটিয়ে দিতে পারে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসে, প্রবীণারা বলেন যমের নাকি চার দুয়ার খোলা থাকে। সহজেই ব্যাধি প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রেও হল তাই।

মৃগেন মল্লিকের অত্যধিক বাড়াবাড়ি দেখা গেল। পাপড়ির হাতে ছিল পথ্যের ভার। নিজের হাতে মামার নির্দেশমত মেপে মেপে খাদ্য সে যোগাত।

একদিন হয়তো পথ্যের পরিমাণ বাঁধাধরা মাপ থেকে একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। শাপড়িকে দোষ দেওয়া যায় না। সারাদিন রাত তাকে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে রোগীর সেবা করে যেতে হয়। কবিরাজ মশাইএর মেয়ে অবশ্য মধ্যে মধ্যে রাত জাগতে আসে, যদি বেশী বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু তার আবার পাঠশালার বাচ্চাদের নিয়ে একটা শারদোৎসব করাতে হবে। বাচ্চাদের সংখ্যা এত কম যে, শহর থেকে চেয়ে-চিন্তে এক ডজনের বাচ্চা যোগাড় করতে হবে। অতএব পুরোপুরি রিহার্সেলও সম্ভব নয়। সেখানকার বাচ্চারা নিজেদের মত অভ্যাস করে যাবে, এখানকার বাচ্চারা এদের মত করবে। অতঃপর জোড়া দিয়ে দাঁড় করানো হবে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান। যা হয়, বলার নয়।

তবু গোটা কলোনীর লোক মেতে উঠেছে। মৃগেন মল্লিকের অসুখে একটু ম্রিয়মান হয়েছিল নগরায়ন, কিন্তু মামা হাল ধরার সাহস ফিরে পেয়েছে। বিকেল হতে না হতে ছোটে তারা কবিরাজবাড়ী।

সিমেন্টের ওপর টিনের চালা ঘর ছটি পাঠশালা ঘর। বাকী বাগচীর অর্থে কেনা সতরঞ্চ পাতা হয়। সেখানে অধরবাবু রাজা। বহুরূপী হারমোনিয়াম অধরবাবুর হাতে নেচে নেচে বাজে। অধরবাবু হাতে তালি দিয়ে দেখান—"এইবার, এইবার। ধরো একসঙ্গে,—

মেঘের কোলে রোদ এসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।' হা-হা-হা-হা!

হ্যাঁ হ্যাঁ। নেচে নেচে, গাও।"

অধরবাবুর যেন কায়াকল্প চিকিৎসার নবজন্ম ফিরে পেয়েছেন। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন, কথায় কথায় হাসেন। জামাই-এর বাড়ী বাজার করা ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়ের খিটখিটে কানে তোলেন না। জামাই বিরস মুখে বাজার বয়ে আনে।

এবারে শারদোৎসবের পরে অধরবাবু ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রস্তাব দেবেন, সপ্তাহে একদিন পাঠশালায় তিনি গান শেখাবেন। যদি হয় তো কিছু আসবে, না হয় বিনা পয়সায়ই শ্রম দেবেন। এতদিন কেন পরিকল্পনা মাথায় আসেনি, ভেবে পান না অধরবাবু।

বাচ্চাগুলো একপায়ে কাঠাকুর মত লাফিয়ে নাচে। দর্শক জোটে বহু। তারা বাৎলে দেয়, "উহুঁ, হচ্ছে না। আর একটু হাত নাড়ো জোরে জোরে। কেটে যাও পাশে। রসু, গলা ছাড়।"

মধ্যে মধ্যে বাচ্চারা বিদ্রোহ করে। কবিরাজকন্যা ছুটে একটা হরলিক্সের কৌটো বার করে অফার দেয়। কম দুধে জোলো চা অধরবাবুকে যোগায়। বেচারী গানে বাজনার দক্ষ নয়। কিন্তু অভিভাবকেরা চান, দিদের পোষাক পরে, জরির ঝোপনা ঝুলিয়ে অন্ততঃ একদিন তাঁদের বাচ্চারা মঞ্চে উঠুক।

কবিরাজকন্যার সময়াভাব ঘটায় বাধ্য হয়েই আমাকে মৃগেনবাবুর শুশ্রূষার কিঞ্চিৎ ভার নিতে হয়েছিল। এখানে সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। করে কে?

সেদিন রাত্রে মৃগেন মল্লিকের হঠাৎ পেটটা কেঁপে উঠল। একে নিঃশ্বাসের কষ্ট, তায় উক্ত অবস্থা। দৃশ্য অবর্ণনীয়।

আমি সন্ধ্যাবেলা মল্লিক মশায় ভালো আছেন দেখে বাড়ী ফিরে মামাকে রিপোর্ট দিয়েছিলাম। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে মামা শুতে গেছেন।

আমি মুরলীর খাঁচার তলাটা সেরে বাড়ি গোবর ঘরে, হঠাৎ দেখলাম কুচো বাংলোর উঠে মুড়ো চালের একটা ভাঁড়, কাগজ-আঁটার আটকানো লণ্ঠন হাতে উর্ধ্বশ্বাসে আসছে।

"চল মোকে সাথ। ডাগতার সাবকে ডাঁকুছি।"

হাঁপাতে হাঁপাতে চাকরটি ছুটে এসেছে ঘরামাঘা

"কি হল, কি?"

শুনলাম বাবু যেন কেমন-কেমন করছেন। এক্ষুণি আমাদের যেতে বলেছেন ওঁরা। ডাক্তার নারায়ণ মিত্রকেও খবর গেছে।

আমি এত রাত্রে প্রথমেই মামাকে না তুলে, নিজে আগে দেখতে গেলাম।

সত্যিই অবর্ণনীয় দৃশ্য। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় যুগেন মল্লিকের প্রাণ বোধ হয় এখনই চলে যাবে। পেট বুদ্ধের মত স্ফীত।

নারায়ণ মিত্র বিপন্ন ভাবে বসে আছেন মাথার শিয়রে। মল্লিকগৃহিণী ঝুঁকে হাত বোলাচ্ছেন।

পাগলের মত পাপড়ি এল ছুটে, "কই, আপনি একা কেন?"

আমি কী কোন কাজই পারব না? কেবলমাত্র মামার মূল্যে আমার মূল্য? এতদিন একাগ্র সেবার পরেও যুগেন মল্লিকের মেয়ে আমাকে একেবারে 'এলেবেলের' দলে ফেলল না কি?

মল্লিকগিন্নীও সজল অনুযোগের চোখে তাকালেন।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "রাত হয়ে গেছে। মামা শুয়ে পড়েছেন। আগে আমি দেখে যাই। কি হয়েছে? তেমন-তেমন দেখলে—"

বাধা দিয়ে পাপড়ি আমাকে সগর্জনে বলল, "তেমন তেমন—আপনি কি দেখছেন না? দেরী করার সময় আছে আর?"

দেবকীর মুখ লাল টক্‌টকে, চুলগুলো যেন উন্মাদিনী কালিকার ভঙ্গিতে ছড়ানো। বুড়ো বাবা, তার কিছু, তাঁর যদি মৃত্যুই ঘটে, তাহলেই বা এমন করে কে?

মেয়েটি যেন কেমন? আদরের ডাকনাম 'পাপড়ি' যেন ওকে মানায় না মোটে। কংস-কারাগারের দেবকীর মত রহস্যময়ী সে, দ্বিতীয় কৃষ্ণের জন্মবাসনায় উদ্বেলিতা হয়তো আবার কোন অবতার তার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবে। তাই দেবকী সাধারণের কলোচ্ছের নিজস্ব কোন মন-অভিলাষে রহস্যময়ী। আমাকে সে এখন তাচ্ছিল্য করে না ঠিক, কিন্তু কোন মর্য্যাদাও দেয়না। মামাকে এনে দেওয়ার মধ্যে আমার অবদানের গুরুত্ব সে দেয়না। আমার কাছ থেকে যে-কোন প্রয়োজন অনায়াসে নেয় সে। ধন্যবাদটাও দেয় না কখনও। অবশ্য আমি কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রদান করিনা। তবু মামার স্নেহযোগ বা ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রের মত আমার নির্ব্বাক-নিস্পৃহতার উপস্থিতিকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বলে নিলে দুঃখ পাই।

আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পাপড়ি কেঁদে ফেলল, "কি হয়েছে? আমিই বুঝি বাবাকে মেরে ফেললাম। খাবার বেশী হয়ে গেছিল।"

আমি সান্ত্বনা-প্রদানের প্রয়াস পেলাম "যদি বেশী হয়েই থাকে, তাতে বলার কিছু নেই।

মানুষের হাত মেশিন নয়। দিনরাত আপনি খেটে যাচ্ছেন। এরা আপনার ওপরে এতবড় রোগীর সমস্ত চিকিৎসা নির্ভরিত হচ্ছে। মাথা ঠিক থাকেনা।"

"কিন্তু আমার মাথা—আমার মাথা গেলে যে আমার কি হবে আপনি না আপনার মায়াকে শীগ্‌গির বিয়ে আনুন। পায়ে ধরছি।"

আমাকে স্তম্ভিত বিস্মিত করে মল্লিকা দীপ্তা পাপড়ি হঠাৎ দুহাতে আমার পা জড়িয়ে ধরল। মল্লিকগিন্নী চোখ মুছলেন। নারায়ণ ডাক্তার মাথা নাড়িয়ে বললেন।

কঠিনার হাত এত কোমল!

আমি তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিতে ওর হাত ধরলাম। সমস্ত পৃথিবী আমার চোখের সম্মুখে কাঁপছে তখন।

মৃণাল মল্লিকের দিকে চেয়ে বুঝলাম, সত্যি দেরী করা চলবে না।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেয়ে মামার দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে মামাকে টেনে বার করলাম। মা খাটের ওপর একটা কোঁট ফেলে কোনমতে উপস্থিত হলেন।

নাড়ি ও বুক চক্ষের নিমেষে দেখে মামা ডাক্তার মিত্রকে আদেশ দিলেন,' ইন্যা

তারপর সারা রাত্রি ঘরে যুদ্ধ চলল।

পাম্প লাগিয়ে মৃণাল মল্লিকের পেট খালি করে তাঁকে বস্তি দেওয়া হল। ঔষধটি নামাবে, তার জন্য সময় দিতে হবে কাউকে ট্রেনে। রাত্রি প্রায় তিনটে তখন।

মামা আমার দিকে তাকাবার পূর্ব্বেই আমি বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি!"

পাশের খুপরি ঘরখানায় পাপড়ি ঢুকে গেল, টাকা আনতে বোধ হয়। আমিও গিয়ে গেলাম।

কোণের জলচৌকীর উপর মল্লিকগিন্নীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাঙ্গের পট ও পুতুলের গায়ে সিঁদুর চন্দন ও ফুল। তামার কুণ্ডে-কুণ্ডে টাট ও কোশাকুশী।

সেখানে মাথা কুটছে পাপড়ি,—"তোমরা কিছু নও। তোমরা শুধু পুতুল, পুতুল!"

কবিরাজকন্যা এসে হাজির হয়েছেন শুষ্ক মুখে। আরও দু'চারজন খবর পেয়ে জড়ো হচ্ছেন একে একে।

কবিরাজকন্যাকে পাপড়ির কাছে ডেকে দিয়ে আমি টর্চ্চ নিয়ে অন্ধকারে রওনা হলাম সাড়ে তিনটের লোক্যালে। সময় নষ্ট করা চলবেনা।

ঔষধপত্র কিনে ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। সকাল শেষ হয়ে গেছে। সোনার রোদ সকলের ঘরে ঘরে সোনা বিছিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট কদমা-বাগানগুলো বারান্দার বেড়া ঘেরা রোদে হাত পা মেলে হাসছে, বাচ্চাদের আনন্দে।

মাছওলা মোড়ে মাছের ঝাঁকা মাথায় অদ্ভুত হয়ে গেল আমার আগে-আগে। আজকাল এখানে একটু জীবন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দু'এক ঘর উদ্বাস্তু কলকাতায় স্থান না পেয়ে এখানে বাসা বেঁধেছেন। এখান থেকেই অফিস করেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েগুলো কবিরাজকন্যার পাঠশালায় যোগদান করায় তবু পাঠশালাটি চলছে।

ডিনওলাও ঘুরছে দেখলাম। গোয়ালা আগেই চলে গেছে। অবহেলার শিথন ধীরে ধীরে যখন সময় পায়, ঘুরে যায়। তবে আজকাল পূর্ববঙ্গের বাঙাল বাসিন্দেরা গোলমাল করেন, চিঠিপত্রের বেরী দেখলে। ওঁদের চিঠিপত্র আসে ঘনঘন।

আজকাল আবহাওয়ার ঘুনস্ত উপত্যকা যেন নিজ রূপ ও রং বদলাতে চায়। হিমন্ত আলস্য গেছে চলে। পুরানো বাতাস এখনও বয়ে যায়। তবে সোনালী রোদ্দুর যাই-যাই করছে। বিদেশী শক্তি কিনে নিয়েছে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। কবে যা ক্রেন এসে মাটী খুঁড়ে তুলবে।

দূরে সরে বাসা নিলেও উষার পরিবার কলোনীর গানে উচ্চগ্রামের তান লাগিয়েছে। ফুল ফোটাতে চায়না তারা, নিজের নিজের বাগানে তরকারীর চাষ করে থাকে। কুনড়োর ফুল, সজনের ফুল তাদের অতিশয় প্রিয়, রজনীগন্ধা বেল রেখে লাভ নেই।

ভয়ে ভয়ে পথ চলছিলাম। সাড়ে চারঘন্টা কেটে গেল। জানিনা পাপড়ির বাবা আছেন কিনা। পথে লোকচলাচল তেমন নেই এখনও। আমি যেন সেই পুরাণখ্যাতে হনুমান, সঞ্জীবনের শক্তিশেল নিবারণে সুদূর থেকে ঘোর রজনীর প্রহরে বিশল্যকরণী খুঁজে ফিরছি। বাড়ীর জানালায় চোখ রেখে দেখছে সকলে। আমার প্রতি পদক্ষেপের তালে তাল রেখে যেন বাড়ীগুলো প্রতিধ্বনি তুলছে, "রবি অষুধ নিয়ে এসেছে। রবি অষুধ নিয়ে এসেছে।"

মনটা সুস্থ ছিলনা। পিতার মৃত্যু সামনে নিয়ে পাপড়ির তথাপি মায়ার জন্য ব্যাকুলতা চোখে পড়ার মত। ঘরে দুধ নেই। রুগ্ন পিতার হরলিক্স্ দিয়ে এককাপ চা এনে মায়ার হাতে দিয়ে খাবার জন্য পেড়াপেড়ি করছে। আবার মামা খাচ্ছেন দেখে পাখা করছে।

আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মামার কষ্ট হচ্ছে এত রাত্রে আচমকা ঘুম ছেড়ে রোগীর ঘরে এসে। মামার মত ডাক্তার গভীর রাত্রে বিনা পয়সায় উঠে এসেছে। অর্থের সামর্থ্য না থাকলে সমাদর দেখানো উচিত।

কিন্তু ইদানীং পাপড়ি যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। আশ্চর্য্য, মামা কিন্তু বেশ প্রসন্ন। মল্লিকগৃহিণী চির সন্দিগ্ধা। কিন্তু এখানে মহা সমস্যা। মেয়ে এমন একটি ব্যক্তিকে হাত করলে ওঁরই লাভ।

এসব কথা মনে করাও অনুচিত ভেবে তৎক্ষণাৎ চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছি।

কিন্তু আমার দেবচরিত্র—চিরকুমার মামার মনে কাজল আগল নাকি? হাসিহাসি মুখে পাপড়ির সঙ্গে গল্পে যথেষ্ট অভিরুচি দেখা যায়। রেণুকার কথা ভুলে গেলেন বুঝি?

আমার সুখী হওয়া উচিত। আমি রেণুকাকে ভুলিয়ে দিতেই চেয়েছি। মামার সুখ গড়ে তোলার জন্যেই আমি এখানে আছি।

কিন্তু এত বয়সে একটা ছোট মেয়েকে মামার আমল দেওয়া অসঙ্গত। তবে সেবায় সকলে তোলে দেখি।

যাই হোক, মনের অবাঞ্ছিত চিন্তাকে চাপা দিয়ে পেছনে সরিয়ে মনটাকে সুখের সাজে সাজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু ভোর রাত্রে একটা ঘুম ঘোরে মানুষের ওপর বিশ্বাস থাকতে চায় না।

খুপড়ি ঘরখানির মধ্যে মামা হরলিক্সের চা খেতে ঢুকেছেন। ডাক্তার নিজ বাড়ী গেছেন একটা ঘুম আনতে। কবিরাজকন্যা ও পাপড়ির মা রোগী দেখছেন।

আমি প্রথম থেকেই রাত জাগছি। কিন্তু আমাকে একবার হরলিক্স্ চা দেবার কথা পাপড়ি মনে করেনি।

নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার সাধনায় সে ব্যস্ত। জীবনে কাঠিন্য এসে গেছে। আমাকে অবজ্ঞা তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি দোষ দেইনা। মানার ভয়ে ভিন্ন আমার অন্য দেবেশ নেই। ভেবেছিলাম একবয়সী আমরা, বন্ধুত্ব হবে। এখানে কথা বলার লোক না পেয়ে মরে যাচ্ছি। বাংলার নোটগুলো ওর কাছ থেকে নিয়ে নেব। ও যদি এক-আধটু সাহায্য করে, সামনের বছরে এম. এটা দিতে পারব। কিন্তু পাপড়ি আমাকে মানুষ বলে মনে করে এমন পরিচয় পাইনি। মৃগেনবাবুর সেবা করে যাই কর্তব্যের খাতিরে মাত্র। নইলে অমন অহঙ্কারী মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতাম না।

দেখলাম হরলিক্স্-চা টেবিলে পড়ে আছে। পাপড়ি মামার গলা জড়িয়ে, বুকে মুখ। মামার মুখ দেখতে পাওয়া যায় না, দরজার দিকে ফেরানো।

চোরের মত পালিয়ে এলাম।

বিশল্যকরণী হাতে ফিরতে ফিরতে ভাবছি। সকলে পুরুষ জাতিকে দোষ দেয়, একদিক দিয়ে ঠিক বলে। আমি চটে যেতাম। মামার উদাহরণ দেখাতাম। মিলন হয়নি মামার বেবুফার সঙ্গে, কেবল মাত্র ভাবমিলন হয়েছিল। তবু তাঁর সন্তার ভাবমিলনে বিস্মৃতা অপূর্ব।

এখন! এখন!

তবে আমি খুশী হচ্ছি না কেন?

মামার বাগানে ফুল তোলাতেই আমি তো এসেছি।

বিরস মনে যত শীঘ্র সম্ভব বুড়ো বাংলোয় পৌঁছলাম।

পৃথিবীর মানুষের জীবনে কেবলমাত্র একটা বস্তুই আছে। তাই নিয়ে সিনেমায় উল্লাস, থিয়েটারে উৎসাহ। সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র আদিদেহের পূজারী। দোষ কারুর নেই। মানুষ নিজেই যদি নেমে যায়, তবে মানুষকে নিয়েই সর্বপ্রকার সৃষ্টি যারা করে থাকে, তাদের দোষ দেব কেমন করে?

তবু পিতা নরোনমো, ডাক্তারের রোগী যায় যায়, এহেন সময়ে পাশের ঘরে—! আমার দেবচরিত্র মামা! চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না!

মৃগেনবাবুকে অপেক্ষাকৃত ভালই দেখলাম। ঔষধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসতে ছিলাম। ওখানে একদণ্ড থাকার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। এক রাত্রের মধ্যে আমার জগৎ ধ্বসে গেছে।

মল্লিকগৃহিণী বাধা দিলেন, "এককাপ চা খেয়ে তোমাকে যেতেই হবে, রবি। হরলিক্সের চা তখন তুমি খেতে পারবে না বলে পাপড়ি তোমাকে দেয়নি।"

মনে মনে ভাবলাম: সে তো বটেই। মেয়ে তোমাকে বোধ হয় তাই বলে বুঝিয়েছে। আসল কথা, ওর আমার কথা মনে ছিল না। সে রসে মজেছে।

প্রবৃত্তির বলিহারী যাই। ওই বুড়োর গলা ধরলি? অবশ্য আমারও পা ধরেছিল। কিন্তু কী উল্টোপাল্টা বুদ্ধি! মামার পা ধরে, আমার গলা ধরাটাই স্বাভাবিক ছিল।

মামার এমন অধঃপতন!

থাকলে, আমি কয়েকদিন পরে চলেই যাবো। পাপড়ি যেন মামার লেপ্-তুরঙ্গের খবরদারী করে; বৃত্যগোপালকে রাঙা বলে ডেকে; আর মামার বাগানে ফুল ফোটায়।

আমার অসুখী মামার সুখ হয়েছে ভেবে শান্তিতে থাকব।

মল্লিকগৃহিণী আমাকে পেছনের বারান্দায় নিয়ে এলেন, ওঁদের রান্নার এলাকায়। সংসার অন্তে শান্তি নেমেছে। মৃণেন মল্লিককে দুটো কেক্ দিয়ে চলে গেছে। বাড়তি লোকেরাও চলে গেছেন যে-যার ঘরে। মৃণেনবাবু নিদ্রাগত।

বারান্দায় এসে গা জ্বলে গেল। সেখানেও ঘুগল উপস্থিত। মোড়ায় বসে আছেন মামা। ওঁর গা-ঘেঁষে পাপড়ি। মুখে হাত ঢাকা। বাবা ভাল হয়ে গেছেন, তবু জাকামীর কান্না যায় না!

মামাই বা কেন এত সহজে রেণুকাকে ভুলে এই মেয়ের বয়সী মেয়েটাকে নিয়ে মত্ত। মামার কাছেও আদর্শ নেই, প্রেমের সম্মান নেই।

আমাকে দেখে মামা তিলমাত্র অপ্রতিভ হলেন না। মানুষ যখন তলিয়ে যায় তখন,—'ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, তিন থাকতে নয়।'

আমার হাতে চা দিয়ে মল্লিকগিন্নী বলেন, "আবার কাঁদছে!"

"বেশুন তো। পাপড়ি, শোন, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। এযাত্রা তোমার বাবাকে আমি সারিয়ে তুলব। কথা রেখেছি। তবে তুমি এখনও কাঁদছো কেন?"

"কাঁদছি"— ভাঙা সুরে হাতের আড়াল থেকে সে বলল, "কি হয়ে যাচ্ছিল। ভবিষ্যতে আমার কী হত? মুখ তুলে দাঁড়াতে কী পারতাম?"

মল্লিকগৃহিণী মাথা নাড়লেন। আমি বিস্মিত। কঠিন মেয়েটি ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে যা মনে হয় বলছে। আজ আপাদগোড়া ওর ব্যবহারটা বিস্ময়জনক। কর-বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে কোন মেয়ে যত আঘাতই পাক, এমন পাগলের মত করে না। অথচ মা-মরার বিশেষ ভক্ত বলেও মনে হতনা ওকে। দূরে দূরেই থাকত। রাতারাতি যেন পিতৃপ্রেমে ক্ষেপে উঠেছে!

মনে মনে হাসলাম। মামাকে ভোলাবার এক চেষ্টা মাত্র।

আমাদের চা খাওয়া হল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এখানে বেশীক্ষণ থেকে মামার সুখে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়।

মামা ডাকলেন, "দাঁড়া রবি, আমিও আসছি।"

আমি মুখ ফিরিয়ে আগে বারান্দা থেকে চলে আসতে প্রস্তুত হলাম। বিদায়ের সুকোমল ভাষা আমার কানে যেন না-ই আসে।

কিন্তু আমারি দু'কান ভরে সেই বাণী শুনতে পেলাম। মামার গলায় অতি মধুর অতি কোমল সুর শুনলাম। মামার গলায় যে এমন মধু আছে তাতো জানিনি।

শুনলাম মামা বলছেন আদরে-গলা গলায়, "পাগলী মা আমার! শান্ত হয়ে মান খাওয়া করো। ভয় কি, মা? তোমার এক বাবা না হয় অসুখে পড়েছেন। আর একটি বাবা তো পাশে দাঁড়িয়ে।"

সমস্ত আকাশ-বাতাস ভরে গেল সেই কথায়। মুহূর্তে সূর্যের আলো হীরার ধারে হেসে উঠে সারা পৃথিবী ঢেকে দিল। অদ্ভুত নিষ্ঠুর ফুল অলকো ফুটে উঠল।

আমার দেবতা ফিরে এলেন।

আরও এক উপলব্ধি তীক্ষ্ণ অগ্নির ধারে আমাকে কেটে দিল।

কেন আমি সন্দেহকাতর রাত্রি বুকে রেখে বেড়িয়েছি? কেন বয়স্ক পুরুষের তরুণীর প্রতি স্নেহকে স্বাভাবিক সহজরূপে নিতে পারিনি?

আজই গভীর রাত্রে সুকোমল একটি স্পর্শ আমাকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। আমাকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে।

রাত্রির শাখার ফুল ফোটে কত শত। অনেকে তুলে নেয় পরার পরে।

জীবনের পথে অনেক করুণা। অনেকে জল পান করে।

আমার গায়ে সেই স্পর্শ অনুপরমাণু উদ্দীপ্ত করে প্রেমে আমাকে নবজন্ম দিয়েছে।

## চতুর্থ কাণ্ড

"তুমি একটা দারুণ বোকা। হ্যাঁ, প্রথমে তোমাকে অপদার্থ মনে হয়েছিল, স্বীকার করি। কিন্তু পরে কী তাই ছিল না কি?"

শেষ প্রান্তে কলোনীর একটা পুকুর আছে। কেউ হয়তো সেখানে কখনও লাল শাপলার ফুল ভাসিয়ে থাকবে। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ফুল পুকুরের জল গ্রাস করে ভাসছে। পানার সবুজ রীনায় আরও শোভা খুলেছে।

বর্ষার শেষ হয়ে শরৎ জলে স্থলে। তাই চারদিকেই বর্ষাধোওয়া পাতায় পাতায় সোনালী রোদের আভা। গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে ভ্রমরা।

পাপড়ি সেই জলার ধারে বসে অনর্গল কথা বলছে। আমরা বিকেল বেলায় বেড়াতে চলে এসেছি।

পাপড়ির বাবা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তবে চলাফেরার বল পান না। বাড়ীর সামনে চেয়ার পেতে বসেন। অবশ্য নিজের কাজকর্ম নিজেই করতে পারেন।

পাপড়ি এখনও ফিরে যায়নি। ফিরবে। কারণ এটা তার পরীক্ষার বছর। ছাত্রীদেরও কতদিন না পড়িয়ে রাখা যায়? শেষে যদি অন্য শিক্ষিকা রেখে দেয়, বিপদ ঘটবে।

প্রথম দেখার দিন আধুনিকা বলে যাকে মনে হয়েছিল, সে এখন ঘরোয়া মেয়ের বেশে পাশে বসেছে। কালো চুলে খোঁপা, শাদা করে শাড়ী পরা।

পাপড়ি বলছে, "দেখ রবি, কতকগুলো কারণে আমি মানুষ সম্পর্কে একটু সাবধানে চলি, বুঝেছ? মানে নয়, বিশ্বাসযোগ্য লোককে অবিশ্বাস করে থাকি। কিন্তু দেখ, আমাকে উপার্জন করতে হয় দিনরাত পুরুষের মধ্যে। সর্বদা যথা উচিত ব্যবহার পাইনা। তাই বিরক্তি বোধ করি সময়ে সময়ে। প্রথমে তোমার আমার সঙ্গে যতটা মিশতে আমাকে হয়েছিল, ভেবেছিলাম অন্য পুরুষের জগতের মত উনিও সুবিধা নেবার চেষ্টা পাবেন। জানো রবি, একবার এক বয়স্ক বুড়ো পর্যন্ত আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু আমি দেখলাম এমন একটি লোককে—। জানোতো কথা আছে, 'নরাণাম্ মাতুলক্রমঃ'। তাবলাম এঁর ভাগ্নে অবশ্য এঁর মতই হবে।"

"হতাশ হলে তো ?" আমি সাগ্রহ প্রশ্ন পাঠাই।

"মোটেই না। তুমি কিছু বুঝতে পারনা। তাই তো তোমাকে বোকা বলি।"

বোকা আমি নই। কিন্তু আমার অনুগ্রহে যেকার জীবন নিয়ে তোমাকে কি বলতে পারি, পাপড়ি ? আজ আমার দিন তুমি ভরে দিয়েছ মনে।

জানি তুমি থাকবেনা পুব হাওয়ার দেশে। দক্ষিণ বাড়ী পাখী তুমি, উড়বে দেশে বিদেশে, দক্ষিণে হাওয়ার দেশে। তবু যেটুকু পেয়েছি তাই শত।

প্রকাশ্যে বললাম, "আমাকে তুমি এত শ্রদ্ধা করো দেখে আনন্দ পাই।"

"ওর মধ্যে কোন সলজ্জ বা কুণ্ঠা কিছু নেই। আমরা চিরদিন মনে একটা আদর্শ চরিত্র এঁকে রাখতে ভালবাসি। কোথায় একটা এ রকম মানুষ থাক। আমরা সেই রকম একটি আদর্শ। এমন লোক আমাদের জীবনে দেখতে পাইনা। কোথাও আছে ভেবেও শান্তি। রবি, তুমিও আমারি ভাবে। হাতটি পর্য্যন্ত ধরতে চেষ্টা করোনি।"

এই যে তোমার হাতখানা ঘাসে আলতে পাড়ে আছে আমারি হাতের পাশে পাপড়ি। সবুজ শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে একগোছা সবুজ চুড়ি হাতে। আমি গুণে দিতে পারি কখানা চুড়ি। চোখ বন্ধ করে আমি বলে দিতে পারি শিরাটি কোথায় দপ্‌দপ্‌ করছে। রবিবন্ধের পাশে তিলটিও আমি চিনি। কিন্তু যে হাত প্রকাশ্য সভায় পাণিগ্রহণে গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখি একদা, কেন অর্থহীন নম্রতায় অথবা আমি সেই হাত অকারণে স্পর্শ করব ? যা দুর্লভ, তাকে সস্তা করে তুলি কেন ?

পাপড়ি বলছে, "নিজের জীবন অন্যের কাজে মিলিয়ে দিতে তুমি পারো, রবি। তোমার সঙ্গে মিশে আমিও সহজ হয়ে গেছি। তোমাকে ধন্যবাদ।"

"চলো, পাপড়ি, বাড়ী যাই। সন্ধ্যা হয়েছে।"

পশ্চিম, আকাশে খোলা প্রান্তরের অনবদ্য বহুবর্ণিল সূর্য্যোদয়। কলিকাতার আকাশ শুধু এরই স্বপ্ন দেখে রংএর রেখায় পূরবীর সুরে। চোখে দেখার ভাষা সে হারিয়েছে, তেরতলা স্কাইস্ক্রেপার তুলে আকাশের গায়ে।

তবু এখানে কমলালেবুর বাগান দেখি আকাশে। কাঁচা ডালিমের গন্ধ ওঠে ; জবর হাজরার বাগানের ধার ঘেঁষে যখন চলি। জগমোহিনীর বাড়ী থেকে চাঁদের আলো জলে ওঠে সোঁদাগন্ধভরা মাটীর কানাচে, দুই চাঁপা ফুলে ওঠে পঞ্চানন প্রামাণিকের বাড়ীর ফটকের পাশে। জলার জলে লাল সাপলা ফোটে, যেন মানসসরোবরে দুর্লভ অরবিন্দ।

আমি পথ চলি। সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটে। বাতাস গতি পরিবর্ত্তন করে দক্ষিণে কখন আমার পথ এসে পাপড়ির পথে মেশে।

আবছায়া অন্ধকারে শারদোৎসবের রিহার্সেল চলছে। অন্ধকার পূর্ণ করে অধরবাবুর স্বরে কচি রিণ্‌রিণে মিষ্টি গলা মিলছে :—

"খেয়াপাতার নৌকা খড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে,
ভাসিয়ে দেব, ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে—"

পাপড়ি নিজের মনে গুণ্‌গুণ্‌ করতে লাগল :—

"আজ আমাদের ছুটী রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটী—"

আমি বললাম, "একটা ভালো গান গাও না।"

পাপড়ি চাপা গলায় ধরল —

"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়—"

আস্তে আস্তে সুরে সুরে ভরে গেল অন্তরীক্ষ। সুনীল আলোয় শান্ত নিস্তরঙ্গে স্থানটি যেন স্বপ্নের দেশ। এখানে গতি নেই, ব্যগ্রতা নেই, ক্ষোভ নেই। সুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরপুর হয়ে আছে।

আমার গন্ধর্বলোক।

বাড়ীর কাছে প্রায় এসে গেলাম। তখনও পাপড়ি অতি মৃদু, কেবল আমাকে শোনাবার গলায় গেয়ে চলেছে :—

—"কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়॥
• • • • আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।"

আমার মনপ্রাণ ধীরে ধীরে এই গানে ভরে গেল। চাপা আলোয় পথ চলা চাপা গানের তালে তালে, বোধ হয় জীবনে এ পথচলা শেষ হবে না। অক্ষয়-অনন্ত করে ধরে রাখি মুহূর্তটি।

এখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই, কাম নেই, গতির অভিশাপ নেই। শুধু আছে পাপড়ির গলায় গান।

প্রেম এখানে দেহ থেকে দেহাতীত রূপ পায়। সব বিক্ষেপ শেষ করে দেয় অবগাহনের শীতলতায়। দক্ষিণের উষ্ণতা পুরানো বাতাস দিনদুয়ারে জমিয়ে রাখে অনন্তের কাছে। প্রেম হয় কসিল—ফুল বা পাতা ঝরে শক্ত হয়ে চিরস্থায়িত্ব পায় এখানে। ধ্বংস নেই, কিন্তু প্রাণই বা কোথায়?

এখানে প্রেম তার শেষ প্রহর বিছায়। যদি এখানে প্রেম অস্তগত করে, তার শেষ থাকে না, অশেষ হয়ে ওঠে সে। কোন পরিবর্তন সে গ্রাহ্য করে না, সময়ের শাসন সে মানে না। সময়ের এখানে কোন মূল্য নেই। যুগান্ত উপত্যকার শিকড়ে শিকড়ে সহজ আসক্ত। পদ্মমধুর অধিত্যকার পায়ে পায়ে তন্দ্রা। ভক্তির বুক পূর্ণ করে অন্নাব মুক্তা। একটি অনুভূতি সময়ের ভক্তিকে পূর্ণ করে মহামূল্য করে তোলে।

মিলন এখানে হয় ভাবমিলন।

রেণুকা বরাটের বাড়ীর সামনে দিয়ে পথ গেছে কুচো বাংলোয়।

রেণুকা বরাটের বৌদি অনেকগুলো ঝি-চাকরসহ বাড়ীতে এসে বসেছেন। ভিনকুলে কেউ নেই তাঁর। দীর্ঘজীবন কেবল বিড়ম্বনা।

মোটা বাড়ীখানি অন্তভাবে সাজানো হয়েছে বহু অর্থ ব্যয়ে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলার রুচির এখন ধনবতী বিধবার প্রাসাদ।

টবের ফুলের গাছের পাশে তুলসীর চারা বসেছে। পূজোর অস্তিত্ব নেই, সেখানে সাড়ী-বারান্দা করা হয়েছে। পেছনের বাগানে অবাগাছে, বেলগাছে। দেবপূজার প্রস্তুতি।

মামা এদেও এ রাস্তা দিয়ে হাঁটেন না। কাছে এগিয়ে এসে শুনলাম—এখানেও গান। কিন্তু কীর্তন। কলকাতার দল এসে গান গাইছে। অনেক লোক জমা হয়েছে। জগমোহিনীর সিপাই আসরে না ঢোকেন বরং।

কীর্তন নগরগ্রামে অনিবার্য বাধুর? রাধাকৃষ্ণ এখানে ফুলনে খোলেন না, কাগে আবীর খেলেন না। এখানে চিরন্তনী রাধা কৃষ্ণের চির বিরহে বিরহিনী। সমস্ত পালাই এখানে মাথুরের পালা।

"আজ ভারী জমাট দেখছি।"

পাপড়ির গান কীর্তনে হারিয়ে গিয়েছিল। সে উত্তর দিল, "আজ সখী-সম্মেলন হয়েছে। তাই চারুবালা দেবী কলকাতা থেকে পালাগানের দল আনিয়ে উৎসব করছেন।"

"সখীসম্মেলন মানে?"

"মানে, জলার ওধারের দুখানা ঘরে মালতী দেবীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছে, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে। আমার মনে হয়, এই আশায়ে চারুবালা এখানে এসেছেন শহর ছেড়ে।"

পাপড়ি আমাকে গল্পটি শোনাল। সংক্ষেপে বলছি।

চারুবালা দেবীর বাল্যবন্ধু ছিলেন মালতী। উভয়ের প্রায় একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। মালতী ও চারুবালার স্বামীরাও একত্রে মেলামেশা করতেন। নিঃসন্তান মালতী অকালে বিধবা হলেন। চারুবালারও ছেলেপিলে হল না। বন্ধুত্ব প্রবল হল আরও।

অকস্মাৎ দেখা গেল রেণুকা বরাটের দাদা, চারুবালার স্বামী মালতীর সঙ্গে প্রণয়বদ্ধ। মালতী চারুবালার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন। কিন্তু স্বামীকে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হল চারুবালায়। মালতীকে বাড়ী করে দিলেন মিষ্টার বরাট, বোনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে। প্রাসাচ্ছাদনের পাকা ব্যবস্থাও হল। কিন্তু মিষ্টার বরাটকে আগেই বিদায় নিয়ে পাপপুণ্যের হিসাব দাখিল করতে যেতে হল পরলোকে।

এতদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ ও বিদ্বেষ শত্রুতার পরে কেমন করে দুই বন্ধুর শেষ বেলায় মিলন হল পাপড়ি বিশদভাবে জানে!

কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

পাপড়ি বলল, "দেখছো, কেমন করে গল্প এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এখানে কত কাহিনী আছে, না?"

আমি বললাম, "এখানে সকলেরি সময় প্রচুর। তাই ঘরে ঘরে কাহিনী তৈরি করার সময় পাই আমরা। শহরের অলিগলি ভরা গল্প। তৈরি করার সময় নেই কারুর।"

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে এলাম আমরা। কীর্তনের সুর কানে আঘাত করে গেল :—

"কো কহ আওব মাধাই?
বিরহতরঙ্গ পার কিএ হোওব,
মঝু মনে নহি পাতিয়াই। ● ●
মাস মাস করি বছর গোওয়ানু
দিবস দিবস করি মাসা—"

উগ্র খোলের বাস্তে রেণুকার বরষার পরিপূর্ণ।

পথে দেখলাম বীরেনবাবু যাচ্ছেন কীর্তনের আসরে। আমাদের দেখে হেসে ঘাড় নাড়লেন।

পাপড়ি বলল, "বীরেনবাবু আমরা বাড়িয়ে বেশী কিনবার চেষ্টা করছেন। কাষ্টমারী হলে হাত থেকে যাবে জানিস। তাই এখনি লাভের চিন্তায় ব্যস্ত। কিন্তু রবি, ভালো হবে কি? এ জায়গাটা অন্য রকম ছিল। এখানে ব্যবসায় করতে চাইত না কেউ। সমস্ত লাভক্ষতির হিসাব মিটিয়ে কেবল যেন বাস করতেই আসত। এখন বয়সভাতার আওতায় দাবিরে নিজের বিশেষত্ব না যায়।"

আমি উত্তর দিলাম, "সে তো যাবেই। কিন্তু ভালোটাও দেখ। সভ্যতার সুযোগ সুবিধাটাও তো পাওয়া যাবে। পথঘাট ভালো হবে, দোকানপাট বসবে। তোমরা সিনেমা দেখতে কলকাতায় ছুটবেনা। তুমি এখানে স্কুল কলেজ চালে বাড়ী বসেই কাজ করতে পারবে। কত সুবিধা, দেখ।"

"কিন্তু আমার ভালো লাগবে না। আমি শহর থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে এমনি একটি জায়গা রাখতে চাই। আমার আসবার জন্যে কোথাও এমন একটা আশ্রয় চাই।"

আমি হেসে বললাম, "অত পলায়নী মনোভাবকে আমি সমর্থন করি না। স্বপ্নকে অত দূরে সরিয়ে স্বপ্ন করে না রেখে বাস্তবে মেশাতে শেখো। আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে।"

পাপড়ি ঠোঁট টিপে বলল, "উহুঁ কাল নয়, তিন দিন বাদে।"

"তি—ন—দি - ন! কেন?" কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়াতে লজ্জিত হয়ে হাল্কা সুরে বললাম, "ব্যাপার কি, পাপড়ি?"

"কিছু না। এখানে থাকবো।

"কোথায় যাবে?"

একটু ইতস্তত করে বলল, "কালীঘাটে যাবো।"

"পুজো দেবে বুঝি? বাবার মানত ছিল?"

"মানত আমি করি না, রবি। মা-বাবাকে নিয়ে যাবো।"

আমি অবাক হলাম, "বাবাকে নেবে কেমন করে?"

"ট্যাক্সি ঠিক করেছি।"

"এতগুলো টাকা খরচ করবে!"

"রবি, যত টাকাই খরচ হোক, আমাকে করতেই হবে।"

গলার সুরের তীব্র দৃঢ়ত্ব শুনে চমকিত হয়ে লক্ষ্য করলাম। প্রথমদিনের কথায় মাথায় সিঁদুরী আজ শাদা শাড়ীর মেরে ঘরের মেয়ে হয়ে কাছে এসেছে। কংস কারাগারের রহস্যময়ী

দেবকী কৃষ্ণমন্ত্রের অভিশাপে অসাধারণ রূপে মুড়ে গড়ে নেই। যে তীব্রতা প্রথম দিনে তার মধ্যে দেখে ভেবেছিলাম, এ তো স্বতন্ত্র, সেই তীব্রতা দিনে দিনে সাধিকা হয়ে গেছে। তবু এখন মনে হল, এর একটা কি যা রহস্য আছে।

বললাম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।"

এবারে অন্য রকম করুণ পাপড়ি, কি যেন বলে

"তোমাকে বলব, রবি। তিনদিন পরে এসো।"

কুচো বাংলোর উল্টো দিকের সরু গলি ধরে বড় রাস্তা এড়িয়ে আমাদের শর্ট-কার্ট। আমি বিদায় জ্ঞাপন করে গলির মধ্যে পা দিলাম।

দুইদিকে দু'টো বাড়ীর রাংচিতের পত্রবহুল বেড়ার মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা গাছের ঘন ছায়ায় আবৃত। ঝরা পাতায় পা পড়ে মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে। ডালে বসে 'খোকা হোক' পাখী কিচ্‌মিচ্‌ করছে। নানা আকারের শালিক সন্ধ্যার ঘরে ফেরায় ব্যস্ত। কোথায় যেন হাসু ও হানা ছুটেছে। গন্ধ গলিটাকে ভরে তুলেছে।

গলির শেষে কলোনীর পুরোহিত যোগেন গোঁসাইএর ছোট টিনের চাল-ছেওয়া পাকা বাড়ী। গরীব পুরোহিত এখনও বিজলী নিতে পারেননি। ঘরে লণ্ঠনের আলো। চণ্ডীমণ্ডপে মাটীর শিবমুখে মাটীর প্রদীপ জ্বলছে।

চাপা একটা আলো আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবী আলো করে তুলেছে। যা দেখছি, তাই সুন্দর। এমন অন্তরাগে-মাখা জগৎ যেন চেতনা পরপারের বস্তু। প্রতিদিনের হাতে ধরার নয়।

পাপড়ি দাঁড়িয়ে রইল গলির মাথায়, আমার পথের দিকে চেয়ে।

আমি চলে এলাম।

জগৎের মত বুকে ভরে নিলাম ছবিখানি। যে রং কোনদিন উঠে যাবেনা, তেমনি রংএ ছুবিয়ে নিলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি বৃত্যগোপাল মহা চিন্তিত।

চা-এর পরে মামা ঘরে দরজা বন্ধ করেছেন। আমিও বাড়ী থেকে যা'র ঘরে গেছি, মামাও ঘরে ঢুকেছেন। জানলাও ভেতরের কাচে পরদা টেনে বন্ধ। নৃত্যগোপাল সাহস পাচ্ছে না দরজা ঠেলতে, অথচ ভয় করছে বিনা কারণে মামা না অজ্ঞান হয়ে পরে থাকেন। সাবনে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি করে অবশেষে আমার পথ চেয়ে আছে।

"না, না। মামা অজ্ঞান হতে যাবেন কেন? আচ্ছা, দেখছি, দাঁড়াও।"

দরজা ঠেললাম।

একটু পরে মামা দরজা খুলে বেড়িয়ে এলেন। শ্রান্ত, এলোমেলো চেহারা।

"কি হয়েছে? আমি একটু দরজা বন্ধ করে কাজ করছিলাম।"

"মামা, রাত্রে কি খাবে?"

"রাত্রে? কেন, রোজ আজকাল যা খাই। ডুমিস্‌ কলী আর মাংসের স্যুপ্‌।"

"মামা, হাতে আবার রং লাগিয়েছে? কি করছিলে একা—একা? আমি করে দিচ্ছি।"

মামা অপ্রতিভ হয়ে হাত দুটো পেছনে রেখে বল্লেন, ও কিছু নয়। বলার মত নয়।"

আমার মনে পড়ে গেল, ডাক্তার হবার আগে মামা আই স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। শেষ বয়সের শেষ প্রহরে শেষ প্রেম তাহ'লে শিল্প?

হায়, হায়! আমি যে চারিটি ডিস্পেনসারী খোলার প্রস্তাব পাপড়িকে দিয়ে দেওয়ার ভেবে রেখেছি। পাপড়ির কথা মামার কাছে বেমানান।

যাই হোক, মামা কোন কাজে নিযুক্ত থাকলেই মঙ্গল। ইরানীং শূন্য দৃষ্টি মামার কেটে যাচ্ছে।

তবে, ভেবেছিলাম মামা বুঝি বাসী হতেই চান।

যুদ্ধ—মেবার লোক না পেয়ে শেষে কিনা শিল্প? ভালো, তাই হোক। তাই হোক। উৎসাহ দিয়ে বললাম, "চলো না দেখি, কি আঁকছ।"

মামা যেন ভয় পেয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালেন, "ও কিছু না। কিছু না। সামান্য অভ্যাস রাখছিলাম। তুই বোধ হয় জানিস না আমি আসামে একজন লোক রেখে ছবি আঁকা শিখতাম। কতকগুলো স্ক্যাচ্‌ভাস আছে আমার। একদিন দেখাব।"

আমি চমৎকৃত হ'লাম।

"একদিন কেন? আজই দেখাওনা, মামা।"

"থাক, থাক। একদিন তোকে, পাপড়িকে কোথায় দিয়েছিলি? রোজই তো বিকেল বেলায় চলে যাস?"

মামা তীক্ষ্ণ সুনিপুণ চিকিৎসকের দৃষ্টি আমার মুখে ফেললেন।

আমি অনুভব করলাম কান গরম হয়ে উঠছে। বললাম, "পাপড়িদের বাড়ী যাই। ওর সঙ্গে বেড়াতে যাই।"

"ওর সঙ্গে বেড়াতে যাস রোজ? রবি, তোর মুখ লাল কেন? পাপড়িকে কি তুই,—মানে তোরা কি বিয়ে করবি?"

আমি মাথা নামিয়ে রইলাম।

আমার মুখ একমিনিটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর স্বভাবগত উচ্ছ্বাসবিমুখতা অতিক্রম করে।

"বা, বা। এই তো চাই। যেদিন ও বাড়ী পা দিয়েছি সেদিন থেকে মনে মনে মেয়েটিকে চেয়েছি। আমি কালই দিদিকে চিঠি লিখব। না কি; নিজেই চলে যাব!"

"মামা অত ব্যস্ত হোয়োনা। তোমার দিদি খাকুন রক্ষণশীল, তুমি ভালো করেই জানো।"

"আরে, ওরা ব্রাহ্মণ। তাছাড়া অমন মেয়ে দিদি পাবেন কোথায়? তার উপর, তোর পছন্দ হয়েছে।"

আনন্দে মামা অধীর হয়ে উঠলেন।

"মামা, তোমার ভাবে বেকার, বিদ্যার জৌলুষ নেই। তুমি জানো। ওর মা-বাবা কেন রাজী হবেন?"

"আরে তোকে বিয়ে পাগ্লিয়ে ছাপ মেরে আনার। আমার সমস্ত তোদের। আর কি চাস ওঁরা? তোকে আমি আগ্রিকালচার,—উঁহুঁ, এডুকেশন পড়িয়ে আনবে। নার্সারি না হোক, আমরা স্কুল খুলব—বড়দের স্কুল। পাগড়িরা বড় লেখাপড়া ভালবাসে।"

পাগলের মত মামা হাঁকাহাঁকি করতে সুরু করলেন, "বৃহন্নলা আজ পোলাউ চড়াও। সুধিয়া ডিম বা'র করে আন। বাজারে যেয়ে মিষ্টি কিনে আন। কাকে বা নেমতন্ন করি?"

মামা, এখনই নিমন্ত্রণের দরকার নেই। কয়েকটা দিন যেতে দাও।"

এখানে সুখময় পরিণতির উপর যদি বা যবনিকা টেনে দিতে পারতাম! যা আমরা চাই, তাই ঘটে কখনও কখনও বলে উপন্যাস লেখা হয়। কিন্তু বাস্তব অনেকক্ষেত্রে পৃথক হয় আদর্শ থেকে। তাদের মেলানো চলেনা। যাঁরা চান, সুখের সূত্রে শেষ করে নিন আমার গল্পটা।

---

## পঞ্চম কাণ্ড

তিনদিন পরে।

সেই জলার ধারে এসেছি। একটু পরে পাগড়িও এল। আমার হাতে সে একটা প্যাকেট দিল।

"তোমার জন্যে এনেছি।"

খুলে দেখি বাঁশের সুদৃশ্য একটি টেবল ল্যাম্প।

"তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে তৈরি হতে পারো যাতে, তাই জ্ঞানের আলো আলাবার ব্যবস্থা রাখছি।"

মামার উল্লাস পাগড়িকে জানালাম।

প্রথমে পাগড়ির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আবার কালো হয়ে গেল।

"একটা কথা তোমাকে বলব বলেছিলাম, না? আমি কাশীঘাটে গেলাম কেন, জানো?"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"সেখানে একটা বিয়ে হল?"

আমি আমার সংকল্প বিস্মৃত হয়ে মুচ্‌মুচিতে পাগড়ির কচী চেপে ধরলাম, "বিয়ে করে এলে?"

"উঃ, ছাড়, ছাড়। না, না। চুড়ি ভেঙে হাত কেটে গেল যে। 'আমি নয়, আমি নয়। বলছি।"

অপ্রতিভ হয়ে হাত ছেড়ে দিলাম। পাগড়ি ভাঙা কাঁচের চুড়ি ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়তে লাগল, 'উঃ! রবি, তুমি যে এমন একটা হী-ম্যান হয়ে উঠতে পারো, জানতামনা। শোন বলছি।"

লাল পাগলার ফুল শুনে যেতে লাগল। আকাশে সন্ধ্যা তারা কান পেতে রইল। পাগড়ি বলে গেল।

"বাবা বহুদিন গুপ্তদলে রাজনীতি করেছিলেন, জানো তুমি। একবার মেদিনীপুরে মহা বিপদে পড়েছিলেন। একজন কায়স্থ জমিদারের এঁদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তিনিই আশ্রয় দেন।

পুলিশসাহেব গোরা। তিনি রাত্রে হানা দিলেন। আমার বাবাকে বিয়ের বর সাজানো হল, জনে কায়স্থ জমিদারের কন্যা। বিয়ে দেন হয়ে গেছে, বাসরে বরকনে, এমনি করেই সেট সাজানো হয়েছিল। পুলিশসাহেব বললেন, "বেশ। ঘরে বরকনে থাক দরজা বন্ধ করে। আমি পাহারায় আছি।" একঘরে সতী হিন্দু মেয়ে থাকতে পারে কিনা পর পুরুষের সঙ্গে, তাই পরীক্ষা করলেন।

মা পরমা সুন্দরী। বাবার সাধে স্থান চাইলেন।

সকালে পুলিশ চলে গেল। বাবাও উধাও। কিন্তু—আমার জন্ম সূচিত হয়ে গেল। বিয়ের অবকাশ মিলল না।

অনেকদিন জেল খেটে বাবা ফিরে এলেন মায়ের কাছে। দাদামশায় মারা গেছেন। মা সকলের উপহাস কুড়িয়ে আমাকে মানুষ করছেন। চলে এলেন ওঁরা কলকাতায়। দেশ একদিন স্বাধীন হয়ে গেল।

বাবা লৌকিক বিবাহ করলেন না। তিনি বললেন, "ঈশ্বর যে বিবাহ দিয়েছেন, এতদিন পরে মানুষের ঘরে তাকে ক্ষুণ্ণ করব কেন?"

ওখানে থাকতে না পেরে এখানে চলে এলেন ওঁরা নির্বাসনে। মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। আমিও মানুষকে সন্দেহ করতে শিখলাম।

কিন্তু বড় হয়ে সমস্ত জানবার পরে যখন সাহস পেলাম, বাবাকে অনুনয় করতে লাগলাম, যাতে উনি আইন সঙ্গত বিয়েটা করে আমাকে লোকসমক্ষে মর্যাদা দেন। বাবা রাজী হন না। যা মানেন না তার প্রয়োজন কী? তিনি ধর্মে তো ঠিক আছেন। অনেক করে রাজী করার পরে অসুখে পড়ে বাবা যাই যাই হলেন। আমি ভাবলাম বুঝি সমস্ত গেল।

অবশেষে এতদিনে সেই বিয়ে পর্ব হয়েছে কালীঘাটে।"

পাপড়ি আমার হাতের উপর হাত রাখল, "রবি, আমাকে কে নেবে? আমি উপযুক্ত হই আগে, প্রতিভার স্বীকৃতি পাই, তবেই তোমার জীবনে যাবো। সাধারণত অর্জন করতে পারলে তবেই আমার কলঙ্ক মুছতে পারব।"

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

গলির মুখে এসে পাপড়ি বলল, "রবি, কথা বলছ না কেন? যদি আমি জীবনে তোমার কাছে যেতে না পারি, কি হবে?"

অন্তরাগে উদ্ভাসিত আকাশের নীচে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। পাপড়ির কাছে সরে গেলাম, কিন্তু দুর্লভ সেই হাত দ্বিতীয় বার স্পর্শসাহিত করলাম না।

বললাম, 'পাপড়ি, জীবন কি মাত্র একটাই?'

আমার বাবা পাপড়ির জীবন জানতেন, কিন্তু বাবা বলে মনে করেন নি।

তিনি আমার অনুরোধে তাকে সমস্ত খুলে চিঠি লিখলেন।

চিঠির উত্তর এল :—

কল্যাণীয়েষু,

রবির সমস্ত ভার তোমার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। বিবাহের দায়িত্বও তোমার ছিল। কিন্তু এমন একটি বিবাহ তুমি দিতে চাও স্বপ্নেও মনে করি নাই।

তুমি বাহিরে মানুষ হইয়াছ। ধর্ম বা সমাজে তোমার আস্থা নাই। কিন্তু আমার আছে। কন্যার যাহা ব্রাহ্মণ, মাতা কায়স্থ। অসবর্ণ বিবাহের দোষ ছিলই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহা, তাহা জানিবার পরে উক্ত পাত্রীকে বধূরূপে ঘরে তুলিয়া আমি আমার শ্বশুরকুলের অকল্যাণ বা অমর্যাদা করিতে পারিব না।

তুমি জাননা, তিন কন্যার জন্ম দিবার পরে আমার বড় বধূমাতার সন্তানজন্মের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামীর বা পুত্রের দ্বিতীয় ভ্রাতা নাই। এক্ষেত্রে রবির দ্বারাই আমার শ্বশুরকুলের বংশরক্ষা হইবে। পিতৃপুরুষের অসদ্গতি দূর করিবার পূর্বে আমি গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জন করিব।

প্রীমানকে পত্রপাঠ এখানে পাঠাইয়া দাও। উহার অভিভাবকত্ব লইবার ক্ষমতা তোমার নাই বুঝিতেছি। আমি সৎবংশজাতা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছি। আমি স্বামীহীনা, আমাকে পুত্রহীনা করিওনা।

তোমার দিদি"

ছাই-এর মত ফ্যাকাশে মামার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি এখন কি করব মামা?"

"তোর যা ইচ্ছা, রবি। নিজের বিচারের ওপর আমার আর ভরসা নেই।"

"তুমি আমাকে মায়ের ইচ্ছামত অন্যত্র বিয়ে করতে বলো?"

মামা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "আমি—আমি বলব? ঘরে আয় রবি, আজ তোকে দেখাব।"

অনেকদিন পরে মামার শয়নকক্ষে প্রবেশের অধিকার পেলাম।

কোণের ইজেলের ঢাকা ক্যানভাস খুলে দিলেন মামা।

অনিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা, কিন্তু বিশ্বস্ত চিত্র। আমার চিরবিশ্বস্ত মামার আঙুল কি অবিশ্বস্ত হতে পারে?

রেণুকা বরাট।

মামা বল্লেন, "রেখে। আমি কি অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে বলতে পারি?"

স্বর্ণসীতা! বহুদিন আগে এই দেশের এক পুরুষ, এক রাজা এমনি মানসী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে সেদিনের রঘুবংশী নৃপতি বিনা দোষে প্রিয়াকে বিসর্জন দিয়ে চিরকাল প্রেমিক পুরুষের কলঙ্ক হয়ে আছেন।

আমার মামা কত বেশী উঁচে।

শুধু ভাবমিলনের মাধুর্যে আমার মামার ভুবন পরিব্যাপ্ত। আমি এই মামারি ভাগ্নে।

লঘুস্বরে বললাম, "কাল মাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখে ঠাণ্ডা করে দেব। তুমি ভেবোনা মামা। আমরা দুজনে এখনও লেখাপড়া শেষ করিনি। এত তাগিদ কিসের? দেখি কি হয়।"

মামা সেটীতে বসে পড়ে বুড়ো মানুষের মত টেনে টেনে বললেন, "আ—চ্ছা।"

বাহিরে চলে এলাম।

দূরে আকাশে চন্দ্র। শারদোৎসবের গান ভেসে আসছে। চারুবালাদেবীর কীর্তনের দল তিনদিন মাধুরের অন্তে মিলন ধরেছে। রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের অন্তে মিলন সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে গেছে :—

"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলালো ঘরে,
রাধিকারো অন্তরে উল্লাস।"

বাড়ীর বাগানে চলে এলাম নরম ঘাসে পা রেখে, ফুলের রাজত্বে।

এখানে কি দক্ষিণা বাতাস কখনই বইবেনা? আমি ওই নারায়ি তারে। আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বারবার বলছি।

"পাপড়ি, দেখি কি হয়।
দেখি কি হয়।"

---

## পরিশিষ্ট

সে গন্ধর্বলোক হারিয়ে গেছে আবার।

অপরূপ বর্ণসম্ভারে উদ্যান বাগানের ফুলগুলো কখন শুকিয়ে গেছে কাগজের ফুলের মত। বিশ্বব্যাপী রংয়ের ঢেউতে আবার ছোট বাগানবাসির স্থান মেলেনি।

সেখানে দুলছে সোনালী গাঁছের আশ্রয়ে। শেষ প্রহরের শেষ প্রেম সেখানে। সকল হয়ে থাকে ফুলের রংএ পাখীর গানে, চাঁদের কিরণে। মন বারবার ফিরে যায় সেখানে। কনকচাপা স্বর্ণচাপা ফোটে। গন্ধে ভরে যায় অলক্ষ্যের সাজি।

আমার বিরক্তি দিনগুলো ভরে যায় লক্ষ-প্রজাপতির পাখার সকারে। দুর্লভ অতিথ সহসা শুকনো গাছ ঘিরে আসে? চেকে দেয় রসমঞ্জরীর হাসে। যা পাইনি তাকেই তো ভালবাসি। দুরবগাহ্য হয়ে এই মানবমনের অভীপ্সা। কোথায় মিলিয়ে গেল সে রসসাগর? কেন গেল? বহু প্রশ্ন কণ্টকিত হয়ে উঠতে পারে, জানি। কাহিনীর শেষ নানাভাবেই হ'তে পারে, সুব্রতার। তোমার কাহিনী তুমি কত ভাবেই না শেষ করো।

আমাদের চাওয়ার সঙ্গে কোন মিল থাকেনা।

মামা হয়তো রোগগ্রস্থ হয়ে এক মিনিটে সমস্ত বিক্রয় করে চলে গেলেন বিদেশে চিকিৎসায়। আমি পুনর্মূষিক হয়ে ফিরে এলাম গলির বুকে। ততক্ষণে সেই গলি আমার কাছে অচেনা হয়ে গেছে।

সুব্রতার, এক কথায় কাহিনী তুমি শেষ করে দিতে পারো।

মামা হঠাৎ বিগত হলেন। দেখা গেল দেনা আছে। বিকিয়ে গেল সমস্ত।

অবলা, যা ছিল, তাহীরার ঘুটে ভাগ হয়ে তয়াংশে পরিণত হল। আমার দাদা মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাদের ভাগের টাকা নিয়ে তেলকল খুললেন। পিচ্ছিল সিমেন্টে পা রেখে, নোংরা আবহাওয়ায় আমি কখনও উন্মনা হয়ে দূরের দেশ ভাবতাম, যেখানে এখনও অযুত নিযুত ফুল ফুটে আছে।

সুব্রথার, এমন শেষই তোমার সুতোর টানে অবিরাম এঁকে যাও তুমি।

তবু তোমাকে বলি জীবন দেবতা!

অথবা আরও বাস্তবে, আরও স্বাভাবিকে তুমি নেমে আসো। সুখময় পরিণতি এঁকে যাও

তোমার মুখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তৃপ্ত চোখে ঊর্ধ্ব থেকে নীচে তাকাও তুমি যেখানে সিনেমার ওই কিউ দিচ্ছে তোমার হাতে-গড়া মানুষ। তারা এমনই পরিণতি চায়।

কলকারখানার কলোনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সত্যই ডাক্তার মিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সোনার হাতে ঘড়ী বিকিয়ে গেল।

আমার শিল্পী দাদা রেণুকা বরাটের ছবি ছিঁড়ে ফেললেন—না, না, সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করলেন। বিরক্ত হলেন নতুনগড়া শহরের কোলাহলে, অথচ তার অনবদ্য বিকাশে।

দাদা সমস্ত বিক্রয় করে দিলেন। চৌরঙ্গির ধারে বাড়ী কিনে দাদা আমার সংসারে আনলেন স্যাম্পেন, হুইস্কির। আমি ফ্রেঞ্চ-পাইপ ট্রাউজার পরে, ছবি আঁকা হাউই গায়ে এঁটে সিনেমার নায়ক হবার লোভে ছোটাছুটি করতে লাগলাম।

আর, কানে কানে বলে সেই শোন, আমি পাগড়িকে ভুলে গেলাম।

তোমার অধরে বাঁকা হাসি, সুব্রথার, আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

অনন্ত তৃষ্ণার্ত আমি। কিন্তু ব্যর্থ আমার অমৃত-যাত্রা। অনির্বচনীয়, তোমার সন্ধান কি করে এ জীবনে পাবো?

এক জীবনে কি করে মধুরের, সুন্দরের কাছে যাবো?

জন্মজন্মান্তরের সেতু পেরিয়ে তবে সেখানে হাত বাড়াতে পারি; ধরতে পারি।

সেই শেষপ্রেমের দেশ।

কিন্তু তুমি মুছে যাও। অনেক সাধনার দক্ষিণ বাতাস হঠাৎ বয়ে যায় পুবদিকে। সমস্ত ঘরে পড়ে। তুমি বলো, কাহিনীকার, এখনও কত বাঁচা তুমি? এই তো ভবে। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপি আজ বাতাস পুবের যাত্রী।

তুমি কেমন করে অন্যহাওয়া লাগাবে?"

---

# অন্ধকারের মুখ

রমনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

— আপনি যান।

অসুস্থ তদন্তকারী অফিসার মিঃ মুখার্জি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

—গুড্ বাই মিঃ মুখার্জি। কল্ দিস্ ইজ টাইম রিগেট। এ্যামি হাউ আই উইল সেট মাই ক্লায়েন্ট ফ্রি। (সময়ান্তে মিঃ মুখার্জি। এ জন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। যে কোন প্রকারেই হউক আমার মক্কেলকে আমি মুক্ত করে নেবই।)

চলতি পথে স্মিত হাস্যে বলে গেলেন মিঃ ব্যানার্জি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি যুবকের কথায় উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি তখনও টেবিলের এক কোনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্বলতায় তিনি কাঁপছিলেন।

যুগের সহরের এক ঘটনায় একটি অসহায় মেয়ের আর্তনাদে একদিন তিনি চমকে উঠেছিলেন। তার সর্বাংগে পুরুষের নগ্ন লালসার ঘৃণ্য দেখে বড় আঘাত পান।

মেয়েটি চিৎকার করে বলেছিল, আমি পারব না। আমাকে মেরে ফেলুন। —একটা অন্ধকার ঘর থেকে ছিটকে এসে পড়েছিল ষোল সতের বছরের মেয়ে অনিতা।

ওকে সামনে দেখে অনিতা স্তব্ধ হয়ে গেছল। বুঝতে পেরেছিল ঐ নির্বান্ধব পুরীতে একজন বাঙ্গালী হয়ত ওর পরম আত্মীয়। স্বাভাবিক কারণেই মেয়েটি আর্তস্বরে বলেছিল, আমাকে বাঁচান। ঐ ছিল তার শেষ আবেদন। নির্মমভাবে ধর্ষিতা অনিতা মাটির উপর এলিয়ে পড়ে গেল। পরিধেয় কাপড়ের অংশ বিশেষ লাল হয়ে গেছে।

ঘর থেকে প্রসাদ এবং আরও দু'জন লোককে টেনে বের করা হল। একজন সেপাই কয়েকটি মদের বোতল এবং কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে আসে।

মানুষ তার আদিম বৃত্তিগুলিকে ঢেকে রাখতে গিয়ে ভদ্রতার মুখোশ পরে। সাহিত্যের জ্ঞান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় বড় কেতাবী বক্তৃতা ঝাড়ে। সমাজের উচ্চ শিখরে থেকেও আইনের আওতায় ব্যভিচারিতার দায়ে নিজ পক্ষ সমর্থনে এতটুকুও লজ্জা পায় না।

আইনজ্ঞ আইন ক'রে সেই বৃত্তিকে একটা গণ্ডীর ভেতর ঠেলে রাখতে চায়। অত্যাচারীর হাত থেকে সর্বসাধারণকে রক্ষা করবে বলে দেশের শিক্ষিত যুবকদল আইন পড়ে।

কিন্তু অনিতা? অনিতা কি তাদের চোখে অত্যাচারিতা নয়? সে কি জনসাধারণের বাইরে? ওর আর্তকে উঠা মুখখানিতে আত্মাবমাননার স্বাক্ষর কি অস্বীকার করার মত? হিংস্র পশুর চাইতেও কুৎসিত এবং ভয়াবহ আক্রমণের হাত থেকে অনিতাকে রক্ষা করা কি সেই আইন ব্যবসায়ীর কর্তব্য নয়?

উত্তেজিত মিঃ মুখার্জির মনে বারবার একই প্রশ্ন ধ্বনিত হতে থাকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে

তিনি তার কর্মজীবনে মানুষের ঐ একই রূপ দেখে আসছেন। আজও তিনি প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ বানার্জির মধ্যে তার কোনই ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন না।

পাশবিক হিংসা মানুষকে কতদূর টেনে নামাতে পারে, তারই এক নির্মম স্বাক্ষর নবদ্বীপের একটি রিফিউজি ক্যাম্প। সদ্যঃ নবজন্মলীন এক মানব গোষ্ঠীকে এক দেশ যখন তাদের ধনপ্রাণ এবং বেঁচে থাকার দাবীকে স্বীকৃতি দিতে পারল না, তখন তারা একটু আশ্রয়ের খোঁজে এ দেশে আসে। সবার মুখের দিকে চায়। একটু আশ্রয়ের আশায় দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র তাদের আশ্রয় দেয়—বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। বিরাট ছিন্ন-মূলকে স-মূলে উৎপাটিত হতে আমরা দেবনা। তাই তারা নবদ্বীপের এক আশ্রয়কেন্দ্রে এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু এখানেও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মানুষের কায়ায় এখানে অনেকে কাঁদে। আবার কেউ কেউ সবার অজ্ঞাতে একটু একটু হাসেও।

রাষ্ট্র-বিপ্লবে মানুষ যখন সব হারিয়ে কাঁদে, তখন এরা মনের কামনাকে সযত্নে ঢেকে রেখে অতি সংগোপনে এই সর্বহারাদের মনের উপর হিংস্র আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে অপরপক্ষের বিরাট দুর্বলতার সন্ধান ওদের অজানা নয়। সে সন্ধান তারা অতি সহজেই খুঁজে পায়। সে দুর্বলতা যুগে যুগে স্ত্রীকে স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সন্তানের মুখের গ্রাস মা জোর করে কেড়ে খায়। মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি চরম কাঠিন্যের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এ অবস্থায় কেউ কারুর শাসন মানে না। সমাজের তন্ত্র কিংবা ব্যক্তিচারিতার কঠিন আঘাতে স্বামী কিংবা স্ত্রী ভ্রূক্ষেপও করে না। কামনার বহ্নি-ঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও তাদের মুখে হাসি ফোটায়। এই নারকীয় রঙ্গশালায় অপরপক্ষ নির্লিপ্তভাবে এগিয়ে আসে।

এই সুযোগে দেশের মধ্যে এক আন্তঃপ্রাদেশিক সমাজদ্রোহীর দল মাথা চাড়া দেয়। বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠী তাদের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

এই সমাজজীবনে বিরাট ধ্বংসের সামনা-সামনি দাঁড়াতে গিয়ে নবদ্বীপ আশ্রয়কেন্দ্রের পরিচালকের এক মর্মস্পর্শী আবেদনে একদিন মিঃ মুখার্জি চমকে উঠেছিলেন। আবুল আহ্বানের মাঝপথে জোর করে থামিয়ে দিয়ে মিঃ মুখার্জি বলেছিলেন, আপনি আমাকে সে সব খবর দিন। আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি একবার দেখতে চাই ওরা কতদূর শক্তিশালী।

পরিচালক মিঃ কুশারী ওর চোখে মুখে উত্তেজনার রেশ দেখে অস্ফুট নিশ্বাস ফেলেন। মিঃ মুখার্জির দৃঢ়তায় উৎসাহ বোধ করেন।

মিঃ কুশারী আস্তে আস্তে ওঁর অভিযোগ বলে চলেন। এই আশ্রয়কেন্দ্র থেকে পর পর কয়েকটি মেয়েই উধাও হয়ে গেছে। অথচ আজ পর্যন্ত একটি মেয়েকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক কারণেই মিঃ কুশারী বিশ্বাস করেন, এর মধ্যে এক অদৃশ্য হস্তের ইংগিত রয়েছে বলে। পুলিসে খবর ঠিকই যায়। কিন্তু মেয়ে চুরির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

নারী হরণ যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে। সে মহাপরাধ থেকে মানব সমাজ তবুও নিষ্কৃতি পায় নি। এক সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত। মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও পেছনে ফেলে,—এ যুগেও নারীদের প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করতেও ছাড়েনি। রাস্তাঘাটে তাদের বিক্রী পর্যন্ত করছে। এ নিয়ে মানুষের মন বিচলিত হয়েছে। তাদের মনে সেই রোষবহ্নি শতধারা বিস্তার করে সক্রোধে গর্জন করে উঠে। তার বহিঃপ্রকাশও তো মিঃ মুখার্জির না জানার কথা নয়।

কেন জানি মিঃ মুখার্জি অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি ভাবেন তবে কি মাতৃজাতির উপর সমাজ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে? তাঁদের উপর কোন মমত্ব বোধই কি তবে নেই? তবে মিঃ কুমারীর অভিযোগের কোন প্রতিকারই হবে না? এ দায়িত্ব শুধু কি পুলিসেরই?

না—না—না। উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলে। প্রতিবাদের সুরেই তিনি সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে চান না।

মিঃ মুখার্জি, ইউ উইল রিগ্রেট। আই—স্যাল—হ্যাভ, মাই—প্রায়েন্ট, মি।

এ-কথা মিঃ মুখার্জি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। উচ্চশিক্ষিত মিঃ ব্যানার্জি তো ভিন্ন সম্প্রদায়ের নন। সাধারণ মানুষের চাইতে তিনি তো অনেক উঁচুতে। বর্তমান সমাজে ওঁর প্রতিষ্ঠাও তো ফেলে দেবার মত নয়। তবে কেন তাঁর মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা?

ধর্মাধিকরণের সামনে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে এরাই সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করে,—মি লর্ড!—অথচ এরাই সমাজের শত্রু, ব্যভিচার কিংবা সমাজদ্রোহিতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে, ভারতীয় আইনের নির্দেশে কোর্টকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাতির কাছে তাদের কাজ সব চাইতে দায়িত্ব-পূর্ণ। তবে কেন মিঃ ব্যানার্জির মুখে এত বড় কথা?

মিঃ ব্যানার্জির কাছে তিনি এক মর্মস্পর্শী আবেদনে মুংগেরের সেই কাহিনী ছাড়াও, প্রকাশ করেছিলেন কি ভাবে এ ভারতীয় যজ্ঞে সমাজের কয়েক জন দায়িত্বহীন ব্যক্তি এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মিঃ মুখার্জি আরও বলেছিলেন,—কি করে এরা বাংলার মেয়েদের অন্য প্রদেশে পাচার করে। বড় আশা নিয়ে তিনি মিঃ ব্যানার্জির কাছে তাঁর আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সব বৃথা।

মিঃ মুখার্জির প্রশ্নে মিঃ ব্যানার্জি হেসেই উত্তর করেন,—স—ব জানি মশাই। অন্যায় যদি না-ই বা করবে, ওরা তবে আমাদের কাছে আসবে কেন? আর যদি না-ই বা আসবে, তবে এত টাকাই বা আমাদের কে দেবে?

মিঃ মুখার্জি চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে বসেছিলেন। ম্যানেজিয়ার পঙ্কু মেহটা তখনও কাঁপছিল।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিঃ কুমারী অনেক কথাই বলেছিলেন।

বয়স কত—? মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করেন।

এই ধরুন ষোল কি সতের।

দেখতে কেমন?

নিঃসন্দেহে সুন্দরী।

পড়াশুনো?

অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়েছে।

ওর আছে কে?

মা—বাবা। ছোট ছোট কয়েকটি ভাই বোন।

ওর বাবা কি করেন?

তরি-তরকারি বিক্রী করে—।

অবস্থা কেমন?

ওরেছি প্রায়ই উপোস যেয়—।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে যে কোন অভিযোগের কারণ বুঝে নিতে মিঃ মুখার্জির প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবতে হয় না। মিঃ কুশারীর কথা শুনে অনিতার অন্তর্ধানে একটি বিশেষ কারণের কথাই ওর মনে পড়ে। সে কারণ হল মানব জীবনের পরম অভিশাপ—দারিদ্র্য।

খবর দেবার লোকের অভাব নেই। চারিদিক থেকেই আসতে থাকে। এখানেও প্রতিশোধ স্পৃহা। শত্রুতা সাধন কিংবা ঈর্ষা যাদের পুড়িয়ে মারে, তারাও চুপি চুপি এসে। ভালবাসা ছড়িয়ে এ ওর নামে অনেক কথাই বলেছিলো, মিঃ মুখার্জি কাউকে বিমুখ করেন না। সহানুভূতি নিয়ে সবার কথা শুনেন। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট্ খেতে খেতে আবার নিজেকে সামলিয়ে নেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, এ আশ্রমকেন্দ্রকে উপলক্ষ করে, কতকগুলি লোক নিজেদের স্বার্থ নিয়ে মেতে উঠেছে। তারা একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।

অনেকেই বলে বড় বড় গাড়ি আসে। তীব্র হেড্ লাইটের পেছনে কয়েক জোড়া হিংস্র চক্ষু—জ্বল জ্বল করে জ্বলে। রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আগোচরে তারা নাকি অনেক কিছুই করে। কোনও কাজ কর্ম নেই। তাদের স্বচ্ছল অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা ভাবে। অথচ সাহস নেই যে কিছু বলে। বললে হয়তো একটু হাসে। বলে রিকিটিকি ক্যাম্পে আছি বলে কি দেশের বাড়িতে কিছু থাকতে নেই। এখনও মাঝে মাঝে কিছু আসে। তাই কোনও রকমে চলে যায়।

ওদের কাজে প্রতিবাদ করতে গিয়ে চোরা গোপ্তা মার খেয়েছে,—এমন ঘটনা অনেক। সাক্ষী নেই বলে ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় না। যদি ওরা দিন কয়েক হাজত বাস করে, ফিরে এসে রক্তচক্ষু হানবার হিংস্রতা নিয়েই আবার রুখে দাঁড়ায়। মান অপমানের বার তারা ধারে না। সমাজ চেতনা কিংবা সুরুচি বলে কোন কিছুর বালাই নেই। মেয়েদের দেখে ইতরামি করে। অভিভাবকদের সামনে চুরুট টানে। তাদের সংখ্যাই বড় দ্রুত বেড়ে চলেছে। হাল ছেড়ে দিয়ে অভাবগ্রস্ত মা-ও বাবা জীবনের অভিশাপ বলেই ওদের মেনে নেয়।

মিঃ মুখার্জির চোখে ধীরে ধীরে রিকিটিকি ক্যাম্পের রূপ ধরা পড়ে।

উগ্র সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে মেয়েরা এখানে সেখানে যাওয়া আসা করে। সাথে থাকে কয়েকটি কিশোর বালক। অদ্ভুত তাদের আচরণ। আরও অদ্ভুত পরিধানে কাপড় জামা। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মতই তাদের চালচলন এবং কথাবার্তা। সব সময়ই মারমুখি। এ বয়সেই দু'চোখে কামনার বহ্নি উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কৈশোর এবং যৌবনের মাঝামাঝি জোর করে ফুটিয়ে তোলা একটি যেন গোলাপ কুঁড়ি।

মেয়েদেরও তাই। আঁট সাট বেশবাসে সর্বাংগে যৌন ক্ষুধার ইন্ধন জুগিয়ে তারা চলে। নারীর সহজাত শালীনতার কোন বালাই নেই। সাহারার বুকে কয়েকটি মরুদ্যানের মতই শান্ত, ধীর-স্থির, কিছু কিছু বালক এবং বালিকার উপস্থিতি মিঃ মুখার্জিকে আনন্দ দেয়। তিনি মনে মনে তাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। ভেঙে পড়া সমাজ জীবনে এখনও সাড়া জাগাবার মতো আশা আছে দেখে তিনি খুশী হন।

মিঃ মুখার্জি যত সহজ মনে করেছিলেন, অনিতাকে বের করা তত সহজ হল না। গোটা সংসার যেখানে স্বার্থন্ধ, সেখানে মানুষের সততার উপর নির্ভর করা বড় কঠিন।

ছাতে বেহটা টেনে নিয়ে মিঃ মুখার্জি চলছিলেন। সূর্যতপ্ত গ্রামা পথের ধারে একটু বিশ্রামের আশায় বসেন। মাথার উপরে ছাতাস্থটবারী বহ-র সাক্ষী হয়েই একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। এক বুড়িমাও বসে ছিল। আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গে মুছে ফেলছিল। একবার মিঃ মুখার্জির দিকে চেয়ে একটু হাসল। বললে—বড্ড ঘেমে গেছি বাবা।

মিঃ মুখার্জিও বসেন। আশে পাশে কয়েকটা শুষ্ক চোখ বুজে আবর কাটছিল। বুড়িমা লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই কয়েকটা কাক উড়ে গেল।

খোপা থেকে বুড়িমা কি যেন বের করে মুখে পুরে দেয়। মনে হল সুপুরির সাথে পান। পান চিবুতে চিবুতে বুড়িমা মুরুব্বির মতই প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে বাবা?

মুচকিলে পড়লেন মিঃ মুখার্জি। ভাবলেন কোনও উত্তর দিবেন না। একটু বিশ্রাম করেই তিনি চলে যাবেন। সামনেই তো ধু ধু করছিল বিধিউদ্ভি ক্যান্সার।

সাধ্য কি বুড়িমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বুড়িমা মিঃ মুখার্জিকে উত্যক্ত করে তোলে। কথায় কথা বাড়ে। বুড়িমার কল্পনাকে মিঃ মুখার্জি এক ফাঁকে অন্য পথে ঠেলে দেন। বুড়িমা গড় গড় করে বলতে শুরু করে। সে বলার পথে অনিতার কথাও এসে পড়ে। কোকলা মুখে হাসি টেনে বুড়িমা অনিতার গল্প বলছিল। সে কথার মধ্যে এক বৈষ্ণবীও আত্মপ্রকাশ করে। কোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে বুড়িমার কুত কুতে চোখ দুটো হাসির দমকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মুখের ভাঁজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। বলার ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে বিস্তারিত হতে থাকে।

বুঝলে বাবা ছুকরি গায় ভাল।

বয়স কত? বুড়িমার অভিমত শোনার সাথে সাথে মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করে বসেন।

হবে বছর চব্বিশ কি পঁচিশ।

বুড়িমা সামনের দিকে পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে বৈষ্ণবীর মধুর কণ্ঠের বিস্তারে মেতে উঠতে থাকে।

বলছিল বুড়িমা, দেখতে শুনতে ভালই। নাকের উপর রসকলি। হাতে একতারা। গান গায় বেশ। সাদা ধবধবে কাপড় পরে। মাথার চুল উপরের দিকে টেনে খোপা বাধে। বিরাট খোপার চারিদিকে সুন্দর বেলী ফুলের মালা জড়িয়ে রাখে।

থাকে কোথায়?

চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে বুড়িমা, কি জানি বাবা কোথায় থাকে। তবে শুনেছি ট্রেণে করে আসে, আবার ট্রেণেই চলে যায়!

অঃ! তাই নাকি?

তাই না কি মানে? ওকে তো সবাই চেনে বাবা। হাঁ, অনিতার সাথে খুব ভাবছিল। সারা গল্প করত। মুখ টিপে টিপে হাসত। ক'দিন ধরে দেখছি না।

বুড়িমার কথা বলার ঢং দেখে মিঃ মুখার্জিরও হাসি পেল। আবার উৎসাহ দেবার জন্য হাসেনও।

রসিয়ে রসিয়ে বুড়িমা কথা বলে, না শুনে উপায় নেই। —থেকে থেকে জিজ্ঞেস করে, বুঝলে তো বাবা?

বয়সের মাপকাটিতে বুড়িমা এরই মধ্যে কুমিতে এসে গেছে।

কেন জানি মিঃ মুখার্জি বুড়িমার কথা বিশ্বাস করেন। একতারা হাতে শুভ্র বসনা এক যুবতী

ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে। বৃত্তিদার কথা ধরে এই বৈকল্পীর সাথে অমিতার যোগাযোগ কেন জানি মিঃ মুখার্জিকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে।

মিঃ মুখার্জি চলন্তিকাটা মেয়েটির খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মিঃ কুমারীও বৃত্তিদার কথায় সমর্থন জানান। অনেকেই বৈকল্পীর কথা স্বীকার করলেও, সে যে কোথায় থাকে, বলতে পারল না।

চলতি ট্রেণে বসে বসে মিঃ মুখার্জি ভাবছিলেন অমিতার কথা। এত পরিশ্রম ওঁর বৃথাই গেল। প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হয়ে গেল। অমিতার খবর নেই। কতগুলো চালচুলোর মধ্যে একমাত্র অমিতাকে চিন্তা করে তিনি চমকে উঠেন। যারা নারীকে শুধু ভোগ্য বস্তু হিসেবে দেখে, তাদের হাতে অমিতার মত মেয়ের কোন মূল্যই নেই। সেখানে নারীর আপন সত্তা বলে কোন কিছু থাকে না। মিঃ কুমারীর কথা মনে পড়ে। এক এক করে অতগুলো মেয়ে চলে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত তাদের হদিশ নেই! কথাটা মনে করে মিঃ মুখার্জির মনের কোণে কে যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠে। রাত্রি-বিপ্রহরে মানুষের মনের শান্তি এমনি করেই ভেঙে পড়ে। যেখানে সমাজ বন্ধন দুর্বল, স্বাধীনতার কথা শুনে মানুষ রাংস করে হাসে, সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা সবার মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। ব্যাভিচারিতা কিংবা যৌন বিলাস মানুষের প্রতিস্তরে, কোথাও উগ্র, আবার কোথাও বিকশিত শুভ্র মল্লিকার বুকে কামড়িয়ে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র মক্ষিকার মতই দংশন করে। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত ঢেউ সমাজের উচ্চ স্তর থেকে—সাধারণ স্তরে এসে পৌঁছেছে। এর বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা অমিতার মত মেয়েদের নেই। তাই পুলিসি জীবনে তিনি দেখেছেন সহরে কিংবা বন্দরে অমিতার মত মেয়ে এখানে সেখানে। দুদিনের অতিথি হয়ে কারা যেন সংসারে আসে। আবার তারা মিশে যায়। যারা আসে তারা সমাজে কলংকিত হয়-না। আর যাদের কাছে আসে, তারা চির কলংকিত—সবার সম্পত্তি বলেই সবাই ভাবে।

হঠাৎ মিঃ মুখার্জি হুকারের ডাক শুনে চমকে উঠেন।

এই শোন্।

ওরে বাবা! আপনি স্যার! এখানেই নেবে যাচ্ছি স্যার।

হকচকিয়ে উঠল হুকারও।

রেল পুলিসে কাজ করার সময় মনে মনে ওদের ধরে নিয়ে মিঃ মুখার্জি বন্ধ করে দিতেন। তাই হুকারের মত ওঁকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। দিনে ভাড়ায় ট্রেনে চাপা আজকাল ট্রেনের লোক বড় বেশী বরদাস্ত করে না। ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভয় পাবার তো কথাই বটে। আজে আবার বহুদিন পর মিঃ মুখার্জির সামনে পড়ে ওরা রীতিমত ঘাবড়ে উঠে।

ওরে আমি খানোয় বদলী হয়ে গেছি।

আশ্বাস দেন মিঃ মুখার্জি।

তবুও হুকারের মন ওঁকে বিশ্বাস করতে চায় না।

চল্। এই ষ্টেশনেই নেবে পড়ি।

পরের ষ্টেশনেই ওরা নেবে পড়ল। আধ ঘন্টা বেঞ্চির উপর ওদের নিয়ে মিঃ মুখার্জি বসেন। এ-কথা ও-কথা থেকে, অনেক কথাই হয়। ওর পরেই আসে বৈকল্পীর কথা।

ওকথা শুনে হঠাৎ নবীন লাফিয়ে উঠে। গড় গড় করে বলতে থাকে। বৈকালীকে সে যে শুধু চেনে তা নয়, কোথায় থাকে সে কথাও ওর জানা। প্রায়ই তো ট্রেনে করে আসে, আবার যায়।

নবীনের হাতে একটি টাকা গুঁজে দিয়ে মনের আনন্দে মিঃ মুখার্জি পরের ট্রেনে দৌড়ে গিয়ে উঠে বসেন। বিস্মিত নবীন একবার হাতের উপর আর একবার চলতি গাড়িটার দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

নবদ্বীপ এলেন মিঃ মুখার্জি। পরিচিত পথঘাট। এ-অঞ্চলে চাকরিও করেছেন অনেকদিন। চাল মধ্য অনেককেই তিনি জানেনও। এগিয়ে চলতে গিয়ে সহসা মনে মনে হেসে উঠলেন। মনে পড়ল একজনের কথা। সমাজপতি না হলেও অনেকের পতি তো বটেই। রাজনীতি থেকে কোন নীতিতেই ওকে আটকায় না। তাই সহরের দু' দশজন লোক মনে মনে না হলেও, অন্ততঃ মুখের উপর বাসিয়া বলতে পারে না। ভেতর থেকে ওর উপর ঘৃণা আসলেও, মুখে হাসি নিয়েই বলেন,—আজে ভালতো?

এই যে নবকিশোরবাবু। সব ভালতো?

আরে আপনি! কি সৌভাগ্য! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন আর? ব্যস্ত হয়েই নবকিশোরবাবু মিঃ মুখার্জিকে অভ্যর্থনা জানান।

মিঃ মুখার্জি বসেন।

নবদ্বীপ ধামের আশে পাশে কতকগুলো মনুষ্যাকৃতি নরপশুর মধ্যে, এই নবকিশোরবাবুও একজন। পুরুষ, তাতে অবস্থাপন্ন। বাপ ঠাকুর্দার আভিজাত্য মার্কা বিরাট বাড়ির একমাত্র মালিক। বাইরে থেকে মনে হয় নবদ্বীপ ধামের রূপ অবতারের এক অবতার এই নবকিশোরবাবু। দেশী ও বিদেশীর বড় বড় ফটোতে ঘরখানি সাজান ওঁহার। প্রত্যেকের আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য প্রচারে সদা জাগ্রত। প্রৌঢ়ত্বের ঘরে এসেও চোখের ক্ষুধায় এখনও ভাটা পড়েনি। বহুক্ষেত্রে তিনি সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। কিন্তু আইনের চোখে তিনি এখনও নিষ্কলঙ্ক। ওর চোখের সামনে মরুভূমের মতই মেয়েরা ধরকে দাঁড়ায়। ভঁস হবার সাথে সাথে ফিরে চেয়ে দেখে পেছনের সিঁড়ি ধসে গেছে। বাধ্য হয়েই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে নবকিশোরবাবুর বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরেই উঠে আসতে হয়। অর্থবল, লোকবল ছাড়াও সব চাইতে রাজনৈতিক বলে বলীয়ান নবকিশোরবাবু কাউকে ভয় করে না। মুখে মিষ্টি হাসিটি লেগেই থাকে। কিন্তু এই মিঃ মুখার্জিই ওর জীবনে মস্ত বড় এক দুঃখ। একবার ওঁর হাতে পড়ে তিন মাস হাজতে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও নবকিশোরবাবু যথারীতি ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এলেন। চলে যাওয়া মিঃ মুখার্জিকে হঠাৎ নবদ্বীপ ধামে দেখে নবকিশোরবাবু চমকিয়ে উঠলেন।

রসকলি কাটা মেয়েটির কথা উঠতেই অর্ধ ইঞ্চি জিহ্বা বের করে নবকিশোরবাবু লজ্জায় মুয়ে পড়লেন। প্রকাশ করলেন সেই সব সংস্রব তিনি সেই থেকেই ছেড়ে দিয়েছেন।

সহসা মিঃ মুখার্জির মুখে কাঠিন্য দেখে নবকিশোরবাবু শংকিত হন। চোক গিলে বলেন, একটু চেষ্টা করে দেখি স্যার! উপরে পাখা থাকা সত্ত্বেও নবকিশোরবাবুর মুখে ঘাম দেখা দিল। নবকিশোরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খালি ঘর। মিঃ মুখার্জির আগমনের সংবাদ সাথে সাথে দু' একজন যারা ছিলেন, চলে গেছেন। রসকলি কাটা মেয়েটি যে আজও নবকিশোরবাবুর চোখে পড়েনি, এ-কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। মেয়েটির বাড়িতো দূর থেকে তিনি দেখেই এসেছেন। কাছেই তো মেয়েটি থাকে।

মিঃ মুখার্জি 'ফিলিম ফেয়ারের' পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখ'ছলেন। সময় কাটাতে হবে তো। পরের পাতা উল্টে যেতে তিনি হেসে ফেললেন। 'যোগেন্'-এ নার্গিস-এর ছবিই তিনি দেখছিলেন। ঐ ছবি বলকলি কাটা বৈকুণ্ঠীর কথাই বারে বারে মনে করিয়ে দেয়।

বাইরে শব্দ হতেই মিঃ মুখার্জি চেয়ে দেখেন নবকিশোরবাবু।

স্যার, নন্দা বাড়ি নেই।

বুঝতে পারলেন মিঃ মুখার্জি, বৈকুণ্ঠীর নাম নন্দা।

কোথায় গেছে?

বোলপুরে ওর মামার বাড়ি।

ক'দিন হল?

ওরা বললে, প্রায় তিন সপ্তাহ।

মামার নাম?

যজ্ঞেশ্বরবাবু।

বোলপুর তো আর এতটুকু জায়গা নয় নবকিশোরবাবু?

যজ্ঞেশ্বরবাবু ওর কেউ নয়। তবে মামা বলে ডাকে। তাই ওরা কেউ আর কোনও খবর দিতে পারলে না স্যার।

নন্দার স্বভাব চরিত্র কেমন নবকিশোরবাবু?

স্যার,.....।

বুঝতে পেরেছি। থাকগে।

স্যার,...একটু মিষ্টি মুখ।

হেসে বললেন মিঃ মুখার্জি, সময় নেই।

মিঃ মুখার্জি চলে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নবকিশোরবাবু, বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। বোলপুরের গ্রাম্য রাস্তা। পথ বেয়ে তিনি চলছিলেন। পথিক এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন কোথাও হোটেল আছে কিনা। কথায় কথায় নিজের পরিচয় দেন। ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মিঃ মুখার্জিকে আতিথ্য মেনে নিতে হল। ভদ্রলোক খুবই আলাপী। ওঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর পুলিসি জীবনের অনেক কথায় এসে পড়া গেল। কাজেই বোলপুরে আসার উদ্দেশ্যও বলতে হল। সাথে সাথে মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করে বসেন, যজ্ঞেশ্বরবাবুকে আপনি চেনেন?

যজ্ঞেশ্বর মিত্রের কথা বলছেন তো!

অমন করে চমকে উঠলেন কেন?

মিঃ মুখার্জির প্রশ্নে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, না-অমনি। মিঃ মুখার্জির চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক আরও গম্ভীর হয়ে উঠেন।

না—বললেও ভদ্রলোকের চোখ ও মুখ স্পষ্টই বলে দেয় তিনি যজ্ঞেশ্বরকে শুধু যে চেনেন তাই নয়, ভাল করে জানেনও। তবে ও কথা বলতেও তিনি তরলা পাচ্ছেন না।

নন্দা বলে একটি মেয়ে নবদ্বীপ থেকে মাঝে মাঝে আসে কিনা, এ প্রশ্ন করতেই ভদ্রলোক আবার মিঃ মুখার্জির মুখের দিকে চান। ধীরে ধীরে বলেন, মিঃ মুখার্জি, যজ্ঞেশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও

কথা বলবার মত সংসাহস আমার নেই। এ গাঁয়ে সেরূপ সাহস কারুর আছে কিনা আমার জানা নেই। অথচ সবাই যজ্ঞেশ্বরের সর্বনাশ কামনা করে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হবার নয়। ওর মত এত বড় শয়তান আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। ওর বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উপর তলায় বহু অভিযোগ জানিয়েছে, প্রতিকার তো দূরের কথা, দিন দিন ওর প্রতিপত্তিতে আমরা বিস্মিত। ওর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কারুর নেই। সর্বস্তরে যজ্ঞেশ্বর ক্ষমতাশীল।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ নিখিলবাবু আবার চুপ করে থাকেন।

সামনে বহুদূর দৃষ্টি যায় গভীর অন্ধকারে জোনাকী পোকার দল নিজু নিজু প্রদীপের আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মিঃ মুখার্জির চোখে বিরাট বৈরাগ্য নিখিলবাবুর কথার ভেতর হতাশার ঢেউ এলোমেলো হতে থাকে।

পরদিন ভোরের দিকে মিঃ মুখার্জি বেরিয়ে পড়লেন। বিদায়কালীন নিখিলবাবুর অসহায় ভাব দেখে মিঃ মুখার্জি আঁৎকে উঠেছিলেন।

বলছিলেন নিখিলবাবু, আমাকেও ছেলে পিলে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হয়। বয়স্থা মেয়েরা রয়েছে। আমার অনুরোধ যজ্ঞেশ্বরবাবু যেন আমার কথা জানতে না পারে।

মিঃ মুখার্জি পথে চলতে চলতে নিখিলবাবুর কথাই ভাবছিলেন, এই তো সমাজ! নিজের আদর্শ কি বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা মানুষ এমনি করেই হারিয়ে ফেলে। সমাজতন্ত্রীর কদর্য কটূক্তির সামনে ভীত সন্ত্রস্ত সবাই। অন্যায়ের অর্থ সেখানে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেয়, তাদের মতি সর্বস্তরে। কেউ প্রতিরোধ করলে সবাই তাকে উপহাস করে। বলতে না পারলেও মিঃ মুখার্জি নিখিলবাবুর কথা বুঝতে পেরেছিলেন—নিখিলবাবু চাইছিলেন মিঃ মুখার্জি যেন ওর আতিথেয়তার কথা কারুর কাছে প্রকাশ না করে। যজ্ঞেশ্বর মিত্তির সে-কথা জানতে পারলে ওর আর রক্ষে রাখবে না।

মিঃ মুখার্জি নিজ মূর্তিতেই চলছিলেন। যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি খুঁজে বের করতে ওঁকে বেগ পেতে হয়নি।

একেবারে সামনা সামনি। একজন পুলিস অফিসার ওকে প্রশ্ন করতেই যজ্ঞেশ্বরবাবু চমকে উঠলেন,—আমাকে!

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকেই আমার দরকার।

এমন কি দরকার? বলুন।

প্রশ্ন আমার অনেক। একটু বসতে পারলে ভাল হত।

একবার মুখের দিকে চেয়েই যজ্ঞেশ্বর বললেন—আসুন।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর মানসিক পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা গেল। শত চেষ্টা করেও বুদ্ধিমান লোক—মুখের উপর মনের কথা মুছে ফেলতে পারেন না। যজ্ঞেশ্বরবাবুও পারলেন না। প্রতিক্রিয়া মুখের উপর কম-বেশী প্রতিফলিত হবেই।

ধীরে ধীরে আসল কথায় এসে পড়া গেল। বার কয়েক মিঃ মুখার্জির মুখের দিকে চেয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবু কি যেন ভাবতে থাকেন। পরক্ষণেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকানর মত ওঁর মুখে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। স্বভাবসিদ্ধ আবেষ্টনে মিঃ মুখার্জি সামনা যেন—উপরওয়ালার হুকুম মানতে এলাম। তা-না হলে এতদূরে কে আসে মশাই।

তবে তার, রিপোর্টটা একটু ভাল করে লিখে দেবেন।

সদ্য-আলা জোয়ারের জলের মতই যজ্ঞেশ্বরবাবু পরম বান্ধব মিঃ মুখার্জির কাছে মনের কথা খুলে বলেন। সন্ধ্যার মত মেয়ে হয় না। পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি যেন বারে বারে। একে অন্যের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ এসে গেছে।

সহসা যজ্ঞেশ্বরবাবুর মেজাজ রুক্ষ হয়। কর্কশ কণ্ঠেই প্রতিবাদ তুলে প্রশ্ন করেন, এতক্ষণ আমাকে আটকে রাখলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে মিঃ মুখার্জি চুপ করে থাকেন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর চোখমুখের পরিবর্তনে মিঃ মুখার্জি বুঝতে পারেন আপাহত যজ্ঞেশ্বরবাবু স্মৃতি ধারণ করেছেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বাহ্যমুখি হয়ে উঠেন। ওর হাঁকডাকে এরই মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

অবান্তর হলেও যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথা সমর্থনের লোকের অভাব ছিল না।

বলতো অমুকের কাছে যাই। কি বলবে যজ্ঞেশ্বর?

সমর্থকের দল মিঃ মুখার্জিকে উপলক্ষ্য করেই যে ওদের কথা বলছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ও-কথা শুনে মিঃ মুখার্জি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যাদের নামে ঘরে ওরা ওকে ও-সব কথা বলছিল, তাঁদের নামের আগে ও পেছনে ঐতিহ্যের বিশেষণের অলংকার, স্বাভাবিক কারণেই মিঃ মুখার্জিকে বিচলিত করে তোলে। যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথার তিক্ততায় ওর মুখের তিক্ততা বৃদ্ধি পেলেও, সব কিছুই ওকে হজম করতে হল।

কারণ, মিঃ মুখার্জির কাছে এমন কিছু ছিল না, যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে গ্রেপ্তার করা চলে।

আশ্চর্য! ষ্টেশনে পৌঁছেই মিঃ মুখার্জি দেখতে পেলেন নিখিলবাবু ওঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

কিছু সুবিধে হল? নিখিলবাবুর দৃষ্টি ছিল এদিক-ওদিক।

না।

ওর কাছ থেকে খবর যে কিছু পাবেন না, সে কথা আমি জানতাম। প্রসাদ বলে একজন হিন্দুস্থানী ওর কাছে প্রায়ই আসে। বয়স বছর চল্লিশের কোঠায়। দেখতে শুনতে বেশ। খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপর কালো রংএর জহর-কোট গায়ে। মিষ্টি মিষ্টি আধ-হিন্দি আধ-বাংলা ভাষায় কথা বলে, গুজব হচ্ছে ঐ প্রসাদই নাকি যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছ থেকে মেয়েদের কিনে নেয়। কয়েকদিন আগের কথাই বলছি। একটি বাংলাদেশী মেয়েকে সাথে করে রসকলি কাটা একটি বৈষ্ণবী এসেছিল।

প্রসাদ থাকে কোথায়? মিঃ মুখার্জি উদগ্রীব হয়ে উঠেন।

ওর বাড়ি মুংগের জেলায়। মুংগের সহরে নাকি ওকে সবাই চেনে। তা ছাড়া মুংগের সহরে ওর বড় বড় হোটেল আছে।

আপনি কখনও দেখেছেন প্রসাদকে?

না দেখলে অত কথা বলবার কি করে?

তাওতো কথা। আচ্ছা বলুন তো প্রসাদের মধ্যে এমন কোনও বিশেষত্ব আছে কিনা, যার উপর নির্ভর করে ওকে এক কথায় চিনে ফেলা যায়।

আলবৎ। খুশী হয়ে উঠেন নিখিলবাবু।

বলুন। থামলেন কেন?

ওর বাঁ চোখটা অসম্ভব টেরা। সব সময় কালো গ্লাসের চশমা পরে থাকে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিখিলবাবু।

জোড় হাতে নমস্কার করে নিখিলবাবু বললেন—বাই।

মুহূর্তে নিখিলবাবু অন্তর্হিত হলেন। মিঃ মুখার্জি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চেয়ে দেখছিলেন সমান্তরাল রেল দুটি। পাশাপাশি চলেও প্রান্তসীমা ধূ-ধূ করছিল। মনে হয় ওখানেই দুটি রেল লাইন একসাথে মিশে গেছে।

রীতিমত সন্ধ্যা হয়ে গেছল। মিঃ মুখার্জি মুংগের সহরে এসে গেছেন। এতবড় সহরে প্রসাদকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি। সোজা গিয়ে উঠলেন থানায়। থানার অল্প বয়স্ক এক যুবক। পরিচয় দিয়ে তিনি পরিচয় বললেন, ওর নাম বনওয়ারী ভেওয়ারী। চোখে-মুখে মূঢ়তার সাথে আত্মপ্রত্যয়ের বেশ মিশে ছিল।

মিঃ মুখার্জির কথা শুনে বনওয়ারীবাবু নিজের আসনেই নড়ে চড়ে বসলেন। পর পর কতগুলো প্রশ্নও করেন।

উৎসাহ পান মিঃ মুখার্জি বনওয়ারীবাবুর দু'চোখে সুধাবিস্তৃত সান্ত্বনা ওকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলে। বার বার তিনি অসহায় মেয়েদের কথা, তাদের আত্মাবমাননার কথা খুলে বলতে থাকেন।

তবুও বনওয়ারীবাবুর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতিই তিনি পেলেন না। যত কথাই তিনি বলেন, তার স্পর্শে বনওয়ারীবাবুর চোখে মুখে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন থাকলেও, ওর কাছ থেকে কোন আশ্বাসই মিঃ মুখার্জি পাচ্ছেন না দেখে, তিনিও স্তম্ভিত।

সহসা বনওয়ারীবাবু মুখ ফিরিয়ে বলেন, মিঃ মুখার্জি, আপনার বক্তব্য আপনি আমায় একটু বিস্তারিত ভাবেই লিখে দিন।

লিখতে গিয়ে মিঃ মুখার্জি হঠাৎ প্রশ্ন করেন, বনওয়ারীবাবু, আপনি কি অসুস্থ?

কেন বলুন তো?

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি খুবই উত্তেজিত।

সত্যিই আমি উত্তেজিত। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে ঐ প্রসাদকে আমি কুকুরের মত রাস্তার উপর গুলি করে মারতাম। কিন্তু আমি অক্ষম। ভারতীয় আইন আমাকে সে অধিকার দেয়নি। প্রসাদকে মুংগের সহরে কে না চেনে? এতবড় একটা কুখ্যাত সমাজদ্রোহীকে আইনের আওতায় আনা খুবই কঠিন। প্রতি পদে এই লোকটার হাতে আমি পরাজিত, জানি সব, কিন্তু আমার কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন? মন গড়া কয়েকটি সাক্ষী কোর্টের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা প্রসাদের আছে। প্রচুর অর্থের প্রলোভনে উঁচু স্তরের সাক্ষী বর্তমান সমাজ জীবনে এখানে সেখানে অনেক। একটু প্রলোভন, একটু ইংগিতে তারা কোর্টের সামনে হলপ করে মিথ্যা কথা হাসতে হাসতে বলতে পারে। এই সুযোগ নিয়ে প্রসাদের দল তাদের ব্যবসা চালায়। আজকের মত এমন সুযোগ হয়তো আমি আর পাব না। এবার প্রসাদকে আপনার হাতেই তুলে দেব। আমি সত্যিই উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি। আপনি আজ আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। অক্ষম আমি এমনি একটি সুযোগের আশায়ই ছিলাম।

বনওয়ারীবাবু সত্যিই কিন্তু মিঃ মুখার্জিকে ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। খেতে বসে অনেক কথাই তিনি বলেন। সুশিক্ষিত বনওয়ারীবাবুর কথা শুনে মিঃ মুখার্জির বড় ভাল লাগল। কথায় কথায় বনওয়ারীবাবু বলেছিলেন, প্রশান্ত অনেক বড় বড় লোকের সাথে শুধু পরিচিতই নয়, মুগেরে সমাজক্ষেত্রে ওর প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

বনওয়ারীবাবুর স্বার্থহীন দীর্ঘশ্বাসে মিঃ ব্যানার্জির কথাই মিঃ মুখার্জির বারে বারে মনে পড়ে—আই শ্যাল গেট মাই রাবেট ফ্রি।

রাত তখন হয়ত ন'টা। সিগারেট কিনে দোকানিকে পয়সা গুণে দিচ্ছিলেন। সহসা মিঃ মুখার্জি চমকে উঠেন। যজ্ঞেশ্বর যে!

তিনজন লোক! পথ বেয়ে চলছিল। একজনের গায়ে শুভ্র খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপর জহর কোট। কেন জানি মিঃ মুখার্জির মনে হল সাথের লোকটি প্রশান্ত বলে। বুঝতে পারলেন না ওরা ওকে দেখেছে কিনা। ওসব শুনে বনওয়ারীবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে টেলিফোন তুলে নিলেন।

পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

শীতের রাত। মিঃ মুখার্জি ঘুম থেকে উঠেই দেখেন বনওয়ারীবাবু ওকে ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি করুন।

বনওয়ারীবাবুর সাথে মিঃ মুখার্জি ঘরের বাইরে এসে দেখেন সবাই প্রস্তুত। ঘড়ির দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন, রাত দু'টা।

অনিতাকে পেয়ে মিঃ মুখার্জি বুঝতে পেরেছিলেন যজ্ঞেশ্বরবাবু ওকে দেখতে পায়নি। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে পাওয়া গেল না।

অনিতার সীমাহীন দুঃখে বনওয়ারীবাবুর সহানুভূতি দেখে মিঃ মুখার্জি অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশান্তের ঘরের উপর বনওয়ারীবাবুর কঠোরতায় তিনি স্তম্ভিত হন।

এরই পরেই মিঃ মুখার্জি ক্ষিপ্র গতিতে যজ্ঞেশ্বর এবং নন্দাকে গ্রেপ্তার করেন। হিড়হিড় করে থানার হাজতে ভরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

কুমারীবাবু মিঃ মুখার্জিকে অভিনন্দন জানালেন।

হতভাগা পিতা অনিতাকে পেয়ে অশ্রু চেপে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। মা মেয়েরঃরক্তমুক্ত মুখখানি বুকের উপর চেপে ধরে আদরে কাঁদে।

পরম তৃপ্তিতে মিঃ মুখার্জি হেসে উঠেন। মিঃ ব্যানার্জির স্পর্ধার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবেন বলে তিনি উৎসাহিতও কম নন। একটু গর্ব হয়েছিল বৈকি।

পরম উৎসাহে মিঃ মুখার্জি একদিন কোর্টের সামনে ওঁর আবেদন পেশ করলেন। ভারতীয় আইনের চোখে সবাইকে আপাতঃদৃষ্টে দোষী বলে তিনি অভিযুক্তদের বিচারপ্রার্থী।

বিচার চলতে থাকে। অপরপক্ষের খরচের বহর দেখে তাক্ লেগে যায়।

পুলিস প্রসিকিউটারের কথায় একদিন মিঃ মুখার্জির দু' চোখে বিস্ময় ফুটে বেরোয়। অস্ফুট শব্দ করে তিনি বসে পড়েন।

সাক্ষীরা সব উল্টোপাল্টা বলছে।

নিরুপায় পুলিস প্রসিকিউটারও প্রশ্ন করেন—এখন উপায় ?

মিঃ মুখার্জিও ভেবে পাননা কি করবেন।

সাক্ষীদের কথায় ভেতর কার যেন পরিচিত সুর ভেসে আসতে থাকে।

পুলিস প্রসিকিউটারের আবেদনে কোর্টের কাজ আপাততঃ স্থগিত রইল।

আবার বিচার আরম্ভ হয়। হঠাৎ মোড় ঘুরে গেছে। কোর্টের সামনে সাক্ষীদের সত্যি কথায় মিঃ মুখার্জি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। পুলিস প্রসিকিউটার উৎসাহে মা ছাড়া দিয়ে উঠেন। প্রসাদের মুখের দিকে মিঃ মুখার্জি বার বার চাইছিলেন। ভাবছিলেন, প্রসাদ নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলে মনে করে।

নিজের আত্মবিশ্বাসে পরম নির্ভরশীল মিঃ মুখার্জি পুলিস প্রসিকিউটারের কথায় আঁৎকে উঠলেন। হতাশায় ভেঙে পড়লেন। ওঁর হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে। সব কিছুই যেন ওর ইচ্ছা শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে।

ভেতর থেকে কে যেন গর্জে ওঠে। এত বড় পরাজয় মেনে নিতে মিঃ মুখার্জি পারেন না। তিনি একবার দেখতে চান প্রসাদের বল কত শক্তি রাখে।

অনিতাদের ঘর তেমনি করেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভাংগা ঘর। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করা। হাওয়ায় একটু একটু দুলছিল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে মাঝে মাঝে শব্দ ভেসে আসে। মুনিবাঁশের দরজাটা ভেতরের দিকে একটু ঠেলে দিতেই, দু' চোখে তীব্র দৃষ্টি নিয়ে একটা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাকছিল। আওয়াজ বড় ক্ষীণ। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে। খালি ঘর, অনিতারা সব পালিয়েছে। প্রসাদের মনায় অন্য কোথাও হয়তো চাঁদ ঘরই বেঁধেছে।

মিঃ মুখার্জি বড় আশা করে কুশারীর কাছে অনিতাদের ঠিকানা চাইলেন। সব বৃথা। মিঃ কুশারী সব কথা খুলে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

যার উপর অত্যাচার সেই অত্যাচারিতা অনিতার অবর্তমানে অসহায় বিচারক সবাইকে খালাস দিলেন।

প্রসাদ, ব্রজেশ্বর, নন্দা সবাই যুক্তকরে বিচারককে নমস্কার জানাল। নীরবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসতে হাসতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়।

মিঃ মুখার্জি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ওঁর মন মুংগেরের এক নোংরা পল্লীর মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। অনিতার উপর নৃশংস অত্যাচারের চিহ্ন যেন ওকে বার বার ধিক্কার দিতে থাকে। অনিতার অশ্রুরুদ্ধ আকুল আহ্বান তখনও চাঁদে অস্থির করে তোলে। চারিদিক থেকে অনিতার সে আর্তনাদ ওকে স্থির থাকতে দেয় না। মনে হয় প্রসাদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েও অনিতা আপন জনের কাছ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না।

দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করতে গিয়ে মিঃ মুখার্জি সহসা থমকে পড়লেন।

গুড্ মর্ণিং মিঃ মুখার্জি। আই হ্যাভ গট্ মাই প্রমোশন স্লিপ। থ্যাংক ইউ স্যার।

মিঃ মুখার্জির মনে হল মিঃ ব্যানার্জি যেন ওঁর মুখের উপর সপাং করে চাবুক বসিয়ে দিল। তীব্র আত্মাবমাননায় মিঃ মুখার্জির মুখটা কুঁচকে গেল।

# শিল্পচিন্তার নূতন যুগ

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দীর্ঘকাল সুপ্তিমগ্ন থাকবার পর রেনেসাঁসের শিল্পসাধনাকে অবলম্বন করে রোমক সভ্যতা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে নূতন আলোকে ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে তোলে—রেনেসাঁসের শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে আপন সত্তার সঙ্গে ইউরোপের নূতন করে পরিচয় ঘটে, তার জীবনের আদর্শ ও মূল্যমানের পুনরুদ্ধার নির্ণীত হয়।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে রূপশিল্পকে আত্মচিন্তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, যে সৃজন প্রতিভা মানুষকে সভ্যতা ও আত্মোন্নতির পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে চলেছে যুগে যুগে মানুষ তার পরিচয় রেখে চলেছে শিল্পে এবং সাহিত্যে সঙ্গীতে এবং নাটকে।

মানুষের আত্মোপলব্ধির পরিচয় বিধৃত হয়েছে তার সৃষ্টিতে। আবার নিজেকে চিনবার জন্য, নিজের সত্তা পরিচয় অবগত হওয়ার জন্য তাকে যুগবাহিত নিজের সৃষ্টিকেই বারংবার অনুধাবন করতে হয়েছে। অনেকদিন পর হারিয়ে যাওয়া নিজের সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য দিশাহারা ইউরোপীয় মানস প্রাচীন যুগোত্তর গ্রীক ও রোমক শিল্প সাধনার অনুধ্যানে ব্রতী হয়েছিল এবং সেই শিল্প সাধনার গভীরে আপন সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করে আত্মস্থ হয়েছিল।

সৃজনধর্মী ভারতীয় মানস সুপ্রাচীন যুগ থেকে যে শিল্প সৃষ্টি করে এসেছে নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও তার সঙ্গে চলিত প্রাণ প্রবাহের যোগ কখনও আজ পর্যন্ত ছিন্ন হয় নাই। এখনও অসংখ্য মন্দিরের প্রাচীরে ও গর্ভগৃহের মণিকুট্টিমে যুগবাহী শিল্পের প্রত্যক্ষ রূপটি সন্ধানীর জন্য প্রতীক্ষমান। প্রলয়কাল উত্তীর্ণ হয়ে ভারত আবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ভারতশিল্পও অক্ষত কালোত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানের কূলে উপস্থিত। এখানে তাই ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের মত ইতস্তত: অতীতকে খুঁজে ফিরতে হবে না। বর্তমানের প্রবহমানতার মধ্যেই অতীত এখনও এখানে প্রাণবন্ত। শুধু উপযুক্তভাবে চিনে নেওয়ার অপেক্ষা তার প্রতীক্ষা।

এই প্রবহমান শিল্পকে চিনে নেওয়ার কোন উৎসাহ জনসাধারণের ছিলনা কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। স্বতঃসিদ্ধভাবেই চলমান সমাজের প্রাণধারার সঙ্গে এই শিল্পও ছিল অঙ্গাঙ্গীজড়িত। বিশেষ করে এই শিল্পের মধ্যে অর্থ ও তাৎপর্য খোঁজার কোন সার্থকতা কেউ বড় একটা অনুভব করে নাই। স্বভাবের আলো-বাতাসের মতই শিল্পেও ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষের সহজাত উত্তরাধিকার—এই শিল্পের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ে তার কোন দ্বিধা বা প্রশ্ন ছিল না—ভক্তির মাধ্যমে তার উপভোগের ক্ষেত্রেও কোন দ্বৈত ছিল না। সাধারণ মানুষ অবশ্য যেখানে ছিল দ্বিধাহীন, সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তার উপভোগ প্রবণতা ছিল পরিতৃপ্ত—পণ্ডিত মহলে দেখা দিয়েছিল তার ব্যতিক্রম। নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত মহলের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিচ্যুতি ঘটায় প্রবহমান শিল্প সম্পর্কে তাদের উপভোগ প্রবণতা ক্ষীয়মান হয়ে এসেছিল। তাদের মনে নানা দ্বন্দ্ব নানা উদ্বেগ নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল

দীর্ঘকালের প্রবল পৌত্তলিকতা বিরোধী মুসলমান সংস্পর্শের মধ্যেও যারা স্বাধিকারে আস্থার থেকে শিল্প তথা প্রতিমার মূল সংবেদনটিতে স্থির ও অটল থাকতে পেরেছিল নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোড়নে তাদের মধ্যে দেখা দিল দ্বিধা। এই দ্বিধার মূলে ছিল প্রবহমান শিল্পধারার সঙ্গে যোগের বিচ্যুতি এবং তার অর্থবোধের অভাব। ফলে উনবিংশের বাঙালীর মধ্যে সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিমার রূপোপলব্ধিকে পৌত্তলিকতা আখ্যায় অভিহিত করতে অনেকেই দ্বিধা করে নাই। ফলে সমাজের একটা বড় অংশই শিল্পধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। প্রবর্তিত পাণ্ডিত্যের সন্ধানুসরণকারীরাও শিল্পধ্যানের তত্ত্বগত অনুশীলনের আর বড় একটা উৎসাহী ছিলেন না। ফলে শিল্প চিন্তার অনুশীলনে একটা ছেদ ঘটে এবং পাণ্ডিত্যের পথে শিল্পের অনুধ্যান বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ভারতীয় শিল্পের মূল্যায়নের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্য তখন কেবল স্বকীয় শিল্প রস প্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্পধারার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাইরের বৃহত্তর জগতের শিল্প সৃষ্টির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। বিদেশীয় ও বৈদেশিক শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ঐশ্বর্যও তখন জগৎ সমক্ষে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। এই মূল্যায়নে ইউরোপীয় দৃষ্টি ভারত শিল্পে প্রেয় বা শ্রেয় বড় একটা কিছু দেখতে পায় নাই এবং এসম্বন্ধে তাদের কোন বিশেষ উৎসাহও ছিল না। পরে ভারতীয় শিল্পের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য যে ইউরোপীয় শিল্পসন্ধানীদের কিছু বিস্মিত না করেছে তা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাই এক শ্রেণীর শিল্পসন্ধানী ভারত শিল্পে গ্রীকোরোমক শিল্পের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। এই নূতন মূল্যায়নে তখন অনেক ভারতীয়ও বিনিদ্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়ে গ্রীকোরোমক শিল্পের আভিজাত্য ও তুলনায় ভারতশিল্পের ন্যূনতা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এই সময়েই প্রথম ইউরোপীয় দৃষ্টিতেই ভারতশিল্পের মহনীয়তা স্বীকৃত হতে থাকে। হিগেল স্থির তার স্বাভাবিক ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতশিল্পের যে মূল্যায়ন করেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের মতই শিল্পের এই সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রভূত কৃতিমতা লক্ষ করা যায়। এরপর কারগুসন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের কিছু মূল্যায়ন করেন যাতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকতাকে অতিক্রম করে কিছু পরিমাণে শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে হ্যাভেলের মূল্যায়ন বহু পরিমাণে ভারতীয় মনকে স্পর্শ করে থাকলেও সেই মূল্যায়নে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য অস্বীকার করা যায় না। এই মূল্যায়নের ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট মমত্ববোধ ও উচ্চগ্রামের শ্রদ্ধা থাকলেও যে মাপ কাঠিতে হ্যাভেল তার এই পরিমাপ করেছিলেন তা মূলত ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দৃষ্টি ও অনুভূতির দিক থেকে কৃত্রিম। এরপর স্বামী বিবেকানন্দ ভারস্বরে ভারতীয় শিল্পের মৌলিকতা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বামী শিষ্যা নিবেদিতা তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে ভারত শিল্পকে সাধারণের চোখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই উৎসাহ এবং ভারত শিল্পের দিকে সত্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যে অনেকটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় ভারতশিল্পের এই নূতন আবিষ্কর্তারা সেই অবলুপ্ত শিল্পধারা থেকে নূতন জীবন চেতনা সংগ্রহ করার উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। এই নূতন আলোকনে অনেকটা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মত আহ্বান ছিল নূতন উদ্দীপনা ও নূতন চেতনা সৃষ্টির।

এর পরে আনন্দকুমার স্বামী নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতশিল্পের মূল্যায়নে ব্রতী হন। কুমার-

স্বামীর শিক্ষা তথা দৃষ্টি জোড়াতে ইউরোপেরই আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু অন্বেষণ ও অনুধ্যানের দ্বারা কুমারস্বামী শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই নূতন দৃষ্টিতে ভারতশিল্প এক উজ্জ্বলতর রূপ নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। এই নূতন দৃষ্টিতেই দেখা গেল ভারতশিল্পে ছেদ পড়ে নাই; এই ধারা স্বতঃই প্রবহমান। যারা এই ধারা থেকে বিচ্যুত তারাই নানাভাবে এর মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিচারের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে—নির্ধারিত হয়েছে তার মূল্যমান। এই মূল্যায়নের অন্বেষণ এখনও প্রকৃত উৎসাহের সঙ্গে আরব্ধ হয় নাই। কিন্তু তার অনুশীলনে আর বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আজ তথা-কথিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জানা উচিত যে ইউরোপীয় মূল্যায়নের মত ভারতও তার শিল্পকর্মের জন্য নিজস্ব মূল্যায়নের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের নিজস্ব চিন্তার জগতে এই শিল্পভাবনা, শিল্পপ্রশ্ন কিছু নূতন নয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই এই শিল্প-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে এই শিল্পচিন্তা পরিপুষ্টি লাভ করে সমাজে শিল্পের স্থান এবং শিল্পের মধ্যে রূপশিল্পের স্থান নির্ণীত এবং নির্দিষ্ট হয়। এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গেই বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ বলেন—

যথা সুমেরু প্রবরো নগানাং যথাওডুনাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরানাং প্রবরঃ ক্ষিতীশস্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥

এখানে বলা হচ্ছে কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্প বা রূপশিল্পই প্রধান।

কাশ্মীরের শৈব-সাধক পণ্ডিত অভিনব গুপ্ত শিল্পের জগতে রসের বৈশিষ্ট্য এবং সংবেদন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পচেতনার বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে অভিনব গুপ্তের আদর্শ ছিলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। পরে শিল্প-বিচারের আদর্শ বহু তাত্ত্বিককে অনুপ্রাণিত করেছে। এই শিল্প বিচারের মানদণ্ড শিল্পের রসে। রসই শেষ পর্যন্ত শিল্পের উপভোগের উপকরণ—শিল্পে তাত্ত্বিক মানদণ্ড। সেই প্রাচীন উক্তি "রসো বৈ সঃ" ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানদণ্ডের মত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রূপশিল্পের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড এখনও ব্যবহার হয়নি। যামিনীকান্ত সেন কিছুকাল ভারতীয় রসের মানদণ্ড নিয়ে রূপশিল্পের বিচারে ব্যবহার করেছিলেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাগেশ্বরীশিল্প বক্তৃতাবলীতে রূপশিল্পের বিচারে ভারতীয় মানদণ্ডের প্রয়োগ ও ব্যবহারের নূতন রীতির পত্তন করেন।

---

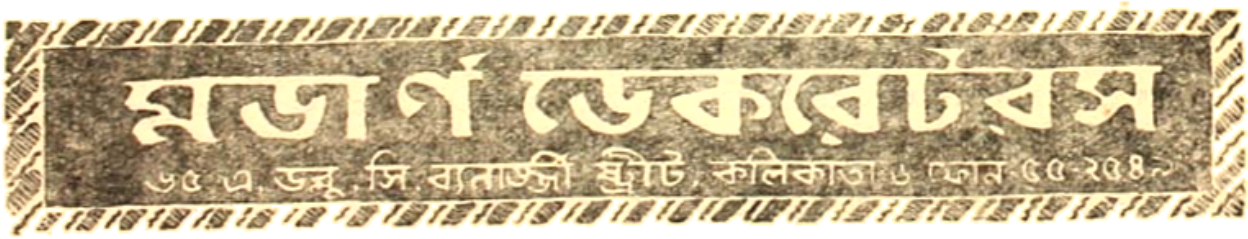

# কান্না

## সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মামীসাহেবার বাড়ি গিয়ে সমাজের একটা নূতন রূপ দেখলুম। বুঝতে পারলুম যে আমাদের দেশে সমাজ একটা নয়, দুটোও নয়, সমাজ অনেক; এবং তাদের প্রত্যেকটির ভিন্ন রূপ। এদের একজনের সুখ দুঃখ আর একজনের সঙ্গে মেলেনা, একজনের সমস্যা আর একজনের মতো নয়। পরিবের কান্না আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু মামীসাহেবার কান্নার কথা কি কেউ জানতে পেরেছে!

বিমল আমার মিত্র, আর মামীসাহেবা তার নিজের মামী। কিছুদিন আগেও বিমল কলীর রোডে তার মামার বাড়িতে থেকে চাকরি করত। সম্প্রতি একটা মেসে এসে উঠেছে। কেন উঠে এল। সে কথা সে কোনদিন ভেঙে বলেনি।

বিমলের সঙ্গে আমি কলেজে পড়তুম। লেখা-পড়া ওর ভাল লাগেনা বলে আই-এস-সি পাশ করে, ও একটা কারখানায় ঢুকল। আর আমি স্কলারশিপ নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম। বিমল এখন নিজেকে মিস্ত্রি বলে পরিচয় দেয়। বলে, মানের শিছনে লেজুর না থাকলে কি আর ইঞ্জিনিয়ার! মোড়লে আর মন্ত্রীতে যেমন তফাৎ। সরকারি গদীতে বসে মোড়লি করলেই বলে মন্ত্রী।

এ যে বিমলের একটা ক্ষোভের বিষয় তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ক্ষোভের সঙ্গে মামীসাহেবাও জড়িয়ে আছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। নিজের চোখে মামীসাহেবার সমাজটা আমি তখনও দেখিনি।

আমার দুরবস্থার কথা বিমল কার কাছে শুনেছিল জানিনা। একদিন তিনকড়িদার বৈঠকখানায় এসে হাসলা শুরু করল, বলল: তুই নাকি ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছিস?

সত্যি কথা স্বীকার করলুম। সেই সঙ্গে মানুষ মারার গল্পটাও বললুম তাকে। প্রথমটায় বিমল কোন উত্তর দিতে পারেনি। তারপরে সামলে নিয়ে বলল: সংস্কৃতে একটা কথা আছে না?—"শতং মারি ভবেৎ বৈদ্য।

সে সংস্কৃত আমলের কথা। আমার হাতে আর একটা মরলে আমাকে পাগলা গারদে যেতে আর আমাকে ডাক্তারী করতে বলিসনে।

বিমল আমাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে বলল: চল তাহলে মামীসাহেবার কাছে।

মামীসাহেবার অনেক গল্প আমি তার কাছে শুনেছিলুম। তাঁকে দেখবার ইচ্ছাও যে আমার হয়নি তা নয়। কিন্তু আজ তার এই প্রস্তাবে বিস্মিত হলুম। বললুম: মামীসাহেবার কাছে কেন?

ডাক্তারী যখন করবিই না, তখন একটা কিছু তো করতে হবে। রাঙাদা শুনছি একটা নতুন কার্ম খুলছেন।

এই রাঙাদার গল্পও আমি বিমলের কাছে শুনেছি। বেলগাছিয়ার এক আত্মীয়ের বাড়িতে

থেকে যাতায়াত করতেন। দশ বছর আগেও ছেঁড়া চটি ফটর ফটর করে বেলগাছিয়া থেকে বালিগঞ্জ যেতেন পায়ে হেঁটে। সে কথা আজ আর কারও মনে নেই। রাতারাতি এখন মামীসাহেবার সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা চালাচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতায় ধনী সমাজে এখন তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

বছর দশেক আগে ছ বছরের ছেলে বেবাশীষ আর বছর চারেকের মেয়ে ডোরাকে নিয়ে মামী-সাহেবা স্বামীকে ছেড়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, অথচ কলকাতার বাড়ীতে স্বামীর ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মামীসাহেবা তাই স্বামীকে শান্তিনিকেতনে রেখে, বাপের বাড়ির দেশ কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁর অভিভাবক দাদারা।

কলকাতায় আসার পর আরও দুটি সন্তান হয়েছে মামীসাহেবার। নিজের প্রাণের চেয়েও ছেলেমেয়েরা তাঁর প্রিয়। তাদের জন্যে করতে পারেন না এমন কাজ নাকি মামীসাহেবার অভিধানে নেই। তাই যখন নিন্দুকেরা তাঁর নামে নানা রকমের নিন্দা ছড়িয়েছে, তিনি একটুও বিচলিত হননি। সবার সব কথা শুনতে গেলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হত।

শৈশবে বাপ মা হারিয়ে বিমল দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিল। মামাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। আমিও একবার তাঁকে বিমলের সঙ্গে দেখেছিলুম। অমন ধনী অথচ অমন মাটির মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি। বয়স হয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু কর্মঠ চেহারা। গায়ে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে বিদ্যাসাগরের চটি। হাতে একগাছা লাঠি সম্প্রতি নিয়েছেন। চশমার পুরু কাচের ভিতর তাঁর গভীর দুটি বড় অন্তর্মনস্ক দেখায়। সারাক্ষণ যেন কিছু ভাবছেন। ঘরিয়ার আশে পাশে তাঁর অনেকগুলো কারবার খনি। মোটা মাইনের ম্যানেজারদের কাজ কর্ম তিনি নিজেই দেখেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কলকাতায় আসেন না। এলে ভাগনের কাছেও আসেন একবার।

সেবারে তিনি যখন এসেছিলেন, আমি তখন বিমলের ঘরে বসেছিলুম। নিজের হাতে নানা রকমের জিনিষ ঘরে এনেছিলেন। ধানবাদের চিত্তরঞ্জন সন্দেশ খেতে বিমল ভালবাসত। ক্ষীর নয়, ছানাও মনে হয় না, কিন্তু অপূর্ব স্বাদ। আমারও খেয়ে ভাল লেগেছিল। বিমল বলেছিল: তুমি এখনও এসব মনে রেখেছ?

মামা হেসে বলেছিলেন: আমি কি আর মনে রেখেছি! এ তোর দিদিমার কাজ। ঝোড়লে নানা রকমের আচার আছে। কিন্তু বেশি খাসনি যেন।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোর বন্ধু বুঝি?

বিমল বলেছিল: বন্ধু, কিন্তু আমার মতো মিথ্যে নয়। ও ডাক্তারী পড়ছে।

সত্যি নাকি।

প্রচুর খুশী হয়ে বলেছিলেন: ডাক্তারী হল পেশার মধ্যে সেরা। মানুষের সেবা করে পয়সা প্রাণ-রক্ষার চেয়ে বড় সেবা তো আর নেই।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কত দিন বাকি আছে?

বলেছিলুম: আর দু বছর।

তবে আর বেশি দেরি নেই।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বলেছিলেন: তুই তো জানিস, আমাদের কোলিয়ারীতে একজনও ভাল ডাক্তার নেই। তবে তোমাদের কি আর সেখানে ভাল লাগবে?

বলে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

তখন আমার বড় ডাক্তার হবার ইচ্ছা ছিল। লরিস বায়রাজির মতো বড় সার্জন। বলেছিলুম: পাশ করার পর হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করতে হবে।

এর পরে তিনি আমাকে ধরিয়া যাবার জন্য অনুরোধ করেননি। তবে কথাটা মনে ছিল। তাই বিমল যখন রাঙাদার কার্মের উল্লেখ করল, আমি আশ্চর্য হলুম। বললুম: এতলোক থাকতে রাঙাদা আমাকে চাকরি দেবেন কেন?

আলবৎ দেবেন। আমি বললে তাঁর না বলবার সাহস হবে না।

আমি তার এই বিশ্বাসের কারণ জানিনে, তাই খুব বেশি ভরসা পেলুম না।

বিমল জিজ্ঞাসা করল: কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

বললুম: রাঙাদা তো তোর বাবা নন, যে ভাগনের বন্ধু বলে আমাকে খাতির করবেন।

বিমল বলল: মামার চেয়েও বেশি খাতির করবে।

কিন্তু কেন করবেন তা বলল না।

মামীসাহেবার রাঙাদাকে বিমল রাঙামামা কেন বলেনা, সেকথা আমি জানতে চেয়েছিলুম। বিমল তখন বলেছিল: মামা বলব কেন, চোখে সুরমা লাগিয়েও তো কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাইনে। আর আমার মামাকে তো দেখেছিস। তাঁর পাশে—

বলে বিমল একটা ভেংচি কেটেছিল।

কর্ণীয় রোডে মামীসাহেবার বাড়িতে আমি এসেছিলুম শুধু বিমলের জোরে। পূবের দিগন্ত থেকে তখনও অন্ধকার মোছেনি। পশ্চিমের আকাশে কিছু আলো তখনও আছে। আমরা ফটক পেরিয়ে সরাসরি দোতলায় বারান্দায় এসে বসলুম। বসবার ঘর তখনও খোলা হয়নি।

আমি বললুম: বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি।

বিমল বলল: একটু আগে আসাই ভাল। বলা যায়না তো, আজ আড্ডা হয়তো অন্য বাড়িতে

তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম।

বিমল বুঝিয়ে বলল: এক একদিন এক এক বাড়িতে আড্ডা বসে। তবে এই বাড়িতেই বেশি। শুধু মামীসাহেবা নয়, রাঙাদাও আছেন কিনা।

এই পরিবেশে আমি খুব সহজ বোধ করতে পারছিলুম না। বললুম: আমাকে দেখে মামীসাহেবা কিছু বলবেন না তো!

কী আবার বলবেন! তাঁর কাছে তো কিছু চাইতে আসিনি!

সত্যি কথা, কিছু না চাইলে অসম্মানের ভয় নেই। বাড়িতে আমরা নতুন আগন্তুক দেখলে ভয় পাই, হয়তো কিছু চাইতে এসেছে। কিংবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। তাইতেই আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। যে কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করেনা, সমাজে তার দাম আছে। মনে মনে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে বিমল বলল: তুই এত ভাবছিস কেন?

বললুম: যখন বেড়াতে আসতে চেয়েছিলুম, তখন একদিন আনলিনা। এখন চাকরির উমেদারিতে এসেছি বলেই লজ্জা হচ্ছে।

সে ভাবনা তো তোর নয় জ্যোতির্ময়। তোর সামনে আমি কাউকে কিছু বলব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।

তারপরে আমাকে ভোলাবার জন্যে বামীসাহেবার গল্প শুরু করল। বলল: কাল নিউমার্কেটে ডালমুট কিনতে গিয়ে বামীসাহেবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশ মুষড়ে আছেন দেখলুম।

কেন?

মেবানীবের অসুখ করেছে। সন্দেহ করছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস।

সর্বনাশ: তাতে খুশী হবার কী আছে!

বিমল হেসে বলল: বাড়িতে বহু ডাক্তার যাতায়াত করছেন, অনেক বন্ধু বান্ধব আসছেন খোঁজ বেশ সরগরম ব্যাপার। তার ওপর—

বিমল থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তার ওপর কী?

ডাক্তার রায় নামে একজন নতুন সার্জনের খোঁজ পাওয়া
ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বিমলের বোধহয় দয়া হল। বলল: গল্পটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি। কবীর রোডের বাড়ি আমি বাইরেই দেখেছিলুম। আর সমস্ত খবরই পেয়েছিলুম সোকারের কাছে। তাই ডালমুটের লাইনে যাবার আগে দয়ারামের দোকানে একবার উঁকি দিয়ে গেলুম। বামীসাহেবা খান কয়েক রঙরঙকে শাড়ি কিনছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কথা বললিনা কেন?

বিমল ঝাঁংকে উঠল: পাগল হয়েছিস! তেলকালি মাখা কারখানার মিস্ত্রিকে তিনি চিনতে পারতেন!

তারপরেই হেসে বলল: ডালমুট চিবোতে চিবোতে পিছন দিয়ে ফিরছিলুম। হঠাৎ একটা সরু গলিতে আটকে গেলুম। একি, বামীসাহেবা যে! শাড়ির রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ম্যাচিং ব্যাগ কিনছিলেন, বললেন, একি বিমল যে! আশ্চর্য ব্যাপার! আনন্দে আমি খপ্ করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললুম। বামীসাহেবা বললেন, খোকার খবর জানতো? ভক্টর রায় অপারেশন করছেন। অদ্ভুত সার্জন, বিলেত থেকে এক গাদা ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: খুব সিরীয়স কেস নাকি?

ক্ষেপেছিস তুই! এ সব অসুখের আলোচনা কি যেখানে সেখানে করতে পারি!

ব্যাগের দাম চুকিয়ে দিয়ে বামীসাহেবা চটির খোঁজে গেলেন, আমিও পালিয়ে বাঁচলুম।

বিমলের কথায় আমার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। মেবানীবের অসুখের সম্বন্ধে তার এতটুকু কৌতূহল নেই। আমি চারিদিকে একবার চেয়ে নেখলুম। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোন সাড়া শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলুম: বাড়িতে কি কেউ নেই?

কে থাকবে এখন?

মেবানীব আজ্ঞা দিতে গেছে, আর মেয়েরা গেছে বেড়াতে।

বামীসাহেবা?

বিমল আঙুল দিয়ে তিন তলাটা দেখিয়ে দিল। বলল: স্নান সেরে বেরবার সময় হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে একটা সুগন্ধ এসে নাকে লাগল। আর একজন উর্দিপরা বেয়ারা যেন সেই সৌরভকে অনুসরণ করে তরতর করে নেমে এল।

আমি বিমলের দিকে তাকিয়েছিলুম। বিমল বলল: মাসীসাহেবা স্নানের ঘর থেকে বেরুলেন।

এখনি নামবেন বুঝি?

প্রণাম হোক।

যে লোকটা নেমে এসেছিল, সে আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। বসবার ঘরের দরজা খুলে জমাদারকে ডাকল। সোফা কোচের ঢাকনাগুলো সরিয়ে গুটিয়ে রাখল।

বিমল বলল: ঘর পরিষ্কার করে, কুকুরে হয়তো নোংরা করে রেখেছে।

এ সবে আমার মন ছিল না। আমি ভয়ানীয়ের কথা ভাবছিলুম। বললুম: আজ্ঞা দিতে গেছে?

বিমল বলল: পরীক্ষার আগে ওদের এই রকমের অসুখ করে। কিছুদিন আগে ডোরারও কী একটা হয়েছিল। তার জন্যে স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়। সেও ঠিক এমনি ঘটনা। মাসীসাহেবাকে মুভে দেখেছিলুম নিউ মার্কেটে। শাড়ি কিনছিলেন, বললেন, ডোরার কথা শুনেছ তো! সহজে ওদের ছেড়ে দিচ্ছিনে। মিটার বাসুকে চেন? গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন। তিনিই ঠিক নিচ্ছেন।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ আর কী! লোয়ার কোর্টের অপদার্থ উকিলেরা মামলাই দাঁড় করাতে পারল না।

বলে বিমল হাসতে লাগল।

এই সময় দরওয়ানকে দেখা গেল সিঁড়ির উপর। একটা বিরাট আলসেসিয়ান কুকুর তাকে টেনে আনছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে লোকটা যেন যুদ্ধ করছে। কুকুরটা এক দণ্ড তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না।

বিমল বলল: আর এগোসনে বাবা, ঐখেনেই থাক।

কিন্তু ভয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে পিছিয়ে গেলুম।

বিমল উঠে দাঁড়াল, বলল: মাসীসাহেবা নামছেন।

সিঁড়ির উপরেই আমি তাঁকে দেখতে পেলুম। চকচকে কাঁচা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছেন, গায়ে একই রঙের জামা। পায়ে হলদে চটি, সোনালি কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝিলে দিয়ে কাঁধ থেকে ঝুলছে। আমি এক নজরে তাঁর অলঙ্কারও দেখে নিলুম। কানে একটা করে মুক্তো, গলায় মুক্তোর মালা; হাতে এক গাছা করে চুড়ি, তাও মুক্তোর। বাঁ হাতের আঙুলেও একটা মুক্তোর আংটি। তাঁর বয়স অনুমান করতে আমি পারলুম না, কিন্তু এটুকু বুঝলুম যে মেদের আধিক্য যদি তাঁর দেহটাকে বিব্রত না করত, তাহলে তাঁর এই বয়সেও ছুড়ি বলা তার হত।

বিমল কিছু বলবার আগেই কুকুরটা তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ল। মাসীসাহেবা ভয় পেলেন না, শুধু নিজের বাম হাতটা শূন্যে তুলে ধরলেন। দেখলুম, তাঁর সেই হাতে বেড়ালের বাচ্চার মতো আর একটা কুকুর নিশ্চিন্ত নিরাপদে মিটমিট করে চাইছে।

কুকুর বাঁচিয়ে বিমল তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল: আজ আমার বন্ধু জ্যোতির্ময়কে সঙ্গে এনেছি।

ছুটে কুকুর ধারা দিয়ে তাঁর জাঁচলটা নামিয়ে ফেলেছিল। সেটি সামলে নিয়ে বললেন : তোমার কারখানার বন্ধু বুঝি !

বিমল প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেল না। মামীসাহেবা হাত জোড় করে আমার নমস্কারের উত্তর দিয়ে বললেন : তোমরা একটু ব'সো বিমল, আমি ওঁর রাত্রের কাছ থেকে চট করে ঘুরে আসছি।

বলতে বলতেই তিনি নেমে গেলেন। আলসেসিয়ান কুকুরটাও গেল তাঁর সঙ্গে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বিমলকে বললুম : চল এবারে।

কিন্তু বিমল আবার বসে পড়ল : আমাদের কাজ তো রাঙাদার সঙ্গে।

কেন জানি না, রাঙাদাকেও একবার দেখবার বাসনা আমার ছিল। আমিও বসে পড়লুম।

দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে ঘণ্টা অনেকক্ষণ আগে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে ঘরের ও বারান্দার সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বেয়ারা নেমে গেছে।

এক ভদ্রলোককে দেখলুম চোরের মত অতি সন্তর্পণে এসে পাশের ঘরে ঢুকলেন। কোনদিকে চাইলেন না, কারও খোঁজ করলেন না। বিমল তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল বলে দেখতে পেল না।

খানিকক্ষণ পরে মেয়েরা ফিরল কলরব করে। ডোরাকে দেখলুম সকলের আগে। কর্সা তন্বী মেয়ে। বছর চোদ্দ বয়স। ফ্রকের উপর বেণী দুলছে, শাড়ি পরলেই যেন শোভন হত। ছোট বোন দুটির সঙ্গে তর্ক করতে করতে উপরে এল।

ওমা, বিমলদা যে !

বলে ডোরা এগিয়ে এল, বলল : ভালই হল, উত্তরটা তাহলে তোমার কাছেই পাব।

একটি ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করল : বল তো, কার মা আকোলার এক বাইজী ?

বিমল তৎপর ভাবে উত্তর দিল। কেন, সেই মেয়ের !

মেয়েরা উদ্দামভাবে হেসে উঠল। ডোরা বলল : এই না হলে বিমলদা।

আর একটি মেয়ে বলল : মাষ্টার মশাই আসেনি ! তাকেই ধরা যাক।

বলে পাশের ঘরটায় সবাই ঢুকে গেল।

বিমল বলল : দিনেমা ষ্টার নিয়ে এখন গবেষণা হবে। ঠিক মতো উত্তর দিতে না পারলে ভদ্রলোকের অন্ন উঠে যাবে।

আমার আর ভাল লাগছিল না। বললুম : রাঙাদা কখন আসবেন ?

তার কি ঠিক আছে ! দু'একজন নতুন মানুষ সংগ্রহ হলেই চলে আসবেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল : মামীমার মামীসাহেবা নাম কেমন করে চালু হয়, সে গল্প কি তোকে বলেছি ?

বললুম : না।

বিমল বলল : সে এক আলুওয়ালার কাণ্ড।

সেকি !

বিমল আমার ভুল বুঝতে পেরে বলল : আলুর কারবারী নয়, নাম আলুওয়ালা, না ঐ রকমের একটা কিছু। গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরে। কোন্ দেশের মানুষ তা জানিনে, তবে এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করে বাঙালী বাড়িতে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারতেন কিনা তিনিই

জানেন, তবে মাঝে মাঝে অকারণে হাসতেন। তিনিই এই নাম দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা সাহেবি কায়দায় 'মামি' বলত, আমি বলতুম মামীমা, ভদ্রলোক মামীসাহেবা বলতে লাগলেন, বোঝলুম ভাবলো, এ একটা সম্মানের ডাক হল।

আমি হাসতে পারলুম না। নিচে মোটর আসার শব্দ পেলুম। তারপরেই সিঁড়ির উপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ। মামীমা প্রথম দলের সঙ্গেই এলেন।

আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি বললেন : তোমরা বাইরে কেন বিমল, ভেতরে এস।

বলে সবাই বসবার ঘরে ঢুকলেন :

একে একে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। সস্ত্রীক মিষ্টার চৌধুরী ব্যারিস্টার, কুমার সাহেব রাজা প্রসাদ মিত্রের নাতি, মিসেস মৈত্র—সলিসিটার মিষ্টার মৈত্রের আজ একটা জরুরী কাজ আছে। ইত্যাদি।

নিজেদের সুবিধার জন্য আমরা দেওয়ালের ধারে একটা ডিভানের উপর বসেছিলুম। দুজন মহিলার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এলেন, তাঁকে দেখতে পেয়েই বিমল আমাকে একটা চিমটি কাটল, বলল : রাঙাদা।

ভদ্রলোক পুরোদস্তুর সাহেব, বয়স পঁয়তাল্লিশের নিচেই মনে হয়। বাঁ হাতে ঠোঁটের পাইপটা নামিয়ে সকলকে অভিবাদন করলেন। আর ডিভানে বিমলকে দেখে একটা চোখ ছোট করে খুশী হবার ভাব দেখালেন।

আমি মামীসাহেবার দিকে তাকিয়ে তাঁর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলুম। তিনি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন : মিষ্টার সিকদার এলো না ?

উত্তরটা মিসেস সিকদার দিলেন না, দিল তাঁর মেয়ে : বাবার আজ একটা সরকারি ডিনার

বিমল এদের দেখে খুব খুশী হয়েছিল। চুপি চুপি আমাকে বলল :
ওকে নিয়ে একটু গোলমাল বেধেছে।

আমি পাশ ফিরে তার দিকে তাকাতেই সে বলল : পরে বলব।

বাণী তার মায়ের কাছে বলল না। বলল ঘরের এ ধারটায়, আমাদেরই কাছাকাছি। তারপর বিমলকে বলল : শুনলুম, তুমি আজকাল ভারি কাজের লোক হয়েছ, এদিকে আসবার সময়ই পাওনা।

বিমল উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল।

বাণী জিজ্ঞাসা করল : আজকাল নাকি একটা মেসে আছ ? ঠিকানাটাও আমাদের দিলে না !

আমি দেখতে পেয়েছিলুম যে রাঙাদা এই কথোপকথনের দিকে কান রেখেছিলেন। বিমল : সে একটা বিশ্রী জায়গা বলেই ঠিকানা দিতে লজ্জা পাই।

তাহলে অমন জায়গায় গেলে কেন ?

বিমল হেসে বলল : স্বাবলম্বী হতে।

ঠিক এই সময়ে দরজায় একটা কলরব উঠল : আরে নকুলদা যে, আসুন আসুন, অনেকদিন পরে এদিকে এলেন।

খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরা এই ভদ্রলোককে দেখলুম সকলেই চেনেন। বিমলের দিকে তাকাতেই সে বলল : বাগবাজারের নকুলদা। আড়ালে অনেকে নারদ বলে।

নকুলদা বললেন : কিছু খবরাখবর দেওয়া নেওয়া থাকলেই আমি আসি।

কুমার সাহেব বললেন : সে তো জানি, কিন্তু আজ খবর দেবার জন্যে, না নেবার জন্যে ?

দুই কাজেই।

বলে নকুলদা একটা ছোট চেয়ারে বসলো।

মালীসাহেবের দিকে তাকিয়ে আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। আলসেসিয়ান কুকুরটা তাঁকে এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছিল না। জাঁতলটা বারেবারেই টেনে নামাচ্ছিল। তার লোভ হাতের ছোট কুকুরটার উপর। মাঝে মাঝে যখন তার লম্বা জিভ দিয়ে মালীসাহেবের হাত চেটে দিচ্ছিল, তখন আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠছিল। বিমলকে আমি আস্তে আস্তে বললুম : এবারে ওঠা যাক।

বিমল আমার পায়ে একটা চাপ দিয়ে বসে থাকতে বলল।

নকুলদা তাঁর খবরের জন্যে সবাই উগ্রীব হয়েছেন দেখে বললেন : দেবাশীষের খবরটা আগে জেনে নিই।

কুকুরের দৌরাত্ম্যে মালীসাহেব সোফা থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে পড়েছিলেন। সে শাড়িটা সামলে উঠে বসে বললেন : ডক্টর রায় অপারেশন করবেন।

নকুলদা বললেন : কোন্ রায় ? আমাদের তর্কচঞ্চু মশায়ের নাতি ?

তর্কচঞ্চু মহাশয়কে কেউ চেনেন না। কিন্তু নকুলদা তার পিতৃমাতৃকুলের সম্পূর্ণ হিসাব দিয়ে বললেন : কাল তো তার প্রায়শ্চিত্তের খাওয়া খেয়ে এলাম।

দু একজনে আর্তনাদ করে উঠলেন : কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?

নকুলদা বললেন : অনেকদিন বিলেতে ছিল। প্রায়শ্চিত্ত না করলে ঠাকুর্ঘা দিয়ে খেবেন কেন !

মামীসাহেবা বিহ্বলে ভাবে বললেন : ভট্টর রায়ের বিয়ে নাকি ?

নকুলদা এক গাল হেসে বললেন : ভাটপাড়ার মেয়ে।

একজন বেয়ারা কফি এনেছিল। আর খাবার এনেছিল আর একজন। নকুলদাই প্রথমে একখানা প্যাটি তুলে নিয়ে বললেন : মেয়েদের আগে দেখাও।

বিমল বোধহয় রাঙাদাকে ইশারায় কিছু বলেছিল। আমাকে বলতে বলে বাইরে গেল। রাঙাদাও আর এক দরজা দিয়ে বাইরে গেলেন। আমি তাদের লক্ষ্য করছিলুম। মিনিট কয়েক পরে তাঁরা ফিরে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এবারে উঠব তো ?

বিমল বলল : অত তাড়া কিসের ! কফিটা খেয়ে যাই।

মিসেস সিকদার তাঁর উল খুলে বসেছিলেন। বললেন : ভট্টর রায়ের উপর আমার কোনদিন ভক্তি হয়নি। ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের অভাব আছে বলে আমার মনে হয়েছে।

মামীসাহেবাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

আমরা বেশিক্ষণ বসিনি। কফির পেয়ালা নামিয়েই বিমল উঠে দাঁড়িয়েছিল। মামীসাহেবার অনুমতি নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলুম।

পথে নেমেই বিমল বলল : অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলেই বাইরে দিবি।

মানে ?

মানে, রাঙাদার চরকাচক্রে তোমার চাকরি হচ্ছে, কেরাণীর চাকরি নয়, অফিসার। একটা প্যাচ দিয়ে দিয়েছি। কয়েকমাস নিশ্চিন্ত।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

বিমল বলল : রাঙাদার বিয়ে করবার শখ হয়েছে। তয় পাচ্ছেন মামীসাহেবাকে, আর বাণী এখনও রাজী হয়নি, বয়সের অনেক তফাৎ। চরকাচক্রে রাঙাদার নিজের কার্য, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম : তাহলে প্যাচটা কোথায় দিলি ?

বিমল হেসে বলল : আমি জানি তুই বুঝতে পারিসনি। বাণী যখন আমার কাছে এসে কথা কইছিল, তখন তুই রাঙাদার মুখের চেহারা দেখিসনিতো ! বারান্দায় ডেকে সেই কথাই বললুম। তোকে একটা ভাল কাজ দিলে বাণীকে আমি রাজী করিয়ে নেব। মানে, আমি সঙ্গে দাঁড়ালেই যে সে রাজী হবে, রাঙাদা একথা বিশ্বাস করেন। তিনি তোর নাম ঠিকানা নোট বুকে লিখে নিয়েছেন। দু একদিনের মধ্যে চিঠি পাবি।

চিঠি ঠিকই পেয়েছিলুম কিন্তু তার পরে শুনেছিলুম আরও অনেক কথা।

সন্ধ্যাবেলায় বিমলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার মেসে অপেক্ষা করছিলুম। এমন সময়

নকুলদা এসে উপস্থিত। বিমল বেড়াতে বেরিয়েছে শুনে তাঁর চটিখুলে বিমলের খাটের উপর উঠে বসলেন।

মেসের চাকরকে ডেকে আমি নারকেলের কুচি মেশানো মুড়ি আনিয়ে দিলুম, আর চা। তাই খেতে খেতে বললেন: দরকারটা ঠিক বিমলের কাছে নয়, দরকার তার মামার কাছে ঘরিয়ায়। বিমলের কাছে একখানা চিঠি গেলে এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর ছুটবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তা মামীমাহেবার কাছে চিঠি লিখেন না কেন?

তার উপায় নেই।

কেন?

বড়লোকের ছুরিয়েছে পরোপকারের প্রসঙ্গ তুললে নিজের ঘাতায়াতের পথই বন্ধ হবে। মামীমাহেবার চিঠিতে কি কাজ হবে।

আমার বিস্ময় আরও বাড়ল।

নকুলদা একবার ঘরের দিকে চেয়ে বললেন: ভেতরের খবরতো আপনি জানেন না। বড় গোলমাল চলছে। বিমলের মামার চেয়ে মামীমাহেবা অনেক ছোট, আর বিয়েটাও তাঁকে স্বেচ্ছায় করেননি। রাঙাদার কিছু মাত্র সম্পত্তি থাকলে তিনি তাঁরই ঘরণী হতেন। স্বামীর সঙ্গে এখন শুধু তাঁর পয়সার সম্বন্ধ মনের সম্বন্ধ দশ বছর আগেই চুকে গেছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

নকুলদা বললেন: দিন কয়েক আগে মামীমাহেবাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

কেন?

ঘুমের ওষুধ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন। হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে আমি তাঁর চোখে জল দেখে এসেছি।

একটু নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন: রাঙাদার বিয়ের বরযাত্রী যাবেন তো?

আমি তো নিমন্ত্রণ পাইনি।

পাবেন। রাঙাদার নতুন ফ্ল্যাট থেকে আমরা যাত্রা করব।

এ কথাও আমার কাছে নতুন। শুধু পুরনো মনে হয় একটি কথা। মামীমাহেবার চোখে নকুলদা জল দেখে এসেছেন। সে জল কি সহজে শুকোবে। হয়তো আবার একদিন ঘুমের ওষুধ বেশি করে খেয়ে ফেলবেন। এখন যে ঘুমেরই দরকার।

নকুলদার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখও একটু ভিজে ভিজে।

---

# যৌবন

নীলিমা দাশগুপ্ত

"তোকে ডাকতে ক'টা ঘণ্টা বাধতে হবে শুনি—?" দিদির এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, হাসির পরিচয় নেই। এক ঝট্‌কায় উঠে বসলো হাসি। ঘোলা ঘোলা ঘুম-চোখ মেলে তাকালো দিদির দিকে। দিদির গম্ভীর মুখ, শক্ত চিবুক যেন কেমন অচেনা ঠেক্‌লো ওর। মনে হয়ে গেছে দিদির, কী করে যে দিদিটা স্নান সারে মুখ ধোবার সঙ্গে কে জানে! চোখ বুজলে, ক্ষিপ্রহাতে, এদিক-সেদিক টানাটানি করে, ভুরুর প্রান্ত ছাঁটুর নিচে হাসি টেনে দিলো।—আজ তো রবিবার—, হাসি মুখ তুললো, কিন্তু কথাটা হাসির ঠোঁটের সামনে এসে ঝুলে রইলো, দিদির চোখে বিরক্তির গাঢ় প্রলেপ দেখে। তবু, সুখী মুখেই নামলো সে বিছানা থেকে। গত সন্ধ্যার আনন্দ এখনো জড়িয়ে আছে ওকে। দিদির দিকে তাকালো না আর।

ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে, পেছনে হাত দুটো টান করে আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে, সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো হাসি। বাথরুম মানে, ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, আড়ে পাশে সাড়ে চার হাত আয়না।

দেড়খানি ঘর, এক চিলতে বারান্দা, একটি রান্নার খুপরি, এই বাথরুম আর সামনে উঠোন নিয়ে হাসিদের সংসার। হাসি, ওর দিদি খুশি, ছোটো ভাই আনন্দ আর ওদের রুগ্ন মা প্রভাবতী। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল আছে, সেজন্য ওরা খুব কৃতজ্ঞ বাড়িওলার প্রতি।

জ্যোৎস্না রাতে, উঠোনে মাদুর বিছিয়ে ব'সে, ওরা চারজন 'তেওথা'র সোনাঝাপা-উদার আকাশটাকে খুঁজে পায়। পদ্মার পাশেই ছিলো ওদের বাড়ি। কালীবাটীরের বাড়ি, এক ডাকে সকলে চিনতো।

কালীপ্রসাদ, পাকিস্থান ছেড়ে, কলকাতায় এসে টিঁকেছিলেন মাত্র বছর দুই। মর্ম-বাবকেল-ডাক্তার এই দেড়খানা ঘরে এসে উঠেছিলেন। স্থির, অচঞ্চল কম কথার মানুষ কালীপ্রসাদ, কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়তেন পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নারাতে। অসুস্থ শরীরটাকে টেনে এনে, উঠোনে মাদুর বিছিয়ে, বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নিজের দুর্বহ অস্তিত্বের বোঝা বিস্মৃত হতে চাইতেন আকাশের অচেনা আলোর দিকে তাকিয়ে। ছেলেমেয়েদের ডাকাডাকি করে কাছে এনে বসাতেন,—দেখ, দেখ, ঠিক যেন আমাদের 'তেওথা'র আকাশখানা। হাসিদের তখন, 'তেওথা'র আকাশ বলে মনে হতোনা আকাশটাকে। কিন্তু, এখন হয়।…

দশ বছরে, মনের সঙ্গে গড়ে পিটে নিয়েছে আকাশটাকেও।

মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো হাসি।

হোক সামান্য, চারবেলার খাওয়া বজায় রেখেছে দিদি। পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে, চারজনের খাওয়া পরা আর ছোটো ভাইবোনের স্কুলের মাইনা যোগাতে, দুবেলা দিদিকে টুশানিও করতে হয়। চাকরীর টাকাতে হয়না।

খুশি রায়, মাস্টারকে ডাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলো যে, বি. এ, তেও দশজনের একজন হয়েছিলো, তার এম. এ. পড়া হলো না। বাবার পুঁজি, মায়ের সঞ্চিত গোনাগাঁথা, সব শেষ হয়ে, তখন মা'র একবেলা খাওয়া জুটে টান দিয়েছে। চোখে পড়তেই, দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলো খুশি রায়।—আর পড়া নয়, চাকরী করবো—। সেই সংকল্প থেকে একচুল সড়ানো গেলোনা ছিপিকে, অটল রইলো। এমনকি, সরীসৃপ', ছিপির এত বড় হিতৈষী মা ছাড়া আর কেউ নেই, তার কথাও শুনলোনা পর্যন্ত।···

হাসি, কেটলি থেকে ছোটো একটা মগ্‌গ্যানে এক কাপ মতো চা ঢেলে উনুনে বসালো। চিনি দুধ মেশানোই থাকে। শুধু গরম করে নিলেই হয়। সকালের ব্যস্ততায়, ঘরে ঘরে চা করার সময় যেমনা প্রভাবতীর। ভোরেই পুরো এক কেটলি চা বানিয়ে রাখেন। ঐ চা গরম করে করে বার পাঁচেক খান দুপুর পর্যন্ত। চায়ের তাপ দিয়ে দিয়ে মানুষগুলোকে সবলে রাখেন। হাসি, চা গরম করে, পেয়ালায় ঢেলে, তাকের মাঝারি একটা টিন খুললো। বানফটি বার করলো একটা। টিনের ঢাকনা এঁটে উনু হয়ে বসলো চায়ের পেয়ালার সামনে। চায়ে রুটি ডিজিয়ে, এক কামড় দিয়েই আবার উঠে পড়লো। তাকের টিনগুলোর ঢাকনা খুলে খুলে কী যেন খুঁজতে লাগলো।

"কী খুঁজছিস?" প্রভাবতী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"কাল সমীরদা যে কেকটা দিয়েছিলেন, তার তো অর্ধেকটাই রয়ে গেছে।—" চায়ের টিন থেকে, প্রভাবতী কেকের বাক্সটা টেনে বার করবার আগেই, ঘর থেকে কাটা কাটা শব্দ ভেসে এলো, "মা, কেক খরচ করোনা। রবিবার আজ, কেউ না কেউ আসতে পারে—" প্রভাবতী সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে আনলেন। হাসি ইসারায় এক স্লাইস কেটে নিতে বললো, কিন্তু অত সাহস প্রভাবতীর নেই। খুব আস্তে বললেন, "বিকেলে খেয়ো।"

হাসি বিনা আপত্তিতে চাটুকু খেয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। নিজেকে একবার দেখবে বলে, ছোটো ঘরে, দেয়ালে ঝোলানো, পারাওঠা ঝোলাটে আয়নার সামনে এসে হাসি দাঁড়ালো। এদিকে, পিছিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো একটু। শাড়ির ব্যাবহারে হাসিকে কাল চেনা যায়নি। নিজেকে নিজেই হাসি চিনতে পারেনি। কাল বিকেলে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো হাসিকে। খুব সুন্দর। আজকেও হাসি শাড়ি পরবে বিকেলে। কী সুন্দর আকাশী রঙের শাড়িটা কিনে দিয়েছে দিদি। কাল, পাশের ভাড়াটে-বাড়ির বাদল আর সামনের লালকুঠির মন্টু, বারে বারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে,—কী সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে হাসি!···

হাসি বেরিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় রাখা বড় বালতিটা শক্ত হাতে ধরে, পেছনের পুকুরে নিয়ে চললো। এখনো বালতির গা বেশ গরম। মা নিশ্চয়ই সকালেও আবার ফুটিয়েছেন কাপড়গুলো। ঠাস্-বোঝাই কাপড় বালতিটাতে। বালতি নামিয়ে রেখে, জোরে হাসি শ্বাস নিলো। একটু এগিয়ে, পুকুরের ঘাটলার সামনে এসে দাঁড়ালো। সবে ওঠা মিষ্টি রোদের আবেশ বুকে নিয়ে, আহ্লাদী-হাসি হাসছে পুকুরটা। পুকুরের আহ্লাদী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো হাসি। একটু একটু ঢেউ। লাল শালুকের মাথার ঢেউগুলো স্থির স্থির করে কাঁপছে। কড়িং বসছে, উড়ছে আর বসছে। পাশের কটকটে খেজুর গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে। লালচে-নীল কচুপাতার তলা থেকে একটা ব্যাঙ্ বেরিয়েই, খেজুর গাছের গুড়ির ওপর একটু যেন নাক

মেয়ে, ওপাশে জামরুল গাছের আড়ালে লুকালো, মজা লাগলো হাসির। একটু সুখ-সুখ নীচ-নীচ ভাব পুকুরটার চারদিকে। হাসি নামাল বুকে ঝাটুলার পাশের ছোটো বড় পাথরকুচি ক'টা হাতে তুলে নিলো। তারপরই, হাসির হাতের পাথরকুচি টুপটুপিয়ে পড়তে লাগলো পুকুরে। জামরুলের ঠীক ছায়া আরো কেঁপে কেঁপে উঠলো। সেই কাঁপা বলয় ছ'য়ার পাশ দিয়েই এক ঝাঁক মৌরলা মাছকে ছুটতে দেখলো হাসি। আর সেই মুহূর্তে আকাশের কোল বেয়ে নেমে এলো একটা মাছরাঙা পাখি। আপন মনে, হাসি হেসে কেলে চোখ ফিরিয়ে নিলো। পিছিয়ে এলো বাসতির কাছে। দেখে দেখে ঝিরঝিরে জামা-কাপড়গুলো বার করতে লাগলো আস্তে। শেষের দিকে, তেমন পরিষ্কার হয়না কাপড়গুলো। হয় থাকে না হাসির।

"কিরে হাসি! তোর কী অন্তীর সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত নাকি?"

জামরুলে কামড় বসিয়ে, পাশে এসে দাঁড়ালো বাদল, "নে, জামরুল খা—" তারা বসালো বড় বড় চারটে জামরুল অনেকোরো ডোরাকাটা প্যাণ্টের পকেট থেকে বার করে বাদল বাড়িয়ে ধরলে।

"তোর কাছেই থাক এখন, আগে কাপড় ক'টা কেচেনি—"

"কাপড় ক'-টা—!" আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ করলো বাদল।

হাসি জবাব দিলোনা। কাপড় কাচা শুরু করলো। মুহূর্ত দুই চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো বাদল। সাবে ধোওয়া শুটোতে শুটোতে বললো, "বাব্বা, খুশুল···খুশুল, টের ক্ষমতা বোঝা গেছে···,কাপড় কাচা কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই কাপড় কাচতে আধঘেণ্টা কাবার হবে তোর—"হাসির হাত থেকে কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে, প্রায় ঝোড়ার ভঙ্গিতে বাদল পুকুরঘাটে কাপড় আছড়াতে লাগলো, ঘাপাস্···ঘপাস্···।

হাসি এক ঝলক হাসলো, "আহাগো, কী কথাই বললেন, যেন প্রতি রবিবার আমার সব কাপড় কেচে দেন উনি—"

খুশির শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট শেষ করে, একটা বিছানার চাদর আছড়াচ্ছে বাদল, "যাই বলো হাসি, খুশিদি ভারি স্বার্থপর। একখোঁটা ছোটো বোনকে দিয়ে রাজ্যের কাপড় কাচালো, নিজের শাড়ি জামাটাও তো নিজে কাচতে পারেন ··"

"দিদি স্বার্থপর—" খুশিয়ে এলো হাসি, আমার দিদির মতো প্রাণ দিয়ে এমন দায়িত্ব পালন কজনার দিদি করে রে?—"চাইনে তোমার জামরুল,—দাও আমার চাদর দাও—"

হাসির হাতশুদ্ধ চাদরটা শক্ত মুঠি করে ধরে ফেললো বাদল, সোজা হয়ে দাঁড়ালো, হাসির প্রতিবাদকে তাচ্ছিল্য করে, হাতের মুঠিতে জোর দিলো আরো,

"তুই একখোঁটা মেয়ে, পারবি আমার সঙ্গে—"

হাতটা ছিনিয়ে নিতে পারছেনা হাসি; ছটফটিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে রাগি মেড়ানের মতো শ্বাস ফেলতে লাগলো। "আমি একখোঁটা মেয়ে, দুবছর পরে, যখন কলেজে পড়বো, দেখিস কুল পাবিনা আপনি বলেও—"

হাত ছেড়ে দিয়ে, হো-হো করে বাদলের হাসি, "আর আমি যেন কলেজে পড়বোনা তখন—

প্যান্টের পেছনে হাতটা ঘষে মুছে, বাদল জামরুল চারটে বার করলো, "নে, রাগ করে জামরুল খেতে থাক, দেখিস, ততক্ষণে আমার সব কাপড় ধোয়া ফিনিশ্…,এই পকেট ভর্তি কী আছে বলতো, পেয়ারা, কাঁচির পেয়ারা—" প্যান্টের বাঁ-পকেটে জোরে একটা ঝাঁকড়া মেরে দেখিয়ে, আপোসের হাসি হাসলো বাদল।

হাসির রাগ ঠাণ্ডা। জামরুল খাওয়া শুরু করে "কার বাড়ির রে—? ভারি মিষ্টি তো—" তরল টলটলে স্বচ্ছচোখে তাকালো হাসি।

"হুঁ…হুঁ…, বোলবোনা—"

একটু পরে দেখা গেলো, ধোয়া কাপড়ের আণ্ডিল সামনে রেখে, আকাশের ঘন ছায়া বেছে নিয়ে, মুখোমুখি বসে পেয়ারা খাচ্ছে দুজনে।

"বুঝলি হাসি, এ পেয়ারা পাড়তে গিয়ে, ভেঁয়ে পিঁপড়ের বা কামড় খেয়েছি, একেবারে চাকা চাকা—"

বাদলের হাতের ওলির দিকে তাকিয়ে, হাসির তখন নিজের শক্তি বিশ্লেষণ চলেছে,—কত অল্পসময়ে, অনায়াসে, কেমন এক বালতি কাপড় কেচে ফেললো বাদল! সত্যিই, ছেলেরা অনেক বেশী শক্তি রাখে—।

"ভাঁয়ে হাসি! ভাবছিস কী—"পেয়ারার বড় একটা কামড় বসিয়ে, বাদল গলাটা একটু খাদে নামালো, আর দ্রুত পরিসরে, বুঝলি—, কাল শাড়ি পরে কী মার্ভালাস যে দেখাচ্ছিলো তোকে …বি—উটিফুল…"

আদরের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো হাসি। গলাভরা-খুশি নিয়ে বলতে গেলো,—আজও শাড়ি পরবো দেখিস্—। কিন্তু, বলা হলোনা কথাটা। মুখ লাল করে, হাসি ফ্রকটা নিচের দিকে টানলো। কেমন চোখে যেন ওর দিকে চেয়ে আছে বাদল। লাফিয়ে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো হাসি। পেয়ারাটা দাঁত বসল করে, হ্যাচক মেরে ধোয়া কাপড় শুদ্ধ বালতিটা ডানহাতে তুলে নিলো, "আর গল্প নয় বাবা, দিদির কাছে তাহলে বকুনি খেতে হবে—"

"তোর দিদি তো বকার তালেই আছেন —" বাদলের চোখদুটো আবার অবাধ্য হলো, "দেখ্‌গে যা, তোর দিদি ইজিচেয়ারে আয়েস করে বসে খবরের কাগজ পড়ছে—" বলেই গুঁড়ি মেরে ঘাটলাটুকু পেরিয়ে গেলো বাদল। বাদলকে নাগালে না পেয়ে, হাসি হাতের আস্ত পেয়ারাটাকে ছুঁড়ে দিলো বাদলের দিকে। বাদল লুকুচ্ছে যাচ্ছিলো। টুপ্ করে গিয়ে পুকুরে পড়লো পেয়ারাটা। হাসির দুঃখ হলোনা তাতে। যা ইচ্ছে বলেই হলো দিদির নামে, দিদির সব ইচ্ছে, সব আনন্দ নিংড়ে নিয়েছে সংসারটা, কী সুন্দর কাঁচা সোনার মতো রং ছিলো দিদির, সেই রংএর কী ছিরি হয়েছে এখন, তামার মতো ম্যাড় ম্যাড় করছে…' সারা সপ্তাহে কী খাটুনীটাই না খাটে দিদি, রবিবারে জিরোবেনা একটু! আসলে, বাদলের রাগ হয়েছে দিদির ওপর। দিদির দোষ কী, মাথা কী আর অমনি বলেছে বাদলকে, একটা ইউনিটারি মেথডের অঙ্ক বোঝাতে দিদির কাছথেকে ছুটেছিলো।…

বালতিটা উঠোনে নামিয়ে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে, কপালের ঘাম মোছে হাসি। বালতি থেকে একটা একটা করে কাপড় তুলে, ঝেড়ে ঝেড়ে দড়িতে মেলে দেয়। দিদির শাড়ি-ব্লাউজ-পেটি কোটে ঘর নেয় বেশী।

"হাসি-ঈ—"

—ওরে বাবা, দিদির আজ হয়েছে কী!—হাসি চমকচকিয়ে গেলো।—এমন মার-মুখো মেজাজ কেন দিদির সকাল থেকে—হাসি ছুটে এলো।

দেখলো, দিদি, শুধু ঘরে জানলার ধারে দাঁড়ালো, ইজিচেয়ারে বসে নেই।

"দুখানা কাপড় কাচতে, দুঘণ্টা লাগালি—" দিদির কণ্ঠস্বর যেমন ঝাঝহীন, চোখের চাউনি তেমনি ধারালো, "যা, আদর্শ বিপণি থেকে এই ফিতের ক'টা নিয়ে আয়—"

মেঘলা-চোখে, দিদির হাত থেকে কার্ডটা নিতে নিতে, হাসি ফেনিয়ে আসা কান্নার ঢেউগুলো সামলালো।—দিদি তো এমন কাঠ গলায় কখনো কথা বলেনা ওর সঙ্গে। কালকে বিকেলেও তো হাসিকে কত আদর করলো। হাসি যখন দিদির দেয়া জন্মদিনের শাড়িখানা পরে, প্রণাম করলো দিদিকে, দিদি বুকে জড়িয়ে ধরে হাসিকে কত আদর করলো, মা'র দিকে তাকিয়ে, কিরকম গর্ব-গলায় দিদি বললো,—মা, ভাখো হাসিকে, ঠিক যেন রাজকন্যে,···আমার বোন বলে কেউ বিশ্বাস করবে? ··তারপর, হেসে হেসে বলেছিলো দিদি, হাসিকে আমি রাজপুত্রের হাতেই দেবো, দেখো—।

আর, এক বালতি কাপড় হয়ে গেলো কিনা দুখানা কাপড়···, গত রবিবারেও তো কত আক্ষেপ করেছে দিদি এ নিয়ে···,এত রাজ্যের কাপড় তুই কাচিস হাসি, রবিবারে ছুটির দিনটা খাটতে খাটতেই তোর শেষ হয়, সামনের বারে, একটা ঠিকে-ঝি রাখবোই আমি—।

সবেগে মাথা নেড়ে, হেসে হেসে প্রতিবাদ করেছিলো হাসি,—নারে দিদি, আমার কিছু কষ্ট হয় না—।···দিদি বললো, কী করে দিদি বললো, দুখানা কাপড় কাচতে দুঘণ্টা কোথায় করলি···।

মনটা মেঘে ভরা। ধলিটা নেবার জন্য, হাসি বারান্দার কোনাকুনি এলো।—আরে। হঠাৎ হাসির চোখে পড়লো বেলী গাছটাকে। না, ভুল হলো হঠাৎ চোখে পড়লো মতিবেলের কুঁড়িটিকে। বাদলের বাড়ি থেকে, ছোট এইটুকখানি শিকলিকে একটা বেলীচারা এনে লাগিয়েছিলো হাসি। তারপর ওর খেয়ালও নেই। নগণ্য বিরহ, সেই শীর্ণ গাছটার বিনা যত্নেই চেহারা ফিরে গেছে। হাসি আয়ত চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে, চিকণ ঝাপসালো পাতার ভেতর থেকে, উঁকি ঝুঁকি মারা আকর্ষণীয় কুঁড়িটির দিকে তাকিয়ে রইলো। মনের মেঘ মুহূর্তে উড়ে গেলো কোথায়! দিদির তাগিদ ও ভুললো। কার্ডটা থলির ভেতর রেখে, পুলকের চঞ্চলতায়, কোথা থেকে একটা ভাঙা খুন্তি নিয়ে এসে, ভরপুর আনন্দে, গাছের গোড়া আলগা করতে লেগে গেলো হাসি।

আদর্শ বিপণির মালিক রতনলাল, কার্ডটা হাতে নিয়ে, চশমার ওধার থেকে, কেমন যেন একটা যাচাইয়ের দৃষ্টি ফেললেন হাসির মুখের ওপর।

"কেউ আসছেন নাকি তোমাদের বাড়ি?"

"না তো—"

রতনলালের বিস্ময় স্বাভাবিক। যে বাড়িতে, গত ছ'বছরের মধ্যে, লাইফবয় সাবান আর টাটার নারকেল তেল ছাড়া, আর কোনো প্রসাধন দ্রব্য ঢোকেনি, সেখানে শুধু বিচিত্র নয়, মূল্যবান প্রসাধনী···পিয়ার্স সোপ, পণ্ড্স কেস্‌পাউডার, ল্যাক্‌টো ক্যালামিন, মিতিয়া···। কার্ড মিলিয়ে

জিনিষগুলি মেলিং টেবিলের ওপর রাখছিলেন রতনলাল। এবার অবাক হচ্ছে হাসিও। মনটা তার ছিলো বলে, কারু ওপর চোখই ফেলেনি হাসি।

—সত্যি তো, কেউ আসবেন নাকি ওদের বাড়িতে!

"এক মিনিট কাগজ দিন তো—" মন্টু সিঁড়ি টপকে দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ালো, "ওমা হাসি, তুই এখানে? কি কিনলি?"

কর্তব্যকর্ম সব জিনিষ দেওয়া হয়ে গেছে রতনলালের। মালকাবারে খুশি এসে দিল মিটিয়ে দেয়। জিনিষগুলি তছরুপ করতে ইচ্ছে করে না হাসির। এমন জিনিষগুলি হালিদের বাড়ি যাচ্ছে, একটু দেখুক মন্টু। মন্টুটা বেয়াকী না হলেও, ওদের বাড়ির সবগুলো একটু উঁচু নাকের। সামনের মানুষদের যেন দেখেও দেখতে পায় না। আবার, মাঝে মাঝে এত বেশী মিষ্টিকথা বলে ফেলে হাসির সঙ্গে, হাসির বয়েস বেশী না হলেও বুঝতে পারে, কৃপা করছে ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ধরে হাসির। মন্টুদের বাড়ি যেতে একদম ইচ্ছে করে না। তবু, যেতে হয় এক আধবার। ভদ্র-পড়োশী বলতে মন্টুদের বাড়ি। আর হাসির সমবয়সী বলতে ওরাই···মন্টু, বাদল।

কাগজ নিয়ে টাকার চেঞ্জটা গুণে নিলো মন্টু। একটা সিকি রতনলালের দিকে ঠেলে দিলো, "টফি দিন তো···মটন—।" "চল্ বাবি না—" মন্টুর প্রশ্নে চকিত হয়ে, জিনিষগুলি ক্ষিপ্রহাতে হাসি থলিতে ভরলো। হাসি হাসি মুখে, লঘু চরণে নেমে এলো দোকান থেকে, "চল—"

"থলিটা দে আমার হাতে—" মন্টু হাত বাড়ালো।

"নুনা—" মন্টুর চাউনি অনুসরণ করে সচকিত বলে হাসি। রাঙা হলো। পিঠ থেকে বেণীদুটো ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে সামনে এনে, সামান্য কুঁকে হাঁটতে লাগলো।

"টফি খা—"

"না রে, ইচ্ছে নেই—" মন্টুর কাছ থেকে কিছু নিতে হাসির কোথায় যেন বাধে।

"কী হলো···" মন্টু নিজের একটা মুখে টফি পুরে, বাকী সব ক'টা জোর করে হাসির হাতের মুঠিতে দিয়ে দিলো। "কাল শাড়ি পরে তোকে যা লাগছিলো হাসি—" হাসির পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে, হাসির কাঁধে হাত রাখতে সাহসী হলো মন্টু "···যেন সুইট সিক্সটিন—"

প্রাণপণ চেষ্টা করে, হাসি মুখের রং স্বাভাবিক রাখলো। বুঝলো, বাক্য ফুলিতে মন্টুটা ইতিমধ্যে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। কার কাছ থেকে শুনেছে যেন কথাটা, যেখানে সেখানে লাগালেই হলো। হেসে হেসে খুব সহজ গলায় বলতে পারলো হাসি, "ষোলো বছর বয়েস পেতে ঢের দেরী আমার, দুটি বছর অপেক্ষা করতে হবে—"

"তোর বড় হতে ইচ্ছে যায় না হাসি—" দুই চোখ টান করে মন্টু তাকালো একটু, "আমি ঠিক করেছি, এবার থেকে ফুলপ্যাণ্টই পরবো সব সময়—"

বাড়িতে এলো হাসি। দরজার কাছে দাঁড়ালো দেখলো দিদিকে।···হাসির দিদির দিকে দৃষ্টি মেলে, খুশির অস্বাভাবিক ক্লান্তিময় মুখচ্ছবি দেখে, ওর কান্না পেলো। একটা প্রশ্ন খুশির অন্তর তোলপাড় করে ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে। বিশ্বের একটি মানুষের ওপর খুশির বিশ্বাস ছিলো, তাই সংসারের চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যেও অসহায়তার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েনি খুশি। আজ, প্রশ্নটা খুশির সেই বিশ্বাসের মূলে যেন কুঠার

হানতে চাইছে।—মুহূর্তে কী ক্ষণস্থায়ী হতে পারে না মানুষের···সে, যতো নীতিবাগীশ মানুষই হোক না?···এর উত্তর শোনার জন্য, খুশি যেন নিজেই নিজের হৃদয়ে কান পেতে আছে। উত্তরটা মিলছে না—হৃদয়ের গভীরে যতো অশান্তি আর আক্রোশের বুড়বুড়ি উঠেছে। আর, একটা তীব্র দুঃখবোধ —যেন গ্রাস করতে চাইছে খুশির সমস্ত সত্তাকে। ওই দুঃখবোধে গতরজনী তার বিনিদ্র কেটেছে। মনের এই দুঃসহ ভারটাকে, যেমন করে হোক তার নামানো দরকার।···

হাসির দিবাদৃষ্টি থাকলে, টের পেতো, এক চিলতে কাগজ খুঁজতে, খুশি বাক্স হাঁটকে, গলদঘর্ম হয়ে, হয়রাণের একশেষ হয়েছে। হাসির কষ্ট হতো। খুশির বি. এ. পাশের পর, সমীরণ কোনো এক ফাঁকে, ছোট্টো ঐ কাগজটা খুশির হাতের মুঠিতে দিয়েছিলো। নীলাভ কাগজে সবুজ কালি দিয়ে দুছত্র লেখা ছিলো,—মনের সাগর হাতড়ে হাতড়ে সবুজ আনার কাটলো,

ব্যর্থ প্রয়াস অন্বেষণের সব উৎসাহী চেষ্টা—

মুক্তো কী নেই?·····

সমীরণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এসেছে, কিন্তু, এর উত্তর খুশির দেয়া হয়নি। কিন্তু, সত্যিই কী উত্তর পায়নি সমীরণ? অলিখিত কিছু?

—যাই হোক, আট বছর পরে, তার উত্তর আজ দিয়েছে খুশি—

তুমি নিজেই জানো, যাকে সে চায়, যেখানে তার লক্ষ লোভ।

কখন তাকে ডেকেছে, তাকে না পেয়ে তার কী ক্ষোভ।

আগুন হয়, কান্না হয়, কখনো বোবা দুঃখ সয়।—

কবিতা কোনোদিন লেখেনি খুশি। ও ক্ষমতা আছে সমীরণের। তবু, প্রাণপণের চেষ্টায়, কবিতার মতো করেই লিখলো। আর স্থির করলো, আজকেই এটা দেবে। ওর এই উত্তর সমীরণের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত, খুশির অস্থির মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে হাল্কা হতে পারবে না।·· ···

বোনের পায়ের শব্দে সচকিত হলো খুশি। অপ্রস্তুত ব্যস্ত হাতে খসিটা বোনের হাত থেকে নিলো।

অন্যদিন হলে, হাসি বাড়ি ঢুকেই জিজ্ঞেস করতো,—দিদি কেউ আসবে নাকি রে? কিন্তু, আজ সকালের শুরু থেকেই, দিদি যেন কেমন কেমন··, দিদির আচরণ দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত লাগছে ওর। হাসি নীরবে খসিটা দিদির হাতে দিয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। দেখলো, আনন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেক খাচ্ছে।

—যাব্বে! এবার যে কেক খাচ্ছে আনন্দ··!—ছিঃ, ছোটো ভাইয়ের সঙ্গেও হিংসে করবো—, টকি চিবুতে চিবুতে খুব সহজেই হাসি উদার হতে পারলো।

"এই ছোড়দি, কোন্ ঘুড়িটা ভোকাটা হবে বলতো? পেটকাটা, না শতরঞ্জি?···শতরঞ্জি? ঠিক বলেছিস,···ওমা হলোনা,·· দুয়ো পেটকাটা, দুয়ো, দুয়ো, পেটকাটা ভোকাটা—" কোমরের বেল্টটা এঁটে, ছুটে কাটা ঘুড়িকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো আনন্দ, হাসি হাত টেনে ধরলো, "এই আর যাসনা, দিদি রাগ করবে, তোর ঘুড়িটা কাটা গেছে বুঝি? মুখটা মলিন করে ঘাড় নাড়ে আনন্দ, পরমুহূর্তেই আপন খুশিতে আনন্দ মুরগাকে খেদো, "আর আমাদের ঘুড়ি কাটা যাবেনা দেখিস, সমীরণদা আজ সুতোয় মাঞ্জা দেবার এ্যাসলা প্যাচ বাতলে দেবেন বলেছেন—"

"সমীরণদা আজ আসবেন নাকি ?" আর একটা টকি মুখে পুরলো হাসি।

"হ্যাঁরে, আজ আজ বিকেলের অনেক আগেই আসবেন, আমাকে মার্কার প্যাচ শিখিয়ে, তারপর দিদিকে নিয়ে পিকচারে যাবেন সমীরণদা।"

"ছ্যাস···, দিদি কোনোদিন সিনেমা দেখেনা—"

"হুঁ তোমাকে বলেছে—," পাছে সমীরণদার আসার সম্ভাবনা কিকে হয়, সেই আশঙ্কায় আনন্দ ছোড়দিকে মুখই ভেংচে দিলো, "কাল সমীরণদার যাবার সময়, দিদি নিজে ডেকে বলে দিলো,—যাবে।"

রান্নাঘরের চৌকাঠ থেকে, হাসি উঁকি দিলো ভেতরে। রান্না হয়ে গেছে মা'র, বিকেলের জন্য আটা বার করছেন প্রভাবতী। প্রাণের স্বাদ্যে যেন উথলে পড়ছে হাসি। লাফিয়ে চৌকাঠ ডিঙোলো। "মা, দাও, আটা আমি মাখছি, তুমি বাক্স থেকে আমার শাড়িটা বার করে নিয়ে এসো না মা—"

"শোনো হাসি, কাছে এসো—" মা'র গলার গাম্ভীর্যে হাসি ঘাবড়ে গেলো।

"কী হয়েছে মা ?"

সামান্য হেসে তরল হতে চাইলেন প্রভাবতী, "কিছু হয়নি—" আবার হাসলেন, "বলছি যে, শাড়ি পরতে চেওনা এখন, দিদি রাগ করবে। কোথাও যাওয়ার জন্য ওটা তোলা থাকনা—"

"না মা, দিদি একটুও রাগ করবেনা। তুমি দাওনা শাড়িটা এনে, কাল দিদি আমাকে বলেছে, তুই তোর ইচ্ছে মতন পরিস শাড়িটা, সামনের মাসেই আর একটা শাড়ি কিনে দেবে বলেছে দিদি—"

"না রে, শোন্, অসুখ হোসনে, তুই তো আমার খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—" একটু থামলেন, গলা দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত স্বর বেরুলো প্রভাবতীর, "শাড়ি পরলে তোকে বড্ড যেন বড় দেখায় ···, আমার ভাল লাগেনা, বেখলিনে, কাল সমীরণ পর্যন্ত বললো এ কথা—" হঠাৎ কথায় যেই যেন হারিয়ে ফেললেন প্রভাবতী।

উদ্যত অভিমানে হাসি মুখ ফেরালো।—মা যে কী বলে! এর কোনো মানে হয় ? কাল শাড়ি পরা হাসিকে দেখে, মা, দিদি দুজনেই তো কী খুশি! দিদি তো বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে অস্থির, তক্ষুনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হাসিকে, আর একখানা শাড়ি কিনে দেবে এ মাসে—।

তবে ? ···তাহলে ?···

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, একটি তীক্ষ্ণ নতুন বোধ হাসির সারা সত্তাকে দাপিয়ে দিলো। ওর মনের সামনে, কুয়াশার ওকটা পর্দা যেন ভাঁজে ভাঁজে খুলে গেলো। পর্দার ভাঁজে ভাঁজে উঁকি দিলো বাদল, উঁকি দিলো, মন্টু, উঁকি দিলো সমীরণদাও···। সমীরণদা কাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন হাসিকে দেখে।—কেকের বাক্সটা হাসির হাতে দিয়ে, হাসির কাঁধে হাত রেখেছিলেন,

—ওমা খুশি !: ভাখো কাঁওখানা···, হাসি এখন আর টুকু নেই, রাতারাতি রাণী হয়ে গেছে যে—, দিদির দিকে তাকিয়ে উচ্চ হাসির রোল তুলেছিলেন সমীরণদা। চোখের পাতায় সমীরণদার কৌতুক কাঁপছিলো। হাসতে হাসতেই আরো কয়েক পলক দেখেছিলেন হাসিকে।

সমীরণদার উচ্ছ্বাসে দিদির সঙ্গে সাড়া ছিলোনা,···সেটা তখন বোঝেনি হাসি···

রং-চটা, বৌয়ার মলিন ঘুলঘুলি আনলার ভেতর দিয়ে, হাসি চোখ বিশাল করে তাকালো। তাকিয়ে রইলো। অবচেতনে, আনন্দ আর স্বপ্ন এসে মিশলো হাসির হৃদয়ে।

আকাশটা যেন হাসির ছোঁয়ায় সীমায় এসে গেছে—মনে হলো হাসির।

আকণ্ঠ এক আনন্দে, ব্রীড়াবনতা হয়ে, অন্যমনস্কে হাসি আটা মাখতে লাগলো।

# পিতৃদেবের ছবি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

প্রথম দিনেই মনটা বিগড়ে গিয়েছিল ওর ওপর। সবে সেদিন কলেজের কাজে যোগ দিয়েছি। ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাশ নেই। এসে ঢুকলাম প্রফেসারস্ রুমে। বসতে গিয়েই বাধা পেলাম। বেয়ারা গঙ্গারাম এসে বললে, বস না ওখানে বাবু, প্রিন্সিপাল সাব এলে মাঝে মাঝে ওখানে বসেন।

পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। তাকিয়ে দেখি দু'তিনজন সহকর্মী এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বসে আছেন। তাঁদের একজন চশমার ফাঁকে চোখ মেলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। হতে পারে চেয়ারটা প্রিন্সিপালের জন্যে নির্দিষ্ট, কিন্তু তাই বলে সবার সামনে এমন করে অপ্রস্তুত করে দেওয়া। মনটা সত্যি বিগড়ে গেল।

এর আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য সে ঘটনার ওকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায়নি। কলেজে ইন্টারভিউর শেষে নিয়োগ পত্রটি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঢুকতে গেলাম বাথরুমে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল ঐ লোকটা।

জিজ্ঞেস করলাম ওকে বাথরুমের খবর।

ও নির্বিকারভাবে দেখিয়ে দিলে যে ঘরখানা, সেখানে ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল একসঙ্গ। ঠিক তার পাশেই তাকিয়ে দেখি আর একখানা ঘর। লেখা আছে, "প্রফেসারস্ ওনলি"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকটা বললে আমাকে।

ওখানে গিয়েছিলে কেন?

মনে হল, একটি চড় বসিয়ে দি ওর গালে। বুড়ো মানুষ, তাই সামলে গেলাম।

ও আবার বললে, ওখানে বাবুসাহেবরা যান।

পরে বুঝেছিলাম গঙ্গারামের বাবুসাহেব মানে প্রফেসাররা।

বললাম, আমিও তাই গিয়েছিলাম। ও যেন কেমন এক অপ্রস্তুতের হাসি দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গঙ্গারাম আমাকে সম্ভবতঃ ছাত্র বলেই ভেবেছিল।

তারপর দশটি বছর কেটে গেছে।

আমি কিন্তু গঙ্গারামের ওপর কেন কি জানি কোনদিনও সদয় হতে পারিনি।

ও শীতের দিনে আমার মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দিতে চেয়েছে।

আবার খুলে দিয়েছে জানালা।

সিগারেট আনতে বলেছিলাম একদিন, ও কিনে নিয়ে এলো একছড়া কলা।

ধমক দিয়ে বললাম, সিগারেট মানেই কি কলা?

সহকর্মীরা সব হাসতে লাগলেন।

লোকটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। বলছে কিনা, এত সিগারেট খায়না বাবু, কলা খাও।

চেঁচিয়ে বললাম, মাতব্বরী করতে হবেনা আর, যাও নিজে খাও গিয়ে।

লোকটা কি রকম যেন হয়ে গেল। গজ গজ করে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল।

তুল করে আবার দাক্ষাই গাইবার ওস্তাদি আছে। গা জ্বলে গিয়েছিল সেদিন।

এ রকম কাণ্ড ঘটাতে এই দশ বছরে কতবার দেখলুম ওকে।

আর সবাই ওকে কিন্তু খুবই খাতির করে থাকে। ঐ বুড়োটাও আমার ওদের মনের মত কাজ করতে ওস্তাদ। কেবল আমার কপাল গুণে উনি হয়েছেন দুষ্টগ্রহ।

ক্লাশে যেতে পাঁচটা মিনিট দেরী হয়েছে কি এসেই হাজির।

ঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, পাঁচ মিনিট কখন পার হয়ে গেছে, এখনও বসে রয়েছ বাবুসাব।

আর যাঁরা বসে রয়েছেন বুড়োটা তাদের যেন দেখতেই পায়না।

মনে মনে ভাবি, ও কর্তৃপক্ষের একটা চর।

রবি ঠাকুরের ভাষায়, 'দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।'

ক্লাশে চেঁচিয়ে পড়ালে অমনি ওর মাতব্বরী আছে।

গলাটা যে ভেঙে যাবে বাবুসাব। এত চেঁচিয়ে পড়ায় না।

আমি চেঁচাবোনা, তোর কি রে বাপু। সারে পড়ে এত উপদেশ কিসের। লোকটার একটুও যদি ভদ্রতা জ্ঞান থাকে।

পূজোর ছুটির আগে বেয়ারাদের বকশিস দেবার একটা রীতি আছে।

কয়েকজন ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। দিয়ে দিয়েছি। গঙ্গারাম এবার আর এলোইনা। আমিও সেধে দিতে গেলামনা। শেষে যখন প্রায় সকলের দেওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন নিজেরই কেমন যেন মনে হতে লাগল। একটা বেয়ারার কাছে ছোট হয়ে যাব।

সকলের সামনে ডেকেই বললাম গঙ্গারামকে।

এই যে নিয়ে যাও তোমার পার্বণী।

যা দিই তার চেয়ে কিছু বেশীই দিতে চাইলাম ওকে। ওর কাছে হার মানা চলবেনা আমার।

লোকটা কাছে এসে বলে কিনা, ভাল করে খুব ঘি কিনে খেও বাবুসাব, আমাকে আর দিয়ে কাজ নেই। দিনে দিনে যা চেহারা হচ্ছে।

সুস্পষ্ট অপমান। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার পথ নেই এ অপমানের। নেওয়া না নেওয়া তার ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করছে।

আজ যখন গঙ্গারামের অবসর গ্রহণের জন্যে প্রকেশারস এসোসিয়েশান থেকে আয়োজন হচ্ছে, তখন আমি অনুপস্থিত থাকব বলেই মনে মনে ঠিক করলাম। একজন সামান্য বেয়ারাকে নিয়ে একটু যেন বেশীমাত্রায় মাতামাতি হচ্ছে বলেই আমার মনে হচ্ছিল। চাঁদা অবশ্য আমিও দিয়েছিলাম। দু'শ টাকার নোট দেবার আয়োজন করেছিলেন কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠান চলছিল নীচের তলায়। আমি লাইব্রেরীতে অধ্যাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের ভেতর বসে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলাম।

একা একাই বসেছিলাম। কতক্ষণ কেটে গেছে মনে নেই। হঠাৎ দরজা ঠেলে কে ভেতর ঢুকে পড়ল। ফিরে দেখি গঙ্গারাম।

বিস্মিত আর মনে মনে একটু সঙ্কুচিত যে না হলাম তা নয়।

আশপাশে কেউ নেই। গঙ্গারাম এগিয়ে এল আমার কাছে।

আজ যে তোমাকে দেখলাম না বাবুসাব?

মুখে একটুখানি হাসি টেনে বললাম, জরুরী একটা নোট করার কাজ ছিল গঙ্গা, তাই যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল লোকটার মুখে।

কিছু একটা বলতে হয়, তাই বললাম,—বুড়ো হয়েছ। চাকরবাকর ওঠা নামা খুবই কষ্টকর। এখন দেশে গিয়ে শেষ জীবনটা ছেলেপুলেদের কাছেই কাটিয়ে দাও।

বড় বিষণ্ণ মনে হল গঙ্গারামের মুখখানা। কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বললে, বাবুসাব, বাপ মা, আর ছেলেপুলে যাই বল সবই ছিলে তোমরা। এই কলেজে পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। বাবুজী, ঘরবাড়ী এর চেয়ে আমার বড় কি আছে বলতে পার?

গঙ্গারাম কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো মানুষটি।

আমি অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক সময় কান্না থামিয়ে গঙ্গারাম বললে, কতদিন কত কথা তোমাকে বলেছি বাবুসাব; মনে নিও না ওসব।

বাধা দিয়ে বললাম, তাতে কি হয়েছে গঙ্গা, ও আমি কিছুই মনে করিনি।

ও বললে, প্রথম দিন তোমাকে দেখে মনটা কেমন করে উঠেছিল। ছেলেটা বেঁচে থাকলে ঠিক তোমার মতই হত বাবুজী।

অবলম্বনহীন সেই বুড়ো বেয়ারা আমার চোখে আজ আমার স্বর্গত পিতৃদেবের মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আজ ওর অতীতের ব্যবহারগুলো পরম স্নেহের রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে একে একে ফুটে উঠতে লাগল।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে গঙ্গা বললে, লেখাপড়া কর বাবুসাব, আমি যাই।

দুটি হাত জোড় করে নত হয়ে গঙ্গারামকে প্রণাম জানালাম।

প্রথমে ওর মুখখানা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তারপর তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হল ওর চোখ দুটি। গঙ্গারাম চিরদিনের মত আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে গেল।

———

# উৎসবে উষা সেলাই বলাই শ্রেষ্ঠ উপহার

উৎসব উপলক্ষে সর্বশ্রেণীর প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। উপহার হিসেবে উষা সেলাই কলের একটা বিশেষ আছে। উষা মেশিন মডেলের প্রতিটি কারুকার্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। আধুনিক উষাকলে সেলাই করে আপনার অবসর

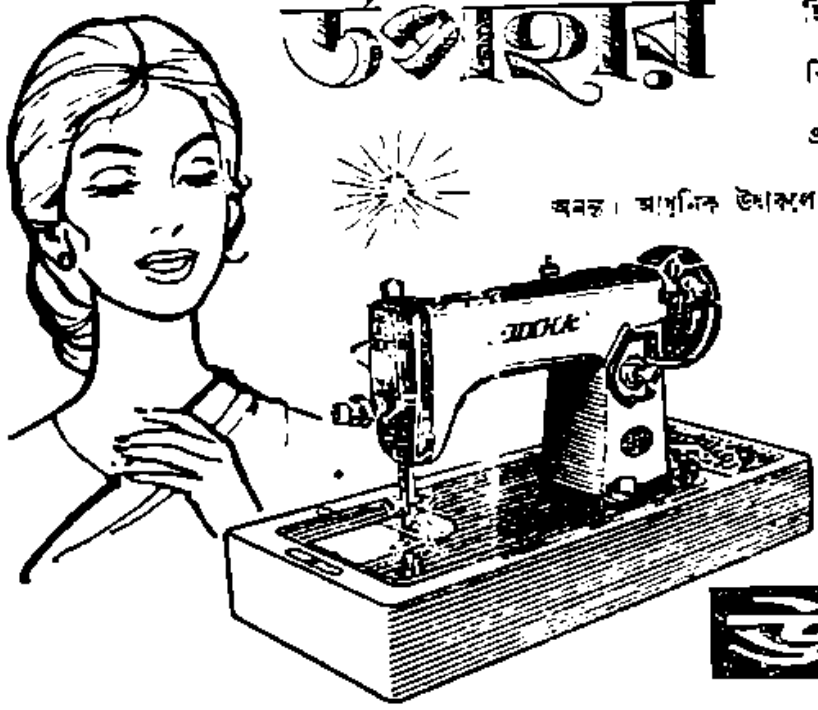


শ্রেষ্ঠ মেশিনে
সেলাই করুন—

**উষা**

বলে সেলাই করুন

উষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড,

# পুতুল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রাখহরির হঠাৎ খেয়াল হ'ল গাড়ুটা বোধহয় উঠানেই পড়ে আছে।

আগেকার দিন হ'লে ভয়ের কিছু ছিল না। ভোরে উঠে যেখানকার জিনিস ঠিক সেখানে পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল তা হবার জো নেই। ছিঁচকে চোরের উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে। বাইরে কিছু থাকলেই রাতারাতি হাওয়া। তা সে ছেঁড়া গামছাই হোক আর ফুটো বাটিই হোক।

শুধু কি রাতে, দিন-দুপুরেই অনাসৃষ্টি কাণ্ড হচ্ছে। ওপার থেকে হৈ হৈ করে লোক এসে এপারের ধানক্ষেতের ওপর পড়ছে। পলকে ধানের গোছা সাবাড়। একেবারে পঙ্গপালের সগোত্র। পক্ষ বাছুর চরবার উপায় নেই। তাড়িয়ে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এদিকের লোকেরাও কম যায় না।

গুটি গুটি গিয়ে ওপারের পাটের ক্ষেত সাবাড় করে।

বগলদাবা করে এপারে নিয়ে আসে।

এপার ওপার আগে ছিল না। এই বছর কয়েকের সৃষ্টি। কোন চিহ্ন নেই, বিশানা নেই, শুধু ছোট একটা ইঁটের ঢিবি। তারই এদিকটা আমাদের দেশ, ওদিকটা তোমাদের।

আচ্ছা বিপদ। চণ্ডীমণ্ডপ, দালানবাড়ী এপারে পড়ল, গোলাঘর আর রান্নার চালা পড়ল ও পার। বাঁটোয়ারার কোন মানে হয়। এ যেন আচমকা মানুষের কলজেটা আলাদা করে মানুষ বাঁচুক আর না বাঁচুক তা কেউ দেখল না। দেখবার যেন দরকার নেই।

রাখহরি ঘরের ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বের হল। গাড়ুটা ঘরের মধ্যে না আনা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

গাড়ুটা তুলতে গিয়েই চোখে পড়ল।

হাতে আধ-নিভন্ত হ্যারিকেন লা টিপে টিপে ব্রজখুড়ো দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। রাখহরি গাড়ুর কথা ভুলে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এ রকম কানাঘুষো এর আগেও কানে এসেছে। পেট কাপড়ে গুপুরি বেঁধে ওদিক থেকে মেয়ে পুরুষ জমলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে এসেছে। একবার এখানকার ব্যাপারীদের হাতে ছোঁয়াতে পারলেই চারগুণ লাভ। গুপুরি আর গুপুরি থাকে না, সোনার ডেলা হয়ে যায়।

তেমনই এদিকের লোকেরাও কাপড়ের টুকরো, লোহালক্কড় ওদিকে বে-আইনিভাবে চালান দিতে পারলেই রাতারাতি বড়লোক।

তেমনই কিছু একটা না হয়ে যায় না।

কিন্তু এই বয়সে ব্রজখুড়োর ব্যবসার শখ হল। শখের কথা মানুষের কিছু বলা যায় না। মাথায় টাক পড়লে অনেকে বাহারে চিরুণি কেনে। বয়স বাড়লে আতরের শিশি।

রাখহরি ঠিকই সন্দেহ করেছিল। বাতিটি টিম টিম করতে করতে বাঁশঝাড়ের পিছনে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার একটু রেখা দেখা গেল। অল্পক্ষণের জন্য। বসির মিয়ার ঘরের কাছ বরাবর এসে আর দেখা গেল না।

রাখহরি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দুটো চোখ বিস্ফারিত করে, কিন্তু ব্রজখুড়ো ফিরল না।

দূরে কলাড় বনে শিয়াল ডেকে উঠতেই রাখহরি ঘরের মধ্যে চলে এল লাঙ্গু বাইরে রেখে।

একরাত নয়, পর পর তিনরাত দেখল রাখহরি। প্রায়ই একই সময়ে আলো সরে সরে এপার থেকে ওপার গেল।

একদিন সকালবেলা মাঠে যাওয়ার পথে রাখহরি ব্রজখুড়োর ওখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রোয়াকে বসে ব্রজখুড়ো গীতা পড়ছে। মায়া প্রপঞ্চময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র সাধনা।

কেমন আছ গো খুড়ো? রাখহরি একেবারে রোয়াকে এসে উঠল। ব্রজখুড়ো উত্তর দিল পড়তে পড়তে হাত তুলে শুধু রাখহরির সম্ভাষণের উত্তর দিল।

রাখহরি জানলার কাছে ঘোষ দাঁড়াল। ভিতর দিকে উঁকি দিল। মশিন শয্যা, নামমাত্র তৈজসপত্র। একটা ভাঙা হাতা। এই তো সংসারের আবরণ আর আভরণ। যে সব মাল নিয়ে ব্রজখুড়ো সওদা করতে যায়, সেগুলো রাখে কোথায়।

গীতা পাঠ শেষ হ'তে ব্রজখুড়ো সাষ্টাঙ্গে ইষ্টদেবতাদের প্রণাম করল তারপর রাখহরির দিকে ফিরে বলল, তুমি কেমন আছ বাপ?

এই কোনরকমে কেটে যাচ্ছে খুড়ো। সোনার দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গেল। একটা মন্বন্তর গেল আর একটা এবার আসবে।

সবই প্রভুর কৃপা, তিনি সৃষ্টি করেছেন, রাখবার হয় তিনি রাখবেন মারবার হয় মারবেন।

ব্রজখুড়ো দুটো হাত তুলে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল।

রাখহরি কিন্তু আকাশের দিকে দেখল না। বাঁশঝাড়ের পিছনে বসির মিয়ার বাড়ীর দিকে চেয়ে রইল।

দেশ ভাগ হবার আগে বসিরের সঙ্গে খুব আলাপ ছিল। ঘন ঘন আসা যাওয়া। রাখহরির বাড়ীর শনি পুজোয় বসির এসে বসত। প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরত। আবার বসিরের বাড়ীতেও যেত রাখহরিরা ঈদের দিন। কোলাকোলি করত। মিষ্টান্ন খেত। নজুমদারদের বাড়ী দুর্গাপুজো শুরু হবার ক'দিন আগে থেকেই বসির আসত, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। তখনও প্রতিমা রংচং করা হয়নি। শুধু মাটি লেপা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। ছেলেকে দেখাত।

বিসর্জনের দিনও চাকীদের পিছন পিছন নদীর ধার অবধি যেত, কোন কোন বার নৌকাতেও উঠেছে। মাঝনদী পর্যন্ত গেছে ভাল করে নিরঞ্জন দেখবার জন্য।

আগে খুব যাওয়া আসা ছিল, অন্তরঙ্গতা। তখন অবশ্য রাখহরিরাও জানত না, বসিররাও নয়, যে তারা আলাদা জাত, তাদের দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, ঈশ্বর আলাদা।

একবার ফাগুনের কড়া রোদে বসিরের চালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। বসিরের বৌ রান্না করতে গিয়ে কি করে আগুন লেগে যায়। ঘরের চাল জ্বলে উঠল, বাঁশের খুঁটি। বসির পাট ক্ষেতে ছিল।

এপার থেকে ছেলের দল ছুটে গিয়ে আগুন নিভিয়েছিল। তখন অবশ্য এপার ওপার কিছু হয়নি। দুটো দেশের মাঝখানে, দুটো মানুষের মাঝখানে এভাবে কেউ বেড়া টেনে সীমানা করে দেয়নি।

এখন এরাও যেমন যায় না, বসির মিয়াও তেমনি কিছুতেই চায় না। বড় বড় বাঁশের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দিয়েছে। যাতে নিজের উঠানে চলতে ফিরতে এদের মুখ না দেখতে হয়।

বসিরের সঙ্গে কথা বলবার, মেলামেশা করবার স্পৃহাও রাখহরিদের নেই। মাঝে মাঝে শহর থেকে জীপ গাড়ী করে বাবুরা আসে। জমিদারবাড়ীর কাছারিতে গিয়ে ওঠে। এখন অবশ্য জমিদারী আর নেই, তবু লোকে বলে জমিদারবাড়ী। গাঁয়ের মোড়লদের ডাকে, চাঁইদের ডাকে। ডেকে অনেক কথা বলে। কিভাবে বসিরের দল এ দেশের সর্বনাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর তার বর্ণনা শুনতে শুনতে রাখহরিদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কোনদিন বসিরদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, অন্তরঙ্গতা ছিল, তেবেই ঘৃণায় শিউরে ওঠে।

রাখহরি ঠোঁট কামড়ে মনে করবার চেষ্টা করল, বাংলের সেই সব সভায় কোনদিন ব্রজখুড়োকে দেখেছে কিনা! দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

অথচ বসিরের সঙ্গে তলায় তলায় ভাব রাখে, গোপনে যাওয়া আসা করে এমন লোকেরও এদেশে অভাব নেই। অভাব যে নেই, তার প্রমাণ তো সামনেই রয়েছে। নিজের মনকে রাখহরি কি করে অবিশ্বাস করবে।

ইচ্ছা করেই রাখহরি কথাটা পাড়ল।

ওদের কাও কারখানার কথা শুনেছ ব্রজখুড়ো?

ব্রজখুড়ো আসনটা পাট করে ঘড়ির আসনায় রাখছিল, রাখহরির দিকে না ফিরেই বলল, কাদের কাওকারখানা?'

রাখহরি একটু অপেক্ষা করল, তারপর ব্রজখুড়ো ফিরে দাঁড়াতে তার দিকে চেয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে ওদের।

আঙুল দেখাল বসিরদের চালাঘরের দিকে। আগে এ ওপাটে বসির মিয়া একলাই ছিল, এখন আরও কয়েক ঘর উঠে এসেছে। আহমেদ, লুকুস আর সোলেমান। বসির দল ভারি করার চেষ্টা করছে। অপকর্ম করার যাতে সুবিধা হয়।

ব্রজখুড়ো একবার বসিরদের পাড়ার দিকে আর একবার রাখহরির দিকে চেয়ে বলল, কি হল?

আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না আর কি। শুনলাম, মেহেরপুরে দুজন চাষীকে ধরে নিয়ে গেছে তার সাথে আর বলার শুধু। কোথায় নাকি গুলি চালিয়ে আমাদের দুজন লোককে জখম করেছে। আমাদের দেশের সর্বনাশ করবার সব রকম চেষ্টা করছে দল মিলে।

ব্রজখুড়ো উঠানে নেমে খড়মজোড়া পায়ে দিল। খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, দেশের সর্বনাশ দেশের লোকই সবচেয়ে বেশী করে রাখহরি। দেশের লোক যদি ঠিক থাকে তো বাইরের লোকের সাধ্য কি কোন ক্ষতি করে।

খড়মের শব্দ তুলে ব্রজখুড়ো বাগানের দিকে চলে গেল।

উত্তরটা কেমন গোলমেলে লাগল রাখহরির কাছে। লোকটা অবশ্য সবসময়েই এই রকম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। লোকে তাতে তার সহার্থ নেই। কিন্তু একটা জিনিষ বোঝা গেল

ভিতরে ভিতরে ও তরফের প্রতি বেশ একটু দরদ রয়েছে। যাতে যা লাগলে মানুষ একটু বেসামাল হয়েই পড়ে। বাইরের নিস্পৃহভাবটা একটা ভড়ং। লোক ভোলানো চটক।

রাখহরিও আস্তে আস্তে নেমে এল রোয়াক থেকে।

হাটে কেরত রাখহরির সঙ্গে সাতকড়ি ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদফার মামলাবাজ কি করে যে সংসার চালায় ভগবান জানেন। কেবল কন্যা আঁটছে।

তবে এ হাটের সবাই আসে মতলব নিতে। এমন পাকা মাথা আর নেই।

রাখহরি সাতকড়িকে হাটের ভীড় থেকে আলাদা করে নিল।

একটা কথা ছিল সাতকড়িরা।

সাতকড়ি বসে বসে ধলের মধ্যে রাখা আলুগুলো গুনছিল। রাখহরির কথাগুলো কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল।

কি ব্যাপার সত্যহরি মামলা কজু করে দিয়েছে নাকি?

সত্যহরি রাখহরির দাদা। বছর দুয়েক আগে জমিজমা নিয়ে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছিল: পাড়ার মাতব্বররা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল। সাতকড়িও ছিল সেই দলে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটে যেতে যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

রাখহরিকে বলেও ছিল।

রাখ, ও আলার পুকুরটা ছেড়ে দিয়ে তুমি বড় বোকামি করলে।

ছাড়লাম আর কোথায় সাতকড়িদা, পাড়ার পাঁচজনেই তো ছাড়ালে। যাক, ভালোয় ভালোয় একটা মিটমাট হয়ে গেলেই ভাল।

সাতকড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, তোমাদের ব্যাপার, তোমরাই ভাল জান ভাই। কিন্তু আমি এই বলে রাখলাম সাতটা পুকুরের পাড়ের আমগাছ দুটোও দাবী করবে একদিন। তা যদি না হয় তো তুমি আমার নামে কুকুর পুষো।

সেইজন্যই রাখহরির কথায় সাতকড়ি প্রথমে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

না, না, সে সব কিছু নয়, রাখহরি মাথা নাড়ল, অন্য ব্যাপার। আরো মারাত্মক।

উৎকণ্ঠিত সাতকড়িকে টানতে টানতে রাখহরি পথের পাশে আমতলায় নিয়ে এল।

বেশ একটু ছায়ায় আঁচড়। দুজনে আয়েস করে বসল।

গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রাখহরি বলল, ব্রজমুড়োর ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকছে না সাতকড়িদা।

কি রকম!

ধারে কাছে কেউ নেই, তবুও রাখহরি সাতকড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে সব বলল। নিজের চোখে যা দেখেছে সব। বেশ একটু বাড়তি রংচং মিশিয়ে।

ভ্রূ কুঁচকে, শরীর টান করে সাতকড়ি সব শুনল, তারপর বলল, এ আর তাবাতাবির কি আছে তায়া। ব্যাপারটা তো দিনের আলোর মতন স্পষ্ট।

স্পষ্ট? বকের মত রাখহরি গলাটা বাড়িয়ে দিল।

চোরা কারবার আর কি। সীমানার দু পাশে সবাই যা করছে।

ব্রজখুড়োর ওপর সাতকড়ির যথেষ্ট রাগও ছিল। লোকটা তো সাতকড়িকে একেবারে পাত্তাই দেয় না। আড়ালে নাম দিয়েছে নধরার পোকা। যেদিকে পাঁক, সেদিকে মোংরা সেদিকেই নজর। লোকের ভাল দেখতে পারে না। তার ওপর ব্রজখুড়োর এক বিঘে নাবাল জমির ওপর সাতকড়ির অনেকদিন ধরে নজর ছিল। ভেবেছিল লোকটার সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। এত জমিজমা নিয়ে করবেই বা কি। একটু ধরাধরি করলেই সস্তায় ছেড়ে দেবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত। ব্রজখুড়ো ভাল করে কথা বলল না। অনেকবার অনুরোধ করার পর পরিষ্কার বলে দিল, জমি সে বিক্রি করবে না। মরিই বা কোনদিন করে, সাতকড়ির মতন লোককে তো নয়ই।

কেন আমাকে দব কেন?

নরপশুকে পশু আর নরমাংসাশী মানুষকে প্রতিবেশী করতে নেই। আখেরে ঠকতে হয়।

সাতকড়ি একটি কথাও বলে নি। উঠে চলে এসেছে। আওতার বাইরে এসে প্রতিজ্ঞা করেছে, ব্রজবিলাসকে গাঁ থেকে যদি উচ্ছেদ করতে না পারে তো সে ঘোষের পোই নয়।

এতদিন অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুযোগ পায় নি, নিরিহ মানুষটাকে জড়াবার কোন ফাঁস। এতদিনে ভগবান বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন।

তুমি আর দেরী কর না রাখহরি।

সাতকড়ি উপদেশ দিল।

কিন্তু কি করব?

তুমি আর কি করবে? এসব কাজে তোমার করবার কি আছে?

তবে?

সোজা গিয়ে থানায় খবর দাও। যা করবার তারাই করুক।

থানায়!

হাতের গামছাটা রাখহরি আরো জোরে জোরে ঘোরাতে লাগল। পৃথিবীর সব বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁপ লাগছে।

থানা এখান থেকে মাইল সাতেক। সেজন্য নয়, হাঁটতে রাখহরি খুব পারে। কিন্তু পুলিশ চৌকিদারদের দেখলেই কেমন শরীরটা ঝিমঝিম করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসব কথা তো আর সাতকড়িকে বলা চলে না।

তাই রাখহরি শুধু বলল, তুমিও সঙ্গে চল সাতকড়িদা। যাহোক তুমি গাঁয়ের একটা মাতব্বর লোক, তোমাকে সমীহ করবে।

সাতকড়ি খুশী হল, তবু একটু ইতস্তত করে বলল, আমি গেলে তো হবে না রাখ, আমি তো আর নিজের চোখে দেখি নি। শোনা কথায় এজাহার দিই কি করে! আইনের ঘোপে টিঁকবে না যে।

ঠিক আছে, রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল, তুমি নিজের চোখেই দেখ সাতকড়িদা। একটা রাত আমার ঘরে থাক,অসুবিধা আর কি।

কথাটা মন্দ নয়। নিজের চোখে দেখার ইচ্ছাটাও সাতকড়ির খুব। এতে তো আর ভয়ের

কিছু নেই। এমন নয় যে মাঝরাতে লাঠি হাতে ডাকাতের দলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিংবা আর মাইল দৌড়ে সিঁধেল চোরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এ শুধু একজনের উঠানে দাঁড়িয়ে আর একজনের গতিবিধি দেখা।

সাতকড়ি রাজী হয়ে গেল।

রওনা সাতকড়ির। কিছুটা রাখহরিরও। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নেটাতে টান ধরে গেল, কিন্তু ব্রজখুড়োকে বেরোতে দেখা গেল না।

মশার কামড়ে অস্থির হয়ে সাতকড়ি বলল, কই হে, ব্রজখুড়ো তো হিরি ঘুমাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমাদেরই অবস্থা কাহিল।

অপ্রস্তুত রাখহরি সান্ত্বনা পাইল, কি জানি সাতকড়িদা, আজ তো ব্রজখুড়ো বের হল না। অবশ্য রোজ যে বেরোবে, তারই বা কি মানে। সওদা করার মতন জিনিস কি আর রোজ হাতের মুঠোয় থাকে।

আরেক ঘণ্টা করে রাখহরি সাতকড়িকে আর একটা রাত আটকাল। ফিকে জ্যোৎস্না। অস্পষ্ট হলেও, সব কিছু অদৃশ্য নয়।

একটু রাত হতেই দেখা গেল ব্রজখুড়ো আস্তে আস্তে এসে উঠানে নামল। এদিক ওদিক দেখল তারপর ওপারের বাঁশঝাড়ের দিকে পা চালাল।

রাখহরি আর সাতকড়ি একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কিছু দেখল।

আশ্চর্য কাণ্ড। খলিফের বাড়ী পর্যন্ত ব্রজখুড়ো গেল না। ওপার থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন বেরিয়ে এল। খলিফই বোধ হয়। দুজনে বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল।

মিনিট কুড়ি কিংবা তার একটু বেশীই হবে। রাখহরি আর সাতকড়ির
তাতে সময়ের হিসাব রাখা সম্ভব নয়।

আবার ব্রজখুড়ো নিজের বাড়ীর দিকে ফিরে এল।

হয়ে গেল। উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে সাতকড়ি বলল।

সাতকড়িকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে রাখহরি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়ে গেল?

দেখবেন আর কি। তক্তপোষের ওপর বসতে বসতে সাতকড়ি বলল, চাদর চাপা দিয়ে খলিফই কোন জিনিস নিয়ে এল বোধ হয়, সেটাই হাত বদল করল। আর দেরী নয় রাখ, কাল ভোরে উঠেই পলাশপুর থানায় খবর দিতে হবে। এইবেলা খবরের থানাতল্লাসী করলে হয়তো হাতেনাতে ধরা পড়বে। এরপক্ষ জিনিস পাচার করে দেবে।

আনন্দে সাতকড়ি বাকি রাতটা ঘুমাতে পারল না। মাদুরের ওপর ছটফট করল। ব্রজখুড়োকে আইনের প্যাঁচে ফেলতে পারলে তার জমিজমা হাতের মুঠোয় আনতে মোটেই দেরী হবে না। নাবাল জমিটা কেন, বাস্তু ভিটেটাই কায়দা করে দখল করা যেতে পারে।

সাতকড়ি উঠে বসল। জানলা দিয়ে নজর রাখল ব্রজখুড়োর বাড়ীর দিকে। কোন শব্দ নেই। কতকগুলো জোনাকি ঘুরপাক খাচ্ছে আর প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক তো আছেই।

থানার অফিসর খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলেন। সীমান্তে অহরহ এইসব চলছে। এপারের জিনিস ওপারে যাচ্ছে, ওপারের জিনিস আসছে এপারে। বিরাট একটা দল হলে পুলিসের ধরার পক্ষে খুব সুবিধা। কিন্তু তাতো নয়, একেবারে ঘাপে যারা বাস করে, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ

সোবেচারা লোকজন তারাই এসব চোরাকারবারে অংশ নিচ্ছে। এই ব্রজখুড়োদের মতন লোক। সেইজন্যই পুলিশ মাঝেমাঝে ধরে যাচ্ছে ঠিক ধরতে পারছে না।

অফিসার বার বার বলেছেন, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যাবেলা দুজন সেপাই পাঠিয়ে দেব। তোমরা কিছু গাঁয়ের লোকও জড় করে রেখো। এসব কেসে ধরতে গেলেই একটা হাঙ্গামা হয়। ওপার থেকে আবার গুলিগোলা না চালায়।

রাখহরি আর দাতকড়ি ফিরে এল। গাঁয়ের দু একজন মাতব্বরকে বলাই ছিল। দরকার সময় তারা এসে দাঁড়াবে। আর পুলিশ যখন সঙ্গে থাকবে তখন আর ভয়টা কি!

দুজন সিপাই বিকেলের দিকেই এসে হাজির হল। দুজনের হাতে বন্দুক।

রাখহরি অবশ্য চায় নি এত আগে থাকতে পুলিশ দুটো এসে জোটে কারণ ব্রজখুড়ো একবার টের পেলেই সাবধান হয়ে যাবে। ওপারেও হয়তো ইশারা করে রেখে। ব্যস, এত পরিশ্রম সব বিফলে যাবে। চোরাই মাল সরিয়ে ফেলে নিজে সাধু সেজে বসে থাকবে।

শেষকালে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য রাখহরিদের চেনস্যার একশেষ হবে। সিপাই দুটোকে রাখহরি নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বারণ করে দিল, যেন উঁকি ঝুঁকি না দেয়। ধরবার সময় ঠিক তাদের ডাকবে।

অন্ধকার নামতেই দু'একজন করে রাখহরির ঠাঁয়ে এসে জমল। কয়েকজন বসল দাওয়ার ওপর। দু একজন এগিয়ে জোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল। হাতে লাঠি, সড়কি, বাঁশের কি জানি, কখন কি দরকার লাগে।

রাত এমন কিছু বেশী নয়। অন্ধকার রাতে গাঢ় অন্ধকার একটা ছায়া সন্তর্পণে বের হচ্ছে।

পাশে দাঁড়ানো পুলিশ দুটোর গা টিপে রাখহরি দেখিয়ে দিল, ঐ দেখ যাচ্ছে।

একটু পরেই ওপার থেকে আর একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

রাখহরি সেদিকেও দেখাল।

পুলিশ দুজন গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। একেবারে হাতে হাতে ধরতে হবে। কোনরকমে সীমানার ওপারে না চলে যায়। তাহলেই ধরার পক্ষে আইনগত নানা অসুবিধা দেখা দেবে।

ঠিক যে সময়ে এদিকের ব্রজখুড়ো ওদিকের ছায়ামূর্তির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সেই মুহূর্তে গোটা দুয়েক টর্চের কড়া আলো এসে পড়ল। লোকগুলো হৈ হল্লা করে উঠল। দেখা গেল ওপারের ছায়ামূর্তিটা বসির মিয়ার, আগের মতনই সর্বাঙ্গে কাপড় জড়ানো।

ধাক্কাধাক্কি, গালাগালি। উত্তেজনার মুখে কে একজন ব্রজখুড়োকে সজোরে ঠেলা দিল। বকধার্মিক, তলায় তলায় এইসব হচ্ছিল?

ঠেলাটা বোধ হয় একটু জোরেই হয়েছিল। ব্রজখুড়ো ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

বসির মিয়া চীৎকার করে উঠল, আহা কি করছেন আপনারা। খুড়োমশাইকে মেরে ফেলবেন না কি?

আগে বসির এক গাঁয়ের লোক ছিল, আজকাল একেবারে তিন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েছে। সকলের সঙ্গেই খুব আনা শোনা।

মিয়াসাহেবের বজ্ঞ যে দরদ। কারবারটা বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি? মালগুলো রেখি।

সঙ্গে সঙ্গে দাড়িওয়ালা কাপড়টা ধরে টান দিল, তারপর হতভম্ব হয়ে একপা দুপা করে পিছিয়ে এসে দাঁড়াল।

বসির মিয়ার কোলে এক শিশু। ঘুমন্ত

মেয়ে চোখ চেয়ে চেয়ে দেখছে।

শিশুটিকেও প্রায় সকলেই চেনে। বসিরের কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন।

বসিরই বরাবরকার বলল, এই হোসেনকে দেখবার জন্যই প্রায় খুড়ো মশাই আসেন। দিনে তো আসবার উপায় নেই, তাই রাত্রে আসেন। পাছে আমাদের ওরকের লোক দেখতে পায়, কিছু মনে করে তাই হোসেনকে কাপড় জড়িয়ে আমি কিছুটা এগিয়ে যাই। বাঁশকাড়ের কাছ বরাবর। জানেন তো খুড়োমশাইয়ের এক নাতি ছিল, ঠিক হোসেনের বয়সী। তিনকুলে আপনার বলতে আর তাঁর কেউ ছিল না। সেটিকেও তো খোদা কেড়ে নিয়েছেন। সেই থেকে খুড়ো প্রায় অর্ধে পাগল হয়ে আছেন। আপনারা খুড়োমশাইকে একটু দেখুন।

শেষদিকে বসিরের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সকলে ব্রজখুড়োর দিকে চোখ ফেরাল। অচেতন দেহ। প্রসারিত একটা হাতের কাছে ছড়ানো মাটির পুতুল। কিন্তু অক্ষত নেই। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।


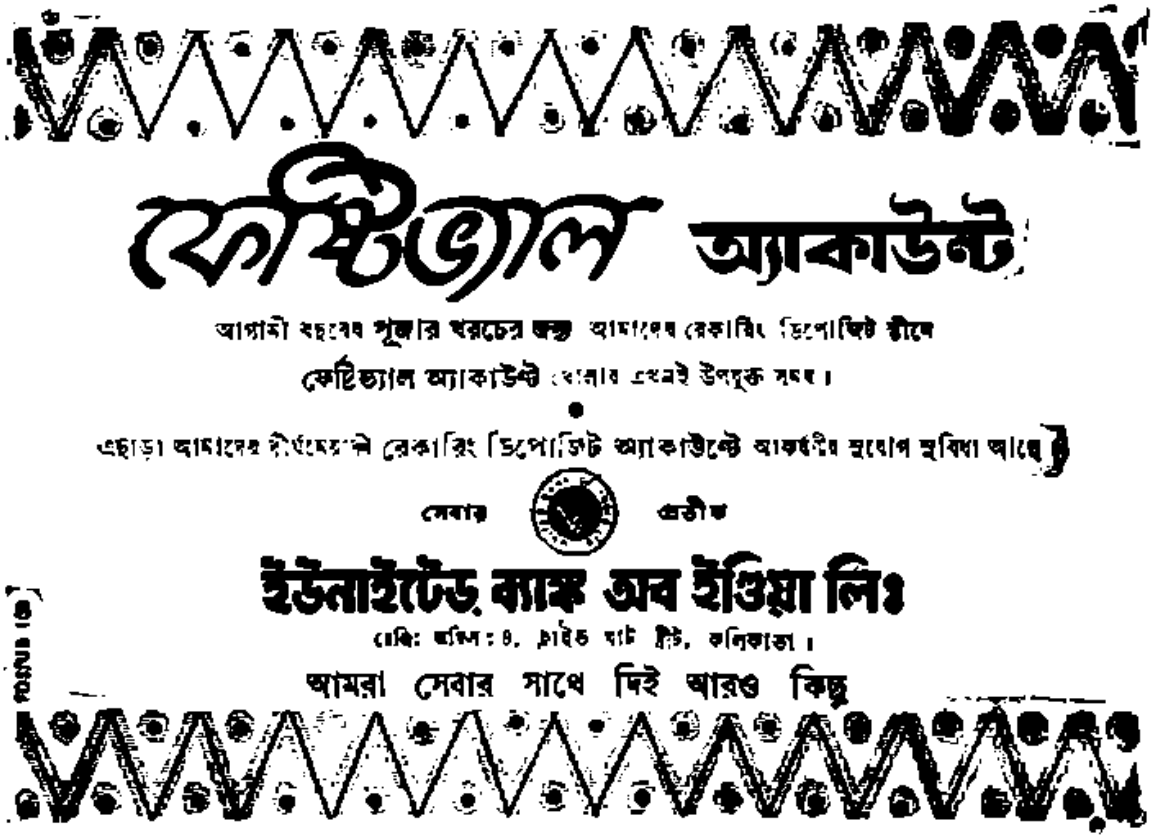

# লঘুমেঘ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারা দিন গৃহিণী দুই অতিথি নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। পঁচিশ বছর আগে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এবং যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া কয়েকদিনের জন্যে আমাকেও বিষম ধাক্কা দিয়েছিল তা নতুন করে মনে পড়ল।

কাশী গিয়েছি, এবং দুচার দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। স্ত্রীকে ডেকে বললাম—বেরিয়েছিলে তাজমহল দেখতে। কাশীর নামে তো নাক শিঁটকে উঠেছিলে। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে তো দেখছি তোমার ধর্মকর্মের আর শেষ নেই। হল কি? আমাকে পর্যন্ত জুলে যেতে বসেছো বলে মনে হচ্ছে! স্ত্রীচরিত্র কথাটা মানতে হল দেখছি।

গৃহিণী হেসে বললেন—বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই মানতে হয়। এই তো সবে সুরু।

—রক্ষে কর। আর মেনে কাজ নেই। এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচি!

উত্তরে তিনি শুধু মৃদু হাসলেন। বুঝলাম, আমার কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না।

বললাম—হাসছো যে? তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। নাস্তিকের অগ্রগণ্য ছিলে তুমি, হঠাৎ কাশীতে এসে পুজো-আর্চা দেবদর্শন আর বামুন-খাওয়ানোর অন্ত নেই। একেই বলে মেয়েমানুষের মন।

অচলা ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, বোধকরি আমি কতখানি বিরক্ত বোধ করছি তা অনুমান করে নিল। তারপর তেমনি হাসিমুখে বললে—কিন্তু কথা ছিল যে একমাস দেশ-বিদেশ ঘুরে আমরা হনিমুন করব। এখনো তো পনেরো দিনও হয়নি। এরই মধ্যেই ফিরতে চাও!

বললাম—হনিমুনে বেরিয়েছিলাম সত্যি। কিন্তু এই কি হনিমুনের নমুনা। এসে পর্যন্ত তো বাড়ীর মধ্যেই একলা কুনো হয়ে বসে আছি, তাছাড়া ক্যাশ বাক্সে যে ঘুন ধরবার জোগাড়। রিটার্ন টিকিট আছে তাই বাঁচোয়া তা নাহলে তো হনিমুন করতে এসে বাড়ীতে টাকা পাঠাবার জন্যে তার করতে হত, "সেণ্ড মনি সুন" আর তাতে আমার মুখ চুন হ'ত।

আমার কথা শুনে অচলা সশব্দে হেসে উঠে বললে—তুমি কী সুন্দর পান্ দিয়ে কথা বানাতে পারো।

বললাম—বিদ্রূপ করছ?

অচলা জিভ কেটে বললে—বিদ্রূপ! ছি ছি, কি বলছ! আমি কি তোমাকে শ্লেষ করে বা তোমাকে শ্লেষ দেবার জন্যে কোন কথা বলতে পারি!

গম্ভীরভাবে বললাম—বেশ! তাহলে তোমার শ্লেষ ঠিকই রইল!

দু'জনেই হেসে উঠলাম। সন্ধি হয়ে গেল।

অচলা বললে—সত্যিই কি আর এখানে তোমার ভাল লাগছে না?

—সত্যিই ভাল লাগছে না।

—কেন বল তো ?

বললাম—তা আগে বলতে হবে। আজ ক'দিন ধরে তোমার চুলের টিকি দেখা যায় তার খেয়াল আছে ?

—মেয়েমানুষের টিকি হয় না।

—আরে ওই হল ! মাথার কেশাগ্রভাগই হল ! কেবল দেখছি, কতকগুলো অসভ্য পাণ্ডা আর বিধবা মেয়েছেলে। এদের নিয়েই চব্বিশঘণ্টা টো টো করে বেড়াচ্ছো। এতে কি আর মন মেজাজ ঠিক থাকে !

এতক্ষণে বোধ হয় আমার কথার কিছু ফল ফললো। অচলা আমার কাছে এসে বললে—তুমি রাগ করো না, লক্ষ্মিটি ! কি করব মা যে বলে দিয়েছেন, এখানকার সব তীর্থ ঘুরে প্রসাদ নিয়ে যেতে।

বললাম—কতগুলো তীর্থ সারলে ? বাকীই বা কত আর ?

অচলা জবাব দিলে—তা তোমার আশীর্বাদে সব সেরেছি। একটা কেবল বাকি আছে। কাল তোর চারটেয় সেখানে যাব। ব্যস, তাহলেই কাজ শেষ।

—তোর চারটেয় যেতে হবে ! ইনি কোন্ দেবতা ?

অচলা বললে—ইনি খুব জাগ্রত দেবতা। এঁর পুজো দেবার জন্যে মার বিশেষ আদেশ না বলেছেন, এঁর কাছে পুজো দিলে, এক বছরের মধ্যে তাঁর একটি টুকটুকে নাতি হবে।

হাসি পেল। রাগও হল। বললাম—সেজন্যে তো আমিই রয়েছি। মার নাতি যদি হয় আমার দ্বারাই হবে। সেজন্যে তোর চারটেয় উঠে…

আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে আরক্ত মুখে অচলা বললে—কী যে বল। মুখে কিছু আটকায় দিনদিন ভারী অশ্লীল হচ্ছ তুমি !

—তোমার অ্যাকশনে আমার রি-অ্যাকশন ! কলাবিদ্যা পড়নি তো ? জানবে কোত্থেকে !

—আর জেনে দরকার নেই। আমি এখন চললাম।

—তা যাও। তাহলে কালই তোমার তীর্থধর্মের শেষ। কাল সকালেই যদি শেষ হয় তাহলে চল না কেন, কালই এখান থেকে এলাহাবাদ রওনা হই। সেখানে নিতাই মামার কাছে দিন দুই থেকে, আগ্রা হয়ে কলকাতা।

অচলা বললে—তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছে। তুমি যদি সেই ব্যবস্থা করতে চাও, তাহলে তাই হবে।

খুসী হয়ে বললাম—বাবা বিশ্বনাথ তোমার সুমতি বজায় রাখুন। কাল দুপুরেই তাহলে রওনা !

অচলা ঘাড় নেড়ে বললে—বেশ বলুম !

• •

পরদিন।

ভোরবেলায় অচলা দু'তিন জন বয়স্কা সঙ্গিনীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

আমি মুখ হাত ধুয়ে ভৃত্য ধুনীর সাহায্যে চা খাওয়া শেষ করে মোটঘাট বাঁধতে লাগলাম।

লাগেজ বেঁধে শহর ঘুরে ষ্টেশন হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে।

তাড়াতাড়ি চান খাওয়া সেরে নেওয়া দরকার। সময় বেশি নেই। খুশীর মুখে শুনলাম, গৃহিণী কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন।

দোতলায় ওঠবার সময় কানে এলো, অচলা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে কথাবার্তার সুর মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর চাবিঘুরির শব্দ করতে করতে অচলা আমার সুমুখে এসে বললে—এসেছো!

স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, আলোর পিছনে অদূরে যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে দেরী হয়নি।

বললাম—হ্যাঁ। টিকিট কিনে নিয়ে এলাম।

আমার কথায় কান না দিয়ে অচলা মেয়েটিকে কাছে এনে আমায় বলল—চিনতে পারো?

চেয়ে দেখলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

বললাম—মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি।

—চিনতে পারোনি?

ঘাড় নাড়লাম।

চিনতে না পারাটা যেন মস্ত একটা অপরাধ হয়েছে আমার এইভাবে অচলা বললে—সেই যে সেবার চাকা থেকে ফেরবার সময় ষ্টীমারে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কতক্ষণ গল্প করলাম এর সঙ্গে। তুমি জিগেস করাতে বললাম, এর নাম নমিতা, বসবার আমাদের পাশের বাড়িতে অনেকদিন ছিল। এত সব কথা হল, আর এরই মধ্যে ভুলে গেলে আচ্ছা, ভুলো মন তো তোমার।

হেসে বললাম—তাতে আর সন্দেহ নেই! তা এঁরা বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

অচলা কি বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। তারপর বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ শোন, খুশীকে দিয়ে তোমার সেই চেনা গাড়োয়ানটাকে ডেকে পাঠাও। তার গাড়িতেই যাব।

—কোথায় যাবে?

—নমিতাকে নিয়ে বেরুবো।

—বেশী দেরি হবে না তো?

অচলা নমিতা নামী মেয়েটিকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বললে—হ্যাঁ, এবেলা ফিরতে পারবো না। নেমন্তন্ন আছে। তুমি সকাল সকাল খেয়ে নিও। আমরা সন্ধ্যার আগেই অবিশ্যি ফিরবো।

সেকি! পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, টিকিট দু'খানা যথাস্থানেই আছে।

বললাম—একবার এদিকে শুনে যেয়ো তো!

ভিতর থেকে উত্তর এলো—আসছি।

বেশ কিছু সময় পরে অচলা বেরিয়ে এলো। বিলম্বের কারণ বুঝতে দেরী হল না। শুধু শাড়ী বদলানো নয়। প্রসাধন পর্বও সারা হয়ে গেছে।

তাকে কাছে ডেকে বললাম—এখন আবার বেরুলে তো ট্রেন ধরা যাবে না।

—ট্রেন! কোথায়? কেন?

অন্ধ জল হয়ে গেল। বললাম—আজ যে আমাদের এলাহাবাদ···

—ওহো! তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ যাওয়া হতে পারে না।

—কিন্তু টিকিট কেনা হয়ে গেছে যে!

—কিন্তু যাবার উপায় নেই।

—কেন নেই?

—সে বড় গুরুতর কারণ। সময়ান্তরে বলব। এখনি নমিতাকে নিয়ে আমায় বেরুতেই হবে। তাছাড়া···

—তাছাড়া কি?

—রাত্রে একজনকে নেমন্তন্ন করে এসেছি। লক্ষ্মিটি! রাগ করো না তিনচারদিন পরেই যাব।

এরপর আর বলবার মত কথা খুঁজে পেলাম না। জোর করতে পারতাম। প্রবৃত্তি হল না। কেমন যেন একটা গ্লানি অনুভব করলাম।

অচলা সেই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

• •

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে নীচে মুন্নীর মুখে শুনলাম, অচলা কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে, সকালের সেই মেয়েটিও এসেছে।

উপরে উঠতে ইচ্ছে হল না। নীচের ঘরে হতাশভাবে বসে ভৃত্যকে মোড়ের দোকান থেকে চা আনতে বললাম। মুন্নী আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেক পরে দরজার প্রান্তে মানুষের ছায়া পড়ল। অল্প আলোয় চিনতে পারলাম না। বললাম কে?

উত্তর এলো—অচলা দেবী কি এই বাড়ীতে থাকেন?

—হ্যাঁ, থাকেন।

লোকটি এবার ভিতরে এসে দাঁড়াল। এক নবীন যুবা, সুশ্রী ও সুবেশ। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে!

বললাম—কাকে চান?

—অচলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার আসবার কথা ছিল। তিনি জানেন।

—ও! কথা ছিল এবং তিনি তা জানেনও! একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম—মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

—আমার নাম প্রদ্যোৎ রায়। তাঁকে খবর দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

মুন্নী চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দিয়ে উপরে খবর পাঠালাম।

সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীচে নেমে এলো। কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—এসেছেন তাহলে। আমরা তো ভেবেছিলাম, এলেন না। আসুন, ওপরে চলুন।

আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি কতক্ষণ ফিরলে? যাঃ। খবর যাওনি তো। একলা অন্ধকারে বসে আছ। আসুন, প্রদ্যোৎবাবু।

প্রদোষ নায়ক ব্যক্তিটি এগিয়ে গেল। তারপর মেঘ যেমন তার পা তেমনি অনুপতভাবে অচলার পিছনে পিছনে উপরে উঠে গেল।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

* * *

তারপর থেকে প্রদোষ প্রায় প্রত্যহই আসছে।

বহুক্ষণ ধরে উপরে বসে হাসিগল্প চলে, তারপর সে এক সময় নীচে নেমে আমার ঘরের সামনে দিয়েই নতমস্তকে বেরিয়ে যায়।

বৈঠকখানায় বসে আমি প্রত্যহ তার এই আসা যাওয়া লক্ষ্য করছি।

সে আমার অস্তিত্ব আর উপস্থিতি নিশ্চয়ই জানতে পারে। কিন্তু কোনদিন ভদ্রতা রক্ষার খাতিরেও আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যায় না। বরং আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় তার মধ্যে যেন কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যায়।

সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যাবেই তো! রুদ্ধ আক্রোশে ভাবি এই সব ঘরে যারা জীবনযাত্রা সুরু করেছে তাদের বোধ করি এই ভীতি।

কিন্তু অচলা! তার মতিগতি হঠাৎ এমন হল কি করে? আমারই চোখের সামনে অত এত পুরুষকে নিয়ে মাতামাতি! কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একেই কি বলে মেয়েমানুষ, এদের লক্ষ্য করেই কি চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম স্ত্রীষু···?

অসহ্য লাগত, সর্বাঙ্গে আগুন ধরত যখন অচলা প্রদোষের সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত অনুগমন করে তাকে পরদিন আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বিদায় দিত!

অসহ্য জ্বালা। দিন দিন বেড়েই চলল।

* *

অচলার সঙ্গে আজকাল দেখাশোনা বেশি হয় না।

নমিতা মেয়েটি সেদিন থেকে আমাদের বাসাতেই আছে। অচলা তাকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকে। এবং দিনরাতের প্রায় সবক্ষণই তার সঙ্গে কাটায়, অপরাহ্ণ বেলায় প্রদোষ আসে। রাত আটটা নটার পর যায়। কোন কোন দিন তিনজনে বেড়াতে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে যখন খেতে বসি তখন মাঝে মধ্যে অচলা হয়ত এসে দাঁড়ায়।

সেই সময় দু'চারটে কথা বলবার সুযোগ পাই।

কবে আমরা কাশী ছেড়ে এলাহাবাদ বা কলকাতায় যাব, আমার এই প্রশ্নের সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে হাসিমুখে অচলা বলল—শিগগিরই যাব। আর দু'চারদিন পরেই তোমায় বলব।

—ওই মেয়েটা কি এখানেই থাকবে?

—কার কথা বলছ? নমিতার?

—হ্যাঁ। আর কোন মেয়ে এ বাসায় আছে বলে তো জানি না।

আমার কথা শুনে অচলা হেসে উঠল। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম।

বললাম—নমিতা যে নির্বিবাদে দিনরাত তোমার কাছে রয়েছে এতে ওর আত্মীয়রা আপত্তি করে না?

অচলা জবাব দিলে—এতদিন তো করেনি। এইবার বোধ হয় করবে।

বললাম—করাই তো উচিৎ। যাক—ওকথা। এখন বল দিকি, আর কতদিন এ ব্যাপার

কথাগুলোর মধ্যে রীতিমতো আহত বিরক্তি প্রকাশ পেল। কিন্তু অচলা তার ধার দিয়েও গেল না। তৎক্ষণাৎ সহজভাবে বললে—আর দিন পাঁচেক।

পরক্ষণেই কান খাড়া করে কি যেন শুনে বলে উঠল—ওই বুঝি প্রদ্যোতবাবু এলেন। তুমি আমি এলাম বলে।

এই বলে সেই যে চলে গেল, সারা দিন তার দেখা পেলাম না। সে চলে যাবার পর আমি যে আর কিছু খুঁজে দিই নি, এ খবরটাও সে জানল না।

• • • •

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। আমার নামে তার। তাতে লেখা: "আজ রাত্রে রওনা হচ্ছি। মধুসূদন।"

মধুসূদন, সে আবার কে? মধুসূদন নামে কাউকে তো চিনি না। আমার কোন জ্ঞাতি বা কুটুম?

সজোরে স্মৃতিমন্থন করলাম। কিন্তু হৈ, কাউকেই তো খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এ মধুসূদন কে? এবং কেনই বা তিনি আসছেন?

অচলা নমিতাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, বাসায় ফিরে দরজার সামনে আমাকে দেখে আমার হাতের দিকে চেয়ে বললে—তার এসেছে বুঝি! যাক্, বাঁচা গেল। কখন এলো?

নমিতা আমাদের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেল।

বৈঠকখানায় ঢুকে বললাম—এইমাত্র এলো।

কিন্তু বোধ হয় ভুল হয়েছে। মধুসূদন নামে কে একজন তার করেছে আমার নামে। কিন্তু ··

অচলা বললে—ভুল হয়নি। তাঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। এ তারই জবাব।

অবাক হয়ে বললাম—কিন্তু টেলি তো আমার নামে!

অচলা জবাব দিলে—আহা, চিঠিখানা লিখেছিলাম তোমারই জবানিতে। আমি মেয়েমানুষ, কি লিখব। এটা আর বুঝছো না?

বুঝছি হাড়ে হাড়ে।

কিন্তু সেকথা বলবার সময় এখন নয়।

বললাম—বুঝলাম। কিন্তু এ লোকটি কে? এবং এর আগমনই বা কেন?

অচলা জবাব দিলে—মধুসূদনবাবু নমিতার কাকা। যাক, কাল আসছেন তাহলে। বাঁচা গেল।

—তা তো গেল। কিন্তু কেন আসছেন?

—নমিতার বিয়ে দিতে।

—তিনি থাকেন কলকাতায়। তাইঝির বিয়ে এখানে? কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে না?

অচলা এবার তরুণোচিত উপর বসল। বললে—বোসো।

বললাম।

অচলা বলতে লাগল—এতদিন তোমায় কোন কথা বলিনি, পাছে আমার প্রাণ পণ্ড করে যাও এই ভয়ে। কিন্তু আর দেরী করা চলে না! শোন, তোমায় একটা গল্প বলি।

উৎসুককণ্ঠে বললাম—এবং তাড়াতাড়ি বল।

অচলার গল্প শুনতে লাগলাম—নমিতারা চারটায় থাকতো। সংসারে ওর ওই কাকা মধুসূদনবাবুই একমাত্র গার্জেন। তিনি কলকাতায় সরকারী আপিসে চাকরি করেন।

—ভাল কথা। তারপর?

—কয়েকদিন আগে সকালবেলা মন্দিরের কাছে হঠাৎ নমিতাকে দেখতে পাই। আমায় দেখে ও কেমন ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। আমি ওকে দেখে খুসী হয়ে কত কথা জিগেস করি, ও কিন্তু ভাল করে একটাও জবাব দিতে পারে না। ওর রকমসকম দেখে আমার যেন কেমন লাগে। ওকে একরকম জোর করেই আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। তারপর আমার কাছে বেশিক্ষণ চেপে থাকতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সব কথা জেনে নি।

এই বলে অচলা আমার কানের কাছে মুখে এনে ফিস ফিস করে যা বলল তা শুনে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললাম—বল কি। কি দুর্নীতি। কিন্তু তুমি এই ইলোপমেণ্টে সহায়তা করছ কি বলে।

অচলা বললে—তুমি বল কি! দেখে শুনেও নিশ্চিন্ত থাকবো! প্রদ্যোৎ তো প্রথমে বিয়ে করতে রাজীই হয় না। বলে, উনিই তো জোর করে চলে এলেন, আমি এ ভাবে আসতে রাজী ছিলাম না, যাই হোক, এখন কিছুদিন যাক, একটা চাকরি বাকরি জোগাড় করি, তারপর হবে। শোন তো কি সর্বনেশে কথা! সহজে কি রাজী হয়। এই ক'দিন প্রত্যহ ওকে বোঝাতে হয়েছে। শেষে ভয় দেখালাম, বললাম যে তুমি কলকাতায় পুলিশমন্ত্রীর হস্তরে বড় কাজ কর, ইচ্ছে করলে প্রদ্যোৎকে এখনি ধরিয়ে দিতে পারো, এখানকার পুলিশ মহলেও তোমার খুব জানাশোনা, তখন কতকটা ভয়ে ভয়ে রাজী হল। দিন ঠিক হয়েছে। পরশু।

অচলার কথা শুনে প্রথমটা নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর তাদের আতিশয্যে তার পিঠে চাপড় দিয়ে বলে উঠলাম—তুমি সত্যিই আশ্চর্য।

"এ কি যুক্তি! এ কি পরিত্রাণ…"

হঠাৎ আমার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। অচলার মুখের পানে চেয়ে বললাম—তুমি তো একটা জবর প্ল্যান নিয়ে খেলা সুরু করেছিলে, এদিকে আমার যে কী অবস্থা হয়েছিল তা তো জানো। আর কিছুদিন হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।

আমার মুখের ভাব দেখে আর গলার স্বর শুনে অচলার মুখের হাসি অন্তর্হিত হল। আরও ঘন হয়ে বসে বললে—কেন বল তো?

—কেন? গত কয়েকদিনের জীবনযাত্রার পাতাগুলো উল্টে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে, অন্তত তোমার মতো বুদ্ধিমতীর বোঝা উচিৎ।

বহুক্ষণ অচলা কোন কথা বললে না, মুখ নীচু করে রইল, তারপর যখন মুখ তুলে চাইল তখন আমি সত্যিই বিস্মিত হ'য়ে গেলাম।

বললে—মনে মনে বুঝি খুবই কষ্ট পেয়েছিলে ?

তার কথায় শুধু একটু হাসলাম।

আপন মনে অচলা বলতে লাগল—ছি ছি ! আপশোষে আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে। থাক ক্ষমা চেয়ে আর লজ্জা বাড়াবো না। কিন্তু কালই আমরা কলকাতা রওনা হব।

বললাম—সে কি ! কাল মধুসূদনবাবু আসছেন। যখন এতটাই করলে···

বাধা দিয়ে অচলা বললে—না, আর নয়। তাঁর ভাইঝিকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেব—ব্যস, তারপর তিনি যা ভাল বোঝেন করবেন। কালই আমরা এখান থেকে যাব। একমাসের ভাড়া দেওয়া আছে, মধুসূদনবাবু ইচ্ছে করলে এ বাসায় এখনো দশ পনেরো দিন থাকতে পারবেন।

—কিন্তু···

বাধা দিয়ে অচলা বললে—তোমার পায়ে পড়ি তুমি অমত কোরো না। এসব আমার আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না !

• • • •

পরদিন যথা সময়ে মহীর ভবনে মধুসূদনবাবুর শুভাগমন হল। বয়স হলেও বেশ শক্ত সমর্থ। বুদ্ধি কিছু উগ্র। পরিচয়াদির পর বললেন—বড় উপকার করেছেন মশায় ! কী উদ্বেগ। ভাগ্যে আপনি আর আপনার স্ত্রী ছিলেন, নইলে কি হত বলুন দিকি, এত বড় চাটুয্যে বংশের নামটা সমাজ জলে তলিয়ে যেতো। কী উদ্বেগ !

বললাম—যাক, এখন তো উদ্বেগের অবসান হয়েছে।

—তা হ্যাঁ, হয়েছে বটে, বজ্জাত মেয়েটা বুঝি আপনার স্ত্রীর কাছে ! উঃ শেষ কালে কিনা এই কাণ্ডটা করলে ! তা যা হোক, বিয়ে যখন হয়ে যাবে তখন আর কোন গোল নেই ! কি বলেন ?

—তা তো বটেই, আর কোন গোল নেই।

ঘনঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—যাক, তাহলেই বাঁচা গেল। উঃ ! কী উদ্বেগ ! বলা যাবে, ছোঁড়াটা কাশীতে চাকরি করতে এসেছিল, তাই সেখানে গিয়েই ভাইঝির বিয়েটা দিয়ে দিলাম। কী বলেন ? তা সে ছোঁড়াটা কোথায় ? সে পাব···

বাইরের দিকে উচ্চকণ্ঠে বললাম—এই যে আসুন প্রবোধবাবু !

প্রবোধ আমার আহ্বানে খতমত খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। মধুসূদনবাবুও আমার সঙ্গে সমান তালে বলে উঠলেন—এই যে এসো বাবাজী এসো ! শরীর গতিক ভাল আছে তো ? থাক, থাক, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক।

বললাম—বসুন প্রবোধবাবু ! মধুসূদনবাবু আপনারা আলাপ করুন, আমি ওপরে খবর দিয়ে আসি।

• • • •

আমার কোন আপত্তি টেকে নি।

মধুসূদনবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধও না। সেইদিনই অচলার বেদে পড়ে আমাদের কাশী ছেড়ে কলকাতা রওনা হোতে হল।

# দেশান্তর

সুবোধ বসু

দিল্লী থেকে আসবার আগে বন্ধু সেনগুপ্তই হোটেলটা সুপারিশ করেছিলেন। তিনি নিজে কখনও ওখানে থাকেন নি, তবে তাঁর এক বন্ধু একবার শিমলা এসে এই হোটেলে দু'হপ্তা কাটিয়ে যান এবং ফিরে গিয়ে সুখ্যাতি করেন। শিমলায় সিসিল বা ক্লার্কের নাম সবাই জানে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের পকেটের সঙ্গে মানানসই সস্তা হোটেলের নাম কলকাতার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে পড়া যায় না। তাই সেনগুপ্তর খবরটা নোট বইয়ে টুকে নিয়েছিলাম।

কালকা স্টেশন থেকে রওনা হবার পর পার্বত্য রেলগাড়ী এঁকে বেঁকে পাহাড়ে চড়তে চড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ই ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে থাকে। একশো একটা টানেল পার হয়ে সেই গাড়ীর শিমলা পৌঁছতে যে বেলা দুটো বেজে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি। দূরের বাসান দিয়ে সাজানো ছোট ছোট ইস্টিশান, কিন্তু বোর্ড ছাড়বার পর আর কোথাও খাবার মতো কিছু পাওয়া যায় না। সহযাত্রী এক মিলিটারী অফিসারের উপদেশ মাত্র ক'রে বোর্ড স্টেশনে রেইনকোর্সমেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় দফা ব্রেকফাস্ট খাবারদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বোর্ড-এর জলও কিছু সঙ্গে নিয়েছিলাম—এমন জল নাকি সারা শিমলা পর্বতাঞ্চলে দুর্লভ। কিন্তু উৎকৃষ্ট জল যে কতটা বিপদে ফেলতে পারে শিমলা পৌঁছবার অনেক আগেই তা টের পাওয়া গেল। অবশেষে শিমলা স্টেশনে যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন মনে হলো দু'মাস কিছু খাইনি।

'ব্লু এঞ্জেল হোটেল। অ্যাটাচড্ বাথরুম। হট অ্যাণ্ড কোল্ড ওয়াটার। সিঙ্গেল সিক্সটিন রুপিস্।' 'মেসার্স হোটেল। নো ক্লাইমব্। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড কন্টিনেন্টাল ফুড। দিস ধারো টাকা।' 'কমপোলিটান হোটেল। অন্ দি মাল। বার অ্যাণ্ড রেস্ট্রোঁ। দৈনিক সিঙ্গেল রোম, ডবল তিরিশ···' হোটেলের দালালেরা একের পর এক এক হাতে কার্ড গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে এবং সশব্দ বিজ্ঞাপনে কান ঝালাপালা করবার উপক্রম করেছে।

'কাপুরের হোটেলের কোনও এজেন্ট স্টেশনে হাজির আছেন কিনা বলতে পারেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কাপুর্ হোটেল! শিমলায়? কই, নাম শুনিনি তো।' একজন হোটেল প্রতিনিধি বিস্ময় ভরে বললেন। 'হিল কাপুর্ হোটেল। অনেক দিন উঠে গেছে।' অপর জন জানালে। শিমলের বেড়াতে এসেছেন, ভালো হোটেলে ওঠা চাই। আমাদের এ-ক্লাস্ হোটেল। দামও না হয় কিছু সুবিধে করে' নেব। কাপুর্ হোটেলে যাবেন কেন?···এ শর্মাজী, সুনিয়ে। ইনি আপনাদের হোটেলের খোঁজ করছেন। অথচ আমি আপনাকে ধরতেই পারছি না।'

শর্মাজী হাজির হবার আগেই সবাই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

এই শর্মাজীর হেপাজতে আমি অবিলম্বে কাপুর্ হোটেলে হাজির হলাম। বস্তুতঃ স্টেশনের এত কাছে শিমলায় আর কোনও হোটেলই বোধহয় নেই, পরে তা আবিষ্কার করেছিলাম। হোটেলের

ঘর পছন্দ করার পর তাড়াতাড়ি নেয়ে ফেললাম। কাপুর নিজে এসে সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেলেন। স্নান-কাপড়ের গরম জল দিয়ে যাবার হুকুম হলো। ভারতীয় না বিলিতী খাওয়া পছন্দ করব জেনে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তার ব্যবস্থা করতে। স্নান সেরেই দেখি, গরম গরম খাওয়া হাজির।

হোটেলটি বড় নয়। একতলা আর দোতলা মিলিয়ে মোট গোটা পনেরো সিঙ্গেল ও ডবল রুম আছে। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। অক্টোবর মাস শিমলার 'সীজন' নয়। তবু এ-কাজে ও কাজে বা বিনা কাজে কিছু লোক সব সময়ই শিমলায় আসে। এদের নিয়েই হোটেলগুলি কোনও রকমে বেঁচে থাকে। যথেষ্ট ব্যবসার হয় না বলে কয়েকটা বড় হোটেল তো এসময় বন্ধই রাখা হয়।

কাপুর্স হোটেল মোটামুটি রকম ভালো করে' রাখা হোটেল। খুব দামি নয়, আবার খুব সস্তাও নয়। অবস্থানটি ভালো। হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা থেকে কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে গেলে প্রথম যে রাস্তার মোড় পড়ে তার খুব কাছেই। মোল রোড থেকে কয়েক ধাপ মাত্র নিচে নামতে হয়। পশ্চিমে এক বা দেড় ফার্লং এগিয়ে গেলে সিসিল হোটেল, পুবে পাঁচ ছ ফার্লং এগুলে স্ল্যাডেস পয়েন্ট আর বীজ।

কাপুর পরদিন নিজে নিয়ে গিয়ে আমাকে শিমলা কালীবাড়ি দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন 'কালী বড় জাগ্রত দেবী। আমি প্রায়ই আসি। এলেই সামনের এই ঘন্টাটা নেড়ে দিই। এখানে তোমাদের বহু বাঙালী দেখতে পাবে। খুব ভালো না হলেও খাবারও এখানে ব্যবস্থা আছে। চল, একবার অফিসটা ঘুরে আসি। কমিটি মেম্বার কেউ যদি থাকেন আলাপ করিয়ে দেব।...'

বস্তুতঃ এর মারফতেই প্রথম কালীবাড়ি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শিমলায় বাঙালির এত বড় জোরের জায়গা আর নেই।

জাকু হিলের মন্দিরেও কাপুরের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। বাঁদর কাহিনীকে তুষ্ট করে' মন্দিরের পথ নির্বিঘ্ন করবার কায়দাটা তিনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শহরের রাস্তায় এবং বাড়ীর ছাদেও এরা প্রায়ই হানা দেয়, কিন্তু জাকু হিলের মত জোর দেখাতে সাহস করে না।

কাপুর আমাকে একটু বিশেষ খাতিরই দেখিয়েছেন। হোটেলের মালিকের মক্কেলকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে দেওয়া কাজ নয়। হয় তো এ অঞ্চলে নিতান্ত আনাড়ী দেখেই শিমলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দু একদিনের পর আর তাঁকে যেতে হয়নি। আমি নিজেই শিমলার সাংঘাতিক চড়াই উতরাই ভেঙে নানা দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় করে' নিচ্ছি। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এলে প্রায়ই কাপুর আমার ঘরে এসে বসেন। কোথায় কোথায় ঘুরেছি জিজ্ঞেস করেন। শিমলার রাস্তায় নাম লেখা থাকেনা বলে নানা রকম বর্ণনা করে তবে আমার ঘুরে আসা স্থানগুলি তার বোধগম্য ক'রে তোলা যায়।

একদিন তিনি নিজেই তাঁর বর্তমানের বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন। এদের আসতে যেতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে দেখেছি মাত্র। কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় নি। সবাই ঘুমুচ্ছে। বসে গল্প করবার মত সময় কোথায়।

উপরতলার একটা পুরো ফ্ল্যাট নিয়েছেন বম্বের কোন এক ফিল্ম প্রোডিউসার সঙ্গে প্রধান ও সহকারী ডিরেক্টর, প্রধান ক্যামেরাম্যান ও প্রোডিউসারের স্ত্রী। 'ভগবান জানেন, স্ত্রী কিনা।' কাপুর নিম্নস্বরে বললেন। 'হয়তো ফিল্ম-প্রোডিউসারের স্ত্রীরাও ফিল্মের নায়িকাদের মতোই

হাবভাব করেন। তবে বয়েসের তফাৎটা বড় বিসদৃশ। যাক গে, ও সম্বন্ধে কৌতূহল আমার বিশ্লেষণের মধ্যে পড়েনা।'

একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক ইন্টারভিউ দিতে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বোর্ড-এর কাছে। সে সারাক্ষণ বট ওন্টাচ্ছে আর ভাইভাভোসিং বক্স তৈরি হচ্ছে। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে এক নববিবাহিত দম্পতি। সারাক্ষণ এরা ক্যামেরা কাঁধে ওরে ঘুরে বেড়ায়, পরস্পরকে ছাড়া আর কোনও কিছু তাদের নজরেই পড়ে না। চণ্ডীগড় থেকে এক শিখ ভদ্রলোক প্রায় তিন হপ্তা ধরে' আছেন। এঁকে ওকে ভেট দিচ্ছেন, ডিনার খাওয়াচ্ছেন বড় বড় হোটেলে। লোক যোগাযোগ তালে সর্বদা ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছেন। উপরতলার কোণের ঘরটিতে দুই বুড়ো-বুড়ী পূর্ব আফ্রিকার নৈরোবী থেকে এসে উঠেছেন। শিমলের বাড়ী কেনবার ইচ্ছে। কিনতে পারলে এখানেই অবসর নিয়ে থাকবেন, কিন্তু শিমলার প্রায় কোনও কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁদের—রাস্তা দুর্গম, হোকোন পাট হয়েই নয়, হাট বাজারের অসুবিধে, যান বাহনের অসুবিধে, রাস্তায় লোকের ভিড় বেশি, জিনিষপত্রের দাম আকাশ এই সব হাজার রকম অভিযোগ। তবু বাড়ী কেনার চেষ্টার ত্রুটী নেই।

'এদের সবারই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। শুধু আপনিই নিছক শিমলা বেড়াতে এসেছেন।' কাপুর বললেন। 'এ জন্যই আপনাকে বিশেষ মনে করি, যত্ন আত্তি করি। তা ছাড়া একটা সম্পর্কও রয়ে গেছে, কিছুতেই তা ভোলা যাচ্ছে না···'

'সম্পর্ক!' সবিস্ময়ে চোখ তুলে বললাম। 'কলকাতায় ছিলেন নাকি কখনও?'

'না, তা নয়।' কাপুর বললেন। 'কিন্তু আমিও একসময় উকিল ছিলাম। মাসতুত ভাই জানেন তো?'

প্রশ্ন কৌতুকোজ্জ্বল চওড়া হাসি কাপুরের রেখাঙ্কিত মুখে। বয়সকালে সুন্দর ছিলেন নিশ্চয়ই। কর্সা লম্বা আধারা চেহারা, মুখটা চওড়া, কপালটা চওড়া, আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ হাত। পা জামার উপর খদ্দরের কামিজ। তার উপর পশমী বাণ্ডি।

'তাই নাকি? ভারি আশ্চর্য তো! তারপর কি হলো?' আন্তরিকতার সুর আবিষ্কার করে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম, 'পরের ঝামেলা ঘরে বেড়াতে আর ভাল লাগল না, কেমন?'

'ঠিক তা নয়। সে কাহিনী আরেক দিন বলব।' কাপুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ ডিনারের টাইম হয়ে গেছে। রান্নাঘরের কাছে এ সময়টা নিজে গিয়ে দাঁড়াই। পরের ঝামেলা ঝেড়ে ফেলবার উপায় কি? এখানেও অন্যের ঝামেলাই পোহাতে হয়—অন্যের পকেটের টাকা নিজের পকেটে টানবার জন্য কোনও তন্ত্র উপায় নেই। নানা লোক, নানা রুচি, নানা ফরমাস, নানা রকম খাওয়ায়। আপনি কোনও ফরমাস করেন না তাই আমার পছন্দমত খাওয়া পাঠাই। —অনেক পাঞ্জাবী ডিশ চালিয়েছি। আলু পরোঠা, ঘাসের ডাল, সর্ষো শাক, মটরপনীর, ভেঁ (বুনো)-র কোপ্তা। জানিনা পছন্দ করেছেন কিনা। কিন্তু যখন পাঞ্জাবে এসেছেন, তখন তার খাওয়াটা খেয়ে যাওয়া চাই। বিলিতি খাবার সবখানেই পাওয়া যায়। কালীবাড়ি থেকে বাঙালিখানাও আনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা সাজেস্ট করিনি। খেতে খুব অসুবিধা হয় নি তো?

'ভালই তো লাগছে।' আমি বললাম, 'দু একটা নতুন তরকারি খাচ্ছি বটে। বুনোদের কোপ্তা বা ভাজির তরকারি খাওয়া রোজ হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তফাৎ তো মাত্র দৌড়নের···'

'সারা হিন্দুস্তানে এই কৌড়মের তফাৎ ছাড়া আর তফাৎ কোথায়? একই সংস্কৃতি, একই চিন্তাধারা এমন কি ভাষাগুলির পঞ্চাশ ভাগ শব্দ এক। যা তফাৎ তা শুধু কৌড়মের!' বলে কাপুর সহাস্যমুখে অতিথি সৎকারের জন্য প্রস্তুত হলেন।

লক্ষ্ণৌবাজার থেকে কাঠের কিছু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে ক্লান্ত হয়ে রীজের এক বেঞ্চিতে এসে বসেছি। পাহাড়ে এত প্রকাণ্ড চওড়া জায়গা আর কোথায় দেখিনি—ম্যাজিস্টিকের চৌরাস্তার চারগুণ চওড়া। এখানে ছোটখাট একটা খেলার মাঠ হতে পারে। বস্তুতঃ খাদের ধারের রেলিং ঘেঁষে যে গ্যালারিগুলি রয়েছে তা ভেতরের দিকে সরিয়ে এনে খেলার মাঠের গ্যালারির মত চারদিকে সাজিয়ে দিয়ে ভেতরে খেলা পর্যন্ত হয় কখনো কখনো।

চমৎকার রৌদ্রে রীজের উজ্জ্বল পিচে-মোড়া প্রশস্ত অঙ্গন ভরে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার পেছনে দিগন্তব্যাপী বরফের পাহাড়। সামনে লাইব্রেরী গির্জার চূড়ো, ছোট শিমলে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে যায় অন্তহীন পর্বতস্তরের মধ্যে। মুহূর্তের একটা ভাব আছে সারা শিমলা শহরে। এর পাহাড় উঁচু, দালান উঁচু, নিচে থেকে বহু বাস উঠে এসেছে এই শহর, বহুদূর ছড়িয়ে আছে।

'কিছু মনে করবেন না। বাঙালী কি?'

চমকে পাশে তাকালাম। আমার নিঃসঙ্গ দর্শনের অবসরে বেঞ্চিতে পাশে এসে বসেছেন এক সহাস্যমুখ বছর চল্লিশের ভদ্রলোক। তার ভাষা শুনে সন্দেহ রইল না খানিকটা।

'আজ্ঞে হাঁ।' তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম।

'কাপুরের হোটেলে উঠেছেন, তাই না? ক'দিন ধরেই আপনাকে লক্ষ্য করেছি। তখনই মনে হয়েছে বাঙালি। ক'দিন আছেন? পুজোটা থাকছেন তো। কালীবাড়িতে খুব ঘটা করে' দুর্গাপুজো হয়। আসুন না একদিন কালীবাড়িতে, সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমার নিজের বাড়ীও কাপুরের হোটেল থেকে বেশি দূর নয়। একদিন এসে নিয়ে যাব। বিদেশে বাঙালী দেখলেই আপনজন বলে মনে হয়।' বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজ নাম, কোন অফিসে কাজ করেন, কত কাল শিমলা বাস করছেন একে একে জানিয়ে দিলেন এবং বিনিময়ে আমার নাম ধাম পরিচয় জেনে নিলেন।

'আশ্চর্য মানুষ এই কাপুর!' হোটেলে কেমন আছি, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি জেনে নিয়ে অবশেষে সান্যাল বললেন, 'এর ইতিহাস যদি বলি, ভাববেন গল্প বলছি। সত্যিই গল্পের মত চাঞ্চল্যকর। আপনি ভাবতে পারেন, হোটেলওয়ালা কাপুর ইচ্ছে করলেই পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'তে পারতেন? ইচ্ছে করলেই।...'

সান্যাল প্রায় না থেমেই সেই চাঞ্চল্যকর ইতিহাস শোনালেন আমাকে। আমিও আলস্যেই করতেই এসেছি। রীজের রৌদ্রদীপ্ত আঙিনার ধারে পাঞ্জাব-বিভাগের সময়কার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনাবলী নীরবে শুনে গেলাম।

বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন কাপুর লাহোর হাইকোর্টে, যেমন নাম, তেমন আয়। এরপর যখন রাজনৈতিক মামলায় তিনি আসামীপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন বিনা পারিশ্রমিকে, তখন তার

খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, এর পরের ধাপ কংগ্রেসে যোগদান। অত্যল্পকালের মধ্যে কাপুর পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হলেন। খেলে গেলেন কয়েক বার। সংগঠনের দিকে তাঁর দক্ষতা সর্বভারতীয় নেতাদেরও প্রশংসা অর্জন করল।

অবশেষে কংগ্রেস আন্দোলনের সাফল্য এলো দেশ বিভাগের মধ্যে। ইংরেজ বলল, 'স্বাধীনতা দিতে পারি, তবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা স্বীকার করতে হবে। পাঞ্জাবকে আর বাংলাকে দু' দু' টুকরো করে পাকিস্তানে আর স্বাধীন ভারতের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।'

এই বিভাগকে স্বীকার না করে' আর কোনও উপায় ছিল না। দুঃখিত অন্তঃকরণে পাঞ্জাবও তাকে মেনে নিয়েছিল—যেমন বাংলাদেশ মেনে নিয়েছিল এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার। সরকারী ভাবে লোক বিনিময়ের কোনও ব্যবস্থা হলো না বটে, দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাই সন্ত্রস্ত জনতা এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে ছুটে পালাতে লাগল। পাঞ্জাবের এই স্বতঃস্ফূর্ত লোক-বিনিময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল, তা এখন সুবিদিত।

প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কাপুর রয়ে গেলেন লাহোরের দায়। ভারতবর্ষে পালিয়ে বাঁচতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্য। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত লাহোরে ছিলেন। এবং একা নয়, সপরিবারে। চলে আসবার কত সুযোগ হয়েছে, বন্ধুরা অনুরোধ করেছেন, শত্রুরা ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচল হয়ে রইলেন। চারদিকে উন্মত্ত নরপশু রক্ত লালসায়, মাংস লালসায়, বিত্ত লালসায় পৈচাশিকতার তাণ্ডব করছে। কাপুরের মত মর্যাদা সম্পন্ন লোক না হলে কে আক্রান্তদের রক্ষার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা সাগ্রহে করতে সমর্থ হতো, ভীত পলায়নপরদের মনোবল রক্ষা করতে পারত? যারা কাপুরকে, অন্ততঃ তাঁর পরিবারের মেয়েদের সরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের কাপুর বলেছেন, 'এত মেয়ের ইজ্জৎ যখন বিপন্ন, তখন শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে কেন? কাপুর পরিবারকে রেখে অন্যেরা তবু সাহস পাবে…'

এই মহত্বের পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ভালো রকমই। যখন শেষ 'রক্ষিত কনভয়' অমৃতসরে এসে পৌঁছল, তখন মনে হলো এক প্রেতবাহিনী যেন মধ্যরাত্রের শ্মশান থেকে দিনের আলোতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কারুরই ভয় পাচ্ছে যেন এরা। রক্তের চিহ্ন তাদের কাপড়ে দেহে যায় পাটরায়। যেন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা এদের মুখে চোখে। রক্ষাব্যূহ ভেদ করে নরপিশাচেরা খুন অপহরণ লুণ্ঠনের শ্রোত বইয়ে গেছে।

অমৃতসর কংগ্রেসের লোকেরা এই প্রেতবাহিনীর মধ্য থেকে অতি কষ্টে কাপুরকে সনাক্ত করে নিয়ে গেল তাঁর জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে। সঙ্গে আর কেউ নেই। বাড়ীর আর একজনও এসে পৌঁছতে পারেনি। একমাত্র কাপুর নিজেই এসে পৌঁছতে পেরেছেন।

পুরো দু'মাস বিছানায় শুয়ে রইলেন কাপুর। বন্ধুরা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আর দেরী নয় এবার কাজে লাগাও। নইলে এঁকে বাঁচাবার আর উপায় নেই। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে।'

এরই ঢেউ চলল কিছু কাল। তারপর একদিন স্টিমের ধাক্কা-খাওয়া এঞ্জিনের মত কাপুর লাফিয়ে পড়লেন সংগঠনের কাজে। এ কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবে। সেই কৃতিত্বের স্বপক্ষ খেলিয়ে দিলেন তিনি। শরণার্থীর সাহায্যে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে, কংগ্রেস

কমিটিগুলির সংহতি ও শৃঙ্খলা বিধানে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখালেন। অমানুষিক খাটবার শক্তি, অবিচল কর্তব্য নিষ্ঠা, অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব ক্ষমতা।

পাঞ্জাবের নতুন মন্ত্রীসভায় তাঁর আসন যে উঁচুতে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রইল না। শোনা গেল, স্বরাষ্ট্রদপ্তর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে কাগজের আলোচনা প্রায় নিশ্চয়তার দিকে পৌঁছল। পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সবাই এ খবর জানে।

এমন সময় কাপুর আবার ভেঙে পড়লেন। যেন ডিপ্থিরিয়া রোগীর মত অস্বাভাবিক জোর পেয়েছিলেন, কিন্তু সে জোর অস্বাভাবিক জোর, অস্থায়ী জোর। কাপুর ভেতরে ভেতরে ভেঙে দুমড়ে চৌচির হয়ে গেছেন। এক অস্বাভাবিক উদ্যমের কিছুকালের জন্য তাঁরা টুকরোগুলি একীভূত ক'রে রেখেছিল। অকস্মাৎ খসে পড়ল কাপুরের মনোবলের যা অবশিষ্ট ছিল। তাইকে কিছু না বলে, দলের নেতার জন্য শুধু এক দীর্ঘ অসংলগ্ন চিঠি লিখে রেখে, কাপুর একদিন চুপে চুপে পালিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। অনুরোধ ছিল যেন অনর্থক তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামান না হয়। তিনি বিশ্রাম চান, এ বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না করা হয়। তিনি শান্তি চান, এ শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না করা হয়।

এরও প্রায় বছর ছয় পরে—যখন প্রায় সবাই তাঁকে ভুলে গেছে—তখন হরবিলাস কাপুর শিমলেয় এসে 'দি গ্লেন্স' নামে বাড়ীটা কিনে সেখানে বাস করতে লাগলেন। কাপুর্স হোটেলের জন্ম হয় এরও বছর তিনেক পরে।

'এই তো কাপুরের আর তাঁর হোটেলের ইতিহাস, গাঙ্গুলী কাহিনী সমাপ্ত করে বললেন। 'কাপুর বহু অর্থ ও সম্পত্তি হারিয়েছেন দেশ বিভাগের ফলে, সোনা জহরত যা নিয়ে সাহোর ত্যাগ করেছিলেন তা ফাস্তায়ই গেছে। তবু তিনি কপর্দকহীন নন। মস্ত বড় উকিল ছিলেন তিনি। দান ধ্যান করেও বহুটাকা বেঁচেছে। এর যে অংশ দিল্লীর ব্যাঙ্কে জমা ছিল তাও খুব কম নয়। এই টাকাতে অনায়াসে তিনি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারতেন। হঠাৎ হোটেল খুলে বসলেন কেন, তাই একটা রহস্য। শত হোক্ এমন কৃতী ও নাম-করা লোক শেষে হোটেলওয়ালা বলে পরিচিত হবে,তা ভাবতে বড় খারাপ লাগে…'

গাঙ্গুলীর মুখের দিকে তাকালাম। শুধু কণ্ঠস্বরই সহানুভূতিতে আর্দ্র নয়, সারা মুখে রীতিমত দুঃখের ছায়া। শিমলা কালীবাড়িতে কাপুর সর্বদা যান। বোধ হয় এ জন্যই এরা তাঁর জন্য ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু কাপুরের মুখে কোনও অসন্তোষের ছায়া আমি কখনও লক্ষ্য করিনি। প্রসন্ন মুখ, কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, ব্যবহারে মর্যাদাপূর্ণ অমায়িকতা। তাঁর ইতিহাস আমার জানা ছিল না, তবু তাঁকে মার্জিত রুচি বুদ্ধিদীপ্ত উদার প্রকৃতি বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, তাঁর বৃত্তির পক্ষে তিনি যেন একটু বেশি উন্নত।

'হোটেলেই ফিরছেন তো? চলুন, আমিও ওদিকে যাচ্ছি।' বলে গাঙ্গুলী বীজের সরকারী বেঞ্চি ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

ভালই কাটল শিমলার দিনগুলি। ব্রিটিশ রাজত্বের ভাইসরয়দের আমলের সেই জলুস, সেই রোমান্টিক আবহাওয়া আর নেই। রাজা উজীর ধামাধরাদের ভিড় কমে গেছে। কিন্তু শিক্ষিত মার্জিত লোকদের অভাব নেই শিমলেয়। বহু অফিস, বহু নতুন কলেজ, বহু হাসপাতাল ও ডাক্তার

অফিসের সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিসের কর্মচারি, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীতে রাস্তা ভ'রে যায়। সন্ধ্যায় স্যাণ্ডেল পায়েই বেড়াবার বা কেনাকাটা করার লোকের অভাব হয় না। কফি-হাউসে ভিড় লেগেই আছে। আপার, মিডল ও লোয়ার এই তিনটে বাজার। মালপত্তরে বহু আলুর বীজ রপ্তানি হয় এখান থেকে। মে-জুনই ট্যুরিষ্টদের আসল সীজন, তবু অক্টোবরেও কিছু কিছু লোক বেড়াতে আসে। পুজোর সময় অনেক বাঙালী চেঞ্জে আসেন; রাস্তাঘাটে সর্বদাই বাংলা ভাষা শোনা যায়। শিমলের আশে পাশে বহু বেড়াবার জায়গা। বাস্-এ চড়ে তার কিছু কিছু আমিও দেখে এসেছি। প্রকাণ্ড আকাশ, তরঙ্গিত দিগন্ত রেখা, তুষারাবৃত হিমালয়। বহু থাকে সাজানো অসংখ্য বাড়ী, ঘুরে ঘুরে চলে-যাওয়া অথৈ হারানো সুন্দর রাস্তাগুলি সব যেন মন হরণ করে নিয়েছিল। এমন সময় বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো বড় তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো।

রাত নটার মধ্যে ডিনার সমাপ্ত হয়েছিল। গায়ে লম্বা ওভারকোট, মাথায় লেদারেটী টুপি পরে কাপুর হাজির হলেন। বললেন, 'চলুন একটু ঘুরে আসি। আজ সুন্দর চাঁদনি রাত। কালই তো চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পাহাড়ের রূপটা একবার দেখে যান। Are you sport?'

লোডটা ভারিন করেই হচ্ছিল। কিন্তু একটু রাত হলেই পাহাড়ের রাস্তা নির্জন হয়ে ওঠে। শীতে ভয় পায় না এমন দলী না হলে বেড়ানো আর হয়ে ওঠে না। লোকে বেড়াইয়ের তলায় বেরুই পছন্দ করে।

'অবশ্যই।' জবাব দিলাম এবং তাড়াতাড়ি নিজের ওভারকোট গায়ে পরলাম।

মালের এদিকে বাড়ী নেই। নিচে গভীর খাদ অন্ধকার রাতে মনে হতো বহুযোজন অঙ্কিত কালো সমুদ্র। নিচের বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আজ জ্যোৎস্নায় যেন অজগরের ঘুমাবার মধি সেখানে ঘুমন্ত রহস্যপুরীর সন্ধান দিয়েছে। পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বাড়ির রেখাগুলি বিস্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ। পাইন গাছের পাতা আর গা বেয়ে জমো জলে পড়ছে। রাস্তা নির্জন। পথের ধারের বেঞ্চিগুলি খালি। নিচের রাস্তা কোথাও চকচক করছে, কোথাও অন্ধকার। কনকনে হাওয়া বইছে। ভেতরটা পর্যন্ত যেন বুঝিয়ে যাচ্ছে এমন উপভোগ্য এই হাওয়া। এইজন্যই আছি শিমলাতে, রাত নটার পরে আর বাইরে বের হইনি। গভীর রাতের এর একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে, একটা স্বপ্নময় চেহারা আছে।

'আজ দিনের বেলায় আর সময় পাইনি। তাই ভাবলাম এখন আপনাকে নিয়ে একটু পায়চারি করে' আসি। কাল দুপুরে তো চলেই যাচ্ছেন।' চলতে চলতে কাপুর বলেন।

'হোটেলের দুঃখ তো এই।' আর মিনিট নীরবে চলবার পর আবার বলেন তিনি, 'কেউ এখানে থাকতে আসেনা। সবাই চলে যায়। যাদের বন্ধু বলে মনে করি তারাও বন্ধন মানে না। আপনি জানেন কি, কেন এ হোটেল খুলেছিলাম? লোক চাই। সঙ্গী চাই, পরিবারের মত অনেকে আমাকে বেষ্টন করে থাকুক, এটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংসার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নির্জন বাসের চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। আবার পালিয়ে এসেছি লোকালয়ে। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হয় নি। আমার জনশূন্য বাড়ীতে লোক চাই। কিন্তু লোক কোথায় পাই কি করে তাদের ডাকি? অবশেষে অনেক ভেবে এই হোটেল খুললাম। নইলে শুধু জীবিকার্জনের জন্য এর খুব দরকার ছিল না ভাই!'

'আমি সব জানি।' সুযোগ পেয়ে আমি তার সদ্ব্যবহার করলাম। 'আপনি একদিন সব বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু আর বলেন নি। আমি অন্যের কাছ থেকেই সব শুনেছি···'

'কি শুনেছেন?' একটু যেন ভীতি ও বিস্ময়ের মিলিত কণ্ঠে বললেন কাপুর। কোথায় শুনেছেন? কালীবাড়ির ওদের কাছে শুনেছেন কি?

'হাঁ। তাই। সবই তাঁরা বলেছেন।' বলে দুচারটি নমুনা সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলাম। রাস্তার ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ঝলকে দেখলাম, কাপুরের রেখাঙ্কিত মুখটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

আর মিনিটটাক নিঃশব্দে চলবার পর তিনি সহসা বল্লেন, 'এরা সবই বিশ্বাস করবেন না। লোকের মুখে সবই পল্লবিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ওসব সুদূর ইতিহাসের কথা। সেই দেশও আর নেই, সে কাপুরও আর নেই। যা অহমিকা ছিল, তাও একটু একটু ক'রে ভেঙিয়ে দিয়েছি। কাপুর্স হোটেল! কাপুর নামটা দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। লোকে বলে হোটেলওয়ালা কাপুর। বলুক না, ক্ষতি কি? কোনও মানুষই তুচ্ছ নয়, কোনও বৃত্তিই তুচ্ছ নয়। অনেক লোকের সঙ্গ পাচ্ছি, এই আমার আনন্দ। বড় আর দামি হোটেল খুললে ম্যানেজার আর নানা রকম কর্মচারি তা চালাত। যেমন অফিস চলে। লোকের সঙ্গে কোনও অন্তরঙ্গ যোগাযোগই হ'তে পারত না সেখানে। সে রকম হোটেল হলে কি আমার চলে? আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। আমি যে লোক চাই···'

এতদিন পরে তাঁর বেদনার কিছু আভাস তাঁর কণ্ঠস্বরে পেলাম। হয়তো তাঁর পূর্ব ইতিহাস জেনে ফেলেছি বলেই এতটুকু প্রকাশ হলো। নইলে কিছুটা বাৎসল্য রসপূর্ণ মার্জিতরুচি হোটেল-ওয়ালা ছাড়া অন্য কিছু মনে করবার মতো কিছুই আর তার মধ্যে নজরে পড়েনি।

হোটেলে এসে পৌঁছেছি। কাপুর আর কিছু বললেন না। নীরবে শুধু আমার হাতটা চেপে ধরে তিনি তাঁর নিজের ঘরগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলাম বলি, 'শিমলায় সব চাইতে বিস্ময়জনক দ্রষ্টব্য যা দেখেছি তা আপনি।' কিন্তু কিছু বললাম না। চুপ করে' চলে এলাম।

---

# বিসর্জন

মানবেন্দ্র পাল

ব্যাপারটা হঠাৎ কী হল কেউ বুঝতে পারল না।

নতুন বৌ। কিশোর ছেলেমানুষও না বেশ হাসিখুশিই ছিল। হঠাৎ যে গতকাল সন্ধ্যায় কী হল—সেই যে ঘরে খিল দিয়ে রইল আর খোলে না। শেষে অনেক সাধ্যসাধনায় যদি বা খিল খুলল, কিন্তু কিছুতেই দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটল না। বিছানাতেও শুল না, মাটিতে পড়ে পড়ে সারা রাত কাটালো। সে রাত্রি তো কাটল। কিন্তু পরের দিনও বউয়ের চোখের জল শুকোয় না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ সকলেই অবাক।—এ আবার কী! অবশ্য বউ বড়লোকের মেয়ে। একটু বেশি আদুরে। রঙটা ছুধে আলতার গোলা। তা—হয়তো একটু জেদীও আছে। তা বলে এমন কী ঘটল যার জন্যে মুখ ভারী, চোখে জল, খাওয়া-খাওয়া বন্ধ? ডাক পড়ল ছেলের।

—হ্যাঁ রে মানিক, ব্যাপার কি? বৌমার কী হয়েছে?

মানিক নেলেই অস্থির। বলে—কী করে জানব?

মা বলেন—তামাশা রাখ্। তোর বৌয়ের খবর তুই রাখিস না তো কে রাখবে শুনি?

মানিক তেমনি ভাবেই হাসতে হাসতে বলে—বিশ্বাস করো মা, আমি কিছু জানি না। কাল সারা রাত্রি ঘরে না ঢুকে আমাকে কেবল খিমচেচে।

মা সস্নেহ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বৌয়ের উদ্দেশে বললেন—পাগল! একেবারে পাগল!

—শুধু বৌই পাগল নয়, তোমার ছেলেটিও পাগল। সারারাত ধরে বৌ খিমচলো আর তোমার ছেলেটি হাসিমুখে তা সয়ে গেল! একবারও জিজ্ঞেস করল না হাসির কারণ কী!—বোন রোষ দিল।

মানিক প্রবল প্রতিবাদ করে বললে—এই চিনু, চুপ কর। তারী তো জানিস। কতবার—ক-ত-বা-র সাধ্যসাধনা করেছি, কিন্তু উত্তর দেয়নি। এই দেখ্ মা সারা পিঠে কী রকম দাগ করে দিয়েছে! বাবা বেছে বেছে বেশ একটি পাগল আমার জন্যে এনে দিয়েছেন!

মা বললেন—বাস্ বকিস নে। ও বয়েসে আমিও অমনি ছিলাম। আমার মনে হয় তোমার কর্তব্যে কোনো ত্রুটি হয়েছে।

মানিক কৃত্রিম বিস্ময়ে দু' চোখ কপালে তুলে যেন ভাববার চেষ্টা করল কী তার ত্রুটি। শেষে ভেবে চিন্তে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা মস্ত ত্রুটি হয়ে গিয়েছে তো! কাল বিকেলে এক প্যাকেট চানাচুর এনে খেয়েছিলাম। তা আমার কী দোষ বলো? ও তো একটু চেয়ে নিলেই পারত। তা না আমায় চানাচুর খেতে খেতে ঘরে ঢুকতে দেখেই চুল বাঁধা ফেলেই এমনি কৌড় মারলে যেন আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। আর তা না হলে মনে হচ্ছে অন্য কারণও হতে পারে। আমার এই জওহর কোটটা দেখে প্রথম দিন থেকেই ও নাক সিঁটকে ছিল। সেইটে আবার পরেছি দেখেই হয় তো—

—মানিক। পাশের ঘর থেকে হেরম্ববাবু ডাকলেন।

মানিক চমকে উঠল—বাবা ডাকছেন! এই বলে চলে গেল।

হেরম্ববাবু বললেন—হ্যাঁরে, বৌমার কী হয়েছে?

মানিক মাথা চুলকে বললে—ঠিক বলতে পারছি না। তবে মনে হয়, বাপের বাড়ি যেতে চায়।

হেরম্ববাবু বললেন—ঠিক কথা, নিশ্চয় যাবে। মা-বাবাকে ছেড়ে থাকা যে কী কঠিন তা আমরা পুরুষরা ঠিক বুঝতে পারি না। মন তো খারাপ করবেই। আচ্ছা, বৌমাকে তুই পাঠিয়ে দে একবার।

এই বৌমাটির ওপরে হেরম্ববাবুর একটু বিশেষ স্নেহ ছিল। মেয়েটি যে মোটামুটি সুশ্রী, মোটামুটি শিক্ষিতা এবং বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানিকের মতো পাত্রের জন্যে এর চেয়েও ভালো পাত্রী যথেষ্ট মিলতে পারত—মিলেও ছিল। কিন্তু রাধারাণীকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন একটি বাৎসল্য রস তাঁর মনের মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠল। সর্বাগ্রেই তাঁর ভালো লেগে গেল নামটি—'রাধারাণী'। বেশ নাম। একালের অর্থ তাৎপর্য-সূত্র নাম তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। আর এ মেয়েটি একালের হয়েও একেবারে সেকালের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। শুধু নামটিই নয়—চলনে-বলনে লাজে-লজ্জায় সংস্কার-আচরণে মেয়েটি যেন দুই যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। খুব চালাকও নয়, খুব বোকাও নয়। খুব চঞ্চলও নয়, খুব শান্তও নয়। বড় সহজ হয়ে গেল মেয়েটিকে। সুতরাং অন্য পাত্রী আর মনে ধরল না। হেরম্ববাবু একদিন ভাবী বেহাইবাড়ি সংবাদসহ ঘোষণা করলেন—রাণী, আমি তোমাকে রাণীর মতো করেই নিয়ে যাব।

হেরম্ববাবু সে কথা রেখেছিলেন।

সেই রাধারাণীর চোখে জল! হেরম্ববাবু অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় ঝড়ের মতো বেগে চিনু এসে ঘরে ঢুকল।

—এই দেখো বাবা, বৌদির বিছানার নীচে কী পেয়েছি।

হেরম্ববাবু অবাক হয়ে দেখলেন—সদ্য একগুছি চুল।

—এ কার চুল? অমন করে কাটল কে? হেরম্ববাবু চমকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু চোখ কেমন অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত হল।

চিনু হেসে বললে—তুমি অমন আঁতকে উঠলে কেন? এ কারও মাথার চুল নয়, এটা নকল চুল। এই রকম চুলের গুছি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

হেরম্ববাবু তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ কিনে কী হয়? যাত্রা দলের নটীরা পরে?

চিনু বুদ্ধ বাপের অজ্ঞতায় হেসে উঠে বললে—যাদের মাথায় চুল কম তারাই এগুলি ব্যবহার করে। জানো বাবা, বৌদিও এই চুলের গুছি দিয়ে চুল বাঁধে। তাই দেখি বৌদি চুল বাঁধছে তো দরজা জানলা বন্ধ কেন? এখন ধরা পড়ে গেছে। আর বৌদির রাগের কারণও আমরা বুঝতে পেরেছি। কাল মামা বিকেলে হঠাৎ বৌদির ঘরে ঢুকে পড়েছিল—বৌদি তখন চুল বাঁধছিল। বৌদি মনে করেছে ধরা পড়ে গেছে। সেই তার লজ্জা আর অভিমান।

হেরম্ববাবু প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।—ও হরি, তাই বলো। কিন্তু মানিক যে বললে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে কাঁদাকাটি করছে।

চিনু হেসে মুখভঙ্গি করে বললে—মায়ার কথা বাদ যাও। কিছু বোঝে নাকি? বৌদি যে মায়াকে দেখেই চুলের গুছিটা বিছানার নীচে রেখে ছুটে পালাল এটা অন্ধ লোক হলেও বোধ হয় তা ধরে ফেলতে পারত। আর তোমার ছেলে—

হেরম্ববাবু বললেন—অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলিস নে। আগে বৌমাকে একটু শান্ত করি। মা অভিমানী মেয়ে! কষ্ট দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দে তো!

চিনু তৎক্ষণাৎ মহা-উৎসাহে চলে গেল।

চিনু চলে গেল আর মুহূর্তের জন্যে ঘরটা খালি হয়ে গেল। হেরম্ববাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন হাতার ওপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল সেই নকল চুলের গুছি। হঠাৎ দেখলে কে বলবে এটা নকল চুল। ঠিক মনে হবে যেন কে কাঁচি দিয়ে এক গোছা চুল কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। এই কথা মনে হতেই হেরম্ববাবু শিউরে উঠলেন। অনেক দিন আগের একটা দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আজ তো তিনি বহু পুত্র-কন্যার পিতা। কিন্তু একদিন তিনিও ছেলেমানুষ ছিলেন। অভিজ্ঞতাটা সেই ছেলেবেলার।

মাকে মনে পড়ে। মাকে তো মনে পড়বেই। মা তো গেলেন এই সেদিন। কিন্তু আজও মনে পড়ে মায়ের সেই রূপ। কর্সা ধবধবে রঙ, কপালে আধুলির মতো বড় গোল টিপ, সিঁথি ভরে সিঁদুর, লাল পেড়ে শাড়ি আর এক পিঠ কুচকুচে কালো ঢেউ খেলানো চুল। সে চুলের বহরই বা কী! কত রকমের খোঁপা বাঁধা!—চাঁদচিতির খোঁপা, পান খোঁপা, পাটি খোঁপা, চাটাই খোঁপা।

এমন কতদিনের ছবি মনে পড়ে—শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে মা আঙুল দিয়ে চিরে চিরে চুল শুকোচ্ছেন। গ্রীষ্মের দুপুরে খাটে শুয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ছেন—খোলা চুল লুটোচ্ছে মেঝেতে, আর বেড়ালের বাচ্চাটা সেই চুল নিয়ে আপন মনে খেলা করছে। আবার সেদিন মা বাধা ঘষতেন, সেদিন সেই স্ফীতকৃত চুল চূড়ো করে বেঁধে যখন কপালে সিঁদুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন—সেদিন মায়ের এক অপূর্ব ভৈরবী মূর্তি!

তারপর মা বিধবা হলেন। এক ফুৎকারে যেন আলো নিভে গেল। লাল পেড়ে শাড়ির বদলে এল সাদা থান। কপালে আর সিঁদুরের চিহ্ন রইল না। মাঝ কপালটা চিবির মতো কঠিন হয়ে উঠল। আর সিঁথিটি—সেদিকে যেন তাকানোই যেত না। পথিক-বর্জিত পথ যেমন শূন্য দেখায় সিঁথিটিও তেমনি খাঁ খাঁ করতে লাগল।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল এ বাড়িতে কতকগুলি বিধবা নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে। এরা এর আগে কোনোদিন মায়ের কাছে দুঃখের দিনে তো নয়ই, সুখের দিনেও এসেছে বলে মনে হল না। এরা সকলেই মায়ের চেয়ে বড়ো—অনেক বড়ো। মাও বিধবা তারাও বিধবা। কিন্তু মায়ের মতো তাদের মধ্যে কোনো বৈধব্যশ্রী ছিল না। মাথার চুলগুলো কাটা। গলায় কণ্ঠি। হাতে হবিষ্যান্নের থালা। কারও কারও সামনের দাঁতগুলো পড়ে গিয়েছে। তারা নিয়মিত মায়ের কাছে আসতে লাগল। তা আসুক, কিন্তু তাদের যেন কেমন ভালো লাগল না। তারা পথ হাঁটে সন্তর্পণে। পদে পদে সতর্কতা, এই বুঝি ছোঁওয়া পড়ল। তাদের চোখের দৃষ্টিতে সর্বদাই সন্দেহ আর বিদ্বেষ। সুস্থ মানুষদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। কথা বলে ফিস্ ফিস্ ক'রে—যেন কিসের ষড়যন্ত্র চলছে।

মা কিন্তু কিছুতেই এবের সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারত না। তবু তাদের সঙ্গে মিশতে হত। তারা কেবল মাকে বলতে লাগল—এটা করো ওটা করো, অমুকটা করতে নেই। ওমা, বামুনের ঘরে বিধবা, এটা জান না?

একদিন স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে অসময়ে। ছেলে বই শ্লেট নিয়ে বাড়ি এসেছে। মাকে অবাক করে দেবে বলে চুপি চুপি ঢুকেছে ঘরে। হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। দেখল মা বড় আয়নাটার সামনে চুলগুলো মুঠো করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

প্রথমটা গেল বিস্ময়ের ধাক্কা। তারপরই ছেলে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।

ছেলে বললে—মা, তুমি কাঁদছ কেন?

ম্লান হেসে মা বললেন—কই, না তো।

ছেলে অভিমান করে বললে—তুমি মিথ্যে কথা বলছ!

মা তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কাঁদছিলাম।

—কেন?

—এই চুলগুলো কেটে ফেলতে হবে।

ছেলে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কেন?

—এই নিয়ম বাবা। বিধবা হয়েছি কি না।

ছেলে প্রবল আপত্তি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে—না, কক্ষণো না। এ চুল তুমি কিছুতেই কাটতে পারবে না।

মায়ের চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—কী করব বাবা, ওরা যে নিন্দে করে।

ছেলে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—না, ওদের কথা শুনবে না। চুল তুমি কাটতে পারবে না—কিছুতেই না।

মা এ কথার ঠিক উত্তর না দিয়ে ছেলেকে আদর করে নিয়ে বললেন—আয়, খাবি আয়।

* * * *

তিন সপ্তাহ পর।

ইনস্পেক্টর আসার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। মনের আনন্দে বাড়ি ঢুকেই ছেলে ডাকতে লাগল—মা—মা—

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। এঘর ওঘর রান্নাঘর গোয়ালঘর, পুকুরপাড় সব খুঁজে এল। কিন্তু মাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। তখন ছেলের বেন কেমন ভয় করল। চুকরে কেঁদে উঠল—মা—মাগো—

এমন সময় ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে মা।

মায়ের দিকে চোখ পড়তেই ছেলে চমকে উঠল—মা!

আর কোনো কথা সরল না। রাগে দুঃখে অভিমানে ছেলের চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

মা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মায়ের এ কী মূর্তি! চুলগুলো কি এমনই নির্মম ভাবে কেটে ফেলতে হয়!

মা এগিয়ে এলেন। তাঁর দু চোখেও জল টলমল করছে। বেদনাহত ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্থির গম্ভীর স্বরে মা বললেন,—বাবা, এ নইলে যে আমার পাপ হত। ঠাকুর রাগ করতেন। অনন্ত নরকে পচে মরতে হত।

নরক সম্বন্ধে ছেলের কিছু ধারণা ছিল। মাকে নরকে পচে মরতে হত শুনে ছেলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। ভয়ে দুঃখে অভিমানে বেদনায় সে মাকে শুধু নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে রইল।

মা বললেন—শোনো, এখনো তোমার একটু কাজ আছে। তুমি নইলে সে কাজ আর কেউ পারবে না। ঐ বারান্দায় কলাপাতা-চাপা একটা ঝুড়ি আছে। কলাপাতাটা তুলো না। অমনি ওটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসো।

ছেলের যেন কেমন ভয় করল। কলাপাতা-চাপা দেওয়া কী রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ ঝুড়িটায়। কী করে তা মাথায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে যাবে!

মা এমনি সময় আবার বললেন—যাও বাবা, দেরি কোরো না। তুমি গঙ্গায় ওটা বিসর্জন না দিয়ে এলে পর্যন্ত আমি যে জলগ্রহণ করতে পারছি না।

এবার আর বিলম্ব হল না। চোখ বুজে ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে ছেলে বেরিয়ে পড়ল।

নির্জন গঙ্গার তীর। বেলা তখন প্রায় তিনটে। হু হু করে বাতাস বইছে। অদূরে শ্মশান-ভূমিতে একটা নিভন্ত চিতা থেকে তখনো ধোঁয়া উড়ছে! ছেলে ঝুড়িটা ধীরে ধীরে মাথা থেকে নামিয়ে দু হাতে ধরে গঙ্গার মধ্যে নেমে গেল অনেকখানি! ঐ ঝুড়িটার মধ্যে কলাপাতার নীচে কী ছিল ছেলে তা জানত না। মা দেখতে নিষেধ করেছিল, তাই সে দেখেনি। কী জানি, যদি তাতে আবার মায়ের কোনো অমঙ্গল হয়!

কিন্তু হঠাৎ এই সময় একটা জোড়ো বাতাস হা হা করে ছুটে এসে সেই কলাপাতার আবরণটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। অমনি ঝুড়ির মধ্যে থেকে একরাশ কালো ঘন কটা চুল বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ ছেলের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। কয়েক মুহূর্ত মাথাটা কেমন করে উঠল? মনে হল জলের নীচে পা দুটো কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এখনি সে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। আর সেই সঙ্গে সেও তলিয়ে যাবে গভীর জলের মধ্যে। তখন ছেলে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে দু হাতে ক'রে নির্মমভাবে ঝুড়িটা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

মনে আছে, তারপর কতক্ষণ সে বসেছিল নির্জন গঙ্গাতীরে। বাড়ি ফিরল যখন তখন রাত হয়ে গেছে।

হেরম্ববাবু চমকে উঠলেন—কে?

দরজার বাইরে লুকিয়ে কে যেন অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হেরম্ববাবু বুঝলেন, বৌমা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেই চুলের গুছিটা সরিয়ে রেখে বৌমাকে ডেকে আনবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

# বমপাশ টাউন থেকে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

মুখের আদল, দেহের গড়ন ঠিক মায়েরই মতন।

পঁচিশ বছর আগেকার সীমা। একটি চঞ্চলা কিশোরী। আনন্দমোহনের চোখে আজো তা অমলান করছে।

আনন্দমোহন তখন তরুণ যুবক। পাড়াপড়শী হিসাবে সীমাকে আপনজনই বলা যেতে পারে। পঁচিশ বছর আগে অন্ততঃ গ্রামের মাতব্বর পড়শীজনকে আত্মীয় বলেই মনে করতো।

হরিকাকার মেয়ে সীমা। প্রায় চঞ্চল কিশোরী। আনন্দমোহনদের বাড়ির অনতিদূরে থাকে:—ইস্কুলের পথে আসতে যেতে দেখা। কখনো কখনো পুকুর ঘাটে, আমবাগানের ছায়াশীতল বৃক্ষকুঞ্জে,—এ-বাড়িতে আর ও-বাড়িতে পরস্পর আসা-যাওয়ার মধ্যেও।

কিন্তু দুজনেরই মনের অতি কাছাকাছি বসবাস। তখনকার দিন তাই; এখনকার দিনকাল হলে বিবাহে আটকাতো না।

হরিকাকা কায়স্থ, আনন্দমোহনের পিতা রমণীমোহন দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড় বলে রমণীমোহন দাদা; তা ছাড়া কুলপুরোহিত-বংশ। মানে, সম্ভ্রমে, বংশ-গৌরবে—সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বিয়ের বাড়িতে, পূজার দরদালানে সামাজিক মেলামেশায় দ্বিজবংশের সম্মান অনেক ঊর্ধ্বে। রমণীমোহন আর হরিদাস তাই এক নয়।

কিন্তু আনন্দমোহন আর সীমার মধ্যে সে-ব্যবধান নেই। বাধা শুধু বর্ণগত, তা না হলে আনন্দমোহনের সঙ্গে সীমার বিয়ে হলে প্রতিবেশী দুই পরিবারই সুখী হতো।

আনন্দমোহন সাধারণ ছেলে। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলো। তারপর একটা দুটো পাশ করে মামার দৌলতে সদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি।

প্রতিবেশিনী সীমা বোধোদয় শিক্ষা অবধারণ করে, রান্না-বান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম প্রভৃতিতে পোক্ত হয়ে পরের ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষারত।

দেখতে শুনতে বেশ মানান সই মেয়ে সীমা। মুখের ছাঁদটি বড় সুন্দর, দেহের গঠনেও লাবণ্যশ্রী। চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল, মাথার চুল হালিতেও প্রমাণমান বেণীবন্ধন, রংটি কেবল একটু মাজামাজা। তবুও সুশ্রী বলা যেতে পারে। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের হরিদাসবাবু যোক্তারি করে দু'পয়সার মুখ দেখেছেন; সুতরাং আনন্দমোহনের বউ হওয়ার যোগ্যতায় সীমা হেরে যাবার মতন মেয়ে নয়।

শুধু জাতে আটকায়। সেইখানেই হার সীমার। আনন্দমোহন ব্রাহ্মণ, আর সীমা কায়স্থ।

সীমারই আগে বিয়ে হয়ে গেলো।

আনন্দমোহনের তুলনায় বরও ভালো পাত্রের সন্ধেই। পাত্র পশ্চিম প্রবাসী-আইনবিদ। অল্প বয়সেই সিভিলকোর্টে বেশ পশার জমিয়েছে।

সুতরাং পাত্র ভালোই।

তবুও বয় কনে বিদায়ের মুহূর্তে আনন্দমোহনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সীমা আর নিজেকে সামলাতে পারেনি।

সবাই বরকনে আশীর্বাদ করছে। আনন্দমোহনও ছিলো। সীমার অশ্রু প্লাবিত সেই মুখখানি গভীর দাগ টেনেছিলো আনন্দমোহনের অন্তরে। ইচ্ছা ছিলো একবারমাত্র স্পর্শ করে সেই বিষুরকান্তি মুখ লাবণ্য।

কিন্তু তা হবার নয়।

সেই মুখখানিই আজ দেখলে আনন্দমোহন দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে। মুখে অশ্রুর প্লাবন নেই, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। চোখ দুটি উদাসীন।

হেওয়রের রমণীয় টাউনের একখানি নিরালা ঘর।

কদিনের জন্যে একটু বেড়াতে এসেছিলেন প্রৌঢ় আনন্দমোহন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে কলুর বলদের সামিল। একটু হাওয়া পরিবর্তন। তাও সুবিধে পাওয়া গেলো তাই। খাওয়া-খাওয়ার খরচ লাগবে না। শুধু আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া মাত্র।

অফিসেরই এক সহকর্মীর দৌলতে আসা। একাই এসেছেন আনন্দমোহন। সাবালক দুই ছেলে আর এক মেয়ে। গৃহিণীও বেশ পাকাপোক্ত। ক'দিন সংসার ছেড়ে এলেও তাই ক্ষতি নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার!

উইলিয়মস টাউন থেকে রমণীয় টাউনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশাখাযুপ মায়াপাহাড়। সেখানে বেড়াতে এসেই দেখা হয়ে গেলো সীমার সঙ্গে।

'ওমা আনন্দদা তুমি এখানে?'

আনন্দমোহনের চোখেও বিস্ময়! 'সীমা, তুমি!'

'হ্যাঁ, এখানে আমাদের নিজেদের বাড়ি। ছুটি-ছাটাতে প্রায়ই আসি আমরা। তা,

'এমনি, ক'দিন বেড়াতে একটু?'

'বৌদি, ছেলেপুলেরা কোথায়?'

'একাই এসেছি।'

'উঠেছো কোথায়?'

'অফিসের এক বন্ধুর বাড়ি। উইলিয়মস টাউন।'

সীমা প্রবলভাবে আপত্তি জানালে, 'তা হবে না। না, কিছুতেই নয়। আমি থাকতে তুমি পরের বাড়ি উঠবে।'

'কালই যে চলে যাবো?'

'সে দেখা যাবে পরে। এখন এসো তো আমার বাড়ি।'

কোন ওজর-আপত্তি শোনেনি সীমা। জোর করেই ধরে এনেছে আনন্দমোহনকে রমণীয় টাউনের তার ছোট্ট বাড়িটিতে। আর তার পরেই হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছে, 'আনন্দদা, আমার নিতান্ত আপনজন।'

চলচলে মুখখানিতে তার পুরো সংসারীর ছাপ। তবুও প্রসন্নময়ী। ছিপছিপে দেহভঙ্গীতে যেমের আধিক্য ; তবুও লাবণ্যময়ী।

আনন্দমোহন বয়স বুড়িয়ে গেছেন। মাথায় এক মাথা টাক, কপালে ভাবনার রেখাবেখা, বিশ্রস্ত চোখ। বয়েসের অবসন্নতা দেহ ঘিরে।

সীমাই সামনে নিয়ে এলো, 'আমার মেয়ে চন্দনা !'

আনন্দমোহন চেয়ে দেখেন, 'ঠিক তোমারই মতন।'

'আমার মতনই আর কই হোল ? রোগা ডিগডিগে।'

'তোমার বোধহয় বিয়ের আগের চেহারার কথা মনে নেই !'

'তোমার মনে আছে ?'

আনন্দমোহন তাকিয়ে দেখেন সীমার দিকে। তার পুরু চেহারায় কিসের ছোঁয়া যেন।

আনন্দমোহন বললেন, 'মেয়েকে তো দেখলাম। তোমার কর্তা কই ?'

'তাঁর কথা আর বলো না। এখানে এসেও মঙ্গলের হাত থেকে রেহাই নেই। গেছেন রিবিয়ার এক মঙ্গলের বাড়ি।'

'আর সব ছেলে পিলে ?'

'আর একটি কেবল ছেলে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। আসবেখন ! তোমার ঘর-সংসার ছেলে পিলেদের কথা তো শুনলাম না।'

'কি আর শুনবে। তারা সব বাপেরই মতন। পরিবের ঘরের দুহৃদ।'

'বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন ?'

শুকনো হাসি হেসে আনন্দমোহন বললেন, 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য !'

সীমা বাধা দিয়ে বললে, 'না, না, ও সব কথা শুনছিনে। এখন এখানকার ক্লাইমেট খুব ভালো। আর তা ছাড়া আমার বাড়িতে কোন অসুবিধেই নেই। চাও তো দুখানা ঘরও ছেড়ে দিতে পারি। তুমি বৌদিকে টেলিগ্রাম করে দাও। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে চলে আসুন।'

আনন্দমোহন এ-কথায় কোন উৎসাহ বোধ করেন না।

চন্দনা দাঁড়িয়েই আছে। রোগা একহারা চেহারা, আয়ত আননে অসঙ্কোচ লাবণ্য, চোখ দুটিতে বিস্ময়ের রেখা। ওর ছিলো মায়ের বাপের বাড়ির আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপন।

আনন্দমোহনবাবু স্নেহে তাকে কাছে ডাকলেন।

সীমা বললে, 'প্রণাম করো। তোমার এক মামা হন।'

চন্দনা আনন্দমোহনবাবুর পায়ধূলি নিলে। আশ্চর্য কোমল স্পর্শ ;—কবেকার একটা সুপ্ত অনুভূতি যেন প্রৌঢ় আনন্দমোহনকে সচকিত করে তুললে। সীমার করস্পর্শ তাঁর মনে পড়ে যায়। সীমার করতলও এমনি কোমল—এমনি স্নিগ্ধরসময় ছিলো।

'থাক মা, থাক। বসো আমার পাশে। কি করো। পড়াশুনা ?'

'ওমা, তা বুঝি জানো না। ও এইবার পাটনা য়ুনিভারসিটি থেকে বি. ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স পরীক্ষা দিয়েছে।'—সীমার চোখে মুখে গর্বের ছোঁয়া।

আশ্চর্য, বোধোদয় পর্যন্ত পড়া সীমাও এখন বেশ ইংরিজি উচ্চারণ করতে শিখেছে।

'তোমার মেয়ে ?'

সীমার প্রশ্নের উত্তরে আনন্দমোহন কী বলবেন ? তাঁর মেয়ে রুমা মায়ের পরিচর্যা করে। সংসারে সমস্ত শক্তি পোঁয়ায়। আর আইবুড়ো মেয়ের কেন যে বর জুটছে না তার জন্যে তিরস্কারে তিরস্কৃত হয়। উত্তর কলকাতার অগুনতি অখ্যাত মসীজীবী কেরানী আনন্দমোহন বরদাশ টাউনের এই ঘরে এই পরিচ্ছন্ন পরিবারের সামনে কী মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারেন ?

তবু বলতে হলো।

'এইবার প্রি-য়ুনিভারসিটি পাশ করেছে।'

'বাঃ, তা বয়েস কতো ?'

'তোমার চন্দনার চেয়েও কিছু ছোট হবে।'

'আমার চন্দনার কতো বয়েস বল তো ?'

আনন্দমোহনবাবু মুস্কিলে পড়েন।

তবু বলতে হয়, 'বছর বাইশ।'

সীমা বালবিধবার হাসি হাসে।

'না, সত্যিই তোমার দৃষ্টিশক্তি দেখছি ক্ষীণ হয়েছে। ওমা, বলো কী। ও দেখতেই চাপা। লম্বা কিনা। কিন্তু মুখ দেখে তো মানুষ অনুমান করতে পারে। চন্দনা সবে সতেরোয় পা দিয়েছে।'

আনন্দমোহন মেনে নিলেন।

কিন্তু কথার কথা বাড়ে। আনন্দমোহন না বাড়ালেও সীমা ছাড়বার পাত্রী নয়।

'তোমার ছেলে ?'

তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে চতুর্থবার থার্ড ডিভিশনে যে ছেলে পাশ করেছে, তাকে কারখানার কাজে শিক্ষানবিশী করতে দিয়েছেন সে-কথা আনন্দমোহন মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

বললেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

সীমা জিগ্যেস করলে, 'কোথায় শিবপুরে ?'

'না।'

'বল্লাপুরে ? না যাদবপুরে।'

'যাদবপুরে।'

'ইলেকট্রিক্যাল না সিভিল ?'

'না, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' কোনরকমে রুদ্ধকণ্ঠকে পরিষ্কার করে নিয়ে আনন্দমোহন উত্তর দিলেন।

'ভালোই করেছো। এখন তো ইঞ্জিনিয়ারদেরই যুগ। আমার ওনার আবার মত অন্য রকমের। উনি বলেন, উল্টো কথা। পয়সা আছে বটে ও লাইনে। কিন্তু কালচার নেই। ছেলেকে উনি আইনে ডকটরেট করতে চান, আর তার সঙ্গে সাহিত্যে। তা ছেলেটির আমার মেধা বেশ। এই বয়সেই—বই লিখতে সুরু করেছে। পড়নি ওর লেখা। সমর বসু। মাত্র উনিশ বছরের ছেলে। এরই মধ্যে তিনখানা উপন্যাস বার করে ফেলেছে।'

সীমা থামতে চায় না।

চন্দনাই বাধা দিলে, 'তুমি কেবল গল্পই করছো মা। মামাকে চা-জলখাবার দাও।'

'যা বলেছিস চন্দনা। ভেবছিস, বাপের বাড়ির লোক পেয়ে এ-কথাটিও ভুলে গেছি। তুই মামাবাবুর কাছে বস। গল্প কর। আমি চা-জলখাবার নিয়ে আসি।'

সীমা চলে গেলো। তার ভারি শরীরে আত্মসুখ আর ঐশ্বর্যের মহিমা। চন্দনা কিন্তু তা নয়।

সে যেন পঁচিশ বছর আগেকার কুমারী সীমা। তার শরীরে শিক্ষা-দীক্ষা রুচি এবং শালীনতার মধ্যেও বাংলার পল্লীশ্রী মাখানো।

আয়ত আয়ন, চোখ দুটি টানা টানা, কোমল করতল শিহরণে ভরা।

আর একবার স্পর্শ পেতে চান আনন্দমোহন চন্দনার।

কিন্তু আনন্দমোহনের সে-সাধ মিটলো কই?

গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরণে চিলা পরিচ্ছন্ন পায়জামা, তরুণ সুদর্শন যে ছেলেটি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকে দেখেই চন্দনার আয়ত আনন মুখর হয়ে উঠলো। টলটলে চোখের চাউনিতে খুশির বন্যা যেন উপচে পড়তে সুরু করেছে।

'এতো দেরি তোমার?'—চন্দনার কণ্ঠে অভিযোগ।

'আর বলো কেন! বাড়িতে কে এক মাসি এসে হাজির। মাসির আদরের ঠেলায় প্রাণ যায়।'

'তোমার মাসি?'

'হাঁ। মার গ্রাম-সম্পর্কে বোন। আজ বৈকুনাথের মন্দিরে মার সঙ্গে দেখা। আর যায় কোথায়? একেবারেই এসে হাজির। মার হুকুম মাসিকে নিয়ে নন্দন পাহাড় যাও,—বারোয়া পার হ'য়ে চোদ্দ পাহাড় বেঁধিয়ে আসো; তাদেরটাও ভুলো না। কী মেয়ো বলো দিকিন!'

বাস্তবজ্ঞান দুজনেরই ছিলো না। তা নাহলে তারা দু'জনেই উপলব্ধি করতে পারতো যে তাদের মাঝখানে আনন্দমোহনও আছেন।

চন্দনা আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, 'চলো তরুণদা ভেতরে যাওয়া যাক্।'

তারপর তার চোখ পড়লো আনন্দমোহনের দিকে। হয়তো একটু কুণ্ঠা এবং লজ্জা! বললে, 'মামাবাবু বসুন, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি!'

চন্দনার সঙ্গে তরুণ চলে গেলো।

আনন্দমোহনের শোনবার কথা নয়। তবুও চুপিসার কথাগুলি তাঁর কানে এলো।

পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তরুণটি জিজ্ঞেস করলে, 'বুড়োটা আবার কে?'

চন্দনার কণ্ঠে সাবধানতার সুর, 'এই চুপ! শুনতে পাবে!'

'মামাবাবু বললে যে!'

'হ্যাঁ মামাবাবু, সেই রকমই তো। তোমার যেমন মাসি।'

তপ্ত শলাকার মতোই কথাগুলি বিঁধলো আনন্দমোহনের কানে। সীমা রান্নাঘরে। কিছু খাবার নিয়ে এখুনি এসে হাজির হবে। তার চেয়ে বরঞ্চ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠে পড়াই ভালো।

সীমা কী মনে করবে?

আর চন্দনা?

না, কারুর কথাই মনে করবার আর দরকার নেই আনন্দমোহনের।

পা দুটোকে সে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলে। ধরণাশ টাউন থেকে উইলিয়মস টাউন;—সেখান থেকে রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাওয়া দরকার। কাল নয়, আজই।

# একই স্কুলের ছাত্র

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

জনার্দন মহা মুস্কিলে পড়েছে। তিন বৎসর এখানে সে চিকিৎসা করছে, তার মধ্যে এমন বিপদে আর কখনও পড়েনি।

শম্ভু ঘোষ মর মর।

সেটা এমন কিছু হত না, যদি লোকটি শম্ভু ঘোষ না হত। পাশাপাশি পাঁচ-ছ' খানি গ্রামের মধ্যে জনার্দন একমাত্র চিকিৎসক। গত তিন বৎসর বহু রোগী সে দেখেছে। বহু রোগী বেঁচে গেছে, বহু মারাও গেছে। তাদের নিয়ে জনার্দন কখনও সমস্যায় পড়েনি। কিন্তু শম্ভু ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

কথাটা আর একটু খুলে বলি :

প্রকাণ্ড একটা বিলের মধ্যে কয়েকটি উঁচু উঁচু ডাঙা জায়গায় পাশাপাশি কয়েকখানি গ্রাম। প্রতি গ্রামে অল্প কয়েকখানি ঘর। বর্ষাকালে এই গ্রামগুলি ছাড়া সমস্ত বিল জলময় থাকে। একটু উঁচু সরকারী রাস্তা গ্রামগুলির পাশ দিয়ে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সদর পর্যন্ত গেছে। কিন্তু বর্ষায় সেটিও জলে ডুবে যায়। তখন গ্রামগুলির সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোন সম্পর্কই থাকে না।

গ্রামগুলিতে গোয়ালার বাসই বেশী। কিন্তু অন্য জাতিও আছে।

এ অঞ্চলে পাঠশালা নেই, ডাকঘরও বহু দূরে। কখনও কারও কোন চিঠিও আসে না।

জনার্দন পাশ করা ডাক্তার নয়। এমনকি পাশ না-করা ডাক্তারও নয়। বস্তুতঃ, সে লেখা পড়াও বিশেষ শেখে নি। বিগ্রহ সেবা, ধনীর গৃহে রাধুনী বৃত্তি, জীবিকা অর্জনের জন্যে নানা রকমের কাজ সে করেছে। কিন্তু তাতে তার পোষায় নি। অবশেষে জনৈক বন্ধুর পরামর্শে সে স্থির করে ফেললে, চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করবে।

প্রথমটা সে সাহস করেনি। চিকিৎসার কিছুই সে জানে না। মানুষের জীবন মরণ নিয়ে ব্যাপার। কি করে কি করবে?

কিন্তু বন্ধু ভরসা দিলে : ব্যাপারটা কিছুমাত্র শক্ত নয়। পুঁজনের মধ্যে একটি আমকাঠের ছোট আলমারী এবং কতকগুলো রঙ বেরঙের জলভরা শিশি।

জনার্দন সভয়ে লাফিয়ে উঠেছিল : এই নিয়ে চিকিচ্ছে!

বন্ধু বলেছিল, হাঁ।

বন্ধুর যুক্তি এই ছিল যে, জীবন-মৃত্যু মানুষের হাতে নয়, ভগবানই বাঁচান, ভগবানই ডাক্তার উপলক্ষ্য মাত্র।

দর্শন শাস্ত্রের একটা মস্তবড় তত্ত্ব। যুক্তিটা জনার্দনের মনে লেগেছিল। সত্যই তো। সে কে? সে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না। সে শুধু ওষুধ দেবে, অথবা ওষুধের নামে যা হোক কিছু দেবে, আর তার বিনিময়ে কিছু পয়সা পাবে। তারপরে যা করেন হরি।

বন্ধু আরও বলেছিল : কিছু বুদ্ধি তোমাকে খরচ করতে হবে স্থান নির্বাচনে। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা ঠিক করতে হবে, যেখানে লোকেরা লেখাপড়া জানে না। যেখানে কেউ

তোমার বিলে নিয়ে প্রশ্ন করবে না, বা তোমার সার্টিফিকেট দেখতেও চাইবে না। শুধু বলে তুমি যা দেবে, তাই তারা ভক্তিভরে খাবে।

—কিন্তু মরে যদি ?

—সে তোমার অপরাধ নয়। সে মরবে তোমার ওষুধের জন্যে নয়,—তুমিতো শুধু জল দিচ্ছ,—মরবে তার পরমায়ু নেই বলে।

এও একটি তত্ত্ব কথা।

জনার্দন একদিন বেরিয়ে পড়ল। তেমনি একটা জায়গার খোঁজে। অনেক জায়গা সে খুঁজল। তেমন জায়গা কোথাও পাওয়া যায় না। সবাই প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে পাস করেছেন ?

ঘুরতে ঘুরতে এই নিশ্চিন্দিপুরের সন্ধান পেলে। শহর থেকে দূরে, রেল লাইন থেকে দূরে, এই গাওর-বর্জিত দেশে একটি মানুষেরও অক্ষর পরিচয় হয়নি। এখানে রোগ এবং রোগী প্রচুর। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে চিকিৎসক নেই। বেদীর ভাগ লোক দুধ ও ছানার চালানি কারবার করে। তার ওপর বিলের ফসল আছে। এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে যে গঞ্জ, সেইখানে যাকে করে ঘিয়ে আসে দুধ ও ছানা আর গরুর পিঠে ছালা বোঝাই নিয়ে যায় রবি-শস্য। ফেরে বাঁক এবং ছালায় বোঝাই করে চাল-ডাল-নুন-তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে। গঞ্জের মারফতে বাইরের সভ্য জগতের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হওয়া সম্ভব, সেইটুকুই মাত্র পরিচয়।

এদের বিশ্বাস অপরিসীম। বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবস্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং জনার্দনের স্থান-নির্বাচনে ভুল হয় নি।

একটা আধ কাঠের আলমারী, ত্রিপদ পরিত্রিপটা ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের শিশি বোতল আর একখানা শুদ্ধপ্রেস পত্রিকা, এই নিয়ে জনার্দন দুর্গা' বলে প্র্যাকটিসে বসে গেল।

শুদ্ধপ্রেস পত্রিকাটা হল মেটিরিয়া মেডিকা। প্রশ্ন করবার কেউ নেই। কারণ, অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন লোক গ্রামে একটিও নেই।

যখন খুব কঠিন রোগী হাতে আসে, নানা ওষুধ দিয়েও রোগের উপশম হয় না, জনার্দন তখন মেটিরিয়া মেডিকা খোলে। কুঁচকে পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকে। হঠাৎ একসময় তার মুখ আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রোগী বোঝে, ডাক্তারবাবু এবার ঠিক হদিস পেয়েছেন। সে খুশী হয়ে বাড়ি ফেরে। রোগী কখনও সারে, কখনও সারে না।

তাতে কি ?

হাত উল্টে জনার্দন বলে, ভাই, আমি তো ভগবান নই। রোগীর চিকিচ্ছে করতে পারি। কিন্তু তার পরমায়ু তো দিতে পারি না। পরমায়ু না থাকলে, আমার বাবারও ক্ষমতা নেই রোগীকে বাঁচাবার। কি করব বল ?

সত্যই বলার কিছু নেই। রোগীর আত্মীয়-স্বজন সেকথা বোঝে। বোঝে নিজের অদৃষ্টকে। জনার্দনকে নয়।

শম্ভু ঘোষের ছেলেরা যদি গ্রামের আর পাঁচজনের মত হত, চিন্তার কোন কারণ থাকত না। কয়েক সপ্তাহ কাটবার পরও যখন উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না, শম্ভুর বাড়ির লোকজন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিশেষ করে তার বড় ছেলে হারাধন।

জনার্দনের উপর শম্ভু ঘোষ ও তার পরিবারবর্গের বিশেষ জোর আছে। যে ঘরটিতে জনার্দনের ডাক্তারখানা, সেটি শম্ভুর সুবৃহৎ গোয়ালের একাংশ। ওদিকে তার অসংখ্য গরু মহিষ, এদিকে জনার্দনের ডাক্তারখানা। যেখানে সেওয়াল তোলা। সে সেওয়ালও এত পাতলা যে, রাত্রে এঘর থেকে গরু বাছুরের রোমন্থনের শব্দ পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম ঘুমের ঘোরেই জনার্দন চমকে উঠে বসে কানে হাত দিত। মনে হত, গরুগুলি বুঝি তারই কাঁধ কামড়ে ধরেছে, শব্দ এত কাছে বোধ হত।

এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আর চমকায় না।

সে যাই হোক, এই বদান্যতার জন্যে জনার্দন কৃতজ্ঞ।

শুধু একাধারে ডাক্তারখানা এবং শয়নকক্ষই নয়, ঘুঁটে, দই ও ঘি পর্যন্ত পরিমাণে উপহারেও ক্ষেত্রের তরিতরকারী, তাও শম্ভু আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশী দিত।

শম্ভু এ গ্রামের সবচেয়ে ধনিক ব্যক্তি। তার জনবল এবং অর্থবলও অন্য সকলের চেয়ে বেশী। বস্তুতঃ, জনার্দন শম্ভু ঘোষের আশ্রয়েই নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালাচ্ছিল। এইসব নানাকারণে জনার্দনের উপর শম্ভুর যেমন জোর বেশী ছিল, জনার্দনও শম্ভুর কাছে তেমনি অনুগত ছিল।

শম্ভুর অসুখ সারে না। হারাধন সকালে এসে দাঁড়ায়। জনার্দনের মুখ শুকিয়ে যায়।

—জ্বর তো কমে না, ডাক্তার। সবাই বলছে, বড় ডাক্তার আনতে। বাবার আপনার ওপর বিশ্বেস খুব বেশী। কিন্তু বাড়ির পাঁচজনের কথাও তো ঠেলা যায় না। আপনি কি বলেন?

ঠিক কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও একজন বড় ডাক্তার আছেন, এ খবর জনার্দন শুনেছে। কিন্তু কখনও তাঁকে চোখে দেখেনি। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র লোক বেশী পয়সা খরচ করে তাঁকে আনতে পারে না।

কিন্তু শম্ভু ঘোষের কথা স্বতন্ত্র। তার পয়সা সুতরাং খরচ করে বড় ডাক্তারকে আনা, তার পক্ষে সম্ভব।

বড় ডাক্তার, কত বড় ডাক্তার, জনার্দন জানে না। কিন্তু যখন অন্যান্য সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করেন, তখন নিশ্চয়ই বেশ বড় ডাক্তার। অন্ততঃ, তার চেয়ে বড়, তাতে আর সন্দেহের কারণ নেই।

এসেই নিশ্চয় তাকে জিজ্ঞেস করবেন, রোগটাকে আপনার কি মনে হয়?

কি হয়ত: কি ওষুধ দিয়েছেন?

জনার্দন রোগ সম্বন্ধে নির্বিকার এবং নির্বিচার। তার কাছে সকল রোগই সমান। কোন রোগেরই নাম গোত্রের সে খবর রাখে না। এবং সকল রোগেই ঔষধ হচ্ছে, ঐই রঙ করা জল। তারও নাম গোত্রের সে ধার ধারে না।

দুশ্চিন্তার আসল কারণ এইটাই।

নতুন ওষুধ দিলে। আগে যেটা ওষুধ দিচ্ছিল, এখন দিলে

কিন্তু হারাধনের ভাগ্যটা মন্দ বলে দুদিনে অসুখ তো ছাড়লই না, বরং আরও বেড়েই গেল।

হারাধন বললে, ডাক্তার, আপনি অনেক করলেন। কিন্তু, অসুখ তো ছাড়ছে না। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ বিকেলে বড় ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাই। কি বলেন?

বলার কিছুই নেই। তার বাপের অসুখ, অন্য কিছুতেই ভরসা পাচ্ছেন। পয়সা আছে। যে বড় ডাক্তার আনতে নিষেধ করে কি করে?

বললে, তাই দেখ।

এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে সে চোখে অন্ধকার দেখলে। কোনমতে বক্তব্যটা শেষ করলে: কিন্তু তাও বলি, বড় ডাক্তারের কি কমী মরে না?

হারাধন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, সে তো বটেই কিন্তু কথা কি জানেন ডাক্তার, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। বড় ডাক্তার দেখাতে তো ক্ষতি নেই।

অর্থাৎ আর তাকে রোখা গেল না। বড় ডাক্তার আনতে সে বাধেই।

জগদীশ নিঃসুম হয়ে বসে রইল। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বড় ডাক্তার অনেক দূরে থাকেন, আজ বিকেলে যদি তাঁর কাছে লোক যায়, কাল সকালের আগে তিনি আসতে পারবেন না নিশ্চয়। আজ রাত্রিই তার নিশ্চিন্দিপুরের শেষ রাত্রি। ভোরের আগে তাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। বড় ডাক্তারের সামনে অসদর হওয়া চলবে না।

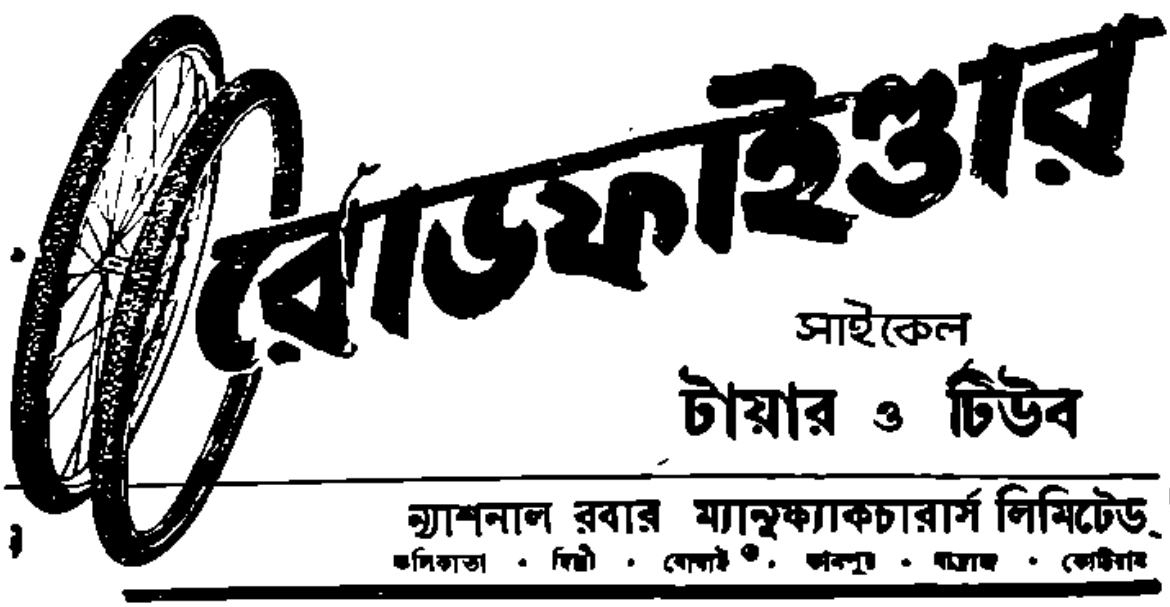

কিন্তু কোথায় যাবে? এই বিদ্যা নিয়ে সে আর কোথায় ডাক্তারী করতে পারে? কোথায় গিয়ে সে রুটি খেতে পাবে?

এখানে যে পয়সা খুব বেশী পেত, তা নয়। কিন্তু চালটা-ডালটা, শাকটা-কলাটা-মুলোটা, তার উপর দুধ-দই-ঘি, নিজের শরীরটা ইতিমধ্যেই বেশ চিক্কন করে উঠেছে। সিকিটা দু' আনিটা কিও পেত। ডাকঘরের অভাবে নিয়মিত মানি অর্ডার করতে পারত না বটে, কিন্তু দুতিন মাস অন্তর বাড়ি এসে জিনিষ পত্র ছাড়াও নগদ কিছু স্ত্রীর হাতে দিতে পারত। বলতে গেলে, সে সুখেই ছিল।

কিন্তু ভগবান একি করলেন।

শম্ভু ঘোষের ওপর রাগও হল। জনার্দনের জন্যে লোকটা অনেক কিছু করেছে সত্যি, কিন্তু শেষকালে যাবার সময় এ কি করে গেল? শম্ভু বাঁচবে না, কিন্তু মরবার সময় জনার্দনকেও মেরে গেল।

রাত্রে রান্না করতে তার মন সরল না। যথারীতি দুধ ছিল আর মুড়ি। তাই খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ত শেষ রজনী।

এবং গ্রীষ্ম কালের রাত্রি কতটুকুই বা!

জনার্দনের চোখে ঘুম আসে না। শুধু আকাশ-পাতাল এলোমেলো চিন্তা। কোথায় যাবে, এমনি একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর জায়গা, কোথায় খুঁজে পাবে, সে চিন্তা তো আছেই। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাততঃ কাক-কোকিল ডাকবার আগে সকলের অগোচরে এখান থেকে পলায়নের চিন্তাই বড়।

বোঝা বেশী হবে না। ওষুধগুলো তো শিশি মাত্র। সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। আলমারীটাও থাক। পরে যে ডাক্তার আসবে তার কাজে লাগতে পারে। একটা স্টেথোস্কোপ আছে, কিন্তু সেটা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাঁধা আর বালিশটা থাকলেই বা ক্ষতি কি? ষ্টেশন অনেক দূরের পথ। ঝাড়া হাত-পাই ভাল।

জনার্দন উঠে বসল।

শিশির জলগুলো ফেলে দিয়ে যাওয়া দরকার। বড় ডাক্তার এসে তার বিদ্যা ধরে ফেলতে কিন্তু আলমারী তালা বন্ধ থাকলে কেইবা তালা খুলে তা বড় ডাক্তারকে দেখাচ্ছে!

জনার্দনের খোঁজ একবার পড়বে। বড় ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করবে ওষুধগুলো দেবার জন্যে।

এত দুঃখেও জনার্দন হেসে ফেলল।

কোথায় ঔষধ, কেই বা দিচ্ছে?

সময় অনেক দূরে। বড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন মত ওষুধ এনে যাওয়ার আগেই শম্ভু পটল তুলবে।

অন্ধকারে জনার্দন হাত বের করে হাসলে।

জনার্দন পালাচ্ছে।

জোরে জোরে পা চালিয়ে কয়েক মাইল আসতে অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে গেল। সেই ফিকে অন্ধকারে মনে হল, অনেক দূরে কে যেন ঘোড়ায় চড়ে আসছে। পিছনে আর একটা লোক। তার মাথায় একটা কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঔষধের বাক্স হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে অশ্বারোহীটিই নিশ্চয় বড় ডাক্তার। নতুন রোগকে দেখতে আসছে।

জনার্দন থমকে দাঁড়াল।

তারপর ধীরে ধীরে পাশে পাটক্ষেতের আড়ালে আত্মগোপন করলে।

পাট গাছগুলির ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টি ওই ঘোড়সওয়ারের দিকে নিবদ্ধ।

যখন তারা আরও কাছে এল, তখন দেখলে, লোক মোট দু'জন নয়, তিনজন। সব পিছনে হারাধন স্বয়ং।

কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে ও লোকটি কে?

যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে, জনার্দন লাফিয়ে উঠল:

গাঁয়ের নতুরাম!

নতুরাম তার ছেলেবেলার বন্ধু। অনেক দিন গ্রাম ছাড়া। তার খবর কেউ বড় একটা রাখে না।

সে কি এই অকালে এসে বড় ডাক্তার হয়ে গেছে?

না, এ অন্য ব্যাপার? কিন্তু তাহলে হারাধন সঙ্গে কেন?

অনেক দিন পরে বাল্যবন্ধুকে দেখে জনার্দন আত্মহারা হয়ে উঠল। যা হবার হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে জনার্দন একলাফে নতুরামের ঘোড়ার সামনে এসে পড়ল।

নতুরামও অবাক। সেও তড়াক করে ঘোড়ার থেকে লাফিয়ে নেমে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।

—আরে, জনার্দন! তুই এখানে?

হারাধনও অবাক: ডাক্তার, আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন?

সেকথা বলবার নয়।

জনার্দন নতুরামের কাঁধে ঝাঁকিয়ে দিয়ে উত্তেজিত আনন্দে জিজ্ঞাসা করলে, আগে বল্, তুই-ই কি বড় ডাক্তার?

নতুরাম স্বীকার করল, এখানে আমাকে সবাই তাই বলেই ডাকে, ভাই।

আনন্দে জনার্দনের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ভগবান তাকে খুব রক্ষা করেছেন।

হারাধন বললে, উনি আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার। বাবাকে উনিই দেখছেন।

নতুরাম রেগে গেল: উনিই যদি তোমার বাবাকে দেখছেন, তবে আবার আমাকে কল্ দিলে কেন? উনি কি সোজা ডাক্তার নাকি? আমরা একই ইস্কুলের ছাত্র।

জনার্দনের সাহস বেড়ে গেল।

বললে, তা হোক। এসে যখন পড়েছিস, তখন তুইও একবার দেখ্। তাছাড়া—হারাধনের দিকে চেয়ে বললে,—পুকুরে একটা বড় দেখে মাছ ধরাও। নতুরামকে আমার হাতের রান্না খাইয়ে দি।

উপন্যাস

# নামবার সিঁড়ি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীহরি...
...নং ...
...
...

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। ইউরোপে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। ইণ্ডিয়ায় তখন ইংরাজের রাজত্ব।

যে গ্রামের কথা লিখছি সে গ্রামখানি শহরের কাছাকাছি—বেশ বড় একখানি গ্রাম।

রোজ সকালে বন্দরতলায় একটি হাট বসে। অন্য গ্রাম থেকে চাষার মেয়েরা আসে ঘরতুলি ফলপ বিক্রি করতে।

কয়েকদিন হলো মেয়েরা আর আসছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, গাঁয়ের মানুষগুলো ভাল নয়।

মেয়েদের আসা বন্ধ হয়েছে। পুরুষেরা আসে।

তখন কার্তিক মাস। মাঠের নতুন বেগুন হাটে এসেছিল।

খবর পেয়ে গণেশ পাঁড়ে সেদিন নিজেই গেল বেগুন কিনতে।

বেগুনগুলোকে দেখাই যায় না। মেয়েরা তখন তাকে ঘিরে ধরেছে।

গণেশ আর গলায় হাঁকলে, ঘর কত হে—ঘর কত তোমার বেগুনের?

লোকজনের কোলাহলে বোধকরি কথাটা সে শুনতে পায়নি, তাই জবাব দিতে পারলে না।

গণেশ এবার এগিয়ে গেল।

—এই ব্যাটা চাষা!

মেয়েরা সরে দাঁড়ালো গণেশকে দেখে।

—কী বলছেন ঠাকুর?

—বলছি ঘর কত?

—আজ্ঞে তিন আনা সের।

—তিন আনা কি বলছিস? সোনারূপো তো নয়, চাষের বেগুন।

অত খদ্দেরের বেগুন ওজন করতে করতে চাষী বললে, কি করবো বাবু, যুদ্ধুর বাজার আজকাল।

—যুদ্ধুর বাজার হলো তো তোর কি? বেগুন তো বিলেতে চালান যাচ্ছে না!

চাষী সেকথার জবাব দিলে না। বললে, আপনার কাছে চার আনা পাঁচসা পাব ছিঙ্কের ঝরণ—

পাবি তো পাবি! আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না হারামজাদা।

গাল দিচ্ছেন কেন বাবু। আমি গরীব মানুষ—পয়সাটা ফেলে দিলেই তো

গণেশ পাঁড়ে বলে উঠলো, যদি না দিই?

—দেবেন না কী বাবু? দিতে আপনাকে হবেই।

—তোর জোর তো কম নয় ব্যাটা চাষা।

হাতের বেগুন খদ্দেরের জাঁচলে ঢেলে দিয়ে চাষী বললে, গায়ের জোর তো দেখাতে পারি না বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ-সজ্জন মানুষ। তাই মুখের জোরেই কাজ সারতে হয়।

আমার জোরে এসে আমাকেই অপমান!

গণেশ পাঁড়ে কটু করে এক চড় মেরে বসলো চাষীকে।

বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো চাষী।

'তুমি আমাকে মারলে?'

গণেশ পাঁড়ের বুকখানাও কম চওড়া নয়। কনৌজ ব্রাহ্মণ। বাংলাদেশে বহুদিন বাস করে মাছের বাঙালীই হয়ে গেছে! লাথি মেরে বেগুনের ঝুড়িটা সে উল্টে ফেলে দিয়ে বললে, ভাগ ব্যাটা ভাগ্ এখান থেকে।

চাষী বললে, কিছুতেই যাব না।

তোর বাপের জায়গা?

আমার বাপের না হতে পারে, তোমার বাপেরও নয়।

গণেশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর। কিল, চড়, লাথি, ঘুষি—কিছু আর বাকি রাখলে না।

মুখে যাই বলুক চাষী কিছুতেই হাত তুলতে পারলে না গণেশ পাঁড়ের গায়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগলো।

লাভের মধ্যে লাভ হলো এই যে ছড়ানো বেগুনগুলো যে যা পারলে তুলে নিয়ে সরে পড়লো।

গণেশ পাঁড়েও রেহাই দিলে না। তখন মোটাচারেক মাত্র পড়েছিল তার গায়ের কাছে। সেই বেগুন চারটি তুলে নিয়ে বিজয়ী বীরের মত সে তার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দেশে তখন জমিদার ছিল। চাষী বললে, যাই আমি জমিদার বাড়ীতে গিয়ে নালিশ করিগে।

গ্রামের কয়েকজন লোক এসে জুটেছিল মজা দেখবার জন্যে। বললে, গিয়েও কোনও লাভ হবে না বাবা। জমিদারের সঙ্গে গণেশ পাঁড়ের আদায়-কাঁচকলায়।

সেই দিন থেকে বরমতলার হাট গেল বন্ধ হয়ে। গ্রামে হাট আর বসে না।

গ্রামের দক্ষিণে রেল-ষ্টেশন।

এই ষ্টেশনটি দিনে দিনে বেশ জমকালো হয়ে উঠেছে। রেল-কোম্পানীর বিরাট একটা লোকো শেড্ তৈরি হয়েছে। 'ক্যারেজ ইয়ার্ড' দিয়ে ইঁট তৈরির একটা বিরাট কারখানা হয়েছে যেন। আর হয়েছে একটা চুনের ভাটি।

আগে 'ক্যারেজ ইয়ার্ড' কাকে বলে জানতো না গাঁয়ের লোক। সাদা সাদা মাটি—ঘর-দোর নিকোবার জন্যে নিয়ে আসতো খুঁড়ে খুঁড়ে। পুজোর আগে বাড়ী ঘর দোর এই মাটির পলস্তরা দিয়ে গ্রামের লোক সাদা ফটফটে করতো। তারপর হঠাৎ একদিন এই গ্রামের জমিদারের ছেলে নবীন তার এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এলো এই গ্রামে। মাটিটা সে পরীক্ষা করে দেখলে। খানিকটা মাটি নিয়ে গেল সঙ্গে করে। তারপর থেকেই এই কাণ্ড। এখন আর কেউ সেখানে মাটি নিতে পারে না। গাড়ী আসে, ট্রাক আসে, মাটি নিয়ে কোথায় চলে যায় কে জানে। শুনছি নাকি রেলগাড়ীতে চালান যায়। সেই তারই একটা কারখানা হয়েছে ষ্টেশনে। সেই মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি হয়।

নবীন বলে, আমার পয়সা থাকলে কারখানাটা আমিই করতাম।

যাক্ সেকথা পরে বলবো। এখন যে কথা বলছি সেই কথা বলি।

গ্রামের লোক সেসব কথা বোঝে না—বুঝতে চায়ও না। সেই সব কারখানায় ছেলে-ছোকরাদের এক-আধটা চাকরি হলেই হলো।

গ্রামের চারটে ছেলে ঢুকেছে সেইখানে।

তিনু ভট্চাজ বলে, যেঁ হেঁ বাবা, এমনি চাকরি হয়নি। চাল বিক্রি করে সাড়ে বত্রিশ টাকা ঘুষ দিলাম। তখন বললে, ছেলেটাকে দিও পাঠিয়ে।

দু'জন ঢুকেছে লোকো সেডে। আর দু'জন অন্য জায়গায়।

ঘরের খেয়ে তবু দু'পয়সা আনছে।

ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। ইংরাজের রাজত্ব। খাও দাও—সুখে সচ্ছন্দে থাকো। আর কি চাই? গাঁজা আফিংএর দোকান করে দিয়েছি। গ্রামে গ্রামে মদের ভাটি। ফুর্তি কর। ফুর্তি কর।

তা ফুর্তি করছেও।

গ্রামের পুব, পশ্চিম আর উত্তর—এই তিনটে দিক এখনও ফাঁকা। চাষ-আবাদের জমিও প্রচুর। পশ্চিমে ছোট একটি নদীও আছে। নদী না বলে তাকে খাল বলা চলে।

চাষ হয়। শুধু ধানের চাষ। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আখের চাষ হতো, খেসারী হতো, বিরি হতো, সরষে হতো। বাড়ীতে সারা বছরের গুড় আসতো, ডাল আসতো, সরষের তেল আসতো। প্রত্যেক বাড়ীতেই গাই ছিল, দুধ হতো। পুকুর ছিল, মাছ হতো।

যাদের ছিল না তারা কিনতো টাকায় আট সের দুধ। আট আনা দু' আনা সের মাছ।

লোকজন কেমন যেন আয়েসী হয়ে পড়ছে দিন-দিন। পাকা ধান ঘরে ঢুকলে কেউ আর মাঠের দিকে ফিরে তাকায় না। সারা বছরের খোরাকী ধান চাল বাড়ীতে রেখে বাকি ধান বিক্রি করে আসে শহরে। জামা কেনে, জুতো কেনে, কাপড় কেনে। কেউ কেউ মদ খায় আর গাঁজা টানে।

গাঁজাখোরের দলটাই যেন ভারি হয়ে উঠছে দিন-দিন। সস্তার নেশা। কিন্তু সেখানেও অতৃপ্তি আছে। মাছ সরকারের জোয়ান ছেলেটা গাঁজা টানতে শিখেছে। কিন্তু বাড়ীতে অভাব। বৌএর শাড়ী কিনতে হবে। ছেলেটার গায়ে শীতের জামা নেই। গিয়েছিল ইশনের কারখানায়। ঘুষ দিয়ে ঢুকেছিল কিটার মিস্ত্রির তল্পেটিতে। তিন দিন পরেই ফিরে এলো।

কি হলো রে? চাকরি ছেড়ে দিলি?

হ্যাঁ ভাই, পোষালো না। দোষা-লক্কড়ের যা বিচ্ছিরি আওয়াজ! দু' আনা রোজগার করতে গিয়ে আবার চার আনা লোকসান।

সে আবার কি রকম?

চার আনায় গাঁজা টেনে সেদায় ঘরের ফুর্তিতে কাজ করতে। আওয়াজের চোটে চমকে চমকে উঠি। ঘণ্টা খানেক পরেই দেখি—নেশা একেবারে ঠাণ্ডা জল। তখন আবার ছোটো। আবার টানো?

কথাটা শোনে আর সবাই হো হো করে হাসে।

পটু গাঙ্গুলী গত বৎসর কোথায় যেন যাত্রা শুনতে গিয়ে একটি হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। কেমন করে এনেছে সেই জানে। কিছুদিন চুপচাপ ছিল। বছরখানেক হয়ে গেল—তার আর কোনও

খোঁজ খবর না নেখে এমন সে হারমোনিয়ামটি বের করেছে। বাজে ভাল, আর পচু পাকুলী বাজায়ও ভাল। ক্ষুদ্র চাটুয্যের তুলি-তবলাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। রাখহরি পাঠকের খঞ্জনী মজিরা সবই রয়েছে। এত সব যন্ত্রপাতি থাকতে গ্রামে একটি যাত্রার দল কেন চলবে না—পচু পাকুলী এই নিয়ে আজকাল গভীর গবেষণা করছে। ছেলেছোকরাদের ডেকে সেদিন রাখহরি পাঠকের বাড়ীতে একটা মিটিংও করেছিল।

বেনোয়ারী-ওস্তাদ যাত্রার দলে ঠিকে চুক্তিতে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়। সেও বলছে, গ্রামে যদি একটা যাত্রার দল হয়, তাহ'লে আর তাকে পরের খোসামুদি করতে হয় না। ঘর-বার দুইই চলে এক সঙ্গে। তারই উৎসাহ যেন সব চেয়ে বেশি।

আমাদের গ্রামে এতগুলো গুণী লোক। আমাদের ভাবনা কি? দলের নামডাক হতে কতক্ষণ। তখন রাত-পিছু দু'এক টাকা করে সবাই পাবে। বেশ ভাব তো ক্ষি।

ছেলেরা ভাই চাঁদা আদায়ের একটা খাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দু'চার আনা যার যা খুশী দাও। দল আরম্ভ করতে হলে প্রথম প্রথম কিছু খরচ আছে।

বরদতলার পাশে মস্ত বড় যে সোনারী হোকানটি চলে, সেখানে আজকাল কাসন্দ কলপ ক্লেট পেন্সিল তো থাকেই, তার ওপর কেমিকেলের গয়না, মেজি মোজা সাবান জরদা তরল আলতা স্নো পাউডার—সবই পাওয়া যাচ্ছে।

সোনো-পাউডারের কেউ কোনোদিন নামও শুনিনি বাবা. আজকাল দেখি আমার মেয়েটা বলে কিনা—বাবা পয়সা দাও, সোনো কিনবো।

নবিশ্বর বলে, এই সবের চলন্ হয়েছে বলেই তো সজনী বয়রার অন্ধকার খুপ্‌রির ওপর দোতলা দালান উঠলো।

কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে খাঁটি দার্শনিক।

সে বলে, উঠুক বাবা উঠতে দাও। দোতলার ওপর তেতলা উঠুক। সেই কথায় আছে না—অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে। ওরও একদিন হবেরে তোমরা'—এই আমি বলে রাখলাম, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। রেলচুরির মাল-বেচা পয়সা বাবা—এরম তুমিও হতে পারো, আমিও হতে পারি।

কেনারাম মুখুজ্যেকে কিন্তু রোজই সকাল সন্ধ্যে দুবেলা সজনীর দোকানে আসতে হয়। আফিংখোর মানুষ। সকাল বিকেল একটুখানি চা না হলে চলে না। অথচ বাড়ীতে চা তৈরীর খরচ আছে। চায়ের পাতা না হয় গরম জলে ফেলে দিলেই চা হলো, কিন্তু মুস্কিল হয় দুধ আর চিনি নিয়ে। বাড়ীতে যে গাইটি আছে তার দুধ অত সকালে দোয়ানো হয় না, চিনি চাইতে গেলেই তো গিন্নি তেড়ে মারতে আসে। বলে, কেন, গুড় রয়েছে বাড়ীতে, নাও না। আবার চিনি কেন?

কাজেই অনেক কষ্টে অনেক বুদ্ধি বিবেচনার পর মাত্র এই সেদিন—গত বৎসর পৌষ মাসের দুরন্ত শীতের এক পরশীর প্রাতঃকালে সজনী বস্তকে এই আফিংএর অভ্যেসটি ধরানো হয়েছে। চা চিনি.দুধ—কিছুরই অভাব নেই তার। দোকানের চালায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে চির পুরাতন চটের আসন-

খানির ওপর চেপে একবার বসতে পারলেই হলো। চায়ের বরাদ্দ কারও কাঁক পড়বে না। অন্তত কাঁসার বাটির এক বাটি চা সেখানে মিলবেই।

কপিল চক্কোত্তিও তবু সেইজন্যেই এসে বসেছিল। দাবার ছকটা তখন ওপর বসিয়ে গরম কাঁসার বাটিটি তার মুখের কাছে তুলে ধরেছে।

এমন সময় কেনারাম এসে বসলো। কপিলকে সে চিনতে পারেনি।

কেনারামের দোষ নেই। কি একটা ব্যারামের জন্য চোখের পাতাদুটি দিনরাত ওঠানামা করে। ভাল দেখতেও পায় না। কপিলের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে বঙ্কিমাথ, তুমিও এলেছ নাকি? ভাখো, চায়ের জন্যে সেদিন বিস্কুট আনতে দিলাম তোমার ভাইপোকে। দু'আনার আনলে তিনটি বিস্কুট। বলি ও হে সজনী, শোনো শোনো! হারুর দোকানে বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছিলাম। দু'আনার আনলে তিনটি বিস্কুট। তোমরা দোকানদার মানুষ—শুনেছ কখনও?

সজনী দোকানের ভেতর তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খদ্দের বিদেয় করছিল, কথাটা হয়ত সে শুনতেই পেলে না।

সজনী না শুনুক, যে শোনবার সে শুনলে।

কপিল চক্কোত্তি বললে, আমি বঙ্কিমাথ নই, আমি কপিল।

কেনারাম তখন চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দোরের একপাশে কাঁসার একটি বড় ঘটিতে তৈরী চা ঢাকা দেওয়া থাকে। যে আসে সে বাটিতে ঢেলে নিয়ে যায়। কেনারাম তার নির্দিষ্ট বাটিতে চা টুকু ঢালতে ঢালতে বললে, চোখের নজরটা আজকাল ভাল চলে না হে, তাই এইরকম গোলমাল হয়ে যায়।

বলেই সে চায়ের বাটিতে চুমুক দিলে। চুমুক দিতেই মুখখানা তার অন্যরকম হয়ে গেল।

এ কী রকম চা হয়েছে সজনী? এ তো চা নয়। এ যে জল—

কথাটা সজনী এবার শুনতে পেয়েছিল। বললে, জল হতেই পারে না। তাকিয়ে ভাখো না কপিলের বাটির দিকে। ওই ঘটি থেকেই তো ঢেলে নিয়েছে। ওর বাটিতে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

সত্যি সত্যিই ধোঁয়া উঠছিল কপিলের বাটিতে। খেতে পারছিল না—এত গরম। কেনারাম দেখতে পায়নি। এতক্ষণ পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। চায়ের বাটিতে ধোঁয়া উঠছে কিনা দেখতে পেলে না, কিন্তু দেখলে কপিল চক্কোত্তিকে।

ও, তুই কপ্‌লে। আমি ভেবেছিলাম বাঙ্কিমাথ। তবে আর বলতে হবে কেন সজনী। কপ্‌লে ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় এসেছে চা খেতে। জানে সজনী দত্তর দোকানে গেলে চা খেতে পাওয়া যায়। গরম চাটুকু নিজে ঢেলে নিয়েছে। তারপর দিয়েছে খানিকটা জল ঢেলে।

বলেই সে আবার আর এক চুমুক দিলে চায়ের বাটিতে। চুক্ করে চা টুকু খেয়েই বলে উঠলো, নিখুঁত জল। আর এও ওই কপ্‌লের কাজ।

কপিল চক্কোত্তি মানুষটা একটু খ্যাপাটে গোছের। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সজনী কেনারামের চেয়ে কিছু বড়ই হবে। বেঁটে খাটো মানুষ, মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ, চেহারাটা বিশ্রী।

বাড়ীতে বৌ আছে। কিন্তু বৌএর সঙ্গে একদণ্ড বনে না। ছেলেপুলে হয়নি। হবার আশাও নেই। বৌএর কাছে চা চেয়েছিল আজ সকালে। চা সে দেয়নি। বলেছে—কারও বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে এসো: চা আমি দিতে পারবো না। চিনি নেই।

কপিল বলেছিল, দুধ দিয়ে যাব।

এই বলে সে নিজেই গিয়েছিল একটু জল গরম করে নিতে। বৌ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। উনোন ছুঁতে দেয়নি। বলেছে, আকাটা কাপড়ে খবরদার বলছি আমার উনোনে হাত দিও না।

কপিল তখন বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ী থেকে একটু চায়ের সন্ধানে। সজনীর দোকানে এসে দেখে—ঘটিতে গরম চা রয়েছে বাটি চাকা দেওয়া। একটা গাড়ু ছিল কাছেই নামানো। চুপিচুপি চা টুকু ঢেলে নিয়ে গাড়ুর জল ঢেলে ঘটির চা যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে দিয়েছে।

কেনারাম বললে, তুই ও-পাড়া থেকে এখানে কি জন্যে এসেছিস কারামজাদা? এখন কি করি বলতে পারিস? এই জলটা আমি খাব?

কপিল বললে, খাও না। উপকার হবে। পেটে গেলেই গুণ করবে।

বলেই ফিক্ করে হেসে উঠলো।

একে আকিংখোর মানুষ, চা খেতে এসে এই বিভ্রাট, তার ওপর হাসি!

আগুন মস্তক জ্বলে গেল কেনারামের। হাতের কাঁসার বাটিটা ছুঁড়ে দিলে কপিলের গায়ের ওপর।—'নে শালা খা তবে তুইই খা।'

বাটিটা ছিটকে ঘুরে গিয়ে পড়লো আর জল মেখানো চায়ে কপিলের কাপড়টা গেল ভিজে। তা যাক্। এর জন্যে গরম চা ছেড়ে ওঠা যায় না। কপিল উঠলো না। রাগও করলে না। বাটির অবশিষ্ট চাটুকু শেষ করে বাটিটি সেইখানে নামিয়ে রেখে বললে, নে কেনারাম, বাটিটা ধুয়ে রাখ্।

সর্বনাশ!

একে কেনারামের রাগ তখনও পড়েনি, তার ওপর এই কথা! উঠে দাঁড়ালো সে—কপিলকে মারবার জন্যে। কপিলও ছুটে গিয়ে রাস্তায় নামলো। বললে, গাড়ুর জলটা তো খেলি!

রাগে কেনারামের চোখের পাতা দুটো ঘনঘন ওঠানামা করছে তখন। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। ঠোঁট দুটো নড়ছে শুধু।

আঃ, এ কী হচ্ছে তোমাদের বুড়ো বয়েসে ছেলেমানুষের মত।

বলতে বলতে সজনী বেরিয়ে এলো তার দোকান থেকে। তার পিছু পিছু এলো কয়েকজন খরিদ্দার। দুবন স্নাকরা সুপুরি কিনেছিল, সেগুলি তখনও সে খুঁটে বাঁধবার অবসর পায় নি। সেইগুলি সে কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললে, কপিলের বাপ একজন মস্ত পণ্ডিত ছিলেন গো! সংস্কিতো জানতেন।

পেছন থেকে কে একজন বলে উঠলো, আর ওই তার ছেলে!

কপিল তখনও ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। কেনারামকে ক্ষেপাবার জন্যে বলতে লাগলো—কেনা, কেনৌ, কেনাঃ। কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ। কেনেন, কেনাভ্যাম্, কেনেভ্যঃ। আমিও সংস্কৃত জানি।

বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি তার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

কেনারাম ছুটে তাকে ধরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, পেছন থেকে সজনী মস্ত তার হাতখানা চেপে ধরলে।

ছি! তুমি ছুটে গিয়ে মারবে ওকে? ও কি একটা মানুষ?

বলেই সজনী সেইখান থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েকে ডেকে বললে, মুখুজ্যের এখনও চা খাওয়া হয়নি মা। ওকে এক পেয়ালা বেশ ভাল করে চা তৈরি করে দে তো!

কেনারাম মুখুজ্যে ঠাণ্ডা হলো। তারপর ঠিক নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসলো গজ্ গজ্ করতে করতে।

কপালে-ব্যাটা পাগল নয়—পাগল নয়, ব্যাটা শয়তান।

মুখুজ্যের রাস্তা দিয়ে একটা লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল বুড়ি মাথায় নিয়ে। কেনারামের নজর পড়লো সেইদিকে।

বলি ওহে ও লোকটি! শোনো, শোনো, নামাও না বুড়িটা। দেখি কি নিয়ে যাচ্ছ! গণেশ পাড়ে দিলে আমাদের পাটটিকে তুলে। এখন মর্ ব্যাটারা—হরি তরকারি কেমন করে জোগাড় করবি কর্!

লোকটি পথ চলতে চলতে বললে, এ তরকারি আপনারা মুখে দেবেন না বাবু।

কী এমন তোমার কচি-মুলো আছে যে মুখে দিতে পারবো না? নামাও নামাও, কেউ বায়নো করবে না—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি নামাও।

হয়ত সে নামাতো না মাথার বুড়িটা। কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে উঠে গিয়ে তার বুড়িটা টেনে ধরলে পেছন দিক থেকে।

—তরকারির বাবরা কিছু নেই বাবা বাড়ীতে। শুধু আলু আর পোস্ত খেতে ভাল লাগে না। বাবা রোজ-রোজ। নামাও তুমি।

লোকটি নামালো তার বুড়ি। বললে, মুরগীর ডিম আছে বাবু।

কেনারাম লাফিয়ে উঠলো।—মুরগীর ডিম!

হ্যাঁ বাবু, ইস্টিশনে নিয়ে যাচ্ছি। সায়েবরা কেনে।

তা মুরগীর ডিম তো এ রাস্তায় কেন? এই বামুনের গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে—ঠাকুর দেবতার থানের ওপর দিয়ে—

কেনারাম মুখুজ্যের চোখের পাতা দুটো খুব ঘন-ঘন ওঠা-নামা করতে লাগলো।

লোকটি তখন তার বুড়িটি আবার তার মাথায় তোলবার ব্যবস্থা করছে, কেনারাম বাধা দিলে।

না না সেটি হচ্ছে না বাপ্‌ধন, দাঁড়াও। মুরগীর ডিম ছুঁয়ে সত্যনারায়ণ চান যখন আমাকে করতেই হবে—

বুড়িটাকে চেপে ধরলে কেনারাম।

বলি তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! ওরে কে আছিস? ডাক্ তো বাবা গণেশ পাঁড়েকে!

যাদের বলের জন্যে বাড়ী বাড়ী চাল আদায় করছিল হরেকেষ্ট বাগাল। চালের ডালাটি মাথায় নিয়ে তখন সে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর বুঝি আনাজ-পত্র বিক্রি করতে এসে চড়া দর হেঁকেছে লোকটা। হরেকেষ্ট বললে, এ গাঁয়ে বেশি দাম চাইলে চলবে না বাবা। এ গাঁয়ে এক দর।

সজনী তখনও দাঁড়িয়েছিল. বললে, কি ভেবেছ তুমি হরেকেষ্ট? ও আনাজ বিক্রি করতে আসে নি। মুরগীর ডিম বেচতে এসেছে।

হরেকেষ্ট চেঁচিয়ে উঠলো।—মুরগীর ডিম! কে খাবে?

কেনারাম বললে, তাই তো বলছি ব্যাটাকে। আমাদের বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুরগীর ডিম। তার ওপর ধর্মরাজতলায়।

সজনী বড় বিবেচক মানুষ। বললে, কেন মিছেমিছি দিক্ করছো বেচারাকে? ছেড়ে দাও।

রাঘবহরি পাঠক এসে দাঁড়ালো গোলমাল শুনে। বললে, না তা হয় না। এ অনাচার আর যেখানেই চলুক, আমাদের গাঁয়ে চলবে না। গবেশকে ডাকি, সেই এর বিচার করে দিক্।

ডিমওলা আর কাউকে না চিনুক, গবেশ পাঁড়েকে চেনে। বললে, পাঁড়েকে ডাকবেন না বাবু, আমি চলে যাচ্ছি, আর এদিকে আসবো না। ইষ্টিশনে যেতে হলে গাঁয়ের বাইরে বাইরে যাব।

কেনারাম বললে, তা যখন যাবে তখন যাবে, এখন কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে যাও!

সজনী মনে মনে হাসলো। বললে, দাও ধর্মরাজকে কিছু প্রণামী দিয়ে যাও। ব্রাহ্মণ ধরেছে যখন, তখন ছাড়বে না।

বলেই সে তার দোকানে গিয়ে ঢুকলো।

ডিমওলা দু'আনা পয়সা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দিতে হলো আট আনা।

কেনারাম মুখুজ্যে আধুলিটি তার ট্যাঁকে গুজতে যাচ্ছিল, হরেকেষ্ট, রাঘবহরি—একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলো।

সাধারণী পয়সা মুখুজ্যে, ধর্মরাজের প্রণামী ওটা—তোমার প্রণামী নয়।

সজনী ভদ্দর বাড়ীর ভেতর থেকে মুখুজ্যের জন্যে চা এলো। গ্লাসটি হাতে নিয়ে কেনারাম মুখুজ্যে বললো। বললে, তা কি করতে হবে বল্। আমিই তো আছার করলাম বাবা। তোরা বলে পারছিস?

হরেকেষ্ট বললে, বেচু নস্করা গরম গরম বেগুনী ভাজছে দেখে এলাম। দাও, আট আনার বেগুনী নিয়ে আসি।

রাঘবহরি পাঠক কিন্তু অন্য কথা বললে।

বেগুনীর চেয়ে পয়সাটা আমাকে দাও। গাঁজা কিনে আনি।

গাঁজা বিক্রির চোরাই কারবারটা তখন চলছে ভাল। গাঁজায় নেশা করবার লোকের সংখ্যা প্রচুর। কাজেই দক্ষিণপাড়ার একজন আর পুব পাড়ার একজন, দু'জন একান্ত সংগোপনে এই লাভের ব্যবসাটি চালাচ্ছে। টাকায় টাকা লাভ। শহর থেকে দশ টাকায় গাঁজা কিনে এনে কুড়ি টাকা লাভ করে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো—বেগুনী এবং গাঁজা দুইই আসুক।

পুটি বস্তুই এলো।

আগে এ-সব কাজ গোপনে চলতো, আজকাল প্রকাশ্যেই চলে।

তবে হাঁ, মাঝে মাঝে গোপন করতে হয় অবশ্য—কারণ যে পেরিয়ে যায় সেই রাস্তা দিয়ে, যেখতে পেলে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে কল্‌কেটা একবার চেয়ে বসে।

চাইলে বুঝি 'না' বলতে নেই। এই হচ্ছে নিয়ম।

সেদিন সজনী ভদ্দর বাড়ি দিয়ে উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পেলে।

গল্পিকা প্রসাদের পর এলো বেগুনী।

ভেজে-ভাজা গরম বেগুনী। রাখহরি রেখে এসেছিল বেচু ময়রা তার দোকানের বাইরে বসে বসে উনোনে কড়াই চাপিয়ে বেগুনী ভাজছে। পাশেই বেচু ময়রার দোকান। আনতে বেশি দেরি হলো না।

কাঁচা পাতের একটি ঠোঙা হাতে নিয়ে নিজের নিজের ভাগের বেগুনী সবাই তুলে নিলে নিজের নিজের হাতে।

গণেশ পাঁড়ের ছোট ছেলেটা এসেছিল সজনীর দোকানে তেল কিনতে। রাখহরির বেগুনী সেবা চলছিল বাইরের একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে। হঠাৎ কি ভেবে গণেশের ছেলেটাকে সে কাছে ডাকলে হাতের ইসারায়।

—এই ভ্যাটুয়া, শোন্।

ভ্যাটুয়া কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাখহরি তার হাতের একটি বেগুনী তার দিকে বাড়িয়ে ধরলে।—'খাবি? গরম বেগুনী।'

ভ্যাটুয়া বেগুনীটি নেবার জন্যে যেই হাত বাড়িয়েছে, রাখহরি টুপ্ করে বেগুনীটি নিজের মুখে পুরে দিয়ে বলে উঠলো, চাই যা ব্যাটা পিত্তি খা!

বেগুনী খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে। কেনারাম, নরেশই, রাখহরি সবাই যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেছে, এমন সময় দেখা গেল গণেশ পাঁড়ে ভ্যাটুয়ার হাতে ধরে টানতে টানতে সজনী ময়রার দোকের কাছে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় সব—এরা গেল কোথায়? বেগুনী কোথায় ভাজছে?

সজনী তার দোকানের ভেতর থেকে বলে দিলে,

—আমার এখানে নয় গো পাঁড়ে, বেচুর দোকানে যাও।

বেচা! বেচি ব্যাটার বেগুনী বেচা আমি বের করছি। সকালবেলা ছেলে কাঁদানো—! চল্ ব্যাটা চল্!

ভ্যাটুয়াকে টানতে টানতে গণেশ বেচুর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছাড়লে—বেচা!

দোকানের সুমুখে বসে কাশী হাজরা কল্কের মুখ দিচ্ছিল। গণেশের হুঙ্কারের চোটে হাত থেকে কল্কেটা তার পড়ে গেল।

বেচু বেগুনী ভাজছিল এক কোণে বসে। বললে, আসুন, পাঁড়ে ঠাকুর, আসুন। বলতে আজ্ঞা হোক্।

চটের আসনটি এগিয়ে দিলে বেচু। ময়রা। দোকান করে খায়। খদ্দেরের মন জোগাতে সে জানে। হাত জোড় করে একটি প্রণাম করে বেচু বললে, এসে বসুন এইখানে।

গণেশ পাঁড়ে বসলো।

ভাখ্ ব্যাটা, রোজ রোজ বেগুনী ভাজছিস্, ছেলেটা কেঁদেই সারা। এ তো ভাল কথা নয় এক-আধদিন ভাজিস্ সেই ভাল, কিন্তু রোজ রোজ—

গণেশ পাঁড়ের মনের বাসনা বুঝতে পেরেছিল বেচুলাল। খাঁচি থেকে দুটি গরম বেগুনী তুলে ভ্যাটুয়ার হাতে দিয়ে বললে, নাও, সেবা যাও ছোট পাঁড়ে।

বেগুনী দুটি হাতে পেয়ে ভ্যাঁটুয়ার মুখে হাসি ফুটলো।

বেচু এইবার ফিরে তাকালো গণেশ পাঁড়ের দিকে।

তা'হলে শুরুন পাঁড়ে ঠাকুর। আগে দিন পায়ের ধুলো দিন।

এই বলে হাত বাড়িয়ে পাঁড়ে ঠাকুরের ধূলি ধূসরিত পায়ে হাত দিয়ে সেই হাতটি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে বেচু বললে, তা'লে শুরুন, শুকনো খড় বলতে তো একগাঁছিও নেই কারও বাড়ীতে। তাই বলি গরু-বাছুরগুলো খায় কি? তাই বলি কিছু বেগুন ফুলুরি ভেজে রাখি। গাঁয়ের বাউরি-বাগ্‌দি মেয়েরা দু'এক আঁটি ঘাস দিয়ে যাবে আর মধের সঙ্গে খাবার জন্যে দু'চার পয়সার ভেলে ভাজা নিয়ে যাবে—এই আর কি! নইলে কি আর আদি নাথ করে রোজ রোজ—

বলতে বলতে আলাদা একটি পাতার প্রায় আট-দশটি বেগুনী নিয়ে গণেশ পাঁড়ের হুমড়ে নামিয়ে দিলে বেচু।

নিন্ আপনিও দেরী দিন ঠাকুর। আজ আমার কত ভাগ্যি বলুন দেখি!

অম্লান বদনে বেগুনীগুলির সদ্ব্যবহার করে গণেশ পাঁড়ে উঠে দাঁড়ালো।

ঠাকুর। মা-ঠাকরুণের জন্যে কিছু দিয়ে দিই আপনার হাতে।

একটি ঠোঙায় আরও কয়েকটি বেগুনী নিয়ে গণেশের হাতে তুলে দিয়ে আর একটি প্রণাম করলে বেচু।

গণেশ পাঁড়ে ভ্যাঁটুয়াকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় বলরাম ডাকুয়া এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে।

পেন্নাম হই পাঁড়ে-ঠাকুর। আজ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে।

কি হয়েছে?

বলরাম বললে, এক ভিরগুলা এসেছিল আমাদের গাঁয়ে। তাকে মারধোর করে কেনারাম মুখুয্যে, হরেকেষ্ট আর রাঘবদের পাঁচটা টাকা কেড়ে নিয়েছে। লোকটা কান্নাকাটি করছিল। আমি বললাম এর বিহিতকার যদি করতে চাস্ তো যা ব্যাটা পাঁড়ে-ঠাকুরের কাছে চলে যা। এই বলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম আপনার বাড়ীতে।

তাহ'লে তো আমাকে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। চলনাম রে বেচু।

গণেশ পাঁড়ে চলে গেল।

কাশী হাজরা ততক্ষণে কল্‌কেটা আবার নতুন করে সেজে হুঁকোয় বসিয়ে গড় গড় করে টানছিল।

বেচু বললে, দেখলে হাজরা? যে-ঠাকুরের যে মন্তর! পাঁড়ে-ঠাকুরকে কেমন ঠাণ্ডা জল করে দিলাম।

বলরাম ডাকুয়া ছেপে বসলো তামাক খাবার জন্যে।—যাও গো হাজরা, কল্‌কেটা একবার দাও নামিয়ে তোমার হুঁকো থেকে।

কাশী হাজরা কলকেটা নামিয়ে দিতেই বলরাম দু'হাত দিয়ে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে টানতে টানতে ধোঁয়া বের করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ তার কি একটা কথা মনে পড়তেই হাজরাকে জিজ্ঞাসা করে বললো, ভাখো হাজরা, এই যে বন্ধুটা হচ্ছে—এটা কতদিন চলবে মনে হয়?

কাশী হাজরা পাঠশালার পণ্ডিত। কিছু লেখাপড়া জানে। বললে, ঝগড়া বারোমাসি বেশিদিন চলে না। মানুষগুলো হাঁপিয়ে যখন পড়বে, তখন থামবে।

বেচুর মনেও একটা প্রশ্ন আছে। বেগুনী ভাজতে ভাজতে সে জিজ্ঞাসা করলে হাজরা-মশাই যুদ্ধ যুদ্ধ তো শুনছি অনেকদিন থেকে। যুদ্ধটা হচ্ছে কোনখানে বলতে পারেন?

ইওরোপে চলছে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ।

কাশী হাজরা গম্ভীর মুখে বললে, বিলেত, বিলেত।

বিলেতটা আমাদের দেশের কোনখানে হাজরামশাই?

হাজরা বললে, পশ্চিমে—ঠিক একধারে খাড়া পুব।

একটুখানি থেমে আবার বললে, সেদিন সেই রামলাটার জন্যে আদালতে যেতে হয়েছিল। ফিরতে রাত হলো। উড়োজাহাজ দেখে এলাম সেদিন।

উড়োজাহাজ মানে এরোপ্লেনের নাম তখন সবেমাত্র লোকজনের কানে এসে পৌঁছেছে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করলে, সে আবার কি রকম হাজরামশাই? শুনছি নাকি আকাশে উড়ছে একরকম জাহাজ—

হ্যাঁ উড়ছে।

সুমুখের মাঠে বেচুর গরুর গাড়ীটা পড়ে ছিল, আঙুল বাড়িয়ে সেইটে দেখিয়ে হাজরা বললে, সাইজে ওর তখন হবে। জন তিরিশেক লোক চড়তে পারে। তারপর ডেগা থেকে পাঁই করে আকাশে উড়ে চলে যায়। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। ডাঙায় চলে, আকাশে ওড়ে আবার জলেও ভাসে।

কড়াইএর বেগুনীগুলো পুড়ে যাচ্ছিল। সেগুলো তাড়াতাড়ি তুলতে তুলতে বেচু বললে, নাঃ, সাহেবরা দেবতা আছে।

কাশী হাজরা বললে, আজ তোমাদের দেখাব। রোজ আকাশে ওঠে। এখান থেকেও দেখতে পাওয়া যায়।

সেদিন রাত্রে আকাশের সন্ধ্যা-তারাটিকে কেউ আর তারা বললে না।

কাশী হাজরা বুঝিয়ে দিলে, অনেক দূরে রয়েছে বলে আমরা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু ওটা চলছে। ঘণ্টায় তিন চার ক্রোশ তো নিশ্চয়ই।

বলরাম তার কপালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো সন্ধ্যার সেই তারাভরা আকাশের দিকে। তারপর বললে, হ্যাঁ, চলছে। তাখো তোমরা একটা চোখ বন্ধ করে—এইদিকে একটুখানি কাৎ করে—

অনেকেই দেখলে।

বেচুর চোখ যেন খুলে গেল সেইদিন থেকে।

সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই সে তার বৌকে টেনে আনতে লাগলো উঠোনের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে। বলতে লাগলো—উ-ই তাখো। তাখো ভাল করে তাকিয়ে।

বৌ বলে, দেখলাম।

উঁহু দেখলাম নয়। আর এইদিকে তাকাও। এই যে এই কদম গাছটার ওপরে। এই

দিকে হাত্যি ওঠে—এই দিকটা পুব দিক। ও-ই যে দেখছো কতকগুলো তালের গাছ—ওর ওপারে তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। তার ওপারে—তার ওপারে—তারও ওপারে অনেক অ—নে—ক দূরে। সেইখানে বিলেত।

আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে বেচু। বলে, আমাদের গাঁয়ে পাড়ে-পাড়ায় যেমন ঝগড়া মারামারি হয়, বিলেতেও তেমনি সায়েবরা ঝগড়া মারামারি করে। ওদের ঝগড়াটা বড় তো।—তাই বলে—যুদ্ধ।

এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে।

* *

ডিমওলা সেদিন সত্যি সত্যিই গণেশ পাড়ের ঘোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গণেশের বড় ছেলে চৈতন তখন কার মাঠ থেকে এক বোঝা আধপাকা ধানের গুছি কেটে এনেছিল গাইকে খাওয়াবার জন্যে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কার মাঠে কাটলি?

চৈতন বললে, জমিদারের।

বলিহারি ব্যাটা চৈতন, ঠিক করেছিস। আগে কই কাৎলা, তারপর চুনোপুঁটি।

তারপর ডিমওলাকে বাড়ীর উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর কাছ থেকে কত টাকা কেড়ে নিয়েছে?'

ডিমওলা বললে, 'আট আনা।'

দূর ব্যাটা, আট আনা কি, বলবি আট টাকা। তার কমে মামলা চলে না। কই দেখি মায়ের দাস!

আজ্ঞে না, মারেনি তো!

বাঁশের একটা কঞ্চি পড়েছিল হাতের কাছে। গণেশ পাড়ে সেই কঞ্চিটা তুলে নিয়ে সপাসপ্ বসিয়ে দিলে লোকটার পিঠের ওপর।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো ডিমওলা। তাহলে বুঝি মুরগীর ডিম নিয়ে এই গ্রামের পথে যাবার জন্যে বুঝি ইনিও তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

আর আমি কখনও এ-পথ দিয়ে আসব না বাবু। আর মারবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।

চলে যাবি কি রে ব্যাটা? তোকে মারছি তোর ভালর জন্যে। পিঠের এই দাগ দেখিয়ে বলবি—ওরা মেরেছে। মেরে আটটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। বল্ এবারে কত খরচ করতে পারবি বল্।

লোকটি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বললে, গরীব মানুষ, ডিম বেচে খাই। খরচ কোত্থেকে করব বাবু?

গণেশ বললে, খরচ না করলে মামলা হয় না। আমাকে দিতে হবে দশটাকা। আর মামলার খরচ—

লোকটি বললে, আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমি চলে যাই। মামলা-মোকর্দ্দমা আমি করতে পারব না।

গণেশ কি যেন ভাবলে। বললে, শুনেছিল যখন, তখন এক কাজ কর।

বলেই ডাকলে, চৈতন! চৈতন!

চৈতন বললে, কি বলছো বাবা?

একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে আয়।

কাগজ পেন্সিল এনে দিলে চৈতন।

গণেশ পাঁড়ে সেই কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে লিখলে—

কেনারাম মুখার্জি

রাধহরি পাঠক

পানকিষ্ট গাঙ্গুলী

হরেকেষ্ট দালাল

প্রেস অভ্ অকারেন্স—সজনী ষ্টল্কর ষ্ট্রীট।

লিখেই কাগজখানি লোকটির হাতে দিয়ে বললে, এইটি নিয়ে চলে যা খানায়। ঢুকে যে এক নম্বর ডাইরি। দারোগাবাবুকে বলবি, মায়ের দাগ দেখাবি, বলবি আটটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবি—গণেশপাড়ে পাণ্ডে। এই আমি লিখে দিচ্ছি আমার নাম—জি, এল, পাণ্ডে।

বলেই সে কাগজখানি আবার কেড়ে নিয়ে নিজের নামটি লিখে দিলে।

সোজা থানায় চলে যাবি। বুঝলি?

ডিমের ঝুড়িটি মাথায় নিয়ে লোকটি চলে গেল।

গণেশ মুখ থেকে খানিকটা থুতু ফেলে বললে, একদম বাজে। লোকটা কোনও কাজের নয়।

গণেশ পাঁড়ে বলে, বাংলাদেশে তাদের চোদ্দ পুরুষের বাস কিন্তু তারা খাঁটিপ্রিয় নিরীহ বাঙালী কান্যকুব্জ থেকে এসেছে তারা—কনৌজ ব্রাহ্মণ। মারামারি কাটাকাটি তাদের রক্তের মধ্যে।

তাদের সে গৌরবান্বিত রক্তের পরিচয় তারা দিতে ছাড়ে না।

গণেশ পাঁড়ের বাপের আমলে তাদের ঘুড়োয় মোটায় আত্মীয় কুটুম্বে প্রায় আট দশ ঘর পাঁড়ের বাস ছিল এই গ্রামে। ঝগড়া-বিবাদের সময় লাঠিতে লাঠিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তো।

গ্রাম থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে সরকারি একটা রাস্তার ওপর ছোট একটি নদীর পুল আছে। আর সেই রেলিং দেওয়া পুলের এপারে ওপারে বড় বড় গাছের শ্রেণী শাখায় শাখায় পরস্পরকে জড়াজড়ি করে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তাটা এমনি ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে যে দিনের বেলাও পথটা মনে হয় যেন অন্ধকার। একা একা সে পথ দিয়ে কেউ চলতে পারে না।

এই পুলের কাছাকাছি জংসন ষ্টেশনের রেলের একটি লাইন রাস্তার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। সেই লাইনের কটকগুলা ছিল গণেশ পাঁড়ের পিতামহ। গ্রাম থেকে বুড়োকে রোজ সেখানে যাওয়া আসা করতে হতো। অন্ধকার রাত্রে পথযাত্রী অনেক পথিক নাকি সেখানে মারা পড়েছে—এই নাকি জনপ্রবাদ। এই এ-সব কীর্তি নাকি গণেশ পাঁড়ের পিতামহের।

গণেশের এক কাকা বাকি ছিল ছুঁড়ে গাঁথি মারতে পারতো। লজ্জার ছিল তার অবধি।

হরলাল পাড়ের গায়ে বাকি ঢোঁট বসতো না।

এমনি সব বিশ্রান্ত অবিশ্রান্ত নানারকমের কাহিনী গ্রামের মানুষ এখনও ভোলেনি।

মারামারি খাওয়া খাওয়ি তারা চিরদিনই করে।

কিন্তু সেবছর মাত্রাটা বাকি একটু বেশি হয়ে পড়েছিল।

সেও আজ প্রায় ছ' বছর আগের কথা।

পাড়েদের সকলের বাড়ীতেই তখন অনেকগুলো করে গায়রা থাকতো। গণেশ আর কিশোরী পাড়ের বাড়ীতে ধান-চালের অভাব চিরকাল। অথচ গায়রা জাতটা বাকি সুখের গায়রা। যেখানে খেতে পায় সেইখানেই চলে যায়। দেখতে দেখতে গণেশের বাড়ীর গায়রাগুলি কোথায় যেন চলে গেল। সে ভাবলে, প্রতিবেশী আত্মীয় কেউ হয়ত বা গায়রাগুলি ধরে ধরে খেয়েছে।

এই নিয়ে তাদের নিজের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধে।

গণেশ আর কিশোরী পাড়ে একদিকে, আর বাকি পাঁচ ঘর আর একদিকে। প্রথমে মুখে মুখে, তারপর হাতে হাতে। মাস পাঁচ ছয় ধরে প্রায় প্রত্যহই তারা একটা না একটা ছুতো ধরে ঝগড়া বাঁধিয়ে তুলতো। দুপক্ষই লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে, খুব খানিকটা গালাগালি চেঁচামেচি হয়, ঢিল ছোড়ে, তারপর আবার যে যার বাড়ী গিয়ে সদর দরজায় খিল এঁটে দেয়।

এমনিই চলছিল।

হঠাৎ সেবছর গ্রীষ্মকালের চরমোৎকর্ষ একটি প্রভাতবেলায় মানুষ যে তার হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য অন্তজানোয়ারেরও অধম হয়ে যেতে পারে তার পরিচয় দিয়ে বসলো।

সূর্য্য যেমন রোজ ওঠে, সেদিন সকালেও তেমনি সূর্য্য উঠেছিল। প্রভাতের আলো ঝিকমিক করছিল পড়োবাড়ীর আগাছার জঙ্গলে আর তাল-তেঁতুলের মাথার ওপর। আকাশ ছিল তেমনি নীল, বাতাস ছিল তেমনি স্বচ্ছ। কিন্তু গ্রামের মাটি সেদিন মানুষের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষই বেরিয়ে পড়েছে।

গণেশ পাড়ে কোত্থেকে একটা অনেক কালের পুরনো মুখেরী গাদা বন্দুক সংগ্রহ করেছিল। না ছিল তার লাইসেন্স না ছিল কিছু। জনতার ভেতর ছুটে এসে ঘরি বাঁচি করে সেইটেই সে দিলে চালিয়ে।

শত্রুপক্ষের ছত্রভঙ্গ মানুষ-মরলো না। জন পাঁচছয় মানুষ জখম হয়ে গেল শুধু। যারা হলো না তাদের ভেতর থেকে একজন ছুটে গিয়ে কিশোরী পাড়ের হাতে একটা টাঙির ঢোঁট বসিয়ে দিলে। কিশোরীর লাঠিতে একটা লোকের মাথা ফেটে গেল।

সেদিন আর এর মীমাংসা বাড়ীতে বসে হলো না। সরকারি আদালতে ফৌজদারী মামলা সুরু হলো। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিচার চলতে লাগল। আসামী সাক্ষীর এজাহার আর শেষ হয় না কিছুতেই। হাকিম ছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক। তাঁর মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। অবশেষে বছর খানেক ধরে এই এতগুলি লোকের হায়রাণীর পর বিচার শেষ হলো।

এক পক্ষের বৎসামান্য অর্থদণ্ড হলো। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না বলে মাসখানেক জেল খেটে ফিরে এলো গণেশ পাড়ে।

আগে ছিল কলকাতায় পুজোর অন্য কেতা। পুজোর দিন ঘনিয়ে এলেই চুলী আর বাজনদারদের ভিড়। লোকে লোকারণ্য রাস্তা। দুদিকে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্বপত্র আর কুচো ফুল। বনেদী বাবু বসেছেন দালানে ; সামনে সোনার আলবোলা, ডাইনে পান্নাবসানো ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরেবসানো টোপদার গুড়গুড়ি। দোকানে শোভা পাচ্ছে চিনির মিঠাই, খুরিভরা গুড় আর মধুপর্ক। বারকোশে দুর্গামণ্ডা আর আগাতোলা সন্দেশ।

এখন কেতা অন্য। এখন বাবুর বাড়ির পুজো নয়—বারোয়ারি পুজো। সেই সঙ্গে রুচিও আলাদা। এখন পুজোয় চাই খাঁটি ছানার রসগোল্লা আর সন্দেশ।

দেবভোগ্য মিষ্টান্নে দুর্গোৎসবের আনন্দ হোক মধুময়।

**কে, সি, দাস প্রাইভেট লিমিটেড**
রসোমালাই-এর স্রষ্টা
কলিকাতা

IWTKCD1217A

তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর নিজেদের ঝগড়া তারা নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছে। ভেদ প্রায় সকলেরই ঘুচে গেছে।

শুধু গণেশ পাঁড়ে ভেদও ঘোচেনি।

ডিসমিসটা সেদিন থামায় যায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম ভাবে না জানি প্রচার হয়ে পড়েছিল সারা গ্রামে। প্রচার করেছিল গোবরা গণেশ পাঁড়ে নিজেই। প্রচার করেছিল এই বলে যে নিরীহ একজন ডিসমিসালকে বাগবোর ভয়ে তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার শাস্তি যে কিরকম করে পেতে হয় তা আমি দেখিয়ে দিয়েছি। কেনারাম মুখুজ্যে, রাখহরি পাঠক, হরেকেষ্ট দালাল—সবার নামেই নালিশ রুজু হয়ে যাবে হয়ত খাজেরের মাঝেই।

হরেকেষ্ট দালাল একটুখানি বেশরোয়া মানুষ। সাঁঝা বেলা একদিন বেশায় বুঁদ হয়ে এক ঠোঙা চিনি নিয়ে বাড়ির অন্ধকারে গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়েছিল একটা ঝোপের আড়ালে বসে বসে।

কে ঢিল ছুঁড়লে? কে? কে? বলে গণেশ বেরিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে। কিন্তু কারও কোনও পাত্তা পায়নি।

ইচ্ছামত মিজা পান করে যাচ্ছিল সেইদিক দিকে। দেখতে পেয়েছিল হরেকেষ্ট দালালকে।

সেই কথাটি কানে দিয়ে উঠেছিল গণেশ পাঁড়ের।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে

বৈমন্ত্রিক ধান পাকবার সময়। গ্রামের পথের ওপর দিয়ে পাকা ধানের গাড়ীগুলো তখন চারেশাই যাওয়া আসা করছে।

গ্রামের দুপুর একঘেয়ে নিস্তব্ধই বলতে হয়। কিন্তু এই ঘেয়েয়ের দুপুর নিস্তব্ধ নয়। সারাদিন ধরে গরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ হয়। পথের ধুলো ওড়ে। লোকজনের কথা শোনা যায়।

—কেন্ ঘাটের ধান গো?

—নয়ানডুলির।

—বেশ বড় হয়েছে তো। আমার ওখানে বিঘে দুই ছিল। বেচে দিয়েছি।

এই রকম সব কথা।

হঠাৎ সেদিন পাঁড়ে পাড়ার পথে অন্য রকমের আওয়াজ শোনা গেল। বেশ একটা গোলমাল উঠলো। গাড়ীর আওয়াজ নয়। মানুষে মানুষে গালি গালাজের মিশ্রী কোলাহল। মনে হলো শব্দটা যেন দেখতে দেখতে পাঁড়ে পাড়া থেকে বয়রতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

দূর থেকে ভাল বুঝাও যায় না। পাঁড়ে-পাড়ায় গোলমাল।

এগিয়ে গিয়ে কেউ যে দেখে আসবে সে সাহসও কারও নেই। ঘরের আছে—কেউ-বা পড়ো বাড়ীর ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে, কেউ-বা গাছের আড়ালে, কেউ-বা পুকুরের পাড় দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু সঠিক কিছু ঠাহর করবার আগেই দেখা গেল গ্রামের একজন লোক হৈ হৈ করে এগিয়ে আসছে জমিদারের বাড়ীর দিকে।

জমিদার সীতাপতিবাবু তখন তাঁর ছোট্ট বাগানে বসে বসে কি একটা গাছ পুঁতছিলেন। এই সব গাছপালা আর চাষবাস নিয়েই থাকেন তিনি। বলেন, চাষ জিনিসটেকে নিয়ে করিস নে বাবা। চাষ আছে বলেই তোরা দুবেলা খেতে পাস্। শহরের দোকান থেকে একজোড়া কাপড় কিনে এনে পরতে পাস্।

লোকজনের সোরগোল শুনে সীতাপতিবাবু মুখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চমকে ওঠবারই কথা।

লোকগুলোর সামনে ছিল হরেকেষ্ট দালাল। তার মাথা দিয়ে কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে। সারা মুখখানা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। দুজন দুদিকে ধরে আছে তাকে। তার পেছনে রাঘবরি পাঠক। তারও সর্ব্ব অঙ্গ ধূলি ধূসরিত। সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ। সঙ্গে কেনারাম মুদুজ্যে। আর পেছনে যারা রয়েছে তারা মজা দেখবার জন্যে ছুটে ছুটে এসেছে এদের পিছু পিছু।

কি হয়েছে?

হরেকেষ্টর তখন ভাল করে ওছিয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেইখানে সে বসে পড়লো।

কেনারাম বুঝিয়ে বললে সব কথা।

বললে, গ্রামে একটি যাত্রার দল করবে বলে হরেকেষ্ট চাল আদায় করছিল বাড়ীতে বাড়ীতে। পাঁড়ে পাড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে ডালাটি মাথায় নিয়ে। ভেবেছিল দুতোর পাড়ায় যাবে একবার।

পথে গণেশ পাঁড়ের ছেলে চৈতনের সঙ্গে দেখা।

চৈতন তার ডালাটি কেড়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল তাদের বাড়ীর দিকে।

হরেকেষ্ট ভেবেছিল সে রসিকতা করছে তার সঙ্গে।

তার পিছু পিছু ছুটেছিল ডালাটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে। চৈতনদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল গণেশ একটা লাঠি হাতে নিয়ে।

ওখানে পাঁড়ে ওখানে তোমার ছেলের কাণ্ড ওখানে। [illegible]লের ডালাটা নিতে ছুটে এলো।

চৈতন তখন ডালাটা নামিয়েছে তার হাত থেকে।

গণেশ বললে, বদ্ ব্যাটাকে।

চৈতন ধরলে হরেকেষ্টকে চেপে। আর গণেশ তার হাতের লাঠি চালিয়ে দিলে হরেকেষ্টর মাথায়।

আর চাল চুরি? আমার বাড়ীতে চাল চুরি করতে যাস্ কোন্ সাহসে?

আবার মার!

আবার!

এমনি করে মার খেয়ে হরেকেষ্ট যখন শুয়ে পড়েছে মাটিতে, তখন এলো রাঘবরি পাঠক।

এ কী করছো পাঁড়ে? ওকে মারছো কেন?

এই যে—তোকেও খুঁজছিলাম। মার্ চৈতন, এ-ব্যাটাও ছিল সেদিন। ডিঙওলার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়েছিল।

রাঘবরির গায়ে জোর আছে। সে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। বলেছিল, তুমিই তো সে ডিঙওলাকে পাঠিয়েছ আদালতে।

বেশ করেছি। গাঁয়ের বদনাম হলে দেখবে কে? দেখবার লোক আছে এ-গাঁয়ে? মরদ ব্যাটাছেলে তো কেউ নেই—সব তো মাগী।

রাখহরি সহ্য করতে পারলে না কথাটা। বললে, তুমিও তো সেদিন খেকে বেশুন কেড়ে নিয়ে গাঁয়ের লাটটি দিলে তুলে।

তোর বাপের হাট রে ব্যাটা! চৈতন, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি?

হাতের লাঠিটা রাখহরির ওপর চালাতে বোধকরি ভরসা হয়নি গণেশের। তাই দু'জনে বচসা হতে হতে চৈতন তাকে মারতে এসেছিল। রাখহরিও তাকে তেড়ে গিয়েছিল। তখন দু' হাত-ব্যাটায় রাখহরিকে কাবু করতে না পেরে চেপে ধরেছিল বেয়ানের গায়ে। এই দ্যাখো না—সারা গায়ে খাঁচড়ের দাগ।

সব কিছু শুনলেন সীতাপতিবাবু।

যারা মজা দেখবার জন্যে তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের তাড়িয়ে দিলেন প্রথমে। তারপর বললেন, তা আমার কাছে এসে কি চাও? তোমরাও তো লোকা চলে যেতে পারতে থানায়।

হরেকেষ্ট কথা বললে এতক্ষণ পরে। বললে, যাব কেমন করে? থানায় যাবার রাস্তায় যদি মারধোর করে? ও-ব্যাটাকে তো বিশ্বাস নেই। ব্যাটা আইনকানুন জানে।

সীতাপতিবাবু রেগে উঠলেন।

তা আমাকে কি বলতে চাও তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিয়ে আসবো?

কেনারাম বললে, না, তা বলছি না। তবে আপনি হচ্ছেন গিয়ে গাঁয়ের জমিদার। আপনি হচ্ছেন গিয়ে—

সীতাপতিবাবু বললেন, না। আমি নামে মাত্র জমিদার। আমাকে দিতে হয় বছরে বারো শ' টাকা। আদায় হয় কখনও সাত শ', কখনও আট শ'। প্রতি বছর আমাকে বাড়ী থেকে টাকা জোগাতে হয়। তোমরা কেউ খাজনা দাও না। বিপদে পড়লে আমার কাছে আসো, নইলে আমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখো না। আমার কিছু জমিজমা আছে তাই কোনোরকমে খেতে পাই। আমি কিছু করতে পারব না। যাও। তোমরা মারামারি করে মর।

হরেকেষ্ট বললে, মারামারি তো আমরা করতে চাই না। আমরা একটা যাত্রার দল করতে চেয়েছি—

চীৎকার করে উঠলেন সীতাপতিবাবু।

না, যাত্রার দল নয়। করতে চেয়েছো গাঁজা টানবার একটা আড্ডা। কী লজ্জার কথা। আমার ছেলে নবীন ইস্কুলটিকে খাড়া করবার এত যে চেষ্টা করছে, তা সেদিক দিয়ে তোমাদের নজর আছে? ইস্কুলে তো তোমাদের ছেলে পুলেরাই পড়বে। লেখাপড়া একটু না শিখলে করবে কী? এই তো হরেকেষ্ট—তাঁতির ছেলে, তাঁতটা বিক্রি করে দিলি কেন?

হরেকেষ্ট বললে, তাঁতের কাপড় কেউ কিনতে চায় না। সবাই মিলের কাপড় পরছে। বিলেত থেকে আসছে মিলের কাপড়। আমরা তার দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না। তৈরি করছিলাম গামছা আর বিছানার চাদর। তাও তো বিছানার চাদর আসতে আরম্ভ করেছে।

কেনারাম এ-সব কথা অনেক শুনেছে। এখন কাজের কথা হোক্। বললে, আপনার দুটো চাপ্‌রাশী এদের সঙ্গে দিন। লাঠি হাতে নিয়ে এদের সঙ্গে যাক্।

সীতাপতিবাবু বললেন, ও-সব আমি জানি না। নবীনের কাছে যাও।

সীতাপতিবাবুর ছেলে নবীন।

সেদিন ছিল রবিবার। নবীন ইস্কুলে বসে বসে কথা বলছিল হেড মাষ্টারের সঙ্গে। ছোট একটি মাইনর ইস্কুল। নবীন তার সেক্রেটারী।

এই ইস্কুলটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষ। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রামে একটি ইস্কুল হোক্। ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক্। সীতাপতিবাবু ছিলেন ধনী। তিনি নিজে হয়েছিলেন হেড মাষ্টার। টিম্ টিম্ করে চলছিল কোনোরকমে। এমন সময় হেড মাষ্টার মারা গেলেন। স্কুল বন্ধ হয়ে যায়-যায়। নবীন প্রতিজ্ঞা করে বসলো—বন্ধ হতে দেবে না। নিজের হাতে তুলে নিলে ইস্কুলের সব দায়িত্ব। হেডমাষ্টারের ছেলে বি-এ পাশ করে চাকরি করছিল কলিয়ারীতে। নবীন তাকে নিয়ে এসে অনেক করে বুঝিয়ে হেড মাষ্টার করে দিলে। কিন্তু সব চেয়ে মুস্কিল হলো স্কুলের গ্র্যাণ্ট্ নিয়ে। গ্র্যাণ্ট্ ছিল কুড়িটি টাকা মাসে। সে টাকাটিও বন্ধ হয়ে গেছে। তারই পরামর্শ করছিল সে বর্তমান হেড-মাষ্টারের সঙ্গে।

এত বড় একটা গ্রাম—প্রতিটি ছেলে যদি মাসে মাসে নিয়মিত মাইনে দেয় তাহ'লেই স্কুলটি চলে যায়। কিন্তু অর্ধেক ছেলে মাইনে দেয় না।

হেড মাষ্টার বলছিলেন, মাইনে যারা দেবে না আমি তাদের কিছুতেই রাখবো না ইস্কুলে।

নবীন বলছিল, না। রাখতে হবে।

হেড মাষ্টার বললেন, তাহ'লে মাষ্টারদের মাইনে—সেটা কম পড়ছে সেইটে তুমি যাও।

দিচ্ছিই তো।

এমন করে কতদিন দেবে? মাসে মাসে টাকা দিচ্ছ, দিয়ে পড়াচ্ছ—এটা কি চিরকাল সম্ভব?

নবীন তখন ঠিক করেছিল—গ্রামের লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করবে প্রতি মাসে।

কিন্তু চাঁদা আদায়ের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়েছিল বেনোয়ারী ওস্তাদ, রাখহরি পাঠক আর হরেকেষ্ট দালাল। তারা বলেছিল—তোমার ইস্কুল না ঘোড়ার ডিম। আমাদের যাত্রার দল আগে। তারপর তোমার স্কুল।

সেই রাখহরি আর হরেকেষ্টকে এইরকম অবস্থায় তারই কাছে আসতে দেখে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এ কী হয়েছে তোমাদের?

কেনারাম বললে, ভাখো, গণেশ পাড়ের কীর্তি ভাখো। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। তোমার বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে।

আমি কি করব?

কেনারাম বললে, তোমার মহত্তাপ, চাপ্‌রাশীকে যাও এঁদের সঙ্গে। এরা গণেশের ভয়ে যেতে পারছে না থানায়।

নবীন বললে, দিতে পারি যদি আমার কথা শোনো।

কি কথা বল।

নবীন বললে, যাত্রার দলের জন্যে কত চাঁদা আদায় করেছ ?

রাখহরি তাকালে হরেকেষ্টর দিকে, হরেকেষ্ট তাকালে রাখহরির দিকে।

শেষে হরেকেষ্ট বললে, তা চার আনা আর নগদ পয়সা—সবসুদ্ধ ধরে টাকা চল্লিশেক।

নবীন বললে, দিয়ে যাও ইস্কুলের জন্যে। আমি দিচ্ছি মহাতাপকে।

ইতস্তত: করছিল হরেকেষ্ট।—আমি তো একা দেবার মালিক নই। বেনোয়ারী ওস্তাদ আছে, পটু গায়েন আছে—

নবীনের সে এক কথা।—যে থাকে থাক্। ইস্কুল আগে। তারপর তোমাদের যাত্রার দল।

কেনারাম বললে, চল্লিশটি টাকায় তোমার ইস্কুল চলবে ?

নবীন বললে, যতটুকু চলে। একমাস চলবে। তারপর আবার তোমরা ইস্কুলের জন্যে চাঁদা আদায় করবে।

ইস্কুলের জন্যে চাঁদা কেউ দেবে না।

আলবাৎ দেবে। না দেয়, আমি সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দেবো।

নবীনের এটা রাগের কথা। কিন্তু একরোখা এই ছেলেটিকে বিশ্বাস নেই। হয়ত-বা আগুন ধরিয়ে দিতেও পারে। এই আগুনকে কেনারামের খুব ভয়। তার গোয়ালের খড়ের চালে আগুন একবার ধরেছিল। সেদিনের কথা এখনও তার মনে আছে।

কেনারাম রাজী করে ফেললে হরেকেষ্টকে।

নবীন তার ঘরোয়ান মহাতাপকে ডেকে বলে দিলে, লাঠি হাতে নিয়ে চলে যাও এদের সঙ্গে।

যদি কেউ আটকায় ?

নবীন বললে, চালাবে লাঠি। এ অবিচার আমি চলতে দেবো না আমাদের গ্রামে।

তারা চলে যেতেই হেড মাষ্টার বললে, কাজটা কি ভাল হলো ?

কেন বল দেখি ?

মাষ্টার বললে, তুমিই তো বল—দুর্জনকে দূর থেকে পরিহার করাই ভাল। গণেশ পাঁড়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই।

নবীন বললে, জানি। গণেশকে আমি ভাল কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম একসময়।

লাগালে না কেন ?

লাগিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ইচ্ছে করলে তুমি অনেক কিছু করতে পারো। কেন যে কর না বুঝতে পারি না।

গণেশ তখন বলেছিল, তোমরা আমাকে যে একঘরে করে রেখেছ।

মাষ্টার বলেছিল, কথাটা সত্যি। ওরা কলৌজ ব্রাহ্মণ বলে ওদের বাড়ীতে তোমরা খাও না।

নবীন বললে, ঠিক তার উল্টো। ওরাই আমাদের বাড়ীতে খায় না।

মাষ্টার বললে, এই জিনিসটাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমরা এক জায়গায় এক গ্রামে এক সমাজে বাস করেও পৃথক পৃথক হয়ে গেছি। ওরা বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী। আমরা হিন্দু, ওরা মুসলমান। আমরা ব্রাহ্মণ, ওরা শূদ্র।—আমরা যদি বলতে পারতাম আমরা মানুষ, তা'হলে অনেক দুর্ভোগ থেকে আমরা বেঁচে যেতাম।

নবীন বললে, তা আর হবার নয়। আমাদের এখন হিংসেটাই সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। গণেশ ভাবে সে শক্তিমান আর সকলেই দুর্বল। তাই দুর্বলের ওপর তার শক্তি পরীক্ষা করে সে আনন্দ পায়।

নবীন যা বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

রাত্রে নবীনই এসে খবর দিলে হেডমাষ্টারকে। বললে, শুনেছ মাষ্টার কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

হরেকেষ্ট আর রাখহরি ভয়ে থানায় যেতে পারছিল না, আমার কাছে এসে বললে—একটা লোক সঙ্গে যাও। দিলাম আমার মহতাপ্ ঘরোয়ানকে। ওদিকে গণেশ আর তার ছেলে চৈতন দু'জনে দুটো লাঠি নিয়ে বড় বাদামের গাঁটি আগলে বসে ছিল। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ওদের দেখেই হরেকেষ্টও ছুটেছে, রাখহরিও ছুটেছে। ছোটেনি শুধু মহতাপ্। মহতাপ্ মার খেয়েছে কিন্তু মারতেও ছাড়েনি। বলছে—গণেশ পাড়েকে মারতে পারেনি, কিন্তু চৈতনের একটা হাত সে ভেঙে দিয়েছে।—ভাবো কিরকম চরিত্র!

মাষ্টার বললে, থানায় তাহ'লে ওরা যেতে পারেনি?

নবীন বললে, না। পালিয়ে এসেছে দু'জনেই।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি করবে?

আমি কি করবো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।

নবীনকে দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত বলে মনে হলো। বললে, এত বড় একটা গ্রাম—গ্রামের এতগুলি লোক ধীরে-ধীরে কত নীচে নেমে যাচ্ছে ভাবো। এদের আমি ভাল করবো কেমন করে? যাদের ঘরে লড়াই করবো তারাও যে কাপুরুষ। একটা মানুষের মত মানুষ নেই। সব মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, বেশাখোর—কী নয়?

মাষ্টার বললে, এ হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরাধীনতার অভিশাপ। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

নবীন বললে, না হবে না। আমার বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার একটু বিস্মিত হলো তার কথা শুনে।

তুমি কি চাও না—দেশ স্বাধীন হোক্।

নবীন বললে, চাই। খুব চাই। কিন্তু কাদের নিয়ে স্বাধীন হবে? এই সব মানুষগুলিকে নিয়ে তো? গাছের বীজ যদি খারাপ হয়ে যায়—মাটিতে যতই সার ও জল দাও, গাছ কখনই ভাল হবে না। মানুষের চরিত্র গেছে নষ্ট হয়ে। ইংরেজ এইটিই চেয়েছিল।

নবীন তার পরের দিন একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে একাই চলে গেল গণেশ পাড়ের কাছে। বললে, 'শোনো গণেশ, যে গ্রামে তুমি বাস করছো সে গ্রামের মঙ্গল হোক্ এটা কি তুমি চাও না?'

কেন চাইবো না?

তা যদি চাও তো কেন এরকম করছো ?

গণেশ পাঁড়ে বললে, আমি করছি না তুমি করছো ?

আমি আবার কি করলাম ?

তুমি তোমার লোক দঙ্গে দিয়ে ওদের নালিশ করতে পাঠিয়েছিলে আমার নামে।

তুমি হরেকেষ্টকে মেরেছ, রাধহরিকে মেরেছ—ওরা নালিশ করবে না ?

গণেশ বললে, কেন মেরেছি তা তো জানো না ?

জানি। ওরা আমাকে বলেছে।

ওরা মিছে কথা বলে।

নবীন বললে, তুমি মিথ্যা কথা বল না ?

গণেশ জোর গলায় বললে, না। আমি কাউকে মারলে বুক ফুলিয়ে বলি—হ্যাঁ মেরেছি। ওদের মত কোণের আড়াল থেকে চিল ছুঁড়ি না।

নবীন বললে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন সবাই মিলে সুখে সচ্ছন্দে যাতে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা কর।

গণেশ বললে, তুমি কর গিয়ে। আমার যা করবার আমি করেছি।

কী করেছ ?

গণেশ বললে, তুমি জানো না ?

না জানি না।

নিশ্চয়ই জানো। আর সব কিছু ছেড়েছুড়েই তুমি এসেছ আমার কাছে।

নবীন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

সত্যি বলছি—আমি কিছু জানি না।

গণেশ বললে, তোমার চাপরাশী মহতাপ, মেরেছে আমার ছেলেকে—সেকথা বোধহয় জানো।

নবীন বললে, শুনেছি। শুনেছি—তুমি আর তোমার ছেলে মহতাপকে মারতে গিয়েছিলে।

শেষ করেছিলাম। এখন তুমি যা করতে পার—কর।

নবীন চুপ করে বসে রইলো।

গণেশ বললে, চুপ করে কি ভাবছো ? আমি ভারতী করে এসেছি থানায়। ওরা যেতে পারেনি কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম। আমার ছেলের হাতে চুন হলুদ লাগাতে হয়েছে। দেখবে ?

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, নিজে করলে অপরাধ, তারপর সেই অপরাধ তুমি অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছো ? কার নামে নালিশ করেছ ?

গণেশ বললে, তোমার নামে।

আমার নামে ?

হ্যাঁ, তোমার নামে। তোমাকে আমি আগে শেষ করতে চাই। তারপর ওদের শেষ করতে আমার বেশি সময় লাগবে না।

নবীন বললে, এর ওপর আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি চললাম।

গণেশ বললে, হ্যাঁ যাও। বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে। দূর হয়ে যাও।

নবীন সত্যিই চলে আসছিল। চলে আসছিল অপমানিত হয়ে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না তার। কিন্তু বিনা কারণেই গণেশ এমন হৈ হৈ চেঁচামেচি আরম্ভ করলে যে চারিদিক থেকে লোক জড়ো হয়ে গেল।

কী হয়েছে পাঁড়ে? চীৎকার করছো কেন?

গণেশ বললে, চীৎকার করবো না? ভাখো তোমরা সবাই ভাখো—নবীন কাল আমার ছেলেকে মেরেছে, আজ এসেছে আমাকে মারতে। তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি আবার নালিশ করবো।

কথাটা হয়ত মিথ্যা বলেনি গণেশ পাঁড়ে। নবীনকে কেউ তোমোদিন গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে আসতে দেখেনি। আজ তারা নবীনকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল বই-কি!

নবীনও কম অবাক হলো না।

চৈতন এতক্ষণ বাড়ীতে ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। সত্যি সত্যিই বাঁচাতে তার চুনথলুদ লাগালো। নবীনকে দেখেই সে চীৎকার করে উঠলো—মারো শালাকে। বাবা, তুমি এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো? কাল ও মতলবকে পাঠিয়েছিল আমাকে মারতে। আজ নিজে এসেছে।

নবীন এক রকম ছুটেই প্রাণ বাঁচালে।

গ্রামে একটা বিশ্রী ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেল।

'এনকোয়েরী' করবার জন্যে থানা থেকে দারোগাবাবু এলেন। কনেষ্টবল এলো।

সবাই শুনলে আমার পকেটে রিভলবার নিয়ে নবীন গিয়েছিল গণেশ পাঁড়েকে খুন করতে। গণেশ পাঁড়ের চীৎকারে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল, তাই আর শেষ পর্য্যন্ত খুন করতে পারেনি। নবীন পালিয়ে এসেছে।

নবীনকে ডেকে তার বাবা সীতাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কথাটা সত্যি?

নবীন বললে, সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি হলেই খুশী হতাম আমি।

সীতাপতিবাবু বললেন, তুমি গণেশ পাঁড়েকে খুন করবে?

না করলে এ গ্রামে আর বাস করা চলবে না।

মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়, তা জানো?

জানি। এরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। গণেশ পাঁড়ের অপমান আর সহ্য হয় না।

সীতাপতিবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, ভাল কাজ করছো না নবীন। গণেশকে তার যা খুশী তাই করতে যাও।

এ কী বলছো তুমি বাবা? গণেশ যা খুশী তাই করবে আর আমি চুপ করে থাকবো?

সীতাপতিবাবু বললেন, তুমি একা তো লড়তে পারবে না গণেশের সঙ্গে। যাদের তুমি সঙ্গে নেবে তারাও যে ভাল নয়। সমস্ত গ্রামটাই যে নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আমলে কিন্তু এরকম ছিল না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম ছিল?

মানুষের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। সবার বাড়ীতেই যথেষ্ট খাবার ছিল।

নবীন বললে, ঘরের এখনও ঠিক তেমনিই আছে। শুধু লোক বেড়েছে। ঘরে ঘরে বংশবৃদ্ধি করেছে, কিন্তু এক বিঘে জমিও কেউ বাড়ায়নি, চাষও করেনি, রোজগারও করেনি।

সীতানাথিবাবু বললেন, রোজগার করবার ক্ষমতা আছে? নেশা করবে না রোজগার করবে?

অবস্থা যত খারাপ হয়েছে, দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকবার জন্যে নেশার আশ্রয় নিয়েছে।

সীতানাথিবাবু বললেন, নেশার আড্ডাগুলো ভেঙে দিতে পারিস না?

চেষ্টা করব। নবীন বললে, যাত্রার দল করবার চেষ্টা করছিল। যাত্রার দল তো নয়, সন্ধ্যাবেলা নেশা করবার একটা আয়গা। সেইটে দিয়েছি ভেঙে। চাঁদা যা তুলেছিল—কেড়ে নিয়ে ইস্কুলের কাজে জমা করে দিয়েছি।

যাত্রার দল করতে দিলে না, এইবার মামলার খরচ তুমি দাও।

হরেকেষ্ট আর রাখহরি আদালতে গিয়ে মামলা করে এসেছে গণেশ পাঁড়ের নামে।

হরেকেষ্ট বললে, আপিল-মোকর্দ্দমা যা কিছু করা—সবই তোমার ভরসায়। ঘরে বেঁধে সেদিন তুমিই আমাদের আদালতে পাঠালে। উকিলের কাছে চিঠি লিখে দিলে। নইলে ও-ব্যাটার নামে মামলা করা কি আমাদের সাধ্যে কুলোয়? এইবার সাক্ষী চাই চারজন।

নবীন বললে, সাক্ষীর ভাবনা কি?

ভাবনা কিছু নেই কিন্তু যাওয়া আসা খরচ খরচা বাদে প্রত্যেককে একটি করে টাকা দিতে হবে নেশা করবার জন্যে।

নবীন বললে, দেবো। গণেশকে জব্দ করতেই হবে।

নবীনের জেদ চড়ে গেল।

জমির চাষ-আবাদের জন্য ঘুনিষ-কুষাণ গণেশ পাঁড়েকে প্রতি বছর নতুন করে রাখতে হয়। পুরনো লোক কেউ থাকে না।

বর্ষায় জমি 'নিড়ান্' থেকে আরম্ভ করে ধানের শুছিতে যতদিন পর্য্যন্ত না পাকের রঙ ধরে, ততদিন ক্ষেতের যাবতীয় কাজ যাকে দিয়ে সে করায়, ফসলের ভাগ দেবার আগে বৎসান্তে একটা ছল খুঁজে মারধোর করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর পাকা ধান নিজেরাই কেটে নিজের খামারে তোলে।

সারা বছর কাজ করবার পর গরীব মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যায়।

সে বছর নেপাল মুচির কপালে এই দুর্ভোগের বরাদ্দটি লেখা ছিল। বেচারা অত্যন্ত দুর্ব্বল। নিতান্ত ভাল মানুষ। ধান কাটবার সময় গণেশ পাঁড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

খবর পেয়ে নবীন তাকে ডেকে পাঠালে।

মার খেয়ে বাড়ীতে বসে বসে কাঁদছিস কেন? থানা নেই? আদালত নেই?

কাঁকর-মাটির দেয়ালের ওপর নেপাল মুচির পিঠটা ঘষে দিয়ে পিঠের খানিকটা চামড়া তুলে দিয়েছে গণেশ পাঁড়ে। তারই যন্ত্রণায় তখনও সে সোজা হয়ে বসতে পর্য্যন্ত পারছিল না। কোনো রকমে হেলানটা সোজা করে উঠে বসলো নেপাল। বললে, গরীব মানুষ হুজুর। মামলা-মোকর্দ্দমা করবার পয়সা কোথায় পাব? চাষের সময় খাটলাম চারটি খেতে পাবো—' বলতে বলতে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

নবীন বললে, গণেশকে তো চিনিস্ তবু সেই ওরই বাড়ীতে চাষ করতে গেলি কেন ?

নেপাল চুপ করে রইলো। নেপালের বৌ তার এই রুগ্ন স্বামীটিকে পরের মাঠে একা ছেড়ে দিতে পারেনি। বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে তার সঙ্গে এসেছে। কোবরেজ মশাইএর ভাঙা ভিটের পাশে দাঁড়া খেজুর গাছটার তলায় সেও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সবকিছু জেনেও কেন যে সে গণেশ পাড়ের জমি চাষ করতে গিয়েছিল সেই কথাটার জবাব দিতে গিয়ে একবার মুখ তুলে তাকালে কিন্তু নেপালের দিকে তার নজর পড়তেই মুখের কথা মুখেই আটকে রইলো। ঠোঁট দুটো কান্নায় থরথর করে কেঁপে উঠলো শুধু। কথা আর তার বলা হলো না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, সাক্ষী প্রমাণ আছে ?

মুচি-বৌ এতক্ষণ পরে কথা বললে।

'খামারের ভেতর ঢুকিয়ে মেরেছেন বাবু। ও মিন্সি কি কম বজ্জাত—'

বলেই সে একটু থামলো। এদিক ওদিক তাকালো একবার। তারপর আবার বললে, বললাম হতচাগা মিনষেকে—ওই পরীর নিয়ে চাষ করতে যাস্‌নে এ বছর। তা সে মরতে মরতেও গেল। বললে, খাবি কি ?

নবীন শুনতে লাগলো চুপ করে।

বললাম, আমার এখনও গতর রয়েছে, যেমন করে হোক্ খেটে খুটে দুটো খাওয়াব তোকে। তা ও শুনলে না। মার খেয়ে বাড়ী এলো। তা যদি শুধু মার খেতো তা'হলেও বা হতো, কিন্তু বাবা খগেশ্বরের যে মাদুলিটি ওকে এনে দিয়েছিলাম সেটিও দিয়েছে টান মেরে ছিঁড়ে কোথায় ফেলে।

বাবা খগেশ্বরের মাদুলি কি জন্যে দিয়েছিলে ?

মুচি-বৌ বললে, ডাক্তারবাবু বললে ওর যে ব্যারাম—সে ব্যারামের নাকি চিকিচ্ছে নাই।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যারাম ?

নেপাল নিজেই বললে, বড় ব্যারাম গো। খক্ খক্ করে কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত ওঠে।

লোহার একটি বড় মাদুলি ঝুলতো নেপালের গলায়। এখন বোঝা গেল—সে অক্ষয় কবচটি তার স্ত্রীর দেওয়া।

হাবু রায় এসে দাঁড়িয়েছিল নবীনের কাছে। এই হাবু রায়কে আজ তার একান্ত প্রয়োজন। কারণ মিথ্যা সাক্ষী দিতে হাবু রায়ের জুড়ি আর কেউ নেই এ-গ্রামে।

নবীন বললে, 'গণেশ কি রকম মেরেছে নেপালকে দেখছো ?'

তাই তো দেখছি ভায়া।

নবীন বললে, সাক্ষীসাবুদ কিছু নেই।

হাবু জিজ্ঞাসা করলে, ক'জন চাই ?

তুমি একজন। আরও জন-তিনেক।

হাবু বললে, ঠিক আছে। আজ কিছু বায়না দেবে নাকি ?

নবীন বললে, না।

তুমি যাবে নাকি ওদের সঙ্গে ?

যাব।

কোথায় ?

প্রথমে ডাক্তারখানায়, তারপর থানায়।

হাবু বললে, মামলাটা তার আগে সাজিয়ে নিলে হতো না ?

হ্যাঁ ঘোষ।

দু'জনে বসে বসে মামলাটা প্রথমে সাজিয়ে নিলে। গণেশ যে নেপালকে মুচিকে মেরেছে সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য ঘটনাকেও মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে হবে—এইটিই মামলার বিড়ম্বনা।

নবীন মহতাপকে সঙ্গে নিলে। তারপর নেপালকে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নেপালের বৌ তাদের পিছু পিছু যাচ্ছিল। নবীন বললে, তুই কি জন্যে আসছিস ? তুই বাড়ী যা।

অশ্বত্তলা পার হয়ে গিয়ে নবীন একবার পিছন ফিরে তাকালে। দেখলে, নেপালের বৌ তখনও তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পথের ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট ঘড় পাঁচটা মামলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে গণেশ পাঁড়ের নামে। পুলিশ-চালানী কেস্ দুটো, আর থানা থেকে আদালতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে আরও একটা।

কিছুই মিথ্যে কোনোটাই নয় তবে সাক্ষীসাবুদ দাঁড়াতে হয়েছে প্রত্যেকটাতেই।

টাকা চাই। নবীন টাকার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। সীতাপতিবাবু টাকা দেবেন না। সেদিন তিনি স্পষ্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন নবীনকে—গণেশ পাঁড়েকে জব্দ তুমি করতে চাও জানি। কিন্তু মিথ্যে মামলা তৈরি করে তার খরচ চালাবার টাকা আমি দেবো না।

নবীন বলেছিল, আমার মামেও তো গণেশ দুটো মিথ্যে মামলা করেছিল।

সীতাপতিবাবু বলেছিলেন, তার ফল কি হলো দেখলে তো ! মিথ্যে কখনও জয়ী হয় না।

তুমি কি তাহ'লে বলতে চাও আমিও হেরে যাব ?

সীতাপতিবাবু বলেছেন, সত্য যদি সেখানে না থাকে তো নিশ্চয় হারবে।

কিন্তু নবীন সেকথা শোনেনি।

গণেশ পাঁড়ের মত দুর্জনকে সায়েস্তা করবার আর কোনও পথ সে খুঁজে পায়নি। সে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

সারা গ্রাম মেতে উঠেছে এই এক বিচিত্র আনন্দে। হিংসার একটা বিষ বাষ্প যেন সারা গ্রামের বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন আনন্দেই আছে সকলে।

মামলার দিন পড়ছে। সাক্ষীরা যাচ্ছে শহরের আদালতে। ফেরার পথে কেউ একটা কফি কিনে আনছে। কেউ আনছে ছেলের খেলনা। কেউ আনছে একটা নতুন গামছা। তার বেশি কিছু কেনবার পয়সাও নেই কারও।

চুপচাপ বসে-থাকা মানুষ যেন একটা করবার মত কাজ পেয়েছে।

নবীন সেদিন হাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু টাকা কোত্থেকে পাওয়া যায় বলতে পারো ?

হাবু অনেক ভেবেচিন্তে বললে, বঙ্কিমানন্দকে যদি একটু নাড়া দিতে পারো তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু বঙ্কিমানন্দ তো চোরাই গাঁজার কারবার করে।

সেই জন্যেই তো বলছি।

নবীনের ইচ্ছে ছিল—গ্রামে এই সব চোরাই কারবার বন্ধ করে দেবার। পুলিশকে তাদের ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছে। কেমন করে তাদের ধরতে হবে সে পরামর্শও দিয়ে গেছে। এই অবস্থায় বঙ্কিমানন্দের কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়া মানে ঘুষ নেওয়া।

সেটা কি উচিত হবে?

হাবু বললে, তোমার টাকার দরকার তাই বলছি। আজ তুমি পুলিশের ভয় দেখিয়ে বের করে নাও তো কিছু টাকা! তারপর পুলিশ যদি এসে তাকে ধরে কোনোদিন, তুমি বলবে—আমি কিছু জানি না।

নবীন রাজী হয়ে গেল।

বঙ্কিম রায়।

নিজের কাপড় জামা সব গেরুয়ায় ছুপিয়ে নিয়েছে। আর কেউ বলুক আর নাই বলুক নিজেই নিজেকে প্রচার করেছে—স্বামী বঙ্কিমানন্দ বলে'।

স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। নিজের সহোদর ভাইদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিজে পৃথক হয়ে গেছে। যদি ধায়গা বিষয় সম্পত্তি তার অংশে যা পড়েছে তাও খুব কম নয়। একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

গ্রামের লোকে অনেকে অনেক কথাই বলে। বলে—বঙ্কিমের হাতে মেলা টাকা।

তবু লোকটা যে কেন টাকা টাকা করে কে জানে।

গ্রামের পূব-পাড়ায় বৈষ্ণবচরণের গোয়ালের পাশে ছোট একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছে সে। পাশেই তার নিজেরই প্রকাণ্ড খামার বাড়ী। ধানের মরাই আছে তিনটে। সে সব আগলাবার লোকও আছে।

নিজে সেই ছোট ঘরটিতে বাস করে। নিজেই চারটি রাঁধে বাড়ে খায় আর গাঁজা টানে। বলে, সংসারের মায়া ত্যাগ না করলে কিছু হবার নয়। তোরা সব সংসারের কীট। আমার মত নিরাসক্ত হতে যদি পারিস তো বেঁচে থাকার মজাটি বুঝতে পারবি।

নিজের সেই ছোট ঘরটিকে বলে, এটি আমার আশ্রম।

সেই আশ্রমে বসে বঙ্কিমানন্দ গাঁজা ঘিক্রি করে আর গান গায়—

'জপ মন ভোলা।
ভোলার দয়া চাস্ যদি কেউ
গায় কর যে গাছের তলা।'

কখনও-বা মনের আবেগে গেয়ে ওঠে—

'গাঁজা তোর মহিমা এ কি
আমি দিন-দুপুরে স্বপন দেখি।'

বঙ্কিমানন্দ তার সেকেলে রঙের কাপড় জামার ওপর রুদ্রাক্ষের একটি মালা পরেছে। অপরিচিত কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে—শ্রীবঙ্কিমানন্দ স্বামী। এই আনন্দটুকুই তো সব বাবা। দুনিয়ায় আনন্দ ছাড়া আর আছে কি?

তারপর তার একটি দুখর বুলি আছে। সেইটি সে যখন-তখন আওড়ায়।

চুরি করলেই চোর, ডাকাতি করলেই ডাকাত, হাওয়াগাড়ী চড়লেই বড়লোক, আর খেতে না পেলেই গরীব।

নবীন সেদিন হাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বঙ্কিমানন্দের কাছে। সন্ধ্যে হয়েছে সবে। মাঠটি জুড়ে বঙ্কিমানন্দ তখন তার মৃগচর্মের আসনটি বিছিয়ে তার ওপর বসে বসে গাঁজা তৈরি করছে।

নবীনকে আর হাবুকে দেখে বঙ্কিমানন্দ বললে, এসো বাবা এসো।

চটের আসনটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, বোসো।

তাদের বসিয়ে গাঁজার কল্‌কেটি নেজে উনোন থেকে আগুন আনবার জন্যে উঠে গেল। কাছে একটি উনোনে তার খিঁচুড়ি রান্না হচ্ছে। কল্‌কের আগুন ফুলতে ফুলতে বললে, মশাক খাই বাবা। এর যে কি আনন্দ তা তোমরা সংসারী মানুষ, তোমরা বুঝবে না।

এই বলে কল্‌কেটি হাতে নিয়ে বঙ্কিমানন্দ ফিরে এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। বললে, ব্যোম ভোলানাথ! আগে আনন্দ করে নিই বাবা, তারপর কথা বলবো তোমাদের সঙ্গে।

বঙ্কিমানন্দ তার দুটি হাত দিয়ে কল্‌কেটি ধরে চৌ চৌ করে টানতে টানতে আনন্দ করতে লাগলো।

তারপর বললে, বল বাবা এবার তোমার কথা বল।

বলেই সে একটু খেমে হাসতে হাসতে আবার বললে, তুমিও বাবা, এও বাবা, সেও বাবা, আর সব-চাইতে বড় বাবা হলো গিয়ে সেই পাগলা-বাবা ভোলা মহেশ্বর। দুর্জয় ব্যাটার সাহস কিন্তু। ঘর-দোর ছেড়েছুড়ে ছাইভস্ম মেখে সন্ন্যাসী হলো—ঠিক আমার মতন। বুঝলে নবীন, ওই ব্যাটাই খাঁটি, আর সব দেবতা-টেবতা সব ঝুটা। শুনলাম তুমি নাকি বাবা গাঁয়ে খুব কুলকাম্ তুলে দিয়েছ? গণেশ পাড়েকে জব্দ করবার মতলব করেছ?

নবীন বললে, আমি আর তাকে কি জব্দ করবো বঙ্কিমানন্দ, সেই আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, পারবে না। পারবে না। শয়তান কখনও কাউকে জব্দ করতে পারে না। সে নিজেই জব্দ হয়ে যায়।

নবীন বললে, আমি বেশিক্ষণ বসব না বঙ্কিমানন্দ, আমার কাজের কথাটা শোনো।

হাবু বললে, আমি বলছি।

বলেই সে এগিয়ে এসে বললো বঙ্কিমানন্দের কাছে। বললে, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা বিক্রি কর—এ কথাটা পুলিশে জানলে কেমন করে বলতে পার?

কথাটা শুনেই বঙ্কিমানন্দ যেন চমকে উঠলো! চেঁচিয়ে বলে উঠলো, কে বললে আমি গাঁজা বিক্রি করি? গাঁজা আমি কিনি, আমি গাঁজা খাই। তাই বলে গাঁজা আমি বেচতে যাব কেন?

হাবু বললে, তা আমি জানি না বাবা, এই নবীনের কাছে এনকোয়েরী এসে এলাম তোমার কাছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, ভাখো হাবু, ভাখো নবীন, পৃথিবীতে যত জানোয়ার আছে তার ভেতর মানুষই হচ্ছে সব চেয়ে খারাপ জানোয়ার। মানুষের বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি দিয়ে সে খারাপ কাজ করে। গাঁজা বিক্রি করি বলে আমাকে যদি কেউ ধরিয়ে দিতে চায় তো আমার সাধ্যি আছে আটকাবার? আমার বাবার বাবাও পারবে না। পারে যদি কেউ তো সে ওই—

বলেই মাথার ওপরটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, বাবার বাবা ভক্ত বাবা সেই ভোলা মহেশ্বর। আর সেই জন্যেই বাবার শরণ নিয়ে বসে আছি।

হাবু বললে, ও-সব বুজরুকি ছাড়ো দেখি বঙ্কিমানন্দ, এখন যদি বাঁচতে চাও তো শ'খানেক টাকা ঝাড়ো, আমরা পুলিশটুলিশকে বলেকয়ে চেষ্টা করে দেখি। ধরো—তোমাকে যদি জেলে ঢুকিয়ে দেয়, তখন ওই বাবা-মহেশ্বর তোমাকে পঁচিশবার করে জেলখানার দিয়ে গাঁজা খাইয়ে আসবে না। গাঁজা খেতে না পেয়ে পেট ফুলে মরে যাবে।

একশ' টাকা দিতে হবে শুনেই বঙ্কিমানন্দের চোখদুটো কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো। বিম্ মেরে একটুখানি চুপ করে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, নে বাবা, একশ' টাকা এখন আমি কোথায় পাই? ভাখ্ হাবু, গাঁজা আমি খাই তাই আমার কাছে গাঁজা সব সময়েই থাকে। সে গাঁজা আমি বিক্রি করবার জন্যে রাখি সেকথা পুলিশকে কে বলেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। গাঁজা যারা খায় তারা বলবে না।

হাবু বললে, বলেছে, কে তা তুমি বুঝতে পারছো না? বলেছে মধেশ পাঁড়ে, নয়ত তার ছেলে চৈতন পাঁড়ে।

ঠিক বলেছিস। ওরা গাঁজা খায় না। ওদের যদি গাঁজা খাওয়াতে পারতাম তাহ'লে দেখতিস এ-গাঁয়ের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো। গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে সব ঘুরে বেড়াতো। এইরকম মারামারি কাটাকাটি করতো না। তাই তো বলি—সুখেশান্তিতে যদি থাকতে চাস তো তোরাও গাঁজা ধর।

হাবু বললে, ধরবো। এখন ও-সব আজেবাজে কথা ছেড়ে দিয়ে টাকাটা ঝাড়ো। আমরা চলে যাই। আমাদের কাজ আছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, টাকা তো নেই।

বেশ, তাহ'লে আমরা চললাম। পুলিশ যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায় তখন আমাদের কাছে যেয়ো না।

বঙ্কিমানন্দ ভয় পেয়ে গেল। বললে, দাঁড়া ভেবে দেখি।

হাবু আরও ভয় ধরিয়ে দিলে। বললে, তুমি বসে বসে ভাবো। আমরা চললাম। ওঠো নবীন।

এই বলে নবীনকে তুলে নিয়ে সত্যিই হাবু চলে যাচ্ছিল।

বঙ্কিমানন্দ বললে, শোন্।

ফিরে দাঁড়ালো দু'জনেই।

কি বলছো?

বঙ্কিমানন্দ বললে, পুলিশ আসবে না তো ?

টাকা দিলে আসবে না।

কত দিতে হবে ?

একশ' টাকা।

অত টাকা আমি পাব কোথায় ?

কত পাবে ?

পঞ্চাশ টাকা।

হাবু বললে, তাহ'লে হ'লো না। টাকা তো আমরা নিজের জন্যে চাই না। চাই ওই গরীব পাড়েকে জব্দ করতে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, কাল সকালে একবার আসিস্। কিন্তু হাঁা, তোর হাতে তো দেবো না। নবীনকে আসতে হবে।

নবীন বললে, আসবো।

বঙ্কিমানন্দের আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলো নবীন আর হাবু রায়। পল্লীগ্রামের অন্ধকার পথ। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ।

পথ চলতে চলতে নবীন বললে, শুধু একটা বাঁদরের জন্যে গ্রামের অবস্থা কি হলো ভাখো। শুধু হিংসা আর হিংসে! ফুলটাকে বাঁচাবার জন্যে আমি দশটা টাকার জন্যে ছটফট করে মরছি, আর এই এতগুলো টাকা সত্যিই যদি পাওয়া যায় বঙ্কিমের কাছ থেকে, সে-টাকাটা যাবে উকিল-মোক্তারের কাছে। না খেয়ার না ধর্মায়—

হাবু বললে, এখন আর সেসব কথা ভাববার সময় নেই। আগুন যখন জ্বলে উঠেছে তখন তাকে নেবাতেই হবে।

এ আগুন নিববে বলে মনে হয় না।—নবীন বললে, হিংসার আগুন যখন জ্বলে তখন সে আগুন সহজে নেবে না। নেবে যখন—তখন দেখা যায় দু'পক্ষই পুড়ে ছাই হয়েছে।

হাবু রায় বললে, অতসব বড় বড় কথা জানি না ভাই। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে দিয়ে আর মিথ্যা কথা বলে বলে জীবনটা গেল।

নবীন বললে, আচ্ছা হাবু, এ সময় কেউ নেই ; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। সত্যি জবাব দেবে ?

বল। সত্যি কথা বলতে তো ভুলেই গেছি। তবু যদি বলবার মত হয় তো বলবো।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এ-সব তোমার ভাল লাগে ?

হাবু বললে, লাগে বই-কি ! বেশ লাগে। মনে হয় বুদ্ধির খেলা খেলছি। তবে একটা জায়গায় আমি খাঁটি আছি।

কোন্ জায়গায় ?

হাবু বললে, আমি যে-দিকটা ধরি, মনে মনে জানি সে অপরাধী নয়।

নবীন বললে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভাল করে বুঝিয়ে বল।

হাবু তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো।

এই যেমন ধর—তুমি আমাকে নেপাল মুচির হয়ে গিয়ে সাক্ষী দিতে বললে। আমি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলাম। কারণ আমি মনে মনে জানি নেপাল সত্যিই মার খেয়েছে। এই মামলায় গণেশ পাঁড়ে যদি আমাকে ডাকতো আমি কখনও যেতাম না। এই যেমন ধর—বক্সিরামল। আমি জানি—লোকটা ভণ্ড। ও সাধুও নয় সন্ন্যাসীও নয়। গাঁজা খায়, চুরি করে গাঁজা বিক্রিও করে। ওর কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা বের করতে আমার আপত্তি নেই।

কথায় কথায় তারা ইস্কুলের কাছে এসে পড়েছিল। স্কুল-ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। দেখলে, টেবিলের ওপর লণ্ঠন রেখে হেডমাষ্টার কি যেন পড়ছে বসে বসে।

নবীন বললে, এবার তুমি বাড়ী যাও দাদু। কাল সকালে এসো। আমি যাব তোমার সঙ্গে বক্সিরামলের কাছে।

দাদু চলে গেল। নবীন গিয়ে ঢুকলো ইস্কুলে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, এতদিন কোথায় গিয়েছিলে?

নবীন বললে, গিয়েছিলাম টাকার সন্ধানে। দ্যাখো, ভাল কাজের জন্যে টাকা পাওয়া যায় না, কিন্তু মন্দ কাজের জন্য টাকা ঠিক এসে যায়। ইস্কুলের জন্যে টাকা জোগাড় করতে পারলাম না। কিন্তু আদালতের মামলায় টাকা ঠিক জোগাড় করছি।—ভাল লাগছে না কিছু মনে হচ্ছে—নেশা করে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকি।

মাষ্টার বললে, আমি কিন্তু অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ। আমার মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত খারাপ কিছু হবে না। ভালই হবে। কিন্তু সে ভাল হয়ত আমরা দেখতে পাব না।

নবীন বললে, আমার বাবাও ঠিক এমনি কথা বলে। আমি কিন্তু ভাল হবে বলে আশা করতে পারছি না। ক্রমাগত মনে হচ্ছে—সারা দেশটাই যেন অধঃপাতের পথে নেমে যাচ্ছে। আমরা সেইখানে নামবার সিঁড়ি তৈরি করছি।

মাষ্টার বললে, দেশের রাজশক্তি যদি চায়—দেশটা উচ্ছন্নে যাক, তাহ'লে তারা অনায়াসেই দেশকে সেই পথে ঠেলে দিতে পারে। ইংরেজ তো আমাদের মঙ্গল কামনা করে না। তারা চায় নিজের মঙ্গল। তাই তারা দেশকে এইখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি দেখো—মানুষ একদিন জাগবেই। চোখ তার একদিন খুলে যাবেই। এই আশা নিয়েই বেঁচে আছি নবীন, তাই তুমি যেদিন বললে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার বাবার প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলটিকে বাঁচাও, আমি সেইদিনই ছুটে এলাম এইখানে।

ইস্কুলের বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই নবীন বললে, কে?

একগাদা বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলো কপিল।

কি খবর?

মাষ্টারের টেবিলের ওপর বাঁশের সিকলিকে ছড়িগুলি নামিয়ে দিয়ে কপিল হাসতে লাগলো।

এই একটি আধ-পাগলা মানুষ কপিল চক্রবর্ত্তী। গ্রামে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এত যে মামলা-মোকর্দ্দমা, এত যে হিংসা-বিদ্বেষ, কপিল সেদিকে একবার ফিরেও তাকায় না। কেউ তার শত্রু নয়। কারও ওপর তার কোনও অভিযোগ নেই। তার কাছে গণেশ পাঁড়েও যা, নবীনও তাই।

নবীন বললে, রাত্তির বেলা তুমি বাঁশের ছড়ি তৈরি করছিলে?

কপিল বললে, মাষ্টারদের ছড়ি চাই না? স্কুলের ছেলেগুলোকে ঠেঙাতে হবে না?

তাই বলে এই এত ছড়ি?

কপিল হাসতে হাসতে বললে, এই এক-একটা ছড়ি এক একটা ছেলের পিঠে ভাঙবে তবে কি হে মাষ্টার, আর ছড়ি চাই?

মাষ্টার বললে, না। আর চাই না। তুমি এখন বাড়ী যাও। অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়িয়ো না। গণেশ পাঁড়ে দেখতে পেলে তোমাকেই মেরে বসবে।

কপিল বললে, না না আমাকে মারবে কেন? আমি তো আজ বিকেলে তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

নবীন একটুখানি অবাক্ হয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, গণেশ পাঁড়ের বাড়ী কি জন্যে গিয়েছিলে?

কপিল বললে, চা খেতে। আমি তো প্রায়ই ওর বাড়ীতে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

নবীন বললে, আ'য়াদের কথা তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না?

কপিল বললে, করে না আবার। খুব করে!

কি বলে?

গণেশের বৌ বলে, 'নবীন তোমাদের পেয়ারা খায়?' আমি বললাম—'খায় বই-কি, খুব খায়।' তখন বললে, 'দুটো পেয়ারা ওর জন্যে নিয়ে যাও।' গাছে মেলা পেয়ারা হয়েছে তো! পাকা পাকা পেয়ারা দুটো এনেছিলাম গাছ থেকে পেড়ে। কিন্তু খুব মিষ্টি পেয়ারা। রাস্তায় আসতে নিজেই খেয়ে ফেলেছি।

মাষ্টার নবীনের মুখের দিকে তাকালে। নবীনও মাষ্টারের মুখের দিকে তাকালে।

মাষ্টার বললে, শুনেছো নবীন? মন দিয়ে শোনো। আমাদের ঘরে ঘরে এই সব মেয়েরা এখনও বেঁচে আছে।

নবীন বললে, বিশ্বাস করতে পারছি না যে!

মাষ্টার বললে, বিশ্বাস কর।

বঙ্কিমানন্দর কাছ থেকে একশ' টাকাই আদায় করেছে হাবু রায়। তার জন্যে কত মিথ্যা কথা যে বলতে হয়েছে তাকে—নবীন তা জানে। নবীন মুখ টিপে টিপে হেসেছে শুধু।

টাকা নিয়ে তারা ফিরে আসতেই দেখে—চণ্ডী ভট্চাজ বসে আছে নবীনের অপেক্ষায়। 'এসো, তোমারই জন্যে বসে আছি।'

চণ্ডী ভট্চাজ নবীনের চেয়ে বছর চারেকের বড়। সারা গ্রামের পুরোহিত। পুরোহিত হলেও নবীন তার সঙ্গে ইয়ারকি ফষ্টিনষ্টি করে।

চণ্ডী ভট্চাজ মানুষটিও এক অদ্ভুত প্রকৃতির।

চণ্ডী ভট্চাজের বাপের মত ভুঁড়ি ছিল। চণ্ডী ভাবে তারও বুঝি ভুঁড়ি হচ্ছে। তাই সে তার বাপের মত খাটো একটা গামছা পরে' হরদম ঘুরে বেড়ায়। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই তার ঠাণ্ডা লাগে। গায়ে বেদনা হয়। তাই সে তার ছোট ভাইএর লালরঙের ফেঁড়া একজোড়া মোজা কয়েকদিন হলো

পায়ে দিচ্ছিল। যোজা পরলেই জুতো পরতে হয়। অথচ জুতো সে কস্মিনকালেও কেনে না। ছোট ভাইএর জুতো জোড়াটা টেনেটুনে পরেছিল কোনোরকমে, কিন্তু একদিনেই পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। পাঁতে বেদনা হয়েছে বলে মাথায় 'মাঙ্কি ক্যাপ'।

সেই বিচিত্র বেশে চণ্ডী ভট্চাজ বসে ছিল ইস্কুলের দাওয়ায়।

নবীন কিছু বলেনি, কিন্তু হাবু রায় বললে, এমন বাঁদরটি সেজে বসে আছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

আমাকে বাঁদর বললি তুই?

বাঁদর সেজেছ, আর বাঁদর বলবো না? সাধুরা পরে পরেই জীবন কাটালে। বুদ্ধি কিনতে পার না? না না, সত্যি বলছি ভট্চাজ, তোমাকে দিয়ে ঠাকুর দেবতার পুজো আচ্চা করানো উচিত নয়। চব্বিশ ঘণ্টা পান জরদা খাও, দাঁত মাজো না কোনোদিন।

হাবু রায়ের ওপর চটে উঠলো চণ্ডী ভট্চাজ। বললে, তাখ্ যা জানিস না তাই নং নিয়ে কথা বলিসনে বলছি। আমাদের শাস্ত্রে চত্বারিংশৎ প্রকার দন্তধাবন প্রণালী আছে। তার মধ্যে সকালবেলা পূবমুখে দাঁড়িয়ে পরেরো বার কুলকুচ করা—একটা। আমি তাই করি। আর তুই বলছিস কিনা আমি দাঁত মাজি না?

হাবু রায় বললে, সংস্কৃত পড়েছ কোনোদিন যে শাস্ত্র পড়বে? তুমি আর শাস্ত্রের কথা বোলো না।

চণ্ডী বললে, আমার বাপ্-ঠাকুর্দা চৌদ্দপুরুষ পুরুতের কাজ করে গেছে, আমিও সারা গাঁয়ের পুরোহিত, বাড়ীতে শ্যামচাঁদের নিত্য পুজো—আর আমি সংস্কৃত জানি না?

মন্ত্রগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সেইগুলো মুখস্থ করে তুলছাল যেমন পারো আউড়ে যাও শুধু। ওকে সংস্কৃত জানা বলে না।

নবীন দেখলে এবার ওদের ঝগড়া বেধে যাবে। তাই সে থামিয়ে দিলে। বললে, হাবু এবার তুমি থামো। ভট্চাজ কি বলবে বলছিলে—বল।

চণ্ডী ভট্চাজ বললে, ভারি বিপদে পড়েছি শ্যামচাঁদকে নিয়ে।

শ্যামচাঁদ তাদের গৃহ-দেবতা। কালো কষ্টিপাথরের তৈরি চমৎকার মূর্তি শ্যামচাঁদের। রাধিকাও আছে। অষ্টধাতুর তৈরি রাধিকা। চণ্ডী ভট্চাজকেই রোজ পুজো করতে হয়।

তার আবার বিপদ কিসের?

চণ্ডী ভট্চাজ কিন্তু যে বিপদের অনুপুঙ্খিক বিবরণ দিলে তাকে বিপদ বলতে হবে বই-কি!

বীরেন ভট্চাজ ছিল চণ্ডীর জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা। কাজেই শ্যামচাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তির অংশীদার ছিল সে। বীরেনের ভাগে পড়েছিল মাত্র পাঁচ বিঘে জমি। পাঁচ বিঘে জমির ধান যেমন সে পেতো, মাসে পাঁচদিন তেমনি শ্যামচাঁদের পুজো তাকে চালাতে হতো।

বাড়ী অবশ্য একটা তার ছিল, কিন্তু বাড়ীতে বৌ ছিল না। বৌ না থাকবার কারণ তারা ছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বিয়ে করতে টাকা খরচ করে বাড়ীতে বৌ আনতে হয়। কিন্তু টাকাও সে খরচ করতে পারেনি। বৌ আনবার সৌভাগ্যও কোনোদিন হয়নি।

আর বৌ ছিল না বলে বীরেন কোনোদিন স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতো না। কোথায় যে থাকতো সেই জানে। গ্রামে আসতো দু' চারদিনের জন্যে। এর বাড়ী ওর বাড়ী চেয়েচিন্তে খেতো

আর নিজের সেই ভাঙা বাড়ীতেই পড়ে থাকতো। তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যেতো। বলতো, একটা বৌ না থাকলে বাড়ীতে বাস করা যায় না।

চণ্ডী ভট্‌চাজকেই দিয়েছিল তার ভাগের পাঁচ বিঘে জমি। বলেছিল, তুমিই জমিটা ভোগ কর আর শ্যামচাঁদের পাঁচদিনের সেবাটা চালিয়ে যাও।

সেই ব্যবস্থাই চলে আসছিল বরাবর।

বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন ধীরেন ভট্‌চাজ গ্রামে এলো। এসেই বললে, এবার বিয়ে মেয়ে একটি পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিয়ে তো আর এমনি হবে না। কিছু টাকা চাই। আর সেই টাকা সংগ্রহ করতে, পড়লো গিয়ে গণেশ পাঁড়ের খপ্পরে। গণেশ বুঝি তাকে নগদ একশ'টি টাকা দিয়ে লিখিয়ে নিলে তার সেই পাঁচ বিঘে দেবোত্তর জমি আর মাসের মধ্যে পাঁচদিন শ্যামচাঁদের পুজোর পালা।

ধীরেন কিন্তু টাকা নিয়ে সেই যে উধাও হলো, সেই থেকে আর গ্রামেও এলো না, বৌও আনলে না।

ধীরেন ভট্‌চাজের পাঁচ বিঘে জমি চণ্ডীর কাছ থেকে কেড়ে নিলে গণেশ পাঁড়ে। কেড়ে নিয়ে নিজেই চাষ করলে।

তারপর মাসের প্রথম তারিখে চৈতন এসে হাজির হলো চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ীতে।

কি ব্যাপার?

শ্যামচাঁদ আর রাধিকাকে নিয়ে যাবে।

পাঁচদিন বাড়ীতে রাখবে, পুজো করবে, ভোগ দেবে, তারপর আবার দু' দিনের দিন পৌঁছে দিয়ে যাবে চণ্ডীর বাড়ীতে।

ঠাকুর ছেড়ে দিতে হলো চণ্ডী ভট্‌চাজকে।

চৈতন এক হাতে নিলে শ্যামচাঁদকে আর এক হাতে নিলে রাধিকাকে। নিয়ে চলে গেল নিজেদের বাড়ীতে।

চৈতনের কব্জির জোর আছে বলতে হবে। নইলে ওই দুটো ভারি ঠাকুর—একটি পাথরের আর একটি অষ্টধাতুর—দু' হাতে দুটিকে নিয়ে যাওয়া যে সহজ কথা নয়।

চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ী থেকে গণেশ পাঁড়ের বাড়ী—এ পাড়া ও পাড়া অনেকখানি পথ।

ঠাকুর নিয়ে গিয়ে কেমন করে কি যে করে, কি মন্ত্র বলে পুজো করে কেমন করে ভোগ দেয় তারাই জানে। তারপর দু' দিনের দিন চৈতন যেমন করে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে আবার ঠাকুর দুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ীতে।

দু' মাস সেবা চালাবার পর তৃতীয় মাস থেকে নিয়মটা গেল বদলে।

চৈতন নাকি গণেশ পাঁড়েকে বলেছে—ছোট-ঠাকুরটা তত ভারি নয় বাবা, কিন্তু রাধিকাটা দশ বারো সেরের কম নয়। ওকে আমি এক হাত দিয়ে আনতেও পারবো না—দিয়েও আসতে পারবো না।

গণেশ বলেছে, দু' বারে আনবি।

তার চেয়ে তুমিও চল না বাবা, দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসবো।

চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ী যেতে হলে নবীনদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যেতে হয়। গণেশ পাঁড়ে রাখী হয় নি। বলেছে, আমি জানবো কি রে ব্যাটা? রাস্তার রাস্তায় ঠাকুর বয়ে আনবো কি রে ব্যাটা? তার চেয়ে এক কাজ কর। রাধিকাটাঁদকে বল দিয়ে শুধু কেষ্টকে নিয়ে আসবি। বলবি—যেয়ে ঠাকুরের পুজো আমরা করি না। আমরা জাত-কহুজ্যে।

সেইদিন থেকে রাধিকাকে ফেলে রেখে শুধু শ্যামচাঁদকেই নিয়ে যায় চৈতন।

তারপর কি হয়েছে শোনো—

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, আজ মাসের ছ' তারিখ। এখনও শ্যামচাঁদকে দিয়ে গেল না। মানুষার অন্তে তখনায় চৈতন গেছে উকিলের বাড়ী। গণেশ নাকি তার ছোট ছেলে ভাঁটুয়াকে বলেছে, তুই দিয়ে আয়। কিন্তু ভাঁটুয়ার মা তাকে বারণ করেছে। বলেছে, না বাবা, তুই ছেলেমানুষ, ঠাকুর নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়িস যদি তো ঠাকুরও যাবে তুইও যাবি।

—এখন কি করবো তাই বল।

নবীন বললে, নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।

চণ্ডী বললে, একা পেয়ে গণেশ যদি আমাকে আক্রমণ করে? ঘট্ করে যদি মেরে বসে?

কেন, শুধু-শুধু মারবে কেন?

চণ্ডী বললে, আমি যে তোমার তরফের লোক।

নবীন বললে, তাহ'লে থাক্ শ্যামচাঁদ ওরই বাড়ীতে। ঠাকুর-দেবতার ওপর তোমাদের ভক্তিও যত, পুজোও তত। শ্যামচাঁদের কপাল। কি আর করবে বল।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, না না—কি করবো তাই বলে যাও।

করবে আবার কি! বাড়ীতে যেমন পুকুর থাকে, তেমনি তোমার বাড়ীতে থাকবে রাধারাণী আর গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে থাকবে শ্যামচাঁদ। আসল ব্যাপারটা তো ঠাকুর নয়, জমির ফসল। সেটা যখন ঠিকই পাচ্ছ, তখন আর ভাববার কি আছে?

চণ্ডী বললে, নাঃ, তুমি দেখছি কিছুই বলবে না।

এই বলে সে উঠতে যাচ্ছিল, নবীন বললে, আমার কথা যদি রাখো তো বলি।

হ্যাঁ রাখবো। তুমি বল।

নবীন বললে, শ্যামচাঁদের বারো মাসের সেবা তো তুমিই চালাচ্ছিলে। এখনও চৈতন যদি ঠাকুর চাইতে আসে তো দিও না।

চণ্ডী বললে, পাঁচ বিঘে জমির ধান মেরে আর পুজো চালাবে না?

ও রকম পুজো নাই-বা চালালো!

গণেশের পাঁচবিঘের পুজো আমি চালাব?

চালালে ক্ষতি কি?

কিছুতেই না। ও যাবে জমির ফসল, আর আমি চালাবো ঠাকুর সেবার পালা? কখ্‌খনো না। কিছুতেই না।

নবীন বললে, তাহ'লে আর আমার কাছে এসে কেন?

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, তুমি যে গণেশ পাঁড়ের ভয়ে অস্থির হয়ে আছো তা কেমন করে জানবো?

পাঁচ বিঘে জমির ফসল আদি ওকে অমনি খেতে দেবো ভেবেছ? কিছুতেই না। আমি ওকে পুষে করার তবে ছাড়বো।

বলতে বলতে চণ্ডী ভট্চাজ চলে গেল সেখান থেকে।

নবীন তার চলে-যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। হায় রে ভাগ্যচাঁদ, তোমার অদৃষ্টে এও ছিল!

নবীনের নামে অনেকগুলো পাল্টা মামলা রুজু করেছিল গণেশ পাঁড়ে।

কিন্তু প্রমাণ অভাবে কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টিকলো না।

গণেশ পাঁড়ে বলেই রেখেছিল—হুজুর, জমিদার ঘোর অত্যাচারী। তার ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না।

কিন্তু নেপাল মুচির মামলাটা গণেশ পাঁড়ে কিছুতেই সামলাতে পারলে না।

খুব ভাল একজন উকিল দিলে। টাকা পয়সা খরচ করলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একমাস জেল হয়ে গেল। আর চৈতনের হলো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সেই জরিমানার টাকা নেপাল পাবে।

কিন্তু টাকা পাবার আগেই নেপাল মারা গেল।

ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নেপালের বৌ এসে দাঁড়ালো নবীনের কাছে। মুখে কোনও


দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

* জাতীয় উৎসব *

এই দিনে আমাদের সঙ্কল্প ঃ

* জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব

* সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করব

* সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব

* জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কথা নেই। দু'চোখ বেয়ে শুধু জলের ধারা টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার গায়ের ওপর।

নবীন বললে, জানি সে মরবে। কিন্তু আর দুদিন পরে মরলেই ভাল হতো। গণেশ পাঁড়ের শাস্তিটা দেখে যেতে পারতো।

সারা গ্রামের আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। সবাই বলতে লাগলো, নবীনের বাহাদুরী আছে।

সজনী ময়রার দোকানের মজলিসটা সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলতে লাগলো।

বেচু তার উনোনের কাছটিতে বসে বেগুনী ভাজতে ভাজতে বললে, মাসখানেক নিশ্চিন্তি মনে কাজকর্ম করা যাবে।

চণ্ডী ভট্চাজ এলো নবীনের কাছে। বললে, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথাই সত্যি হলো নবীন। জামচাঁদকে আর গণেশের বাড়ী পাঠাব না। কয়েদ-খাটা মানুষের হাতে জামচাঁদের পুজো চলতেই পারে না।

সবাই আসতে লাগলো নবীনের কাছে। কেনারাম এলো। রাঘবহরি এলো। হরেকেষ্ট এ মেয়াদটা খুব কম হলো। বছরখানেক হলেই ভাল হতো।

কাশী হাজরা সেদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে দুটো উড়ো জাহাজ আবিষ্কার করে ফেললে।

কেনারাম বললে, সবই তো হলো বাবা, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, গুলিখেকো বাঘ—জেল থেকে ফিরে এসে গণেশ কী কাণ্ড যে করে বসবে কে জানে।

হিজুল নদীর ধারে জমিদারের খানিকটা দো-ফসলের জমি ছিল। শশী ঘোড়ুই সেই জমিতে একবার আলু-পেঁয়াজের চাষ করেছিল। কিন্তু আলু পেঁয়াজগুলি বড় হবার আগেই সারা মাঠের ফসল উপ্ড়ে তুলে ফেলে দিয়েছিল দুষ্টু লোকে।

তখন থেকে শশী ঘোড়ুইয়ের আফ্শোষের আর অবধি ছিল না। চাষার ছেলে, চাষ করতে না পারার যে কি কষ্ট তা সে জানে। রাত্রে তার ভাল ঘুম হতো না।

শশী তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাঁকুড়া জেলার মহানন্দপুর গ্রামে গিয়েছিল তার শ্বশুর বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে দেখলে—চাষীর ঘরে লক্ষ্মী যেন বাঁধা। তিনখানা লাঙলের চাষ। চার-পাঁচটা ধানের মরাই বাঁধা রয়েছে উঠোনে। চার জোড়া চাষের বলদ। তিন-তিনটে গাই দুধ দিচ্ছে দুবেলা। অভাব বলতে কোথাও কিছু নেই। দু'জন শালা। তাদের স্বাস্থ্যসুন্দর চেহারা দেখলে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকতে হয়।

শশীর মাথাটা যেন খারাপ হয়ে। বৌকে বললে, ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি কিছুদিন থাকো ভাইএর বাড়ীতে। আমি আর একবার দেখি চেষ্টা করে।

বৌ বললে, তোমাদের গাঁ একেবারে অহল্যাময় গেছে। ওখানে কিচ্ছু হবে না। খেটেই মরবে শুধু।

মরি মরবো। তবু আমি একবার চেষ্টা করতে ছাড়বো না।

এই বলে শশী তার মেয়েছেলেকে শালার বাড়ীতে রেখে গ্রামে ফিরে এসেছে।

আবার সে চাষ করবে। সীতাপতিবাবুর কাছে গিয়ে বললে, আবার একবার জমিটা দিন বড়বাবু। আমি আবার একবার লাগবো।

সীতাপতিবাবু হাসলেন। বললেন, দিতে তো আমি সব সময়েই রাজী। কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নয় বড়বাবু, এবার আর আলু-পেঁয়াজ বেচো না। এবার লাগাবো কচু।

সীতাপতিবাবু একটু ভেবে বললেন, তা মন্দ নয়। কচু ছাগলে গরুতে খায় না। কিন্তু আমার ভয় শুধু মানুষকে।

শশী বললে, সে মানুষটা তো জেলে চলে গেছে।

সে আর ক'দিন! পাঁচ দশ দিন পরেই তো ফিরে আসবে।

তা হোক্ বড়বাবু।

সীতাপতিবাবু বললেন, তাহ'লে আমিও খানিকটা কচুর চাষ করি। চল্ জমিটা মেপে আসি।

শশীর আনন্দ যেন আর ধরে না!

তাহ'লে আর কেউ কথাটি বলতে পারবে না হুজুর। মেয়েছেলে তো রেখে এসেছি শ্বশুর বাড়ীতে। আমি একটা কুঁড়ে বেঁধে ওইখানেই বাস করবো। দেখি কেমন করে কে আমাদের ফসল নষ্ট করে!

কেনারাম বোষ্টম ঠিক কথাই বলেছিল।

শুলিখাওয়া বাঘ।

শুলিখাওয়া বাঘের মতই গণেশ ফিরে এলো যেন খেপে। বলতে লাগলো, আরও কিছুদিন যদি থাকতে পেতাম জেলে তো দেখতিস শরীরটা কিরকম বাগিয়ে নিয়ে আসতাম।

যতটুকু বাগিয়েছে তাতেই রক্ষা নেই। চৈতনকে বললে, পুরনো সেই তলোয়ারটা বের কর্। ইট্ দিয়ে ঘষে বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে রাখ্।

চৈতন জিজ্ঞাসা করলে, তলোয়ার কি করবে বাবা?

তলোয়ার দিয়ে কি করে জানিস না?

চৈতন বললে, কাকে কাটবে বাবা?

গণেশ বললে, নবীনকে। শত্রুকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভাল।

মনের আনন্দে চৈতন তার মাকে বলতে গিয়েছিল কথাটা।—সকাল সকাল আজ আমাদের খাইয়ে দিবি মা। আজ আমরা একটা কাজে বেরুবো।

চৈতনের মা বললে, হ্যাঁ তা দেবো বই-কি। যে গুড় কাজে যাচ্ছ তোমরা—

চৈতন আর কোনও কথা বললে না।

মা বললে, এ ছাড়া তোদের আর কি কোনও কাজ নেই রে হতভাগা? সবাই মিলে আনন্দ করে থাকতে কি তোরা জানিস না?

চৈতন বললে, আমাকে কি বলছো—বাবাকে বল।

বলবার মত মানুষ হলে বলতাম। তুই আমার পেটের ছেলে তাই তোকেই বলছি—এই সব কাজ করবার আগে তোরা আমাকে কেটে ফ্যাল্।

তোমাকে কেটে ফেললে আমাদের রান্না করবে কে?

খুব রসিকতা করেছে ভেবে ক্যা ক্যা করে হাসতে লাগলো চৈতন।

মায়ের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে।

হাবু রায়কে সঙ্গে নিয়ে নবীন গিয়েছিল শহরে। বিকেলের ট্রেণে ফেরবার কথা। বিকেলে এই একটিমাত্র ট্রেণ। শহর থেকে লোকজন সাধারণত ওই ট্রেণেই গ্রামে ফেরে।

হিজল নদীর পাড় ঘেঁষে শিমুল গাছের তলা দিয়ে গাঁয়ে চলার যে পথটা গেছে গ্রামের দিকে; রেল ষ্টেশন থেকে গ্রামে ফেরার ওই একটি মাত্র পথ।

পথের ধারে বাসক ঝোপের তলায় লাঠি, কুড়ুল আর একটা তলোয়ার লুকিয়ে এনে রেখেছিল চৈতন। লুকিয়ে রেখে একটা টিলার আড়ালে অপেক্ষা করছিল।

গণেশ এলো। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, ট্রেণটা চলে গেছে?

হ্যাঁ গেছে।

চল্ তাহ'লে ওই ঝোপটার কাছে গিয়েই বসি।

দুজনে ঝোপের কাছে এসে বসলো।

হেরোকে তুই তাড়া করবি তলোয়ার নিয়ে। আমি তখন ধরে নেবো নবুনেকে।

মহাতাপ দারোয়ানটা যদি সঙ্গে থাকে?

থাক্ না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অস্থির হয়ে উঠলো চৈতন। বললে, এ ট্রেণে বোধহয় এলো না। রাতের ট্রেণে ফিরবে।

গণেশ বললে, আরও ভাল।

চৈতন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, বোধহয় চাঁদ উঠছে। ওই ভাখো!

গণেশ বললে, তুই ভাখ। অমন চাঁদ আমি কত দেখেছি: চাঁদ সুদ্ধি দু'জনেই থাক্ না বাবা। বাঘে যেমন করে শিকার ধরে ঠিক তেমনি করে ধরব আমি নবুনেকে। ধরে নিয়ে গিয়ে ফেলবো হিজুলের বালিতে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটব। তুই ততক্ষণ একটা গর্ত খুঁড়বি। তারপর সেই গর্তে লাশটাকে ফেলে দিয়ে—

কথাটা শেষ হলো না গণেশের। চৈতন বললে, গর্ত খুঁড়তে হবে তা তো বললে না তখন! একটা কোদাল নিয়ে আসতে হতো যে বাড়ী থেকে।

গণেশ বললে, বালিতে গর্ত খুঁড়তে কোদাল লাগে না। হাত দিয়েই হয়।

না বাবা একটা মানুষ পুঁতবার মত গর্ত হাত দিয়ে হবে না।

গণেশ কি যেন দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। বললে, হবে না তো হবে না। তাখ দেখি—ওখানে কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চৈতন দেখলে। হিজুল নদীর উত্তর পাড়ে বো-জবির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সীতাপতিবাবু। পাশে দাঁড়িয়ে আছে শশী মোড়ল।

সীতাপতিবাবু বলছেন, বীজ যদি ভাল হয়, আর একটুখানি সার গোবর পড়ে মাটিতে, তাহ'লে আর দেখতে হবে না। গাছকে ঠিক মাথা তুলে উঠতেই হবে। ঝন্ ঝন্ করে ঠিক সাপের মত উঠবে। খুব তেজ হবে গাছের!

শশী বললে, তা যা বলেছেন বাবু।

সীতাপতিবাবু বললেন, আসল কথা কি জানিস? মাটিকে আদর যত্ন করতে হবে। ভালবাসতে হবে। ভাল না বাসলে কেউ কিছুই দেয় না শশী, ভাল না বাসলে কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

কথা বলতে বলতে হিজুলের পাড়ের ওপর দিয়ে সীতাপতিবাবু বোকরি বাড়ী ফিরছিলেন।

নদী তখনও একেবারে শুকিয়ে যায়নি। নদীর দু'দিকে বড় ছোট নানারকমের গাছের সারি ডালপালা বাড়িয়ে নদীর জলের ওপর যেন ঝুঁকে পড়েছে। মস্ত বড় একটা শিরিশ গাছে ফুল ফুটেছে বিস্তর।

দূরের একটা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে।

সীতাপতিবাবু সেইখানে দাঁড়ালেন। বললেন, নদীর এই আরসাটায় জল বাঁধতে হবে শশী। আর এ শিরিশগাছের তলায় চুয়ো খুঁড়ে একটা টেঁড়া বসিয়ে দিলেই জল উঠবে মাঠে।

Telegram : WOOLTOP Telephones : 23-6776 (3 Lines)

*Puja Greetings to all*

**BHARAT WOOLLEN MILLS LTD.**

*WORSTED SPINNERS AND MANUFACTURERS.*

11, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1

Proprietors of J. J. R. INDUSTRIES, Dulhipur-Moghalsarai.

শশী বললে, সে সব আমি ঠিক করে নেবো।

এমন সময় পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো গণেশ আর চৈতন। সীতাপতিবাবু দাঁড়িয়েছিলেন পেছন ফিরে। গণেশ তাঁরই ওপর চালালে তার হাতের লাঠি।

উঃ। সীতাপতিবাবু হাতদুটো তুলে লাঠিটা আটকাবার চেষ্টা করলেন।

শশী ঝাঁপিয়ে পড়লো গণেশের ওপর।

চৈতন চালিয়ে দিলে সীতাপতিবাবুর হাতের ওপর আর এক লাঠি।

'ঈ—স্' বলে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন।

শশী তখন প্রাণপণে চীৎকার সুরু করেছে—মেরে ফেললে আমাদের! কে আছিস—ছুটে আয়!

বাবা ও ছেলে দু' জনেই তখন শশীকে নিয়ে পড়লো।

মার্ ব্যাটা চাষাকেই আগে মার্!

গণেশ তার মুখখানা চেপে ধরলে। চৈতন তখন ঝোপের ধার দিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসছে।

আর-একটু হলেই শশীকে বোধহয় তারা কায়দা মেরে দিলে।

ভয় নেই। যাচ্ছি—যাচ্ছি।

সেখান থেকে ভিন্ন গ্রামের কয়েকজন লোক সেই পথ দিয়েই আসছিল। তারা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো।

ঘটনাস্থলে তারা যখন এসে পৌঁছোলো, দেখলে সীতাপতিবাবুর হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। আর শশী শুয়ে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে তার পায়ের যন্ত্রণায়। পায়ের ওপর দেখা গেল একটা চোটের দাগ। চৈতন তলোয়ার চালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। গণেশকে তার ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

নবীন বাড়ী ফিরে এলো রাত্রে।

এমন যে হবে তা সে ভাবতেও পারেনি। বাপ শুয়ে আছে বিছানায়। শশীকেও তাদেরই বাড়ীতে আনা হয়েছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছে।

শশীর মুখে সবই শুনলো নবীন।

সীতাপতিবাবু বেশি কিছু বললেন না। শুধু নবীনের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন, এইখানেই সব শেষ হোক্!

নবীন বললে, কেন? গণেশের ভয়ে?

না। হিংসার শেষ নেই। এ আগুন জ্বালিয়ো না। এইখানেই নিবিয়ে দাও।

নবীন কোনও জবাব দিলে না। ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। দোতলায় ঘরে তার বন্দুকটা ছিল। পাখি-করা দোনলা বন্দুক।

কয়েকটা বুলেট ভরা কার্টিজ নিলে তার পকেটে আর বন্দুকটা নিলে হাতে। তারপর সে বেরিয়ে যাচ্ছিল বন্দুক হাতে নিয়ে।

সীতাপতিবাবু ডাকলেন, নবীন!

নবীন ফিরে দাঁড়ালো।

সীতাপতিবাবু বললেন, শোনো। এদিকে এসো।

নবীন তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় যাচ্ছ?

আজ আমি গণেশ আর চৈতন—দু'জনকেই শেষ করে রেখে।

সীতাপতিবাবু বললেন, না।

মার খেয়ে চুপ করে থাকবো? তুমি কী বোধ করেছ? বিনা দোষে সে তোমার গায়ে হাত তুললো কেন?

সে বোধ তাদের নেই।

এর জন্য তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

সে শাস্তির ভার নিজের হাতে তুলে নিও না। ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও।

নবীন বললে, সে বিশ্বাস আমার নেই। অতখানি মহত্বও আমার নেই।

সীতাপতিবাবুর বাঁ হাতটি ব্যাণ্ডেজ করে গলার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ডান হাত দিয়ে নবীনের হাতখানা তিনি চেপে ধরলেন।

আমি বলছি বন্দুক নিয়ে তাদের মারতে তুমি যেয়ো না। আমার কথা শোনো।

নবীন বললে, বেশ তাহ'লে আমি যাচ্ছি পুলিশ-সাহেবের কাছে। এর ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

আজ রাত্রেই যাবে?

হ্যাঁ আজ রাত্রেই যাব। প্রথমে যাব থানায়। তারপর যাব পুলিশ-সাহেবের কাছে।

আমি বলছি—না গেলেই ভাল হয়।

না বাবা আমাকে যেতেই হবে।

নবীন চলে গেল। সঙ্গে গেল মহতাপ্।

পরের দিন গ্রাম একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। মোটর বাইকে চড়ে পুলিশ-সাহেব নিজে ওদিক থেকে দারোগা এলো। চারজন কনেষ্টবল এলো।

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নতুন এসেছেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। তাঁরা তাঁরা হিন্দীতে কথা বলতে পারেন। সীতাপতিবাবুর কাছে এসে বসলেন তিনি। সব কথা শুনলেন একটি একটি করে। শশী ঘোড়লকে দেখলেন। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তিনিও যা বলবার বললেন।

সীতাপতিবাবুর কাছারিতে বসেই তিনি ডেকে পাঠালেন গণেশ পাড়েকে আর তার ছেলে চৈতনকে। কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু নিজে গিয়েছিলেন তাদের ধরে আনতে।

কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু ফিরে এলেন হতাশ হয়ে। গণেশকেও পাওয়া গেল না। চৈতনকেও না। দু'জনেই পালিয়েছে বাড়ী থেকে।

দারোগাবাবুর ওপর মামলা দায়ের করবার ভার দিয়ে পুলিশ-সাহেব চলে গেলেন।

গ্রামের সবাই বলাবলি করতে লাগলো—এবার আর রাঘবনের নিস্তার নেই।

পুলিশ-চালানী কেস সুরু হলো আদালতে। সমন বেরুলো গণেশ পাঁড়ে আর চৈতন পাঁড়ের।

হুলিয়া বেরুবার আগেই তারা আদালতে গিয়ে 'সারেণ্ডার' করলে।

দিনের পর দিন পড়তে লাগলো।

সারা গ্রামের আবহাওয়া কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আগে ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হতো। আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়ো জাহাজের সন্ধান করতো। আজকাল আলোচনা চলে গণেশ পাঁড়ে আর সীতাপতিবাবুর মামলা নিয়ে।

মামলা করেছে পুলিশ। আসামী গণেশ পাঁড়ে আর চৈতন পাঁড়ে। প্রধান সাক্ষী সীতাপতিবাবু আর পশী মোড়ল। আরও অনেক সাক্ষী আছে। মামলার দিন সাক্ষীরা খরচ পায়। দিন করে টাকা আদায় করতে হয়।

দশদিন জেল-হাজতে থাকবার পর জামিনে খালাস পেয়েছে গণেশ আর চৈতন। যা দিন আদালতে হাজির হতে হয়। উকিল দিতে হয়।

নবীন সেদিন সকালে তার বাড়ীর সুমুখে রকের ওপর বসেছিল চুপটি করে। হাতে একটা বেতের ছড়ি। আজকাল এই ছড়িটা সবসময়েই তার হাতে থাকে। কথা সে আজকাল খুব কম বলে।

চণ্ডী ভট্‌চাজ তার সেই বিচিত্র পোষাকে এসে দাঁড়ালো তার সুমুখে।

বলি কি ভাবছো নবীন?

নবীন মুখ তুলে তাকালে তার দিকে।

ভট্‌চাজ বললে, ভাববার কিছু নেই। ওদিকে রাঘবনের ছেলেরা ভে

সে আবার কি?

ভট্‌চাজ বললে, শ্যামচাঁদ আমাদের জাগ্রত দেবতা। ডাকলে সাড়া দেয়। গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে সে থাকবে কেন? আমার ঠাকুর আবার আমার কাছেই চলে এলো।

নবীন বললে, সে তো আমিই তোমাকে আনতে বলেছিলাম।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, তুমি তো বলেছিলে—শ্যামচাঁদের পুজো করবো আমি আর গণেশ পাঁড়ে পাঁচ বিঘে জমির ফসল নেবে অমনি ফোকোটিয়া। আমি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে না বাবা। জমি ভোগ করতে হলে পুজো তোমাকে করতেই হবে। তারপর তো ব্যাটার জেল হয়ে গেল। তখন থেকে শ্যামচাঁদকে আর পাঠাইনি। আচ্ছা তুমিই বল—পাঠানো কি উচিত? জেলখানায় ছত্রিশ জাতের হাতে ভাত খেয়ে আর জাতজন্ম থাকে কিছু? আমাকেই পুজো করতে হচ্ছিল। পুজো করবার সময় রোজই বলতাম শ্যামচাঁদকে—তোমার জমি খাচ্ছে গণেশ পাঁড়ে আর পুজো করছি আমি—এটা কি ভাল হচ্ছে? বাস্, শ্যামচাঁদ ব্যবস্থা করে দিলে। গণেশ পাঁড়ে এলো আমার কাছে। এসে বললে, শ্যামচাঁদের জমি তুমি ফিরে নাও ভট্‌চাজ। যাঁকে আমি যে টাকা দিয়েছিলাম সেই টাকাটা আমাকে ফিরে দাও। একশ' টাকা দিলাম। দিয়ে শ্যামচাঁদের জমি আবার লিখিয়ে নিলাম। আমার জমি আবার আমার কাছেই ফিরে এলো।

নবীন বললে, ওর এখন খুব টাকার দরকার। মামলার খরচ তো কম নয়।

চণ্ডী ভট্‌চাজ অত-সব জানে না। মামলা-মোকর্দ্দমা কোনোদিন করেওনি। তার খরচ কত পড়ে তা সে জানেও না। সে তার নিজের শরীর নিয়েই ব্যস্ত। আজ দাঁতের ব্যথা, কাল গালে বেদনা।

কিন্তু তবে যে শুনলাম, তোমরা খরচ পাও!

নবীন বললে, সে-সব তুমি বুঝবে না।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো চণ্ডী ভট্‌চাজের। বললে, আমি বুঝি না? আমি সব বুঝি। এই ছাখো না—গণেশকে একশ' টাকা দিলাম তো। টাকাটি মুঠে বেঁধে গণেশ বললে, আমাকে আবার মদনপুরের বাবুদের বাড়ীতে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? সে বললে—কিছু টাকা পাব সেখানে। জমি-জমা সব বেঁচে দিয়ে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। সে কথা কেন বললে আমি কি আর বুঝতে পারিনি ভেবেছ? আমি সব বুঝতে পারি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কী বুঝতে পার?

গণেশ গাঁ ছেড়ে চলে যাব বলছে ওর বৌএর জন্যে।

নবীন একটু অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

বৌএর জন্যে? মানে—চৈতনের মায়ের জন্যে?

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, হাঁ। আমি সেদিন নিজের চোখে দেখে এলাম যে। এই জমি বেচেছির ব্যাপারে দুদিন যেতে হয়েছিল তো ওর বাড়ীতে। একদিন গিয়ে দেখলাম ওর বৌএর কপালটা ফুলে উঠেছে, দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে। ভাবলাম বুঝি গণেশ ওকে মেরেছে। তারপর শুনলাম—না মারেনি। গণেশের বৌ গণেশের সঙ্গে ঝগড়া করে বুড়ো শিবতলার সেই পাথরটায় মাথা ঠুকেছে। বলছে, যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকে চলে যাব আমি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এই কথা বলছে ওর বৌ? তুমি শুনে এলে?

শুনলাম না! টুপিতে কানদুটো ঢাকা ছিল, শোনবার জন্যে টুপিটা খুলে ফেললাম তো! তবে আমাকে দেখে আর কিছু বললে না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি সব। এই ধরো না। তুমি যেরকম ওর পেছনে লেগেছ, গণেশের আর চৈতনের জেল হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। তখন? ওর বৌ তো একা থাকবে ওই বাড়ীতে। তুমি যদি তখন ওর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে ওকে পুড়িয়ে মেরে দাও? সেইজন্যে বলছে—চলে যাবে এ গাঁ ছেড়ে।

নবীন আর কোনও কথা বললে না।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, ন্যায়চাঁদ আমাদের খুব জাগ্রত দেবতা। তুমি দেখে নিও, ন্যায়চাঁদ ওকে ঠিক জেলে পাঠিয়ে দেবে। তুমি যখন ওই অত বড় একটা সায়েবকে ডেকে আনতে পেরেছ, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি—ন্যায়চাঁদ রেগেছে গণেশ পাঁড়ের ওপর। ওর আর রক্ষা নেই।

এই বলে সে উঠলো।

যাই। আমাকে আবার চান করতে হবে। ঠাকুর-ন্যায়তা খাওয়া কি কম জ্বালা ভেবেছ? সকালে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাবার জো নেই। তার ওপর চান না করলে পুজো করা চলবে না। তা সে তোমার দাঁতের ব্যথাই হোক্ আর গালই ফুলুক।

চণ্ডী ভট্‌চাজ এই সব কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিল খানিকটা। আবার কি কথা মনে পড়তেই ফিরে এলো।

আচ্ছা নবীন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। যেরকম গম্ভীর হয়ে থাকো আজকাল, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে। সাহেবকে দেখবার জন্যে আমি এসেছিলাম সেদিন। সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিল কেন বে?

নবীন বললে, আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—কে এ লোকটি?

ভট্‌চাজ বললে, কি বললে তুমি?

বললাম, আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক।

বললে না কেন—আমাদের সারা গ্রামের 'প্রিষ্ট'—মানে ধর্মগুরু।

ঠোঁটটা চেপে একটু হাসলো নবীন। বললে, বলতে ভুলে গেলাম। এবার যেদিন আসবে সেইদিন বলে দেবো।

হ্যাঁ বোলো। বলবে, হি ডজ্ পুজো অভ্ হিজ্ হাউস্-গড্ শ্যামচাড্ মর্নিং এণ্ড ইভ্‌নিং। পুজোর ইংরেজি কি?

নবীন বললে, ওয়ারশিপ্।

চণ্ডী ভট্‌চাজ গ্রামের মাইনর স্কুলের ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। তার ধারণা ইংরেজি সে বেশ ভালই জানে। বললে, যাঃ, ওয়ার মানে তো যুদ্ধ, আর শিপ্ মানে জাহাজ। ওয়ারশিপ মানে তো যুদ্ধজাহাজ। আমাকে ভুল ইংরেজি শিখিয়ে দিচ্ছ? কাজ নেই বাবা, আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিও। আমি নিজেই বলবো।

এই বলে সে চলে গেল।

চণ্ডী যেতে না যেতেই এসে দাঁড়ালো কেনারাম মুখুজ্যে। আজকাল অনেকেই একবার করে আসে নবীনের কাছে।

সাপ মারতে গিয়ে শিবের গায়ে লাঠি চালানো! তা ভালোই তুমি ছিলে বাবা, তাই ব্যাটা জব্দ হয়ে গেল। আজকাল আর ট্যাঁ-ফোঁ করছে না গরেশ পাঁড়ে। একঘর ঠাণ্ডা।

নবীন কোনও কথা বললে না।

কেনারাম কি বলবে কিছু বুঝতে পারছিল না। চোখ দুটি মিটু মিটু করতে করতে বললে, গাঁয়ের এত উপকার যখন করছো, তখন আর একটি উপকার তোমাকে করতে হবে বাবাজি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কী করতে হবে?

কেনারাম বললে, এই যে বসন্তর টিকে দিতে আসছে রোজ ওরোজ, বলছে—ছেলেবুড়ো সবাইকে টিকে নিতে হবে। যত বলছি—ভাখো আমরা বাংলাটিকে নিয়েছি একবার ছেলেবেলায়, আর নিতে হবে না। কিছুতেই শোনে না। বলছে—প্রতিবছর নিতে হবে। ছেলেমেয়েগুলোর কিরকম খাস্তি বল দেখি? ঘরের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে, বেরুতে পারছে না। কিরকম জুলুম বল তো? এইটি তুমি বন্ধ করে দাও বাবাজি।

নবীন বললে, বন্ধ করবো কী বলছো? আমিই তো লেখালেখি করে আনিয়েছি ওদের।

তুমি আনিয়েছ?

হ্যাঁ, ওরা দু'জন তো আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে। সমস্ত গ্রামের লোককে টিকে দিয়ে তারপর যাবে।

সবাইকে নিতে হবে টিকে ?

নিশ্চয় নিতে হবে। গত বছর কি হয়েছিল মনে নেই ? আমাদের গ্রামে মরেছে পঁচিশ জন। পিয়ারডুবিতে মরেছে তেরো জন, বিনু গয়লানী তো অন্ধ হয়ে গেল। এগুলো মনে থাকে না কেন ?

কেনারাম বললে, টিকে নিলে আর হবে না ?

না।

কিন্তু টিকেগুলো কি দিয়ে তৈরি হয় জানো তা ? গরুর গায়ে বসন্ত থেকে তৈরি ওই টিকে, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ—আমাদের রক্তে মেশাতে হবে ?

নবীন বললে, ও সব ভাবছো কেন ?

কেনারাম বললে, ইংরেজ রাজা হয়েছে বলে কি—তুমি বুঝছো না নবীন, এমনি চালাকি করে ওরা আমাদের জাত মেরে দেবে। সব খিরিস্তান করে নেবার মতলব।

নবীনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না কেনারামের সঙ্গে। এমনি সব। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ এমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেনারামের এ থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতেই হবে। ইস্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাই তার এত আগ্রহ চেষ্টা।

নবীন বললে, তুমি টিকে যদি না নিতে চাও নিও না। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে দেবো আমি নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রত্যেককে টিকে দেওয়াবো।

কেনারাম বললে, অমন কাজটি কোরো না বাবাজি, তোমার এই বিপদের সময় সব সাক্ষী বিগড়ে যাবে।

নবীন বললে, তাই। সে আমার সহ্য হবে, কিন্তু বসন্ত কলেরা মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে—সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না।

কেনারাম বললে, তোমরা দেখছি—ঠাকুরদেবতাতেও বিশ্বাস করছো না আজকাল। শেতলার পুজোটি কর যেমি ভাল করে—টিকে কিকে কিছু নিতে হবে না—এই আমি বলে রাখছি দেখো।

নবীন বললে, শীতলার পুজো করতে হলে চাঁদা দিতে হবে, কিন্তু টিকে নিতে হলে কিছু দিতে হবে না।

কেনারাম বললে, দেবো চাঁদা।

বৈশাখ মাস।

বৈশাখ মাসকে গ্রামের লোকেরা বলে—ব্রাহ্মণ মাস।

গ্রামের ছেলে ছোকরার দল খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। নেচে গেয়ে গ্রামটাকে একেবারে মাতিয়ে তোলে।

অঘোর ঘোষালের বাড়ীর ভেতর ঢুকলেই দেখা যায়—তার ঘরের দেয়ালে পেরেকের গায়ে টাঙানো একটি খোল ঝুলছে। রঙিন একটি কাপড় সেলাই করে তার একটি জামা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সারা বছরের পর এই সময় ধুলো ঝেড়ে খোলটিকে বাহারো হয়।

কিন্তু সে বছর আর নামানো হলো না।

মহু বৈষ্ণবী শিখেছিল তাকে সংকীর্তনের কথা বলতে।

অঘোর বলে, আমি তাঁতির ছেলে, বিছানার চাদর আর গামছার মোট নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে আসতাম। চৈতন একদিন লাঠি দেখিয়ে তিনটে গামছা নিলে কেড়ে। সেইদিন থেকে হাট-বিবেতে কোথাও যাওয়া-আসা বন্ধ করেছি ভাই।

খঞ্জনীদার রাধু বোরেগী বলে, না দাদা, পথেঘাটের দোর দিয়ে যাব না।

বেনোয়ারী ওস্তাদ মাসাধিক কাল তার মাসীর বাড়ী গিয়ে বসে আছে। গ্রামের লোক জানে সে যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাড়ে-পাড়ায় পাশে—ঘরতে গেলে পথেঘাট পাড়ের একেবারে দোরের কাছে—প্রকাণ্ড একটি পুরনো অশথ গাছের নীচে বুড়ো শিবের আস্তানা। সবাই বলে পাথরের এই শিবঠাকুরটিকে কেউ কোনোদিন প্রতিষ্ঠা করেনি। মন্দিরের কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। প্রকাণ্ড এই শিবলিঙ্গটি পাতাল থেকে মাটি ভেদ করে আপনা থেকেই ওই জায়গায় উঠেছে—এইটিই নাকি জনপ্রবাদ। আপাততঃ ফণী-মনসার দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মধ্যখানে তিনি নিরাপদে বিরাজ করছেন।

বৈশাখের শেষ দিনে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আগে স্নান করে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকেই এক ঘটি করে জল এই বুড়োশিবের মাথায় ঢালতে হয়। আবহমানকাল ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। বুড়ো বাবার মাথায় জল ঢেলে তাকে ঠাণ্ডা না করলে সে বৎসর নাকি বর্ষা ভাল হয় না, মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।—

বৈশাখের সংক্রান্তির আর মাত্র চার-পাঁচ দিন বাকি। এপাড়া ওপাড়া থেকে লোকজন আসতে লাগলো নবীনের কাছে।

এ বছর কি হবে বল তো? পথেঘাট পাড়ের দোরের সামনেই বুড়ো শিবের আস্তানা। ব্যাটা তো আগা কুকুর হয়ে আছে। হাতের কাছে আমাদের পেলে যদি হাঙ্গামা করে। তাই এলাম তোমার কাছে একটা পরামর্শ করতে।

নবীন বললে, আমি কি বলবো?

হাতে একটি জলের ঘটি নিয়ে যেতে যে ভয় করছে।

নবীন বললে, যেয়ো না।

যদি বৃষ্টি না নামে! যদি দুর্ভিক্ষ হয়!

নবীন বললে, হয়—হবে।

আর দুপুটি এসেছিল নবীনকে জিজ্ঞাসা করতে। তার এই জবাব শুনে বললে, তোমার কি বাবা, টাকা পয়সা আছে, ধান-চালের বস্তা রয়েছে বাড়ীতে বাঁধা। একবছর কেন, দশ বছর যদি অনাবৃষ্টি হয় তোমার কোনও ক্ষতি নেই। মরতে মরবো আমরা। তার চেয়ে আমি বলি কি—গাঁয়ে একটি চোল সহরৎ করে দাও, তিরিশ চল্লিশ জন করে এক এক দলে যাই আমরা—বাবার মাথায় জল দিয়ে আসি। একসঙ্গে অনেকগুলো লোক দেখলে হাঙ্গামা করতে সাহস পাবে না।

কে একজন বললে, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে হাঙ্গামা তো করবে না। ওর ছেলেটা তাড়ি খাচ্ছাত। সেই চড়বা হয়ত আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ে দেবে মাথায়।

ঠিক এই সময় হাবু রায় এসে দাঁড়ালো সেইখানে। তার হাতে একটি মস্ত বড় কাগজ। বললে, আমি তার ব্যবস্থা করেছি।

কি ব্যবস্থা করেছ ?

হাবু বললে, এস্-ডি-ও র নামে একটি দরখাস্ত লিখে এনেছি। এ সই চাই।

কি দরখাস্ত লিখেছ শুনি।

হাবু পড়ে শোনালো—

মহামান্য এস-ডি-ও মহোদয়, সমুদয়েষু –

আগামী বৈশাখের সংক্রান্তির দিন আমাদের গ্রামে একটি চিরাচরিত প্রথা আছে। প্রথা না বলিয়া ইহাকে উৎসব বলিলেও চলে। এই উৎসবটি আমাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুষ্ঠিত। গণেশ পাঁড়ে ও তাহার পুত্র চৈতন—যাহাদের নামে আদালতে মামলা চলিতেছে—তাহারা আমাদের এই ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাদেরই বাড়ীর সুমুখে আমাদের এই উৎসবের স্থান। ধুড়োশিবতলা। কাজেই এই অশান্তি উপদ্রবের আশঙ্কায় আমরা হুজুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—হুজুর উক্ত দিবসে যদি কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী দিয়া গ্রামের দরিদ্র প্রজামণ্ডলীকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। নিবেদন ইতি।—

নবীন প্রথমেই সই করে দিলে।

সই করতে কারও আর আপত্তি রইলো না। অনেকগুলি সই করিয়ে নিয়ে দরখাস্তটি হাবু রায় নিজে দিয়ে এলো এস-ডি-ও র কাছে।

এবং তার ফল হলো এই যে, সে বৎসর বৈশাখ-সংক্রান্তির এই ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানটি পাঁচজন কনেষ্টবলের সাহায্যধীনে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

খবর নিয়ে জানা গেল—গণেশ পাঁড়ে তিনদিন আগে টাকার সন্ধানে কোথায় যেন গেছে। এখনও বাড়ী ফেরেনি। তার ছেলে চৈতন তখন তাদের গোয়ালে বসে মনের আনন্দে গরুর জন্য ছানি কাটছিল।

বুড়ো শিবের মাথায় জল ঢালা হলো অনেক। কলি মনসার কাঁটা ঝোপের বাড়বাড়ন্ত হবে খুব। বাবার মাথা ঠাণ্ডা হলো, কিন্তু ধরিত্রীর মৃত্তিকার ঠাণ্ডা হবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

যে সময়ে বর্ষা নামলে চাষ-আবাদ ভাল হয় সে সময় বর্ষা নামলো না। আকাশে মেঘ উঠলো, কিন্তু বৃষ্টি হলো না।

বর্ষা নামলো নিতান্ত অসময়ে। মনে হলো যেন অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি রসিকতা করছে। মাঠের সবুজ ধানের গাছ তখন শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। সারা গ্রামের অকর্ম্মণ্য মানুষগুলো তখন বেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছে আর বলছে—এ-সব হলো শুধু গণেশ পাঁড়ের পাপে।

চাষ হলো না, ফসল হলো না, কিন্তু মামলাগুলো ঠিকই চলতে লাগলো।

গড়াতে গড়াতে বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এলো।

সামনে পুজো।

গণেশ পাঁড়েকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে ছোটোখাটো মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হলো এতদিন পরে।

গ্রামের তিনটি দুর্গা-প্রতিমার তখন মাটি পড়েছে।

সীতাপতিবাবুর হাতভাঙা মোকর্দ্দমাটার এজাহার জবানবন্দী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু'পাঁচ-দিনের ভেতর যাহোক্ একটা কিছু হুকুম হয়ে যাবে, এমন সময় গণেশ পাঁড়ে একটা ভারি মজার ব্যাপার করে বসলো।

হাতে টাকা নেই অথচ বড় ঘরের একজন উকিল দিতে না পারলে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। বড় আদালতে গণেশ এই বলে এক আর্জি পেশ করলে যে থানার পুলিশ-কনেষ্টবল থেকে আরম্ভ করে সাবডিভিজনের বিচারক পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে অপর্য্যাপ্ত ঘুষ খেয়েছে, কাজেই অন্যত্র বিচার না হলে তার পক্ষে সুবিচারের কোনও আশা-ভরসা নেই।

মোকর্দ্দমা দায়রা সোপরদ্দ হয়ে গেল।

দায়রাও তখন একটা ডাকাতি-মামলার বিচার চলছে। গণেশ পাঁড়ে কয়েকটা দিন সময় পেলে।

বিচারে কি হয় কিছু বলা যায় না। গণেশ আর চৈতনের জেল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বাপ আর ছেলে দু'জনেই যদি জেলে চলে যায়—চৈতনের মার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাওয়া দরকার।

ধীরেন ভট্টাচার্য্যের মরণ আমচাদের বেবসেবার পালা সমেত যে পাঁচ বিঘে জমি চণ্ডী ভট্টাচার্য্যকে গণেশ সেদিন নগদ একশ' টাকায় বিক্রি করেছে, সেই জমিটাই মদনপুরের তারিণী মুখুজ্যের কাছে গণেশ বিক্রি করে এলো চারশো টাকায়।

এখন আর অত-সব ভাবতে গেলে চলে না।

দায়রার ছুরির বিচার শেষ হয়ে গেল পুজোর ঠিক আগেই।

জমিদার সাধারণতঃ অত্যাচারী হয়ে থাকে। এ যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং সীতাপতিবাবুই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেমন করে? মামলাটি আগাগোড়া জমিদারের সাজানো। গ্রামের বিরাট প্রজা গণেশ পাঁড়ে এবং তার পুত্র চৈতন পাঁড়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সুতরাং ছুরির বিচারে গণেশ আর চৈতন দু'জনেই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

সেদিন আর তারা পায়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকলো না।

শহর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে নবীনদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে পেরিয়ে গেল।

নবীন হেডমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি হলো? পুলিশ-সাহেব নিজে দেখে গেলেন—

মাষ্টার বললে, সাহেব এসেই আমাকে বলেছিল—Anything political?

বলেছিলাম, না স্যার রাজনীতির ধারও ধারে না এরা। বৃটিশ থাকলো কি গেল কিছুই আসে যায় না এদের।

Then there must be wine.

না, স্যার, তাও না। মদ এদের দু'পক্ষের কেউ খায় না।

Then woman.

না স্যার, মেয়েমানুষের নামগন্ধও নেই এখানে।

আমার জবাব শুনে সাহেব খুশী হননি। বাঁকা একটু হেসে বলেছিলেন, মিস্টিরিয়াস্ ইণ্ডিয়া।

মাষ্টার বললে, আমি তখনই বুঝেছিলাম—ইতিহাস নতুন এসেছেন তিনি। এখনও ইতিহাসকে চিনতে পারেন নি।

পুজো এলো।

প্রতি বছর যেমন আসে সে বছরও ঠিক তেমনি এলো—ঢাকঢোল বাজিয়ে।

দেখা গেল হরি কোবরেজ বসে বসে কাঁদছে। লোকজন দেখলেই বলছে, সিঁদিমে-পুজো এ বছর আর হলো না দাদা। ঘট-পুজোই হোক্। পয়সাকড়ির খুব টানাটানি।

বঙ্কিমানন্দ বেশ আনন্দেই আছে। চোরাই গাঁজার কারবার তার ভালই চলছে। নেশায় বুঁদ হয়ে বলছে, ও-বেটির পুজো না করাই উচিত। ওর ওই স্বামী বেটাই হচ্ছে—বাবার বাবা ভক্ত বাবা!

কলিল চক্রবর্ত্তীর আমল আর নেই! কবি কেটে কেটে ঝাড়গুলোকে একেবারে নির্মূল করে ফেললে। হাতে একটি আর বগলে গোটাকতক বাঁশের ছড়ি নিয়ে দুর্গা প্রতিমার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আর বলে, এই কার্ত্তিক, এই গণেশ, ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল। ভাল করে পড়া তৈরি করবি। না পড়লেই কেলাযায় হয়ে যাবি। নেশা ভাং খাবি আর ঘোম্ ঘোম্ করে ঘুরে বেড়াবি।

সেবার কোন পুজো শেষ হয়ে গেল। এলো বিজয়া দশমি।

প্রতিমা বিসর্জ্জন কখন হয়ে গেছে এ বছর নবীন তার খোঁজও রাখেনি।

বিসর্জ্জনের পর গ্রামের লোক বাড়ী বাড়ী প্রণাম করতে বের হয়।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে তাল-তেঁতুলের ছোট একটি বাগানের ভেতর বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ একটি মন্দিরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তিণীকে জানাতে হয় প্রথম প্রণাম।

সেখানে যাবার জন্যই বোধকরি নবীন উঠলো। সিদ্ধির নেশায় মাথাটা তখন তার ঘুরছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছিল। দশমীর চাঁদ।

গ্রামের পথে গোকুল চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। রোগা কঙ্কালসার মানুষটি ঘুরের গ্রামে ছোট একটি পাঠশালা করে চালায়।

গোকুল বললে, এসো ভায়া, কোলাকুলি করি।

নবীন তার হাত দুটি বাড়িয়ে তার সেই শীর্ণ দেহটিকে সাগ্রহে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

বিজয়ার প্রণাম করে আর সুখ নেই ভায়া। মেঠাই-সন্দেশ খাওয়াতে হবে বলে দোরে সব খিল বন্ধ করে দিয়েছে। সতীশের কিছু নেই তবু দেখলাম সতীশের দোরটাই খোলা। হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, অন্য বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে এসে আমার বাড়ীতে শুধু জল খাবে। আমার কিছু নেই। বলেই সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। দেখলাম সতীশের চোখে জল। বুকটা কিন্তু জুড়িয়ে গেল ভাই। চলি এবার তোমাদের বাড়ীতে যাই।

গোকুল চলে গেল।

পথে আর কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কোথায় সে আনন্দকলরব মুখরিত গ্রাম? মনে হয় যেন প্রেতপুরী। ঘরে ঘরে খিল পড়েছে।

পথের দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। যেখানে-সেখানে কাঁটা-বনঝাঁর জো বাড়ীগুলো খাঁ খাঁ করছে।

ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্নার আলোয় মনেহলো সবেশ পাঁড়ের বাড়ী থেকে তারা যেন বেরিয়ে আসছে বলছে—ব্যাটার আছে কী যে খাওয়াবে!

দূর থেকে তাদের দু'জনকে চিনতে পেরে নবীন চমকে উঠলো। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। চারহরি আর হরেকেষ্ট।

নবীনকে যোধহয় তারা দেখতে পেয়েছিল। নইলে কামারদের গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো কেন?

নবীন ফিরলো। রাত্রীর নবিয়ে তার আর যাওয়া হলো না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। ইস্কুলের হেড-পণ্ডিতের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার কোন্ একটা গ্রামে। পূজোর ছুটিতে তিনি বাড়ী। ওঁরই সেই বয়বাদি খুলে নবীন ভেতরে গিয়ে বসলো।

খোলা জানলার পথে চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো এসেছে।

বাউরি পাড়ার মাদল বাজছে। হরি কোবরেজের বাড়ী থেকে হারমনিয়ম আওয়াজ আসছে।

কার্ত্তিক মাস পড়ে গেছে। আকাশ-প্রদীপ দেবার সময়। হিজি-বুড়ীর উঠোনে প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় ছোট্ট একটি আকাশ-প্রদীপ ঝুলছে।

নবীন সেই প্রদীপটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। হিমেল হাওয়ায় চোখ দুটো তার বন্ধ হয়ে আসছে।

মনে হলো প্রদীপটা যেন ধপ্ করে জ্বলে উঠলো।

সিন্ধির নেশার ঘোরে ভুল দেখছে কি না কে জানে।

আকাশ-প্রদীপের রঙিন কাগজের আবরণটা পুড়ে গেল। বাঁশের মাথাটাও জ্বলছে যেন!

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে নবীন।

সুমুখে বইএর আলমারি। আলমারির মাথার ওপর একটা গ্লোব।

এই গ্লোবটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের সে অনেকবার বুঝিয়েছে—ইওরোপ, আমেরিকা, এশিয়া—আর এই আমাদের ভারতবর্ষ!

তাদের এই ছোট্ট গ্রামখানি নবীন খুঁজতে লাগলো। গ্লোবটা যেন ঘুরছে। সমস্ত দেশ, মহাদেশ, গ্রাম, নগর—মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেল। সমস্ত সীমারেখা মুছে গেল। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা চলে গেল। সারা পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে গেল। এক জাতি। এক প্রাণ। সমাজ-ধর্ম-সভ্যতা বাঁধা পড়লো প্রেমের বাঁধনে। স্বর্গের সুষমা নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে।

নাঃ, সব ভুল। নবীনের নেশা হয়েছে প্রচুর।

ওই তো আগুন লেগে গেল বইএর আলমারিতে। বইগুলো পুড়ছে। সেই আগুন ছিটে লাগলো গ্লোবে।

গ্লোবটা পুড়ছে।

পুড়ুক। আর-একটা নতুন গ্লোব এনে দেবো।

নবীন আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। চেয়ারের হাতলে মাথাটা কাৎ করতেই দেখলে—দোরের কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বেদনার্ত্ত মুখচ্ছবি। মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি!

কে?

নবীন উঠে দাঁড়ালো। ভুল দেখছে না তো?

দেখলে—গণেশ পাঁড়ের স্ত্রী—মহামায়া!

তারই পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে নবীন একটি প্রণাম করলে। বিজয়া-দশমীর প্রথম প্রণাম।

মাথাটি তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে মহামায়া থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ঠোঁট দুটি কিন্তু মুখে কোনও কথা বলতে পারলে না। চোখ দিয়ে দর দর করে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।

---


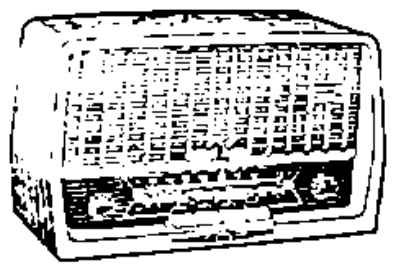

SIEMENS
INDIA
সিমেন্সের
রেডিও

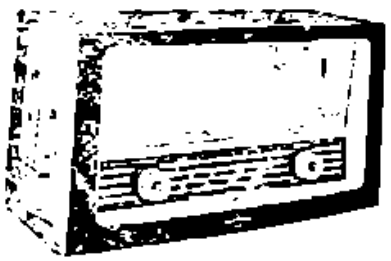

৬৯২ ডব্লিউ ও
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—৫৭৫৲ ও স্থানীয় কর।

আর এ—১০১
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—২৭০৲ ও স্থানীয় কর।

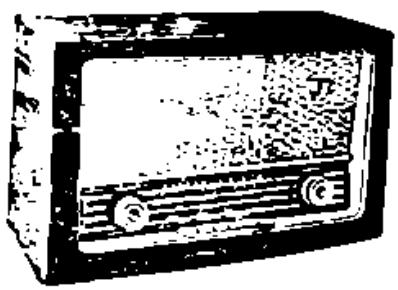

৬৯১ ডব্লিউ ও
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—৪১৫৲ ও স্থানীয় কর।

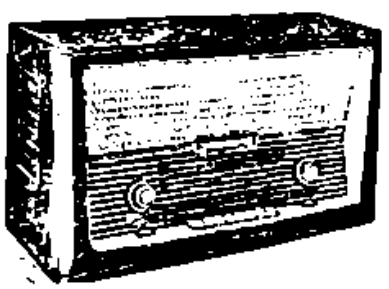

৭৯০ ডব্লিউ (এ.সি.)
৭ ভাল্‌ভ, ৬ ওয়েভ ব্যাণ্ড,
৮+৫ পুশ বাটন, ৫ লাউড স্পীকার।
মূল্য—৯৯৩৲৩০ ও স্থানীয় কর।

নিকটবর্ত্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক:

নান এণ্ড কোং ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার,
৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

# রং বদলায়

## আশীষ গুপ্ত

এমন করে হাঁটছিলেন যে মনে হল দু' পায়েই কোস্কা পড়েছে, ব্যথাও হয়েছে কড়া। জুতো দুপাটি খুলে নিয়ে বগলদাবা করবেন বোধ হয় এখুনি, তারপর ন্যাংটোপায়ে ন্যাংচাতে করতে রাস্তা অতিক্রম। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই মনে হল যেন চেনা-চেনা। ট্রাফিক বিল্ডিংয়ের কোণটায়ে অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে থমকে গেলেন। নিশ্চিন্তপুরী কায়দায় পায়ে-পা ঠুকে সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে ডান হাত উল্টো করে তর্জনী ও মধ্যমা কপালে ঠেকিয়ে স্যালুট করলেন। তাঁর পিছনে ঘড়ায়মানা একটি তন্বী কিশোরী।

অবাক হলাম। একটু চিন্তিতও হলাম হয়তো। এ আবার কী ব্যাপার!—সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি আমাদের গ্রামের কীর্তনদাদুর নিরঞ্জনদা। পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর গুণী যে কোকিলকণ্ঠী সাধনা, শিতার যোগ্য শিষ্যা।

দাদা তখনও অ্যাটেনশন ও স্যালুটের ভঙ্গীতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে, সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত ভাবলেশহীন মুখে। দেখেশুনে আমি তো স্তম্ভিত। তবুও কোনরকমে বললাম, "এ আবার কি যেন্ নিরঞ্জনদা?"

কপাল থেকে হাত নামিয়ে সহজ হয়ে বললেন, "ইমার্জেন্সির জন্যে আজ সকালেই এটা শিখেছি।"

"সেকি! এই বয়সে?"

"চৈনিক শত্রু দ্বারে আগত। এখন আর বয়স-টয়স নেই ব্রাদার। প্যারেড করছি রোজ। দেখবে নাকি আমার এই বেপনার কলেবরের লেফ্ট্-রাইট, লেফ্ট্-রাইট?"

"না দরকার নেই। কিন্তু যুদ্ধে যাবার আগে দাঁতগুলোও তো সব খুইয়েছ দেখছি। ওগুলোও কি কাঁপা-শরীরের মতনই কাঁপছিল?"

"না। ওরা সব কাঁপবার opportunityই পায়নি। আগেই গিয়েছে। সে হল আমার বিয়ের সময়কার ব্যাপার। ছিল দুরন্ত পাইওরিয়া, রোজই দাঁত কনকন, কান ঝনঝন। রাগ করে সব ফিলায় ফেলে। বাঁধিয়ে নিলাম দুপাটি দাঁত। ঝকঝক করতে লাগল আইভরির মত। নিখুঁতভাবে সাজানো, ওপর-নিচের দুপাটিই একেবারে সমান-সমান মেপানো।

"বিয়ে করতে গেলাম সেই দাঁত লাগিয়ে। স্ত্রী-আচারের সময় উপস্থিত মহিলাকুলকে বললাম, 'কিছু যদি না মনে করেন, এক বাটি জল চাই।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'জল এল। ফস করে দুপাটি দাঁতই খুলে ফেললাম। জলের বাটিতে রাখলাম সে-দাঁত।

বললাম, নতুন বাঁধিয়েছি। এখনও ঠিক set করেনি। মাড়ি একেবারে ব্যথায় টনটন করছিল,—তুলেও দিয়েছে বোধ হয়।'

হেসে উঠল মেয়ের বৌদি ও বোনেরা। সে-হাসি আর থামে না!

'খুব তোল্ উষা। তোর হাতের পাটিও অমনি তিথিয়ে রাখ।
পরে আছিস!'

'মেয়ে তো লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল!
পাইওরিয়া—তারও সব দাঁত বাঁধানো।'

হাসলেন নিরঞ্জনদা। পকেট থেকে একটা অ্যালিউমিনিয়ামের কৌটা বার করলেন।

"তা বলে দন্তহীন হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি সেকথা যেন মনে কোরো না। মুখে দাঁত নেই। কিন্তু পকেটে আছে।"

কৌটো খুলে দাঁত দেখালেন। নিমেষে তা নামিয়ে ফেললেন মুখে। চেহারা গেল বদলে, বয়স গেল কমে দশ বছর। বললেন, এবার লেক্চ্-টাইট করলে শরীর আর আগের মত কাঁপ্‌বে না। দেখবি?"

"এখন থাক, আর একদিন না হয় হবে demonstrationটা।—কিন্তু খুব সময়ে দেখা হয়ে তোমার কাছেই যাব-যাব ভাবছিলাম।"

"খুব ভালো, খুব ভালো! আমার কথাও মাঝে মাঝে মনে হয় তাহলে?"

"হাঁ, হাঁ, খুব মনে হয় নিরঞ্জনদা।—আমাদের ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশন এসে গিয়েছে তাতে তোমাকে গান গাইতে হবে। তোমার আর সাধনার কীর্তন একসঙ্গে। তোমাদের বাপ আর মেয়ের যুগ্ম কীর্তন একেবারে অপূর্ব!"

"যাঃ, সব সোনা হয়ে গেল!"

"সে আবার কি?"

"মিষ্টি জল সোনা হয়ে গেল!—ভাবনাটা তাহলে আমার জন্যে নয়। আমার গানের জন্যে। ক্লাবের অধিবেশনই হল তাহলে চিন্তার মূল।—যাঃ, মিষ্টি জল সোনা হয়ে গেল!"

হেসে ফেললাম, "না নিরঞ্জনদা, তোমার জন্যে ভাবনা আমাদের চিরদিনের।"

সাধনার কান বাঁচিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "সেই যে তুমি একবার কোন এক প্রস্ফুটিত কমলকলিকার সঙ্গে প্রাণ মেওয়া-মেওয়ার জন্যে বিবাগী হয়ে যেতে চেয়েছিলে, ওঃ সেদিন তোমার জন্যে যে কী ভাবনাটাই হয়েছিল। তোমার ওই পাকা গোঁফের তরুণ অবয়বে একটা কাঁচা রেখাও ওঠেনি সেদিন, আর আমরা তো তখন একেবারেই কুঁড়ো চিংড়ি! ওঃ, সেই বয়সেই তুমি হৃদয় বিনিময়ের সাধনায় উপলব্ধি করে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছিলে, আর আমরা পাড়াসুদ্ধু ছেলের দল একেবারে কালশিটে মেরে গিয়েছিলাম তোমার জন্যে ভেবে ভেবে! সেই তো রসের নাগর তুমি, কীর্তনীয়া হয়েছ, তা ঠিকই করেছ। কিন্তু রোগটা সারল কিসে?"

"সারল বাবার একদিনের ধমকেই ঠ্যাঙানিতে। ওই রোগের ও-ই হল একমাত্র ওষুধ। কিন্তু ওসব কথা থাক। আমি আবার এখন হেডমাস্টার।"

আজ আর আমার চমকে ওঠার শেষ নেই। হেডমাস্টার? সেকি! নিরঞ্জনদা ছিলেন জমি ও বাড়ীর দালাল, তা থেকে একেবারে হেডমাস্টার!

"হাঁ, আমি এখন আবার হেডমাস্টার। প্রাইমারী ইস্কুলের। বুড়োবয়সে আর কি কাজই বা করব? তাই মাস্টারীই করছি। একাজই হল পৃথিবীতে সব চাইতে সোজা।"

আমি বাকরুদ্ধ। নিরঞ্জনদা ব্যাখ্যা করলেন।—"বছর কয়েক আগে এক মাস্টার মশাইকে জমি কিনিয়ে দিয়েছিলাম সস্তা দামে। তা ভদ্রলোকের কৃতজ্ঞতাবোধ আছে।—তিনিই দিলেন হেডমাস্টারী প্রাইমারী ইস্কুলের।—তা বেশ আছি। চল্লিশ বছর আগে কলেজ ছাড়বার পর থেকে আর লেখাপড়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিনি। অথচ এখন মানুষ আগামী যুগের মানুষ তৈরী করছি আমি। ঘোর কাণ্ড। জমি বিক্রী করতাম, বাড়ীর খদ্দের যোগাড় করতাম, তা থেকে একেবারে মানুষ তৈরী। —এ ছাড়া কীর্তন তো আছেই।"

"আর ইমার্জেন্সির অর্ডার সেফ্‌টি-রাইট, সেফ্‌টি-রাইট?" মৃদু হেসে টিপ্পনী কাটলাম আমি।

"হাঁ, ওটা শরীর fit রাখবার জন্যে। যদি মুছে যেতে হয়, তাই।"

কথা কইতে কইতে প্রায় হেমার স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, বললাম, "চল নিরঞ্জনদা, একটু চা-টা খেয়ে আসি। ভালো রেস্তোরাঁ আছে হ্যারিসন স্ট্রীটের কাছাকাছি।"

খুশী হলেন নিরঞ্জনদা, "সাধু প্রস্তাব। যা রেখে চিবিয়ে খেতে পারব। দুপাটি দাঁতই লাগিয়ে নিয়েছি।"

খেতে খেতে বললাম, "তোমার হেডমাস্টারীর কথায় আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ক্লাবে অনেক পণ্ডিত, বিদ্বান ও ধনী সভ্য আছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন কলকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায় একটি আদর্শ আবাসিক স্কুল খুলবেন। আবাসিক কলেজেরও বন্দোবস্ত করা হবে সেখানে, কিন্তু সেটা হয়তো দু'এক বছর পরে হবে। বিপুল তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। শ্যামনগরে পনেরো বিঘে জমি দেখা হয়েছে। শীঘ্রিরই বাড়ীঘর ইত্যাদির কাজ শুরু হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে, অভিনব পদ্ধতিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। দেশবিদেশের কোন স্কুলের কাছেই এ-স্কুল হার মানবে না।—সবচেয়ে জোর দেওয়া হবে তরুণ সমাজের চরিত্র গঠনের ওপর। তোমাকেও হয়তো আমাদের দরকার হবে গান শেখাবার জন্যে।"

একটু পরিহাসের লোভ ছাড়তে পারলাম না।—কথার শেষে যুড়ে দিলাম "আর তুমি তো already মানুষ তৈরীর পুণ্য কাজে লেগেই গিয়েছ, কাজেই আমাদের এ-ব্যাপারটা তোমার খুব সম্ভব খারাপ লাগবে না।"

হঠাৎ খুশীতে ঝলমলে হয়ে উঠল নিরঞ্জনদার চোখ মুখ। বললেন, "মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলাম রেডিয়ো স্টেশনে অডিশন-টেস্টের জন্যে, তাই তো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।" পরমন্ত আছে মেয়েটা।—তা তোদের কাজ তো সৎ কাজ। আমি তোদের সাহায্য করবার জন্যে এখন একজন লোক দিতে পারি যে খুশী মনে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "কে এমন গৌরী সেন, নিরঞ্জনদা?"

"তুই খুব ভালো করেই নাম জানিস তার। ব্যারিস্টার হেমেন রায়।"

"নতুন একনমিক কমিশনের চেয়ারম্যান? সেই পাঁড় মাতালটা?"

"চিনিস তাকে?"

"না। দূর থেকেই তাঁর অপরূপ ব্যাপ্তি শুনেছি।"

"পরিচয় থাকলে বুঝতিস যে—। কিন্তু থাক, আগে গল্পটা বলে নিই।"

মনে হল নিরঞ্জনদা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সুতরাং অপেক্ষা করলাম তাঁর কাহিনীর জন্যে।

বললেন নিরঞ্জনদা, "কদিন আগে গিয়েছিলাম হেমেনের ওখানে। ওর সঙ্গে আমার দীর্ঘ-কালের পরিচয়, শুধু ওর সঙ্গে নয়, ওদের পরিবারের অনেকের সঙ্গেই। বছর কুড়ি আগে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম জমি বিক্রী উপলক্ষে, কদিন যাতায়াতেই কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। হেমেন তখন ব্যারিস্টারীতে এত পসার করেনি,—পরে ডুবিআর হিসেবে যে তখন নাম করছে। সেই থেকেই পরিচয়। অনেক জমি ও বাড়ী বেচেছি ওদের পরিবারে। হেমেন আমাকে "দাদা" বলে ডাকে এবং গরীব বলে কোনদিন বুকফিফটি করে পিঠ চাপড়াবার চেষ্টা করে না।—হেমেনের কাছে গিয়েছিলাম একটি ছেলের জন্যে একটা সুপারিশের দরকার ছিল তাই।

"ওর খুড়তুত ভাই রবীন বলল, 'একটু সাবধানে কথাবার্তা বোলো দাদা। অনেক টাকা Sacrilice করছে পীড়াপীড়িতে পড়ে। মাসে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার disclosed income এর ওপরেই income-tax দিত। আর undisclosed income যে কত তা জানেন একমাত্র ভগবান। তার তুলনায় একনম্বরি কমিশনের ফুটো পয়সা হল ওর বাবুর্চি, খানসামা, দরোয়ান, ড্রাইভারের মাইনে। কাজেই মেজাজ ঠিক ভালো থাকবার কথা নয়। তাই বলি দাদা, একটু সামলে চোলো—আর তাছাড়া সন্ধ্যার সময় ও রং-এ থাকে। কথা বলবার কো নেই, সেলাই পানীয় offer করবে। ও-রসের রসিক না হলে সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে মজা নেই। কাজেই, সকালে যাওয়াই প্রশস্ত।'

তা সেদিন সকালবেলাতেই গেলাম। দেখলাম ভারী ব্যস্ত, অনেক লোকজন বসে রয়েছে। ব্যারিস্টারীর কাজকর্ম গোটাচ্ছে।—সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়েছে, অতএব ব্যারিস্টারী ছাড়তে হবে। বলল, 'বিকেলে এসো, এখন কথা কইবার সময় নেই'।

বিকেলেই গেলাম। যা শুনেছিলাম তাই। প্রচুর টেনেছে, কিন্তু তবুও জ্ঞান আছে টনটনে।

একটু অমৃতের স্বাদ নেবে নাকি দাদা?

হাতজোড় করলাম, 'বড় ভাইকে আর ডুবিয়ো না ভাইয়া'।

'আরে যাও, যাও,—জীবনটাই তোমার বাজে গেল।' বলেই টেবিলের ওপর থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে একেবারে গলার ভেতরে ঢেলে দিল। পাঁচ সেকেণ্ডেই বোতল খালি!

এমনতর মদ্যপান এর আগে আর দেখিনি। চোঁক গিললাম। কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম, 'অনেক টাকা sacrilice করলে হেমেন'।

"কি? একনম্বরি কমিশনের দায়িত্ব নিয়ে?

'হাঁ। কী আয়টাই ছাড়লে! এখনো আর কটা টাকাই বা পাবে'?

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কত আমার income ছিল ব্যারিস্টারীতে বল দেখিনি'।

'সে আমি কি করে বলব?

'Just guess.'

'Guessই বা করব কেমন করে'?

'Monthly পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার basisএ income-tax দিয়েছি। এটা হল প্রকাশ্যে।

আর—' অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপল।—আবার একটা বোতল এক নিশ্বাসে শেষ হল। সোডা-টোডার কোন দরকার হয় না ওর।"

" 'এঁকে চেন' ?—কথাগুলো জড়ানো কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না। ঘরের কোণে আরামকেদারায় পুস্তক পাঠনিরত এক পাকা মাথা ভদ্রলোকের দিকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল উল্টো করে দেখাল। ভদ্রলোক বই বন্ধ করে তাকালেন আমার দিকে।—আমি বললাম, কি করে চিনব ? পরিচয় করিয়ে দাওনি তো'।"

"আবার একটা বোতল চালান হল। পরিচয় করিয়ে দিল এতক্ষণে, 'My father-in-law and class-mate !

"আমার দিকে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে বলল, 'My elder brother Niranjan Dutt.'

"Father-in-law and class-mate ! বলে কি রে বাবা !—পক্ষাঘাত ভদ্রলোক তো একেবারে অপ্রস্তুত। বলল হেমেন, 'অবাক লাগছে ? পরে বলব। দিনের বেলা বলব। বুঝবে তখন সত্যি কিনা।'

"তখন ভেবেছিলাম মাতাল বুঝি বা প্রলাপ বকছে,—পরে জেনেছিলাম কথাটা সত্য। একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল হেমেন, স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের তফাৎটাও প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর। মহাদেব চাটুয্যে হেমেনের সঙ্গে পড়তেন সেন্ট জেভিয়ার্সে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা কন্যা সুরুচি। বিয়ে দিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার হেমেন রায়ের সঙ্গে এবং যুগপৎ হয়ে দাঁড়ালেন father-in-law and class-mate !

"প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, 'তোমার আইনের জ্ঞান কিন্তু গভর্ণমেণ্টের খুব কাজে লাগবে। তোমার মত লোক যে-কোন administration-এর পক্ষে একটা asset.'

"হাসল হেমেন। 'আইনের জ্ঞান ! তাই বটে ! একটা কথা জেনে রেখো নিরঞ্জনদা, Hemen Roy knows everything under the sun except law ! একনমিক্স্ সে নিশ্চয়ই জানে। একনমিক কমিশনের মারফত হয়তো সে গভর্ণমেণ্টের গোটা economic policyটাকেই পালটে দিয়ে জনসাধারণের কিছু উপকার করতে পারে। কিন্তু with regard to law ? Hemen Roy's knowledge is not really considerable.'

"মাত্রাতিরিক্ত মেধা সত্ত্বেও বুঝল যে আমি বিস্মিত হয়েছি। ব্যাখ্যা করল নিজেই, 'When I build up a case, I build it up on sand. The judge sits up and says, No monkeying please !—But he is hoodwinked all the same !'

"আমি চুপ করে রইলাম।

"জানো নিরঞ্জনদা I build up a story, right from the bottom. a nice plausible story. The presentation is superb and I do always win my case. But law ? Pooh ! Not the least bit of it. I know nothing of it. I raise a skyscraper on sand,—mind you the foundation is always sand.'

"রবীনকে বলেছিলাম কথাটা কিছুকাল পরে। বলল রবীন, 'দাদা মিথ্যে বলেনি। অর্থনীতি শাস্ত্রে ও সত্যিই বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী, কিন্তু আইনের তথীয় দিকটায় ও বেশ কাঁচা।"

"রবীন বিয়ে অ্যাটর্নি, কাজেই আদালত এলাকার সংবাদ তার অজানা নয়। বলল সে, 'সেদিন ক্যালকাটা ক্লাবে জাস্টিস্ সান্যাল হাসতে হাসতে বলছিলেন, তোমার ভাইয়ের মত বাগ্মীবাজ

আর ত্রুটি নেই, যখনই কেস্ করতে ওঠে আমার এজলাসে তখনই জানি আসল আইনজ্ঞানের ধার দিয়েও যাবে না। শুধু ওলপণ্টি দিয়ে মামলা জিতবার তালে থাকবে। সচেতন হয়ে থাকি, ফাঁকি না দেয়। কিন্তু দেখার চোটে ও প্রতিপক্ষের পেটের কথা ফাঁকসি দিয়ে টেনে বার করে, তারপর সেটা present করে প্রস্তুত artist-এর মত। জানি তাতে আইনজ্ঞানের দাখিলা নেই,—কিন্তু তবুও কিছুক্ষণ হেমেন রায়ের বক্তৃতা শোনবার পর মনে হতে থাকে যেন পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, এ-অবস্থায় বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওর পক্ষে রায় দেওয়া! সুতরাং কেস্-এর merit থাকুক বা না থাকুক হেমেন রায় কেস্ জিতবেই।'

"এ হল রঙ্গীনের দেওয়া খবর। এ যে সত্যি তাতে আমার সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে হেমেন কিছু ঘোড়লের পর ঘোড়ল ওড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু জড়ানো সুরে বলল, "My dear Niranjanda, don't forget that Hemen Roy knows almost everything in this world except law. This is not modesty, but fact."

"ওর এক সেলাদের বন্ধুরা সব আসতে আরম্ভ করলেন, আমি উঠে পড়লাম। আমার দিকে নিমেষমাত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেমেন বলল, তুমি তো এখন মাস্টারী কর, না?'

"হাঁ। প্রাইমারী ইস্কুলে।'

"হক প্রাইমারী স্কুল, তবুও স্কুল তো বটে। —তা তুমি বড় স্কুলের বন্দোবস্ত কর। একেবারে প্রথম শ্রেণীর স্কুল। লোক জোটাও, পণ্ডিত জোটাও, বিদ্বান জোটাও চরিত্রবান মানুষদের জোটাও।

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হাঁা, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল কারখানায় সেন-র‍্যালের তৈরী

JAC-RS 61N

যারা দুর্বল নয়, লোভী নয়, নেশাখোর নয়। সোনার মত খাঁটি, হীরের মত তীক্ষ্ণ যারা, তাদের নিয়ে এসো সংগ্রহ করো। দেশকে উপহার দিক তারা বজ্র ছেলেমেয়ে যারা হবে বজ্রের মত কঠোর, ফুলের মত কোমল, ব্যবহারে শুচি, চরিত্রে অমলিন। গড়ে তোল প্রতিষ্ঠান, পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠান। দু' লাখ, দশ লাখ যত লাগে আমি দেব।'

"আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম,—হেমেনের যে কয়জন বন্ধু এসে পৌঁছেছিল তাদের অবস্থাও আমারই মতন। হেমেনের কথায় আতিশয্য ছিল, বলবার ভঙ্গীতে বেশ খানিকটা অলঙ্কার ছিল, কিন্তু তবুও তা পানাশ্রিত বলে আমার মনে হল না। বলল হেমেন, 'লোক যোগাড় কর, সংগ্রহ কর জ্ঞানীগুণীবিদ্যাব্রতীদের। কিন্তু কোন নেশাখোর চলবে না, এমন কি পান-সিগারেট-বিড়ি যারা খায়, নস্যি যারা নেয় তারাও বাদ। গড়ে তোল তোমরা সত্যিকার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, চরিত্রে, মননে আচারে, আচরণে। আদর্শ জ্ঞান ও আদর্শ ব্যবহারের সমন্বয় ঘটুক সেখানে। Go ahead—টাকার জন্যে ভেবো না।'

"আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে ওর বোধ হয় মনে হল যে আমি সব কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না। তাই বলল এবার 'নিরঞ্জনদা, হেমেন রায় মাতাল, সিঁপে-সিঁপে মদ খায় সে,—কিন্তু মনে রেখো সে কখনও মাতাল হয় না। The gentleman in him never forgets himself. অতএব তোমাকে যা কিছু বলেছি I mean every syllable of it.—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। আর নেশার কথা?—আমি নিজে ফেঁসে গিয়েছি। আমার তো আর ফিরবার উপায় নেই!'

"একটু থামল হেমেন। ওর গলার সুর এখন আশ্চর্য রকম কোমল ও নিরুত্তাপ, অন্তর্দর্শনের ফলে তা চাঞ্চল্যকরভাবে মৃদু। মনে হল যেন ওর মনের ভিতরকার আর্তনাদকে ও সজোরে মুখ চাপা দিয়ে মন্দীভূত করছে। সে-হাহাকার কিন্তু সীমাহীন বেদনায় নিতান্তবিহ্বল আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, বলতে চাইছে মর্মাহত চীৎকারে, পথ নেই, পথ নেই—আমার আর ফিরবার পথ নেই!"

"একটু হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। খেয়াল হতেই শুনলাম হেমেন বলছে, নিরঞ্জনদা, Everyone knows me for a blotto, কিন্তু বিশ্বাস কর I hate drinking from the core of my heart; as a matter of fact no one detests it more than I. কিন্তু ফিরবার আর পথ নেই ব্রাদার,—আমার বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে।'—শেষের কথাটা অবশ্য বলল হাসতে হাসতেই, কিন্তু মনে হল যে সকলের সামনে প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে কাঁদতে পারছে না বলেই যেন হেমেন এমনই করে হাসছে!'

"বললাম, 'চলি ভাই হেমেন।'

"এসো। যা বলেছি মনে রেখো। I'm very serious about it.—যদি পার তাড়াতাড়ি খবর দিয়ো।' —আবার একটা বোতলের তরল-অমৃত গলায় ঢেলে দিল হেমেন রায়।

"এই হল তোর গৌরী সেন। একেই তিড়িয়ে দিতে চাইছি তোদের সঙ্গে। আখ যদি চলে।" —নিরঞ্জনদার মুখে একটু তিক্ত হাসি।

"সরাসরি উত্তর দিলাম না। বয়কে ডেকে বিলের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার মুখে বললাম নিরঞ্জনদাকে, 'হেমেন রায়ের ওখানে এর পরে যেদিন যাব সেদিন ওঁকে বলো যে আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি।'

"নিরঞ্জনদা যে ঠিক কি ভাবছিলেন বুঝতে পারলাম না। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, 'আচ্ছা'।

# তমিস্রা

## সুলেখা দাশগুপ্ত

মায়া আর শোভা দু'বোন। মায়ার বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। সে এখন পাকা ঘরণী গৃহিণী।

শোভার বিয়ে হয়েছে বছরও ঘোরেনি। সে এখনও সংসারের ভিতে শক্ত শোক্ত পায় দাঁড়িয়ে উঠতে পারেনি। মাছ কাটতে বসে যখন দেখে কোন মাছ কী ভাবে কাটে ঝিকে বলতে পারে না—ছোটে দিদির কাছে। তরকারী কুটতে বসে যখন দেখে ইঁচড় আর মোচার কোনটা ফেলতে হয়, কোনটা রাখতে হয় ইদিস করে উঠতে পারছে না—ছোটে দিদির কাছে। নিজের বা সমীরের অসুখ বিসুখ হলে ভয়ে দিদিকে এনে বসিয়ে রাখে সামনে।

আর রান্না ঘরে গিয়ে কেবল হাত পা হিম হয়ে আসে আর কান্না পায় ওর। বলে, দিদিরে কড়াতে তেল গরম হতে হতে কালো আলকাতরার মত রং হয়ে আসে কেনরে? মরব না তো খেয়ে? রাতে হঠাৎ হঠাৎ সমীরকে ঠেলে জাগায়। ঘুম জড়ানো চোখ মেলে সমীর ধড়মড় করে উঠে বসে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বলে, না এমনি। তুমি ঘুমোও। বলেই আর সমীরকে জিজ্ঞাসা করতে দেয়না কিছু। পাশ ফিরে শুয়ে টিপে চোখ বুজে থাকে। সমীর নালিশ জানায় দিদির কাছে।

দিদি জানতে চান এমন করে কেন সে। শোভা কেঁপে উঠে বলে, দেখতে হবে না বেঁচে রয়েছে না মরে রয়েছে। তুই বলিসনি এমন অবস্থা হয়েছে আজ কাল যে, সকাল বেলা ঘুমে হয় আরো একটা দিন তবে বাঁচলাম কিছু বিষ হজম করে।

দুবোনের বাড়ির ব্যবধান নিতান্তই সামান্য একই পাড়ার এদিক ওদিক। সে দিন মায়া দুটুকরো মাছ নিয়ে এসে হাজির হলো শোভার বাড়ী। কলকাতার বাজারে মাছ নেই। স্বামী কি কাজে যেন কল্যাণী গিয়েছিলেন সেখান থেকে ইলিশমাছ নিয়ে এসেছেন—কলকাতার বুকে বসে মাছ—তাতে ইলিশমাছ খাওয়া—এ যে স্বপ্ন! ছোট বোনকে দুখানা না দিয়ে খাওয়া যায়! এসে দেখে রান্না ঘরময় বাসনপত্র ছড়িয়ে আছে। একদিকে মা দাঁড়া হয়ে রয়েছে। অন্য দিকে উনোনে চাপানো কড়াইতে তেল জ্বলে উঠবার মুখে। শোভা পেটিকোটের উপর কোনমতে শাড়ি জড়িয়ে একহাঁটু জলের মধ্যে বসে ঝুঁকে পড়ে মোসলা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাতের বাটি নামিয়ে রেখে উনোনের কড়াই সাঁড়াশি দিয়ে টেনে নামাল মায়া। ধমকে উঠে বলল, এখুনি পুড়ে মরতিস যে।

শোভা উঠে দাঁড়ালো। বলল, বাঁচার চেষ্টা করে লাভ নেই। রামের হাতে মরলেও মরণ, রাবণের হাতে মরলেও মরণ—আমরা বৃথা হাঁকুপাঁকু করছি বাঁচবার জন্যে—হ্যাত্‌রি। বলে মোসলার হাত ঝাড়া দিল সে।

লাল হলুদজলের ছিটে গিয়ে পড়ল মায়ার মুখে। মায়া মুখ মুছতে মুছতে বলল, কেন হয়েছে কী? তোর বি কোথায়?

চলে গেছে।

কেন? বলে ঘরের ভেতর ঢুকে 'নে সর' বলে শোভাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উনোনের কাছে বসে পড়ল। শোভা কি কি রান্নার আয়োজন নিয়েছে তা একনজর দেখে নিয়ে কড়াই চাপিয়ে দিলো উনোনে।

একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়াল শোভা। বললো, কেন আর। চুরি করছিস যাচ্ছেতাই রকম। এতদিন বুকেও চুপকরে ছিলাম যে দিদি। তোকেও বলিনি। তুই যদি বকিস। যদি চলে যায়। কিন্তু সপ্তাহের বেশন যদি তিন দিনে হ'ওয়া হয়ে যায় তবে আমরাই খাবো কী বল?

আচ্ছা! তরকারী নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলো মায়া।

শোভা বললো, তাও দিদি, মুখে কিছু বলিনি। রেলের বিজ্ঞাপন থাকেনা, 'ঘা'র যার মাল নিজে সামলাও?' তেমনি নিজের মাল নিজে সামলাচ্ছি। উঁড়ার চাবি বন্ধ করে নিজের হাতে সব বের করে দিতে লাগলাম। দুটো দিনও তারপর হয়নি। আজ বললে, মাইনে চুকিয়ে নেও। কাজ করব না। অসুখ হয়েছে।

ঘুরে রাগতকণ্ঠে মায়া বললো, আর তুই বুঝি অমনি মাইনেপত্র চুকিয়ে দিলি?

তবে কী করব? বোকা বোকা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো শোভা।

মাইনে দিবিনে এমন হঠাৎ ছেড়ে চলে গেলে। তুই যদি তাড়িয়ে দিতিস, তবে মাইনে দিতে হতো। কিন্তু ও যখন তোকে আগে না বলে মাসের মধ্যখানে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তুই মাইনে দিতে যাবি কেন? সবটাতেই তো একটা নিয়ম আছে।

তাই বুঝি নিয়ম? জানি না তো। তা যাকগে। মাইনে না দিলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে আরো কাণ্ড করত। কিন্তু এখন একটি কাজের লোক পাই কোথায় সেই হলো ভাবনা রে দিদি!

নাহুর মাকে রাখবি? ও এখন বসে আছে। কালকেই এসে আমার কাছে অনেকক্ষণ বসে থেকে গেছে একটা কাজের জন্য।

নাহুর মাকে পাওয়া যাবে—যেন হাতে স্বর্গ পেতে গিয়েও পেলোনা শোভা। মুখে নিরাশা ফুটে উঠল তার। বললো, নাহুর মা কাজে ভালো। লোকটাও ভালো। কিন্তু ওকে রাখা যাবে না। ও কিছুতেই এখানে থাকে না। কাজ নিয়ে যাবে বাড়িতে। আর সে কী ভাত

নেওয়া! ঠেসে ঠেসে এক গামলা। কিছু কওয়াও যায় না। নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু হড় হবেই বা কী করে বল। অত ভাত দিলে খেলনে হবে? ভাত নিয়ে যাবে বাড়ীতে অমন কি আজকাল রাখা যাবে না বে দিদি।

তা ঠিক। নাতুর মা যদি এখানে খেতে রাজী থাকে তবে পাঠাবো?

তবে তো কথাই নেই।

নাতুর মা প্রথমটায় এ প্রস্তাবে রাজী হলো না। তারপর অনেকক্ষণ চুপকরে বসে থেকে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো, আচ্ছা মা, তাই হবে।

একে ঝটপট কাজের লোক মিলে গেল, তাতে পুরোনো লোক—কাজ বোঝানোর শেখানোর হাঙ্গামা পোহানোর দরকার হলো না—শোভা খুসী। নাতুর মার সঙ্গে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করল। স্নান করে পরবার জন্ত একটা পুরোনো শাড়ি এনে দিল। নিজেদের সমান সমান মাছ তরকারী নাতুর মার জন্ত রাখল। নিজের হাতে পরিপাটি করে ভাত বেড়ে রান্নাঘরে দিয়ে এলো। কিছুক্ষণ বাদে কোন একটা কাজের কথা বলতে গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে শোভা দেখল নাতুর মা ভাতের থালায় হাত রেখে চুপকরে বসে রয়েছে। ওকে দেখেই ত্রস্ত হাতে ভাত তরকারী মাখামাখি করতে লাগল। যেন এই এক্ষুনি মুখে গ্রাস তুলবে। যা বলতে গিয়েছিল তা বলে চলে এলো শোভা কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল ওর মনে। কখন ভাত দিয়ে এসেছে। নাতুর মাকে খেতে বসতেই দেখে এসেছে সে—তবে এতক্ষণ নাতুর মা খাচ্ছিল না কেন? ভাতের থালায় হাত রেখে বসেছিল কেন? আস্তে আস্তে আবার উঠে গেল শোভা। গিয়ে দেখল ঠিক সেই ভাবে বসে আছে নাতুর মা ভাতের থালায় হাত রেখে হাঁটুতে চিবুক চেপে।

তুমি খাচ্ছ না কেন নাতুর মা? অসুখ করছে?

এবার কেঁদে ফেলল নাতুর মা: পাচ্ছিনে মা খেতে। গলা দিয়ে কিছুতেই নামছে না। বাচ্চা দুটো না খেয়ে রয়েছে····· কান্নাভাঙ্গা মুখে ভাতের থালা তুলে নিয়ে কলতলায় চলে গেল সে। শোভা দেখলে যে নাতুর মা দুটো চাল পড়ে গেলে খুঁটে খুঁটে তোলে সেই নাতুর মা থালা ভরা ভাত কলতলায় কুকুরের মুখে ঢেলে দিল।

পায় পায় গিয়ে উপস্থিত হলো শোভা দিদির কাছে। ঘটনাটা দিদির কাছে বলে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল শোভা মায়ার মুখের দিকে। বললো, এখন কী করব দিদি বল?

জানিনে শোভা—জানিনে। কালকে হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি আমার বিটি হাঁড়ি থেকে মুঠো মুঠো ভাত তুলছে আর কোন মতে কোঁক কোঁক করে গিলে চলেছে। আমাকে দেখে মুখভরা ভাত শুদ্ধ—যা করে কেঁদে ফেলল। বললো, দু মুঠো খেয়ে না নিলে হাত পা আর চলছিল না মা·····

কান্না কান্না গলায় শোভা বললো? এ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিরে দিদি?

পূর্ব ফাল্গুনী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

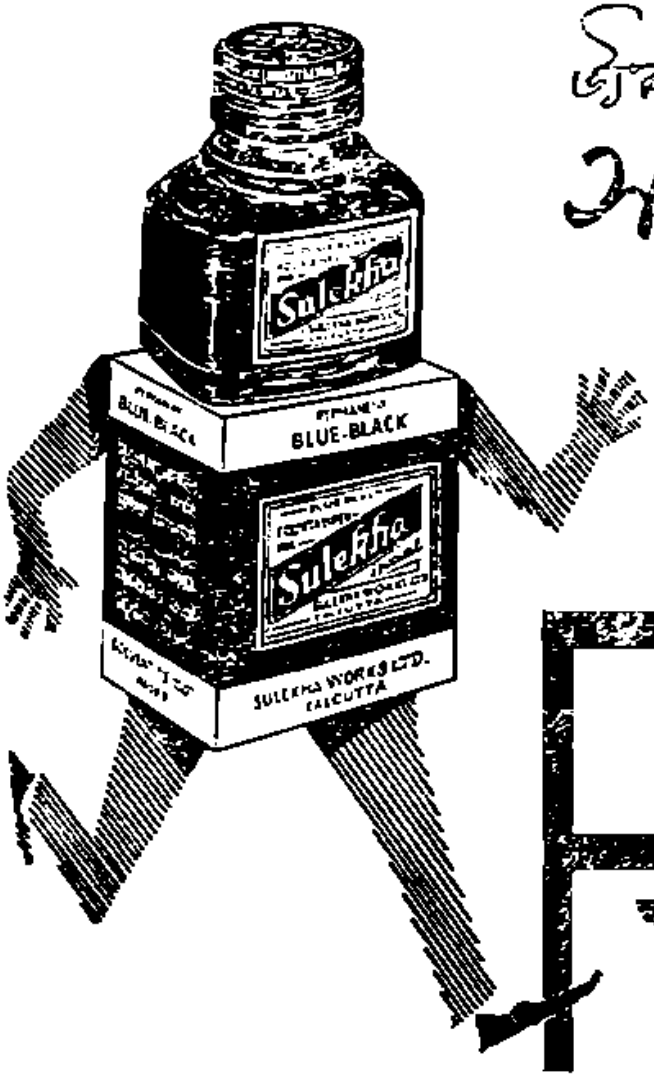


ঐতিহ্য ও উৎকর্ষসাধনে

# সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে **সুলেখা** আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

## দেশ-বিদেশে সমাদৃত

**সুলেখা**-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : **'অ্যাডসল'** পেস্ট এবং গাম, **'সিকিউরিটি'** সিলিং ওয়াক্স, **'পেনসল'**, স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

# সুলেখা

স্পেশাল

ফাউন্টেন পেনের

## কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন [illegible]

এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম.এল. সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

PRO/SW—13

সুচরিতাসু

তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার আমার নেই। তবু আজ লিখতে ইচ্ছে হল। অনেকদিন ধরে লিখি লিখি করছিলাম। কিন্তু দ্বিধাও ছিল। আজ সেই দ্বিধাটুকুকে জয় করেছি। আজ তোমাকে বিনা কুণ্ঠায় ডাকতে পারছি, এসো সঞ্জয় আর ধ্রুব দুজনকে নিয়েই এসো। এই চিঠি ওদের দুজনকেও দেখতে দিয়ো। এ চিঠি তোমাদের তিনজনেরই। আমরাও এবাড়িতে এখন তিনজনই আছি। আমি অমলা আর অনু। আমাদের মেয়ে। ওর বয়স এই শ্রাবণে দশবছর পূর্ণ হল। আমি অমলাকে রাজি করিয়েছি। ও কিছু বলবে না, কিছু মনেও করবে না। ও জানে সবাই জানে আমার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আমি যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। যাওয়ার আগে সবাইর সঙ্গে একবার করে দেখা করে যেতে চাই। সব বিষাদ মিটিয়ে যেতে চাই, সব দুষ্কৃতি মুছে দিয়ে যেতে চাই একথা বলব না। আমি জানি তা সম্ভব নয়। সারা জীবনের ঘায়ে শুধু একবার দেখায় মেটে না। সে দেখা যদি শেষ দেখা হয় তাতেও না। ক্ষমা চাইলেই সব অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যায় না। আমি তা জানি। আমি যোগশয্যায় সব পুরোন বন্ধুদের ডেকে ডেকে এনেছি, আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে এনেছি। সবাই আসেননি সবাই সাড়া দেননি। কেউ কেউ দিয়েছেন। কিছু পাওয়ার জন্যে কিছু চাওয়ার জন্যে তো আমি তাদের ডাকিনি এমন কি ক্ষমা চাওয়ার জন্যেও নয়। শুধু একবার যে তাদের সঙ্গে দেখা হল এইটুকুই যথেষ্ট। এইটুকুই পরম পাওয়া। তোমরা যদি আস আমিও তোমাদের কাছ থেকে তাই পাব। দেখা পাব।

এসো। আমি আজকাল সারাদিন বিছানায় প্রায় শুয়েই থাকি। শুয়ে শুয়ে অল্প পড়ি। একটু একটু চিঠি লিখি, ডায়েরি লিখি কখনো দুচার ছত্র। কখনো বা দুচার পাতা। দেখতে পেলে অমলা বকে, রাগ করে। তখন দেখাদেখি বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। জানলা দিয়ে এই বিশাল আকাশের কতটুকুই বা চোখে পড়ে। তবু চেয়ে চেয়ে দেখতে বেশ লাগে। প্রহরে প্রহরে আকাশের রঙ বদলায়। সেই রঙ বদলানো দেখতে বেশ লাগে। এসো। যদি পার এই রবিবারই এসো। ষোলই শ্রাবণ। অনেকদিন বাদে এই তারিখটির কথা কের মনে পড়ল। পড়া উচিত নয়। তবু মনে পড়ল। এসো, সবাইকে নিয়ে এসো। এলে খুশি হব। তোমাদের খুশি করতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু যাওয়ার আগে একটু খুশি হয়ে যেতে পারব। ধ্রুবকে স্নেহ, তোমাদের দুজনকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

পরিতোষ গুপ্ত

সুনন্দা চিঠিখানা পড়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

বাইরের ঘরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বৈষয়িক আলোচনা হচ্ছিল। জমি নিয়ে আলোচনা। ঘুরে ঘুরে দুজনে জমি দেখে বেড়াচ্ছে। উত্তর পশ্চিমকোণে দেখেছে, দক্ষিণে দেখেছে। কিন্তু পছন্দমত জমি এখনো পায়নি সুনন্দা।

সঞ্জয় বেশি কিছু বলে না। শুধু বলে 'তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।'

কিন্তু তাই কি আর হয়? নিজের পছন্দের সঙ্গে স্বামীর পছন্দ মিলিয়ে নিতে চায় সুনন্দা।

অনেক ব্যাপারেই মেলে আবার অনেক ব্যাপারে মিলতে চায় না। যেমন জমি পছন্দ করার ব্যাপারে মেলে না, ভাড়াটে বাড়ি পছন্দ করার ব্যাপারে মেলা কঠিন হয়। তবু সুনন্দা শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে তার আগ্রহ বেশি ফুটে ওঠে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে প্রায় যেতেই চায় না সুনন্দা।

ছুটির দিন। সকাল বেলায় দু রকাপ চা হয়। মর্নিং-এ আর সেট মর্নিং-এ। সেই দ্বিতীয় পর্বের চা আর জমির আলোচনা চলছিল। সেক-টাউনে নাকি এখনো কিছু জমি আছে। সুনন্দাকে সন্তান দিয়েছে তার মামতুতো ভাই তন্টু। সেও নাকি সেখানে জমি রাখবে। সুনন্দার ইচ্ছা সঞ্জয়কে নিয়ে আজ বিকালে সেকটাউন ঘুরে আসে। জমি পছন্দ হোক আর না হোক, জমি কেনা হোক আর না হোক এই উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গে তার বেরোনও হয়, বেড়ানোও হয় একটু। সব দিন তো আর সময়ও পাওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মত সুনন্দাকেও প্রায় পাঁচটা পাঁচটা অফিস করতে হয়। অফিসের পরে ঘর সংসারের কাজ দেখতে হয়। না দেখলে নিজের মনই খুঁৎ খুঁৎ করে। সঞ্জয়ের যেমন একটু গড়াগড়ি না করতে পারলে ঘুঁৎ ঘুঁতির অন্ত থাকে না।

ছুটিছাটা ছাড়া বেরোন হয় না। সব ছুটির দিনগুলিতেই যে বেরোবার ফুরসুৎ পাওয়া যায় তা নয়। সময় থাকে তো মেজাজ থাকে না, মেজাজ থাকে তো সময় থাকে না। সময়ের সঙ্গে মেজাজের মিল হওয়া চাই। দুজনের সময়ের সঙ্গে দুজনের মেজাজের। আজ বিকেলে সেই মিলটুকু হয় কিনা চেষ্টা করে দেখছিল সুনন্দা। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। একখানা মাত্র চিঠিই আজ এসেছে। চিঠিটা সুনন্দার নামে। কিন্তু পিওন দিল সঞ্জয়ের হাতে। খামের চিঠি।

হাতের লেখাটা চেনাচেনা। কিন্তু ঠিক চিনে উঠতেও পারল না।

একটু হেসে বলল, 'তোমার চিঠি নাও।'

চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল সুনন্দা। চোখ বুলিয়ে চিঠিটা পড়েও নিল।

একটুকাল চুপ করে বসে রইল। একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হল কিছুক্ষণের জন্যে।

সঞ্জয় বলল, 'কার চিঠি?'

সুনন্দার খেয়াল হল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও দেখো।'

সঞ্জয় একটু চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু এ তো তোমার চিঠি।'

সুনন্দা বলল, 'তাতে কি। তুমিও দেখ। আমার এমন কোন চিঠি থাকতে পারে না, যা তুমি দেখতে নেই।'

সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিল। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি?'

সুনন্দা এবার মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'ওর বাবার।'

সঞ্জয় চুপ করে রইল। সুনন্দা কি বলতে পারত না 'পরিতোষবাবুর।' স্বামীর নাম ধরে তো সে মাঝে মাঝে ডাকে। অন্য লোকের কাছে উল্লেখও করে। ভূতপূর্ব স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে দোষ ছিল কি। ওর বাবা এ কথাটা না বললেই কি পারত না সুনন্দা?

একটু বাদে চিঠিখানা ফেলে রেখে সুনন্দা পাশের ঘরে চলে গেল।

নিচু সেন্টার টেবিলের ওপরে চিঠিটা তেমনি পড়ে রইল। সঞ্জয় সে চিঠি হাত দিয়ে ছুঁলনা। ছুঁতে যেন তার কেমন একটা ঘৃণা হচ্ছে। এ চিঠি সুনন্দা আজ এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারে। এ চিঠি

আজ আর ঘাবড়ায় না। এ চিঠি পরিতোষ গুপ্ত নামে প্রায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের। বাটের কাছাকাছি তাঁর বয়স। এ চিঠিতে নিশ্চয়ই তিনি সুনন্দাকে প্রণয় নিবেদন করেন নি। তবু ভূতপূর্ব স্বামীর চিঠিখানা সুনন্দা সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারে।

সঞ্জয় একটু হাসল। সুনন্দা জানে ও চিঠি সে ছোঁবেনা। তাই নিশ্চিন্তে চিঠিখানা ফেরৎ

তবু কী সাহস পরিতোষ বাবুর, কী স্পর্ধা! তিনি আজও সঞ্জয়ের স্ত্রীকে অনায়াসে চিঠি লিখতে পারেন। হলেনইবা তিনি বোগাশ্রমের পরিচালক। তবু সুনন্দাকে চিঠি লেখার কী অধিকার আছে তাঁর? লিখলে তিনি সঞ্জয়কে লিখতে পারতেন। সেইটাই শিষ্টতা হত।

কিন্তু তেমন শিষ্টাচার কবেই বা পরিতোষবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করেছে সঞ্জয়? সততা, হয়ত এই মানুষটির মধ্যে কদাচিৎ দেখেছে সঞ্জয়। বরং যত ঘনিষ্ট ভাবে মিশেছে তত বিশদভাবে পরিচয়ই ও পেয়েছে ওর। অবশ্য লৌকিক শিষ্টাচারে ভদ্রতায় তিনি চিরদিনই নিপুণ। কিন্তু তাঁর আড়ালে যে মানুষটি বাস করেন তাঁর লোভের সীমা নেই, তাঁর নীচতা ক্ষুদ্রতা অপরিসীম।

প্রথম আলাপের কথা আজও মনে আছে সঞ্জয়ের। সবে বাংলায় এম, এ, পাশ করে বেরিয়েছে। রেজাল্ট ভালো হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর সীমায় কোন রকমে স্থান পেয়েছে একটু।

হাই সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া বন্ধু সুব্রত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। আর একটা সাবজেকটে পরে এম, এ, দিয়ে নিলেই পারবে। তাছাড়া চাকরি বাকরির বাজার রেজাল্টের ওপর নির্ভর করে নাকি? লুকস্কির জোর থাকলে তুমি এতেই ভালো চাকুরি পেয়ে যাবে।'

কিন্তু সঞ্জয়ের কই সেই লুকস্কির জোর। বাবা মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী। চারটি ভাই বোন। কোন রকমে দিন চলে। এতদিন টুইশন করে নিজের পড়ার খরচ চালিয়েছে সঞ্জয়। ভাইবোনগুলিকেও কিছু কিছু সাহায্য করেছে। যে সব আত্মীয় বন্ধু সমাজের উঁচু সিঁড়িতে উঠে গেছেন তাঁদের সঙ্গে সঞ্জয়দের যোগাযোগ খুব কম। এক তরফা সম্পর্ক তো আর রাখা যায় না। সঞ্জয়দের দেখলেই তাঁদের আশঙ্কা হয় কী যেন চাইতে এসেছে। মুখের ভাব বদলে যায়। তাঁদের আশঙ্কা আর অস্বস্তি বাড়িয়ে কী লাভ! তাই সঞ্জয় কারো কাছেই যায় না। আত্মীয় স্বজন সবাইর সঙ্গেই তার সম্পর্ক ক্ষীণ। এই নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে খুব বকেন। তাঁর ক্ষোভ দুঃখ আক্ষেপ অভিযোগ শোনা যায়। 'লোকের কাছে যাবিনে, লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবিনে, লোকে তোর জন্যে কেন করবে বলতো? মানুষের কাছে যাবি, মানুষের সঙ্গে মিশবি, তবে তো মানুষ হতে পারবি। যা স্বভাব চরিত্র দেখছি বনমানুষ হয়ে চিরকাল বনে বনে ঘুরবি।'

কারো কাছে অসম্মানিত অনাদৃত হওয়ার চেয়ে সঞ্জয় বরং তখন বনমানুষ হওয়াই পছন্দ করত। এখনো তাই করে। এখনো কোন রকম বৈষয়িক সাফল্যের জন্যে সে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না।

কিন্তু সুব্রতের পীড়াপীড়িতে তার সঙ্গে সেদিন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

হরতুকি বাগান লেনের সেই মোতলা পুরোন বাড়িটির কথা এখনো বেশ মনে আছে সঞ্জয়ের। বিশ বছর হয়ে গেল। তবু বাড়িটি যেন এখনো ছবির মত ভাসে। অবশ্য বাড়িটি মোটেই ছবির মত সুন্দর

ছিল না। একতলায় ছটি তিনেক ঘর। তাতে ছোট একটি প্রেস আছে। দোতলায় বাসযোগ্য দু'তিন খানা ঘর। একটির গায়ে লেখা মন্দাকিনী অফিস। সন্ধ্যার পরেও সেই অফিস ঘর খোলা ছিল।

সুব্রত বাইরে থেকে বলল, 'পরিতোষদা আছেন?'

'আরে এসো এসো, সুব্রত এসো।'

সাদর সৌজন্যে আহ্বান করলেন গৃহস্বামী!

গলার স্বরটুকু বেশ মিষ্টি।

সুব্রত বলল আজ আমার একজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি পরিতোষদা।'

'বেশ তো ভালোই তো, সবান্ধবেই তো এখানে আসবে। সেই তো নিয়ম।'

ভদ্রলোক হেসে দোরের সামনে এগিয়ে এলেন। দীর্ঘ চেহারা। মোটামুটি সুপুরুষ বলা চলে! বয়স কত চটকরে আন্দাজ করা যায় না। তিরিশের ওপরে নিশ্চয়ই। কিন্তু কত ওপরে তা সঞ্জয় বুঝতে পারেনি। স্মিতমুখ প্রসন্ন চিত্ত ভদ্রলোককে দেখে সেদিন আকৃষ্টই হয়েছিল সঞ্জয়।

সুব্রত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল 'পরিতোষদা। মন্দাকিনী পত্রিকার সম্পাদক। আমার বন্ধু সঞ্জয় সরকার। আমাদের মতো এম, এ, পাশ করেছে। ওরও লেখার একটু আধটু হাত আছে পরিতোষদা। আর সাহিত্যে দারুণ উৎসাহ।

পরিতোষবাবু হেসে বলেছিলেন 'এই তো চাই। ভবিষ্যতের ভার তো তোমাদেরই হাতে ভাই।'

ঘরে আর কেউ ছিল না। পরিতোষবাবু টেবিলে বসে কী যেন লিখছিলেন।

সুব্রতের পিছনে পিছনে সঞ্জয় ঘরে ঢুকেছিল।

পরিতোষবাবু হেসে তাঁর সামনের চেয়ারটি দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো তোমাকে তো তুমিই বলতে পারি। তুমি যখন সুব্রতর বন্ধু।' সঞ্জয় হেসে বলেছিল 'নিশ্চয়ই। তুমি না বলে আপনি বললেই বরং আমার আপত্তি থাকত।'

পরিতোষবাবু কী যেন লিখছিলেন। লেখাটা বন্ধ করে বললেন, 'তোমারও লেখালেখার সখ আছে কি।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'আছে একটু একটু। কিন্তু সে নিতান্তই সখ। কিছুই হয়না।'

'কিছুই হয় না! কী করে বুঝলে তুমি কিছুই হয় না।'

সুব্রত বলেছিল, 'আর বলবেন না পরিতোষদা। সঞ্জয়ের মত এমন একজন পেসিমিষ্ট আমাদের দলে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

পরিতোষবাবু হেসে বলেছিলেন, 'তার মানে তোমার এই বন্ধুটির স্বভাবের মধ্যে গভীরতা আছে। যারা একটু হালকা ধরণের মানুষ তারাই অপটিমিষ্ট। যারা ভাবতে জানেনা ভাবতে চায়না তারাই সহজে সুখী হয়। সঞ্জয় তাহলে আমারই দলে।

সুব্রত বলল, 'আপনিও কি পেসিমিষ্ট পরিতোষ দা! আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয়না।'

পরিতোষবাবুর হাসি আরও নিগূঢ় রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন 'আমাদের যা দেখায় কি আমরা নিজেরা যা দেখি তাই কি সব সুব্রত? Dark continent এর মত আমাদের স্বভাবের বেশির ভাগ অংশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্যে তো দূরের কথা আমরা নিজেরাও জানিনা

আমরা কী। আমাকে পা ফেলে ফেলে আমাদের এগুতে হয়। তাই নিয়েই আমাদের কাজ চলে। কাজ তো চালাতেই হবে।'

'কের বুঝি তোমার তত্ত্বকথা আরম্ভ হয়েছে?

আমি দেখতে পাচ্ছি।'

ছিপ ছিপে লম্বা চেহারার একজন ভদ্র মহিলা ঘরে ঢুকলেন। দেখতে সুশ্রী। গায়ের রং গৌরবর্ণই বলা যায়। তবে উজ্জ্বল গৌর নয় একটু যেন ফ্যাকাসে। নাক চোখ টানাটানা। কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন বিষাদের ভাব আছে।

স্ত্রীর সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পরিতোষবাবু।

'আমার গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিদৌ।

ম্যানেজার সুনন্দার আরো কয়েকটি পদও আছে। তা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

সুনন্দা হেসে বলেছিলেন 'পদ না আরো কিছু। তোমার যা সম্পত্তি তার আবার ম্যানেজারি। তার আবার ক্যাশিয়ারি।

'কেন আমার সম্পত্তিটা একেবারে কম দেখলে কিসে!' পরিতোষবাবু হেসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'বাড়ি বাড়ি বিষয় আশয় সম্পত্তি বলতে কি শুধু এই সবই বোঝায়? এই যে সুব্রত, এই যে সঞ্জয়, আগেই ওর সঙ্গে আলাপ হল কিন্তু মনে হয় যেন কতদিন ধরে আমাদের চেনাশুনা এরা বুঝি আমার সম্পদ নয়?

তুমি বুঝি আমার সম্পদ নও?'

সবাইর সামনে পরিতোষবাবুর এই প্রকাশ্য প্রণয় ভাষণে সঞ্জয় আর সুব্রত একটু লজ্জিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরে একদিন যেতে না যেতে সঞ্জয় বুঝেছিল এইটাই ওদের রেওয়াজ। 'ওরা নিজেরা একা থাকলে ঝগড়া করেন আর বাইরের দোকজনের সামনে প্রণয় নিবেদন করেন।

একটু পরেই সঞ্জয় বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু পরিতোষবাবুও বাধা দিয়েছিলেন, সুনন্দাও সহজে ছেড়ে দেননি।

হেসে বলেছিলেন, 'তাই কি হয় বাবা? এই প্রথম এলেন? একটু মিষ্টি মুখ না করেই চলে যাবেন? তাই কি হয়?'

সঞ্জয় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের ওই মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা মধুর আচরণের চেয়ে আরো মধুর দ্রব্য কি থাকতে পারে তা যেন সেই মুহূর্তে সঞ্জয় ভেবে পায়নি।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে চাকরকে খাবার আনতে পাঠিয়েছিলেন সুনন্দা। চা এনেছিলেন নিজের হাতে।

সেই থেকে আলাপ।

সুব্রত কিন্তু বেশি জড়ায়নি। দু'তিন মাসের মধ্যেই সে চাকরি নিয়ে বাংলা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিল সঞ্জয় নিজে।

সে আর কিছুতেই বেরোতে পারেনি।

তাকে দুজনেই আকৃষ্ট করেছেন। পরিতোষবাবু আর ওঁর স্ত্রী দুজনে দুই অর্থে, দুই ভিন্ন

সঞ্জয় সে কথা নিজেও বুঝতে পারত। তবু না দিয়ে পারত না। ওঁদের জীবনযাত্রা সঞ্জয়ের কাছে যেমন যে স্বাভাবিক মনে হত তা নয়। কোথায় যেন একটা সোপনতা প্রচ্ছন্নতা আছে ওঁদের—বিশেষ করে পরিতোষবাবুর জীবনে। কখনো বা মনে হত ওঁর জীবিকার পথ তেমন সহজ সরল নয়। তবু সেই প্রচ্ছন্নতা নিগূঢ় রহস্যের মত সঞ্জয়কে আকর্ষণ করত।

সঞ্জয় মনে মনে কত দিন ভেবেছে কত কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে আর যাবে না, তবু না দিয়ে পারেনি।

অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ ভালোই চলেছিল।

সেই প্রথম সাক্ষাতের পর দিন পনের যেতে না যেতেই পরিতোষবাবু বললেন, 'সঞ্জয়, আমার ইচ্ছা তুমি এই কাগজটার দেখাশোনা কর। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছে যাদের কাছে ঘরো আছে তুমিই তাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি। তোমার সাহিত্যবোধ আছে, লেখার শক্তি আছে। এই কাগজ তুমিই চালাতে পারবে।'

সঞ্জয় লজ্জিত হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে খুসিও কম হয়নি।

হেসে বলেছিল, 'কী যে বলেন পরিতোষদা।'

পরিতোষদা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি পারবে? কে জানে ভবিষ্যতে তুমিই হয়তো একদিন এই মন্দাকিনী পত্রিকার সম্পাদক হবে। আমি তখন অন্যকাজে ব্যস্ত থাকব। কোন একটা কাজ নিয়ে বেশিদিন পড়ে থাকবার মত স্বভাব আমার নয়। আমার মেকিংএর মধ্যেই সেই স্থিরতা নেই। এই নিয়ে গৃহলক্ষ্মীর কাছে আমাকে বকুনি খেতে হয়। ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছেও কম ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয় না। কী করব বল 'অতীত্য হি গুণান সর্বান স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ত্ততে।' নিজের ছোটখাট দোষ ত্রুটি তখনো অকপটে স্বীকার করতেন পরিতোষবাবু। কিন্তু বড় অপরাধের কথা কৌশলে গোপন করে যেতেন।

'মন্দাকিনী' কাগজে সহ-সম্পাদকের চাকরি হল সঞ্জয়ের। নামে চাকরি। কিন্তু কোন মাইনে টাইনে নেই।

পরিতোষবাবু সঞ্জয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, মন্দাকিনীর এমন সাধ্য এখনো হয়নি তোমার মত গুণবান ছেলেকে মাইনে দিতে পারে। যখন ক্ষমতা হবে তখন আর বলতে হবে না। এখন শুধুই Love's labour. তবে it will be not the lost.'

সঞ্জয়ের তখন টাকা পয়সার দিকে খেয়াল ছিল না। নিজের খরচটা চালাতে পারলেই যথেষ্ট। সেই খরচ চালাবার জন্যে মাষ্টারী নিল সঞ্জয়, টুইশন নিল। আর কাগজের কাজটা হল তার শখের কাজ। সেই শখের জন্যেই সে মন্দাকিনী অফিসে আসে। এই আসাটা নেশার মত হল। মাইনে না পেলেও সঞ্জয়ের তেমন ক্ষোভ ছিল না। প্রথম যৌবনে কাগজ চালাবার একটা নেশা আছে। সঞ্জয় সেই নেশায় মশগুল হয়েছিল। নেশা যাচাই বাছাই-এর কাজও তার হাতে। সে ইচ্ছা করলে

এ কাগজে যা খুশি তাই লিখতে পারে। একি কম স্বাধীনতা? এর চেয়ে বেশি সুখ তখন সঞ্জয়ের পক্ষে কল্পনার অতীত ছিল।

তা ছাড়া আরো একটি গোপন কারণ ছিল সুখের। সঞ্জয় সুনন্দাকে পেয়েছিল সহকারিণী হিসাবে। তিনি চা দিতেন, খাবার দিতেন প্রুফের কপি দেখতেন। কোন লেখা যাবে না যাবে সে সম্বন্ধে মতামত দিতেন। সুনন্দার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিলনা। কিন্তু সাহিত্যবোধ ছিল। সঞ্জয় সেই বোধের উপর নির্ভর করত। নির্ভর করতে ভালো লাগত তার।

সাহিত্য সংসার সব দুজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে পরিতোষবাবু বাইরে বাইরে ঘুরতেন।

সঞ্জয় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, 'কোথায় থাকেন পরিতোষদা? আপনার দেখাই পাওয়া

পরিতোষবাবু জবাব দিতেন, 'পেটের ধান্দায় থাকি ভাই। দেখা পাবে কী করে।'

তারপর ধীরে ধীরে পরিতোষবাবুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে লাগল। ব্যাপারটা কি তাও খানিকটা টের পেতে লাগল সঞ্জয়। গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে পরিতোষবাবুর জানাশোনা। সহরের অনেক বড় বড় লোকের কুকীর্তির কথা সেই সূত্রে তার নখাগ্রে। পরিতোষবাবু ইচ্ছা করলে তা ছাপতে পারেন, ইচ্ছা করলে চেপে যেতে পারেন। কিন্তু টানাটানির সংসার পরিতোষবাবুর। তাই কিছু খরচ দরকার।

একথা জানবার পর থেকে সঞ্জয়ের মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল।

সংস্পর্শে থাকে এমন ইচ্ছে তার হয়নি।

কিন্তু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে সব বাঁধন তো আর ছেঁড়া যায় না। পরিতোষবাবুর সঙ্গে সে একটি মহৎকাজে তখন ব্রতী। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ আর তার সম্পাদনা সেই কাজে। সে কাজ দুএক বছরে শেষ হবে না। সে কাজ সময় সাপেক্ষ আর পরিশ্রম সাধ্য।

আরো একটি বন্ধন আছে। মধুর বন্ধুত্বের বন্ধন। সে বন্ধন সুনন্দার সঙ্গে। তখনো সম্পর্ক শুধু প্রীতির আর সৌখ্যের। আর কিছু ছিল না তার মধ্যে।

সুনন্দা সঞ্জয়ের চেয়ে বয়সে দুতিন বছরের বড়। জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আরো বেশি। তাকে বউদি বলেই ডাকত সঞ্জয়। মাস কয়েকের মধ্যে আপনি থেকে দুজনেই তুমিতে নেমেছিল।

সঞ্জয়কে সুনন্দাও ছেড়ে দিতে চায়নি। বলেছেন, 'উনি তাহলে আরো পেয়ে বসবেন। একেবারেই যা ইচ্ছা তাই শুরু করবেন। তুমি থাকো সঞ্জয়। তুমি থাকলে আমি ভরসা পাই। আমরা দুজনে মিলে ওঁকে বাঁধব। ওঁকে ঠেকাব।'

কিন্তু পরিতোষবাবু যে তাদের দু'জনের তুলনায় অনেক' বেশি শক্তিধর তা সঞ্জয় অনুভব

মাঝে মাঝে সমালোচনাও করত সঞ্জয়। মুখের ওপরই বলত, 'পরিতোষদা, আপনার এ সব আমার পছন্দ হয় না।'

পরিতোষবাবু হেসে বলতেন, 'কোন সব।'

'আপনি অন্যের দুর্নাম রটনার ভয় দেখিয়ে টাকা নেন। এটা কোন ভদ্রলোকের জীবিকা নয়। এর নাম ব্ল্যাক মেইলিং।'

পরিতোষবাবু কিন্তু চটেননি। শান্ত স্মিত মুখে বলেছিলেন চাঁদ তাঁহার নাম যে মুড়ি তা আমিও জানি। কিন্তু তুমি যে এত বড় চার্জ আমার নামে আনছ কোন প্রমাণ পেয়েছ? পেয়ে থাকো তো বল, আমাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দাও।'

সঞ্জয় চুপ করে গিয়েছিল।

সত্যি তার হাতে কোন প্রমাণ ছিলনা। মাঝে মাঝে দু'চারজন পুলিশ অফিসারকে সে এ বাড়িতে আনাগোনা করতে দেখেছে। আর পুলিশ যাদের ধরে নিয়ে যায় ঠিক সেই ধরনের মতো মার্কা দুচার জন লোকের সঙ্গেও পরিতোষবাবুকে পরামর্শ করতে দেখেছে সঞ্জয়। তাতেই প্রমাণ হয় না পরিতোষবাবু ওদের দলের একজন। কিন্তু হাতে হাতে প্রমাণই কি সব। মানুষের অনুভব-শক্তি কি কিছুই নয়?

পরিতোষবাবু হেসে সঞ্জয়ের কান মলে দিয়েছিলেন সঞ্জয়ের। কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে। তুমি শুধুই বড় কান দাও। এই তার শাস্তি। ওসব দিকে কান না দিয়ে তুমি নিজের মনে নিজের কাজ করে যাও। সেই হল সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। অনেক দুষ্ট লোক পরিতোষ গুপ্তের নামে অনেক বাজে

কথা বলবে। স্বার্থে ঘা লাগলেই মানুষ চেঁচামেচি করে। কিন্তু সব চীৎকারই আর্তের চীৎকার নয়; পরিতোষ গুপ্ত দুর্জনকে শায়েস্তা না করতে জানুক, কথতে জানে, ভয় দেখাতে জানে। তার জন্যে তাকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হতে হয়। এই ক্ষেত্র-আপাতত্বকু না নিয়ে তার উপায় নেই। তার জনবল নেই, অর্থ-বল নেই, শাসন ত্রাসনের তার যাদের হাতে সে তাদের মধ্যে পড়েনা। এসব সত্ত্বেও সে যে কিছু করতে চেষ্টা করছে কিনা, কিছু গড়ে তুলতে পারছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রেখো।'

পরিতোষবাবু বেশ জোরের সঙ্গেই কথাগুলি বলেছিলেন। সেই জোরের কাছে মাথা না নুইয়ে পারেনি সঞ্জয়। অভিভূত করবার মত শক্তি পরিতোষবাবুর ছিল।

সুনন্দা তখন অন্তঃসত্ত্বা। এর আগে একটি বাচ্চা নষ্ট হয়েছে। সুনন্দার নিকট সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। অন্তত তাঁদের কথা সঞ্জয় শোনেনি। সুনন্দার মুখেও না পরিতোষবাবুর মুখেও না। কাউকে আসতেও দেখেনি বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তখন তেমন সংস্রব ছিলনা পরিতোষবাবুর। কিন্তু স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষার জন্যে আর একটি মেয়েকে আনলেন পরিতোষবাবু। তার নাম মহু। আঠের উনিশ বছর বয়স, দেখতে আরো সুন্দরী। তারও নাকি তিন কূলে কেউ নেই। পরিতোষবাবু বললেন মহু সম্পর্কে তাঁর মাসতুতো বোন হয়। তাকে দেখে সুনন্দার মুখ ভার হল। এই মনের পরিচয় তাঁর জানা ছিলনা তা স্পষ্টই বুঝতে পারে সঞ্জয়।

কিন্তু মহু শুধু সুন্দরীই নয়, সে খুব কাজের মেয়ে। সেবায় শুশ্রূষায় সে দুহাতে অন্তত চার হাতের কাজ করে।

সঞ্জয়ের মতই বউদি বলে ডাকে সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা তাতে প্রীত হয় না।

সঞ্জয় তখনই লক্ষ্য করত সুনন্দার চেয়ে মহু পরিতোষবাবুকে বেশি আনন্দ দেয়। পরিতোষবাবুর মধ্যে যে উদ্যমতা আছে মহু যেন তারই অংশভাগিনী। দুজনের প্রকৃতির মধ্যে মিল আছে সঞ্জয় তখনই লক্ষ্য করেছিল।

মহু পরিতোষবাবুকে কোন কাজে বাধা দিত না, কোন তর্ক করত না, সৎপথ অসৎপথ নিয়ে মাথা ঘামাত না। সব পথই যেন জীবনের চলবার পথ। যে ছুটে চলতে পারে তার কাছে কোন পথই যেন বিপথ নয়।

অবশ্য কখনো কোন বড় বড় কথা মহুর মুখে শোনেনি সঞ্জয়। তত্ত্বের ধার ঘেঁষে সে চলত না। সেই বিদ্যা বুদ্ধিও তার ছিল না। চলায় বলায় জীবনী শক্তির প্রাচুর্য ছিল তার মধ্যে।

সেই শক্তি অল্পদিনের জন্যে সঞ্জয়কেও মুগ্ধ করেছিল।

পরিতোষবাবুর তা চোখ এড়ায়নি। তিনি এসব নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন মহুকে বেশ মানায়, কি বল সুনন্দা।'

সুনন্দা বলতেন, 'এ কি আর তোমার মনের কথা? কার সঙ্গে কি মেশে তাও জানো।

পরিতোষবাবু লজ্জার ভান করে বলতেন, 'ছি ছি ছি একি বলছ।'

মহু কি বুঝতে পারত না সে সুনন্দার মনে অশান্তির সৃষ্টি করেছে? পারিবারিক বিশৃঙ্খলাকে এগিয়ে আনছে? হয়তো পারত। কিন্তু বুঝতে যেন চাইত না। কি যখন যেটুকু সুবিবেচনা তার আসত পরিতোষবাবু তা ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন।

তারপর ছেলে হতে সুনন্দা হাসপাতালে গেলেন। মা হতে চলেছেন কিন্তু মনে যেন সুখ নেই। ঘরের অশান্তি তাঁকে এমন ভাবে ঘিরে ধরেছে।

ছেলের নাম পরিতোষবাবু নিজেই রেখেছিলেন। অভ্যেসমত রেখেছিলেন সঞ্জয়ের কাছে 'কী, নামটা তোমার পছন্দ তো? বেশ ধনীর গন্ধ আছে না? তোমাদের উপযুক্ত নাম।

পরিহাস ছিল পরিতোষবাবুর কথায়। কিন্তু এ পরিহাসের মানে কি। ধ্রুব তো তাঁরই ছেলে। তার নাম সঞ্জয়ের পছন্দ হোক আর না হোক তাতে কী এসে যায়?

ধ্রুব দেখতে খুব সুন্দরই হয়েছে। পরিতোষবাবু নিজেও তো সুপুরুষ। বরং সঞ্জয়ই রূপের দিক থেকে হীন। রং কালো চোখদুটো। মাথায় সেই বয়সেই টাকের আভাস পড়তে সুরু করেছে।

এই রূপের রাজ্যে আর একটু রূপ থাকলে বেশ ভালো হত সঞ্জয়, ভাবত মাঝে মাঝে। কিন্তু প্রকৃতি এ ব্যাপারে তার প্রতি ঘড়ই কার্পণ্য করেছে।

কিন্তু হাসপাতালের কেবিনে পুরুষ দেখে সুনন্দার শান্তি ছিলনা। স্বামীর কথাই বারবার তাঁর মনে পড়ত।

মাঝে মাঝে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করতেন সুনন্দা! 'মধু ওই বাড়িতেই আছে তো?'

সঞ্জয় হেসে বলত, 'আর কোথায় যাবে? ও থাকবে বলেই তো এসেছে।'

সুনন্দা যে এধরনের পরিহাসে আঘাত পান তা সঞ্জয় জানত তবু একটু খোঁচা দেবার লোভ যেন সামলাতে পারত না।

সুনন্দা বলতেন, 'না ও থাকতে পারবে না। আমি গিয়ে ওকে যদি ও বাড়ি থেকে না তাড়াই—আচ্ছা, সঞ্জয় তুমি আমার একটি উপকার করবে? বন্ধুর কাজ করবে?'

'বলো কী করতে পারি।'

'তুমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাও।'

সঞ্জয় হেসে উঠেছিল, 'তাতে কি সমস্যা মিটবে? আমি ক'জনকে বিয়ে করব?'

'তা ঠিক। তুমি আর কজনকে।' হঠাৎ যেন নিভে যেতেন সুনন্দা। তাঁর কষ্ট দেখে সঞ্জয়ের আরো বেশি কষ্ট হত।'

তারপর সুনন্দা ছেলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই অশান্তি আর মনোকষ্ট তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না।

মধুকে নিয়ে প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হত। সুনন্দা বলতেন, 'তুমি এতদিন বাইরে বাইরে যা করেছ করেছ। কিন্তু ঘরের মধ্যে তুমি আর একজনকে এনে পুষবে তো আমি সহ্য করতে পারব না।'

পরিতোষবাবু অসংকোচে অবিচলিত ভাবে বলতেন, 'মধু তো তোমার সেবা করবে বলেই এসেছে। ওকে যদি তোমার পছন্দ না হয় বল ওকে সরিয়ে দিই।'

অথচ সত্যি মধুর ওপর পরিতোষবাবুর কোন অসংযত আচরণ সঞ্জয়ের চোখে পড়েনি। হাসি ঠাট্টা করতেন এই পর্যন্ত। বেশদিন আনন্দিত হতেন, কথা বলতে উল্লাস বোধ করতেন।

তবু সুনন্দার ঈর্ষার ধরণ দেখে সঞ্জয়ের মনে সন্দেহ হত স্ত্রী স্বামীর মনের কথা যে ভাবে জানে তেমন আর কেউ জানতে পারে না।

মধুর উচ্ছলতা, প্রাচুর্য থেকে সঞ্জয় যত সে পরিতোষবাবুর কাছে গভীর কিছু পেয়েছে। অন্তত কিছু আশ্বাস, কিছু প্রতিশ্রুতি তাকে দিতে পরিতোষবাবু কোন কার্পণ্য করেন নি।

মধু অসংকোচে পরিতোষবাবুর টেবিল গুছিয়ে দিত। ধূপদানিতে ধূপ কাঠি জেলে দিত, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখত।

আর তার প্রতিটি কাজ দেখে সুনন্দা ঝঙ্কার দিতেন, খবরদার তুমি এসব কখনো ছোঁবেনা। তোমাকে এসব কে করতে বলেছেন।'

মধু বলত, 'পরিতোষদা বলেছেন বউদি।'

সঞ্জয়ের এক একদিন মনে হত সুনন্দা যেমন তার সঙ্গে গল্প করে তাকে সঙ্গ দান্ত্বিয়া দিয়ে স্বামীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করেন তেমনি তার প্রতিশোধ নিবারে পরিতোষবাবু মধুর ওপর বেশি অনুরাগ দেখান। তাকে ঈর্ষান্বিত করাই তার উদ্দেশ্য। তিনি হয়তো আসলে মধুকেও ভালোবাসেন না। তিনি শুধু নিজেকেই ভালোবাসেন।

পরিতোষবাবুর সেই আত্মপ্রেম যে কত নির্লজ্জ তা আরো বছরখানেক পরে প্রমাণিত হল।

প্রবচন সংগ্রহের প্রথম খণ্ড বেরোল। কথা ছিল সেই বইয়ের যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে সঞ্জয়ের নাম থাকবে। পরিশ্রম বেশির ভাগ সেই করেছে। পরিতোষবাবু শুধু মাঝে মাঝে উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম পাতা খুলে সঞ্জয় দেখতে পেল পরিতোষবাবুই সেখানে একমেবদ্বিতীয়ম হয়ে আছেন, সঞ্জয়ের সেখানে নামগন্ধও নেই। অবশ্য ভূমিকার শেষের দিকে কয়েকজন বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সেখানে সহকারী হিসাবে সঞ্জয়েরও উল্লেখ আছে।

সঞ্জয়ের আর সহ্য হল না। সে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি হল পরিতোষদা?'

পরিতোষবাবু তেমনি হেসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

সঞ্জয় বলল, 'সম্পাদক হিসাবে আমার নামও থাকবে আপনি কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু নাম তো দেখলাম না।'

পরিতোষবাবু শান্তভাবে বললেন, 'নামের জন্যে অত ক্ষেপে উঠলে কেন? নামের সময় এখনো যায় নি। পাবলিশারের পরামর্শেই এ কাজ করেছি। তোমার নামটা গ্রন্থকারদের মধ্যে থাকলে বই বিক্রি হত না। নামের জন্যে ভেব না। দ্বিতীয় খণ্ডে তোমার নামটাই আগে থাকবে। কি তখন তুমিই একমাত্র হয়ে থেকো।'

কিন্তু সেই আশ্বাসে সঞ্জয় কোন সান্ত্বনা পায় নি।

সুনন্দা অবশ্য সঞ্জয়ের হয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, 'এ-তোমার কী অন্যায়। কেন তুমি সঞ্জয়ের নাম দিলে না? ও যে দিনরাত কত খেটেছে, গাঁটের পয়সা খরচ করে কত জায়গায় ছুটোছুটি করেছে তা তো আমি দেখেছি। তুমি কেন ওর নাম চুরি করবে?'

পরিতোষবাবু হেসে জবাব দিয়েছেন, 'ও তোমার মন চুরি করেছে। সেই অমূল্যধনের কাছে ওর নামটা এমন কিছু বেশি দামি নয়।'

সঞ্জয়ের সাক্ষাতেই এ সব কথা বলেছেন পরিতোষবাবু। একটুও তাঁর লজ্জা হয়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে সঞ্জয় আর অপেক্ষা করেনি। সে জোর করে নিজেকে গুপ্ত পরিবারের ওই গুপ্ত গহ্বর থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এর আগেও মন্দাকিনীতে সঞ্জয়ের কোন কোন রচনা

পরিতোষবাবুর নামে চলে গেছে। সে সব লেখায় অবশ্য কারোরই নামসঙ্ক থাকত না। তার খ্যাতিটুকু পরিতোষবাবু কৌশলে গ্রহণ করতেন, দুর্নাম হলে আঙুল বাড়িয়ে দিতেন সজয়ের দিকে।

হেসে বলতেন, 'তুমি যুবক। বোঝা বইবার শক্তি তোমার বয়সখানি আমার কি আর তত আছে। তাছাড়া একটু নিন্দাভাজন হওয়া ভালো তাতে ঘাড় শক্ত হয় মন শক্ত হয়।'

হাসি পরিহাস দিয়ে নিজের সব দুষ্কৃতিকে পরিতোষবাবু ঢেকে দিতে পারতেন, অপকর্মকে কল্যাণকামনার বর্মে ঢাকতেও তাঁর ত্রুটি ছিল না।

আঘাত খেয়ে প্রতিঘাত দিতে পারেনি সজয়। পুরোন পারিবারিক আশ্রয়ে ফিরে এসেছিল। অন্তত আসতে চেয়েছিল। অবশ্য ফরওয়ার্ডিং এজেন্সির এ বাড়ির আশ্রয় তো সে ত্যাগ করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িটি যেন শুধু খাবার জায়গা আর ঘুমোবার জায়গা। বাপ-মা-ভাই-বোনের যে বন্ধন যেন বন্ধনই নয়। তার নিজের গড়ে তোলা বন্ধুত্বের বন্ধনই যেন সবচেয়ে বড়। সেইভাবেই চলে এসেছিল সজয়। কেউ চলন বদলাতে দিয়ে রেখে তা আর চলে না। বাড়িতে শুধু থাকবার আর খাবার জায়গাটুকুই আছে সজয়ের আর কোন আশ্রয় নেই। যে আসনে তার জন্মগত অধিকার ছিল, সে আসনে মেজো ভাই এসে বসেছে। মা নেই, বাবা অসুস্থ। মেজোই এখন বড়কর্তা। যে সহজ শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্কটুকু ছিল ভাইবোনদের মনে তা ক্রমে শিথিল হয়ে গেছে সজয় দেখতে পেল। ওদের দোষ দেওয়া যায় না। দোষ তারই। হৃতগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা সে আর করেনি। তার চেয়ে নিজেই সরে গিয়ে মেসের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তাতে বাবার কোন অসুবিধা হয়নি। সজয়ের চেয়ে বেশি কর্মক্ষম রঞ্জিৎ আর অঞ্জনই তখন বাবার ডান হাত বাঁ হাত হয়ে উঠেছে। সজয়কে বিয়ের জন্যে দু'একবার অনুরোধ করা হয়েছিল। সে রাজি হয়নি। কিন্তু গৃহিণী ছাড়া তো সংসার চলতে পারে না। তাই রঞ্জিতই বিয়ে করেছে আগে। তার ফলে যথাকালে অঞ্জনও বউ এনেছে।

পরিতোষবাবু আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সজয় আর ওমুখো হয়নি। গিয়ে কী করবে? পরিতোষবাবুর সেই পত্রিকা উঠে গেছে, প্রেস বিক্রি করে দিয়েছেন, গ্রন্থ সংকলনের নেশাও আর নেই। জীবিকার জন্যে আরো গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ তিনি অবলম্বন করেছেন। সে পথ সম্বন্ধে সজয়ের কোন ধারণা নেই। কিন্তু ওসব পথের পথিকদের ছায়াও যে সে মাড়াবে না সে সম্বন্ধে তার মন নিঃসংশয় হয়েছে।

সজয় স্কুলে মাস্টারি করে, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে পড়ায়। যেন খরচা বাদে, নিজের সামান্য হাত-খরচা বাদে যা বাঁচে বাবার হাতে দিয়ে আসে। কিন্তু বাবা তাতে খুশি হন না।

'কে চায় তোর টাকা? আমি কি টাকার কাঙাল?'

'কে বলে তুমি কাঙাল? আমি নিজেই দিচ্ছি। দেওয়া আমার কর্তব্য তাই দিচ্ছি।'

'থাক, তুই আর কর্তব্যের বোঝাই পারিসনে। তুই যে কত কর্তব্যপরায়ণ, কত সৎপথে চলছিস তা আমার জানা আছে।'

সজয় প্রতিবাদ না করে সরে এসেছে।

এরপর আর বাবার হাতে টাকা দেয়নি। বোনের হাতে দিয়েছে।

রেখা ছলছল চোখে বলেছে, 'দাদা, তুমি কেন মেসে পড়ে থাকো। আমাদের সঙ্গে এসে

থাকো না। তুমি তো সবই পাও। টাকা-পয়সা পাও, বইটই কিনে দিয়ে যাও। শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ সবই তোমার কাছ থেকে পাই, শুধু তোমাকেই পাই না।'

সঞ্জয় সস্নেহে ছোট বোনের গাল টিপে দিয়ে বলেছে, 'খুব বড় বড় কথা শিখেছিস। আমাকে আবার কী পাবি। যাকে পাওয়া দরকার তাকে খুঁজে এনে দেব। দুটো দিন সবুর কর।'

কিন্তু সবাইর কাছ থেকে সরে থাকতে পারলেও একজনের কাছ থেকে সরে থাকতে পারেনি সঞ্জয়। স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই বনিবনাও হয়নি সুনন্দার। পরিতোষবাবু সুনন্দাকেও রাখতে চান, মহুকেও রাখতে চান। একজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ্য আর একজনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন। সুনন্দা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে বুব সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে চেংমারি আছেন। এখবর সঞ্জয় আগেই পেয়েছিল। সুনন্দার চিঠিতে তারই সমর্থন পেল।

সুনন্দা লিখেছেন, 'বড় অসুবিধের পড়েছি। একদিন এসে যদি দেখা কর খুব খুসি হব।'

সঞ্জয় না গিয়ে পারেনি। সেও তো নিরাত্মীয় নিঃসহায়। সুনন্দার ডাকে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি।

দাদার বাসায় একটি ঘর নিয়ে থাকেন সুনন্দা। তিনিও চিঠিপত্র করেন। গেছেন। হঠাৎ যেন বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে।

সঞ্জয় ভেবেছিল আর্থিক অসুবিধার কথা বলবেন সুনন্দা। কিন্তু তা তিনি বললেন না। নিজের অসুখ বিসুখ অস্বাস্থ্য নিয়েও কোন কথা তুললেন না। বরং সঞ্জয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে দেখে উদ্বেগ জানালেন। বিয়ে টিয়ে করছে না কেন মৃদু অনুযোগ দিলেন। পরিহাস করলেন একটু।

আসল সমস্যা এবারে নিয়ে। ছেলেকে নিয়ে যেতে চান পরিতোষবাবু। কিন্তু সুনন্দা ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারেন না। অতটুকু ছেলেই বা মাকে ছেড়ে থাকবে কী করে?

পরিতোষবাবু এই নিয়ে চিঠি লেখালেখি করছেন। পাঠিয়েছেন উকিলের চিঠি দেখেন। লিখেছেন, 'ও যদি তোমাকে ছাড়া থাকতে না পারে—ওকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে থাকো। কিন্তু আমার ছেলেকে অন্যের আশ্রয়ে মানুষ করতে তা হতে দেব না।'

সঞ্জয় বলল, 'ঠিকই তো বলেছেন।'

সুনন্দা বললেন, 'আমি জবাব দিয়েছি মহুকে তুমি যতদিন ত্যাগ না করবে আমি তোমার বাড়িতে যাব না। তুমি যদি আইন আদালত কর। আমিও যাব সেখানে। আমারও বলবার কথা আছে।'

যেন দুজনেরই সমান। পরিতোষবাবুও তাঁর পথ ছাড়বেন না, সুনন্দাও তাঁর মত ছাড়বেন না। তবে আইন আদালতের ভয় যতই দেখান পরিতোষবাবু সেদিকে শেষ পর্যন্ত যেতে চাইবেন না। হয়তো তাঁরও দুর্বলতা ছিল।

তবু তিনি সঞ্জয়কেও দেখাতে ছাড়েন নি। চিঠি লিখে জানিয়েছেন সুনন্দা স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছেন না এর মূলে আছে সঞ্জয়। তারই পরামর্শে তিনি এমন দূরে সরে আছেন। সঞ্জয় যদি এখনো সুপরামর্শ না দেয় তিনি শেষ না নিয়ে ছাড়বেন না। ব্যাপারটাকে তিনি আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন।

এসব চিঠির কোন জবাব দেয়নি সঞ্জয়। ভয় পায়নি। যা খুশি করবার তিনি করুন।

কিন্তু পরিতোষবাবু করেন নি শেষ পর্যন্ত কিছুই।

হাড়াহাড়িটাই সকলে মেনে নিয়েছে। আর বেশি কথা কলরোল হৈ চৈ হট্টগোল যে নিষ্ফল তা বুঝতে পেরেছে সবাই।

পরিতোষবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সুখের হয়েছেন। সুনন্দা অবশ্য অত তাড়াতাড়ি মন স্থির করতে পারেন নি। ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। সে কী ভাববে। তাই বছরের পর বছর শুধু বন্ধু হিসাবেই রয়েছে সঞ্জয়। অধীর হয়ে ওঠেনি, অসহিষ্ণু হয়নি। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে।

তারপর অবশ্য সুনন্দা রাজি হয়েছেন। নিজেই প্রস্তাব করেছেন, 'এভাবে থাকাটা আর ভালো দেখায় না। তুমি যখন বিয়ে করলেই না, সংসারী হলেই না', এসো এক বাড়িতেই থাকি। সম্পর্কটাকে বৈধ করে নেওয়াই ভালো। ছেলে বড় হয়েছে। সেও এখন তাই বলে।'

যেন ছেলের অনুমতির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন সুনন্দা।

সঞ্জয় ইচ্ছা করলে 'না' করতে পারত। বলতে পারত, 'এখন আর তার দরকার নেই সুনন্দা। এখন আমরা দুজনেই উত্তীর্ণ যৌবন। বাকি দিনগুলি, যেমন আছি আমাদের কেটে যেতে পারে।'

কিন্তু সঞ্জয় তা বলেনি। বলতে পারে নি। নারীর ঘর বাঁধার আগ্রহকে অপমান করতে সায় দেয়নি তার মন।

সঞ্জয় নিজেও কি কোন একটা আশ্রয় চাইছিল?

যৌবনের সেই উত্তালতা উদ্দামতা এখন অস্তমিত। দ্বিতীয় সন্তান হবার আশাও আর সুনন্দার নেই। সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ভার্যা পুত্রার্থে ক্রিয়তে নয়। শুধু ভার্যার জন্যেই ভার্যা।

তবু সঞ্জয় রাজি না হয়ে পারে নি।

ধ্রুবও সব মেনে নিয়েছে। তার সঙ্গে এখন সঞ্জয়ের মোটামুটি প্রীতির সম্বন্ধ একটা কিছু স্বীকার করে। কিন্তু কোন রকম সম্বোধন করে না। ধ্রুব মিতভাষী। ধীর শান্ত। ও ঠিক যত কাছের, তত দূরের।

একটু বড় হওয়ার পর ওকে হস্টেলেই রেখেছে সুনন্দা। এখনো হস্টেলেই থাকে। তবু বাড়িতে ওর জন্যে আলাদা একটি ঘর আছে। ছুটি-ছাটায় সে ঘরে এসে থাকে ধ্রুব। নিজের ঘরে নিজের মনে নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকে। তখন ওর আর নাগাল পাওয়া যায় না। যেন কাছে থেকেও কাছে নেই।

কোথায় যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে সঞ্জয়। কিসের যেন এক অপরাধ বোধ খোঁচা দেয়। তবে কী দরকার ছিল, এই বিয়ের কী দরকার ছিল।

সুনন্দার উৎসাহ উদ্যম আয়োজন-অমি বাড়িটাড়ি করবার ইচ্ছা দেখে সঞ্জয়ের মনে হয় না সে আর এখন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। সে সব ভুলে গিয়ে সুখী হতে চায়, স্বামী পুত্রকে সুখী করতে চায়। পূর্ব জীবনের কথা সে আর মনে করতে চায় না।

আজও পরিতোষবাবু শুধু সব কথা তাকে আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বাকি সব বিরোধ মিটিয়ে নিতে চান।

এই আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তিতে সঞ্জয়ের বিশ্বাস নেই। সুনন্দা যদি যেতে চায় যাক। ধ্রুব যদি যেতে

চায় থাক। সঞ্জয় যেতে পারবে না। এতদিন বাদে পরিতোষবাবুর মুখ একটা যে রাগ আছে তা নয়। ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। বিরাগ বিদ্বেষ আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ সব তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আবার দেখা হলে সব ফিরে আসতে পারে। কেন এসা সঙ্কেতে যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হবে তা সহ্য করবার শক্তি সঞ্জয়ের নেই। কি শক্তি থাকলেও ইচ্ছা আর আগ্রহের অভাব। ওরা ঘুরে আসুক। সঞ্জয় ততক্ষণ বাড়িতে বসে থাকবে। কি একটা বেরিয়ে পড়বে। পার্কে গিয়ে বসে থাকবে। না হয় পথে পথে ঘুরবে। নিজের নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করবে সঞ্জয়। নিঃসঙ্গতা কি সে বাড়িতে থেকেও বোধ করে না? সুনন্দা আর ধ্রুব যখন নিজেরা বসে কথাবার্তা বলে, ছেলে তার সাধ-আহ্লাদের কথা মার কাছে বলে, আর মা বসে বসে শোনে আর মৃদু টিপে টিপে হাসে তখন কি সঞ্জয়ের মনে হয় না সে এদের মধ্যে বহিরাগত। বিয়েই করুক আর যাই করুক সঞ্জয় সুনন্দাকে যেন পুরোপুরি পায়নি। ওর স্নেহের মধ্যে সন্তান হয়ে পুনর্জন্ম নিতে পারেনি সঞ্জয়। ধ্রুবকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার তো কথাই ওঠে না। ওরা দুজন তো একসঙ্গে অনেক জায়গাতেই যায়। যদি আরো এক জায়গায় যেতে চায় যাক। সঞ্জয় বাধা দেবে না। কিন্তু সে যাবেও না ওদের সঙ্গে।

'কী বসে আছ যে? চান করতে যাবে না? কত বেলা হল দেখ তো।

সুনন্দা এসে স্বামীকে তাগিদ দিল।

'এই যাচ্ছি।'

'না না, এখুনি ওঠো। যাও আর দেরি কোরো না।'

ধ্রুব ওর বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় বেরোল। চান-টান করেই গেছে। এসেই খেতে চাইবে। আমরা আজ এক সঙ্গে বসে খাব। যাও, আর দেরি কোরোনা।'

সুনন্দা স্বামীর পিঠে হাত রাখল। যেন ধ্রুবর মত এও আর একটি অবুঝ অশান্ত ছেলে।

স্নানের তাগিদে আজ বোধহয় একটু বিরক্তই হল সঞ্জয়। প্রিয়া করস্পর্শে যেন তার অসহিষ্ণুতা বাড়ল।

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

সুনন্দা একটু আগেই স্নান করে এসেছে। পিঠে এলো চুলের রাশ ছড়ানো। হাতে দুগাছি করে চুড়ি আর শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা, কপালে ফোঁটা। লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি পরেছে। কী ভেবে সুনন্দা আজ এসব পরেছে কে জানে। অন্তত পূর্ব স্বামী পরিতোষবাবুর কথা ভেবে পরেনি। তিনি এসব পছন্দ করতেন না। তিনি বয়সে প্রবীণ কিন্তু মতামতের দিক থেকে অনেক আধুনিক। তিনি ধর্ম মানতেন না ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। সুনন্দা যখন তাঁর স্ত্রী হয়ে ছিল তখন তার এখন গৃহিণীর সজ্জা ছিল না।

তিনি বলতেন, 'তোমার অমন লক্ষ্মীঠাকরুণ হয়ে থাকার দরকার নেই। আমি নিজে অলক্ষ্মীর চেলা, উড়ন চণ্ডী। আমার ঘরে ওসব মানায় না।'

সুনন্দা কবে সঞ্জয়ের কথা ভেবেই আজ এসব পরেছে?

সঞ্জয় পছন্দ করে শ্রীশ্রী, লক্ষ্মীশ্রী। পূজো-পার্বণ সেও পছন্দ করে না কিন্তু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যেখানে তার চোখে সৌন্দর্য ধরা পড়ে সেটুকু সঞ্জয় রেখে দিতে চায়।

সঞ্জয় বলে, 'আমার মা ঠিক ওই রকম করে সাজতেন না। ছিল না।
সিঁদুর আর আলতাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রসাধনের বস্তু।

গয়না-গাঁটি সুনন্দারও বেশি নেই। সঞ্জয় গড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু সুনন্দাই রাজি হয়নি। হেসে বলেছে, 'গয়না পরতে আমার ভালো লাগে না।'

সঞ্জয়ের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলেছে, 'এই তো আমার গয়না।'

এই আদর এই কৃতজ্ঞতা সঞ্জয়ের প্রাপ্য। সঞ্জয় তার জন্যে অনেক করেছে, অনেক সয়েছে। সেই তুলনায় সুনন্দা ওকে কীই বা দিতে পারল। আর যাই দিক সন্তান দিতে পারেনি। পারবে না যে সে কথা সুনন্দা আগেই বলেছিল। ধ্রুব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কারো আসার পথ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নইলে সুনন্দা নিজে বাঁচত না। প্রকৃতি যেন তাকে বলে দিয়েছে 'তোমার আর মা হয়ে হয়কার নেই তুমি শুধু প্রিয়া হয়ে থাকো', কিন্তু তাই কি আর হয়? আরো মা হতে ইচ্ছা করে। অন্তত আর একবার মা হতে ইচ্ছা রয়েছে সুনন্দার। নিজের জন্যে নয় সঞ্জয়ের জন্যে। কিন্তু শুধু ইচ্ছা করলেই তো আর হয় না। চাইলেই মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

সন্তান যে আর হবে না সে কথা প্রথম প্রথম অস্পষ্ট ভাবে আকারে ইঙ্গিতে তারপর স্পষ্ট ভাষাতেই সঞ্জয়কে জানিয়ে দিয়েছিল সুনন্দা। বিয়েতেও দিবা যে তার এজন্যে সে কথা বলেছিল। 'আমি তো তোমাকে সব আনন্দ দিতে পারব না।'

একটু থমকে গিয়েছিল সঞ্জয়। মুখে কিসের যেন একটু ছায়া পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেটুকু কাটিয়ে উঠে হেসে বলেছিল, 'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে পেলেই আমি সব পাব। তাছাড়া বংশধর রেখে যাওয়াই তো জীবনের একমাত্র গৌরব নয়। বলা যায় না বুড়ো বয়সে কীর্তিধরও তো হতে পারি।'

একটু থেমে সঞ্জয় বলেছিল, 'তাছাড়া আমাদের ধ্রুবই তো আছে। সে আমাদের দুজনেরই। তোমার কায়ন্ত আর আমার মনোজাত।'

ধ্রুব অবশ্য সঞ্জয়ের কাছে সে ভাবে ধরা দেয়নি। কিছু বলে ডাকে না। অবশ্য ডাকাটা কঠিন। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে কাকা বলত। এখন কী বলবে? কিছুই বলে না। বি-পিতার ওপর তার যে বিরূপতা আছে তা নয়। সঞ্জয়কে সে শ্রদ্ধা করে। তার ত্যাগ, তার একনিষ্ঠ প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়। এখন তো বড় হয়েছে। এম. এ. পড়ে ছেলে। সবই জানে, সবই শুনেছে সবই বোঝে।

তবু ধ্রুব সঞ্জয়ের কাছ থেকে যেন দূরে সরে থাকতে চায়। সামনে এলে ওর লজ্জা জড়তা আড়ষ্টতা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

ধ্রুব যে তাদের দুজনের ছাড়া আরো একজনের একথা যেন সে অনুভব করতে পারে না। ভুলতে কি সুনন্দাই সব সময় পারে? ওর চেহারা বারবার সে কথা মনে করিয়ে দেয়। নাক চোখ মুখের ভৌল জোড়া ভ্রূ সব তাঁর মত। গায়ের সৌরবর্ণও বাপেরই পেয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করে সুনন্দা ধ্রুব যেন তাঁর আর কিছু না পায়। স্বভাবটা না পায়।

ধ্রুব যে তাঁরও একথা ধ্রুব বাবাই কি ভুলতে পেরেছেন না পারেন? এই ছেলেকে নিজের কাছে নেওয়ার জন্যে তাঁর কী জেদ, তাঁর কী শাসন, কত রকম ভয় দেখানো। এমন কি আইন আদালতের ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু ছেলের অধিকার সুনন্দা ছাড়েনি। কিছুতেই ছাড়েনি। এমন কি সঞ্জয়ের বন্ধুর

আর প্রথম হারাবার ভয়েও ছাড়েনি। সুনন্দা জানত ছাড়লে আর ছেলেকে সে ফিরে পাবে না। ছেলে তার বাপের মত হবে। বাপের শিক্ষা দীক্ষায় মানুষ হবে। অবশ্য অনেক গুণ আছে প্রথম বাবার। সাহস দৃঢ়তা, কর্মশক্তি অনেক গুণই আছে। কিন্তু নানা দোষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবাই তো আর তা বেছে নিতে পারে না। বেশির ভাগ লোকই গুণ বাদ দিয়ে দোষগুলিকে তুলে নেয়। ছেলেও যে তাই নিত না তার কী মানে আছে। তাই ছেলেকে বাপের কাছ থেকে এমন করে সরিয়ে রেখেছে সুনন্দা। শুধু স্নেহের জন্যে নয় শুধু স্নেহের জন্যে নয়, ছেলের ভালোর জন্যেও। ওই তো সম্বল। আর তো হবে না। ছেলে যদি মানুষ হয় তাতে সবাইরই মঙ্গল।

একথা ছেলের বাপ প্রথমে বুঝতে চায়নি। যেমন ভয় দেখিয়েছেন। আইন আদালতের ভয়ও তার মধ্যে ছিল।

অবশ্য সুনন্দা জানত আদালতে উনি যাবেন না। অনেক অসুবিধা আছে ওঁর অনেক রকম অনেক ব্যাপার আছে যা বেরিয়ে পড়লে ক্ষতি। সুনন্দা ইচ্ছা করলে যেমন ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু তিনি আর এগোননি। সুনন্দার এগোবার কোন কথাই ওঠে না। সে শুধু আত্মরক্ষা করতে চায়, আর বাড়িয়ে কাউকে আঘাত দিতে চায় না।

আদালতে উনি যেতেন না। সুনন্দার সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে হয়েছে তার তো কোন প্রমাণ নেই। সে বিয়ে হয়ই নি। উনি বলতেন, 'বিয়ে-টিয়ে আবার কি? আমি ওসব মানিনে।'

তিনি কিছুই মানতেন না। সুনন্দার বিধবা মার সঙ্গেও তাঁর যে সম্পর্ক ছিল তা বিবাহ বিধির বাইরে। বড় হয়ে সুনন্দা তা বুঝতে পেরেছে। অবশ্য প্রথম প্রথম তেমন ভালো করে বুঝত না। ওঁর সঙ্গে মার ঘনিষ্ঠতা দেখে হিংসা হত সুনন্দার। সেই হিংসাকে উনি কাজে লাগালেন। কিন্তু মার মনে যে এত হিংসা, আর সেই হিংসার চোটে তিনি আত্মহত্যা করবেন তা কি আর সুনন্দা ভাবতে পেরেছিল? দুঃখে কি বুক ফেটে যায়নি সুনন্দার? সে কি আর বিছানা ছেড়ে কদিনের মধ্যে উঠতে পেরেছিল? তিনিই হাত ধরে তাকে তুলেছিলেন। সে হাত আর ছাড়েন নি। সুনন্দা নিজেই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। শুরুতেই জানত তাদের জীবনে মায়ের অভিশাপ লাগবে। তাই লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত সুখ হল না।

তবু সুখ চেয়েছে সুনন্দা। কে না চায়? অনেক অপমান লাঞ্ছনা আর দুঃখের পরে সেই সুখের দেখা মিলেছে। স্বামীর সুখ সন্তানের সুখ।

সুনন্দা মার হাত থেকে তাঁর বন্ধুকে কেড়ে নিয়েছিল। নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। সব সময় মনে হত তাঁকে আবার কে কেড়ে নিয়ে যাবে। নিয়েও ছিল। শুধু কি মনু? মনুর আগেও অনেকে এসেছে পরেও অনেক এসেছে। তাঁকে পুরোপুরি কোনদিন পায়নি। বিশ্বাস করেনি। সেই অবিশ্বাসের দুঃখে সবচেয়ে নিজেই বোধ যন্ত্রণা পেয়েছে।

কিন্তু সঞ্জয় তাকে কোন দুঃখ দেয়নি। সঞ্জয় পরম বিশ্বাসী বন্ধু বিশ্বস্ত প্রণয়ী, নিষ্ঠাবান স্বামী। সঞ্জয়কে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, সুনন্দার তুলনায় অন্য কোন তরুণী মেয়েকে দেখে সঞ্জয় প্রলুব্ধ হবে না একথা সুনন্দা জানে। একজন সম্পূর্ণ আপনার এ আশ্বাস কি কম সুখ। মনে হয় সব সুখ ওই সহজ বিশ্বাসটুকুর মধ্যে সহজ জানটুকুর মধ্যে আছে।

সুনন্দাও সঞ্জয়কে সুখী করার জন্যে সব দিকে চেষ্টা করেছে। প্রথমে বান্ধবী হিসাবে হিতৈষিণী

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

# আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা শুধুই সর্বাধিক প্রচারিত নয়, সর্বাধিক জনপ্রিয়ও। তার কারণ অনেক। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়, সুসম্পাদিত সংবাদ পরিবেশন আর বহুবিধ বিশেষ প্রবন্ধমালা।

যে-কোনো দিনের কাগজ
বৈচিত্র্যে, সুমুদ্রণে ও স্বকীয়তায়
আপনাকে মুগ্ধ করবে।

সংবাদপত্র জগতে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশের সেরা

## দেশ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কার্টুন, রসরচনা, বিচিত্র বার্তা, রঙ্গজগৎ, সঙ্গীত, পুস্তক সমালোচনা, ক্রীড়াজগৎ প্রভৃতি বহুবিধ রচনায় ভরপুর

খ্যাতনামা লেখকরাই দেশ
পত্রিকায় লেখেন।

যেখানে প্রতিদিন দৈনিক কাগজ পৌঁছায় না,
দূর গ্রামে যাঁরা বাস করেন,
তাঁদের জন্যে আছে

অর্ধ-সাপ্তাহিক

## আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রতি সোম ও শুক্রবার

প্রতি সংখ্যায় থাকে নিয়মিত সংবাদ,
সম্পাদকীয় এবং রবিবাসরীয় বিভাগের
বিশিষ্ট রচনা।

ইংরেজী খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন তাঁদের জন্যে আছে

## হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

এমন ভাল কাগজ আর দ্বিতীয় একখানি নেই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড

৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

হিসাবে সঞ্জয়ের কল্যাণেই চিন্তাই সে করেছে। নিজের জীবনের কথা সব খুলে বলেছে সঞ্জয়কে। সোনের কথা পাপের কথা অনুতাপের কথা কিছুই গোপন করেনি। শেষে অনুরোধ করেছে, 'তুমি আমার সঙ্গে তোমার পবিত্র জীবনকে জড়িয়ো না।

সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করেছে, "তুমি অপবিত্র কিসে? তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। সেই ভালোবাসা সব কলুষ নাশ করে আমি জানি। তোমার কখনোই কোন দোষ ছিল না, এখনো নেই।'

সুনন্দা হেসে বলেছে, 'মানুষ কি কখনো নির্দোষ হয়? একেবারে নিখুঁত? তা হয় না তবে তোমার জন্যে আমার কের সেই কিশোরী কুমারী হতে ইচ্ছা করে।'

সঞ্জয় তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলেছে, 'হতে ইচ্ছা করে কি, তুমি তাইতো রয়েছ। আমার কাছে তুমি তাই। অনাঘ্রাতা কুসুম, অনাস্বাদিত মধু।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছে, "কিন্তু আমার জন্যে তুমি তোমার বাবা ভাইবোনদের ছেড়ে আসবে তা আমি হতে দিতে পারব না। আমার এমন কি সাধ্য আমি একা তোমার সব অভাব পূর্ণ করব? সব সাধ আহ্লাদ মিটাব?"

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে 'ছাড়ব কেন। তাদের সঙ্গে আবার আমি যোগাযোগ করব। তাদের কিরে পাবার চেষ্টা করব। আমি তাদের পাবও। তোমাকে পেয়ে আমি শুধু একটি সংসারই পাব না, জগৎ সংসারকেও পাব।'

সুনন্দা কিছুতেই ওকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সুজনে মিলে সংসারী হয়েছে।

সঞ্জয়ের স্ত্রী হবার পর পূর্ব জীবনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সুনন্দা। চেষ্টা করে ভুলতে হয়নি। সময় আর পরিবেশ আপনিই সব ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি বা কখনো মনে পড়েছে সুনন্দা নিজে থেকে সে প্রসঙ্গ কখনো তোলেনি। সঞ্জয়ের মনে সে কোন ঈর্ষার উদ্রেক করতে চায় না।

সুনন্দার জন্যে কি সত্যি বাবা সত্যিই অপেক্ষা করেছিলেন? কে জানে? সুনন্দার সে কথা বিশ্বাস হয় না। শেষে তিনিও বিয়ে করলেন। বয়সটা বিয়ে না, কি। বেছেটি করা বিয়ে সে খোঁজ নিতে যায়নি সুনন্দা। তবে এইটুকু শুনেছে মহুকে তিনি বিয়ে করেননি। তা কি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। না কি মহু নিজেই ছেড়ে গেছে কে জানে।

নিজের ঘর সাজাবার পর মহুর জন্যেই বরং সুনন্দার একটু দুঃখ হয়েছে। আহা, মেয়েটা সত্যিই ওকে ভালোবাসত। ভালোবাসার কী যে লক্ষণ তা তো সে জানে। ভালোবাসার কী যে জ্বালা তা হারাবার দুঃখ যে কত তীব্র তাও তার অজানা নেই। সে ঘরে তাঁর কের সন্তান হয়েছে সে খবরও পেয়েছে সুনন্দা। জীবনের বারাও হয়তো আস্তে আস্তে বদলে নিয়ে থাকবে সুনন্দা ঠিক জানে না। হয়তো এতদিনে সত্যিই গৃহস্থ হয়েছেন। তবে বাড়িঘর কিছু করতে পারেননি। বিষয় সম্পত্তিও না: বরং যেটুকু যা করেছিলেন সব খুইয়েছেন।

সঞ্জয়ই মাঝে মাঝে খবর আনত, 'জানো সুনন্দা, পরিতোষবাবুর সেই বীরদর্প আর নেই। নতুন কিছু করবার দিকে তাঁর যে ঝোঁক ছিল তা চলে গেছে। এখন আগে পাঁচজনের মতই শান্ত গোছ ঘানা জীবনযাপন। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সেই গতানুগতিক ধারায় আত্মসমর্পণ।'

সুনন্দা হেসে বলত, ভালোই তো, সবাই তো তাই চায়। তিনিও সমাজবিরোধী না হয়ে যদি সমাজের পক্ষে থাকেন তাহলে তোমার আপত্তি করবার কি আছে?'

সঞ্জয় জবাব দিত, 'আমার আপত্তি থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষটির বিদ্রোহে যে কত ফুয়ো ছিল এতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আসলে দুর্নীতি আর বিদ্রোহ এক নয় স্বার্থপরতা যৌন অসংযম আর মৌলিক বৈপ্লবিক চিন্তা ভিন্ন জিনিস।' পরিতোষবাবু কোনদিনই বিদ্রোহী ছিলেন না। কেবল বিদ্রোহের ভান করতেন। যে সব সমাজ বিরোধী কাজ তাঁর স্বার্থের শুধু সেই কাজগুলি করতে পারলেই তিনি পরিতৃপ্ত হতেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থসিদ্ধি। সেই সিদ্ধি তাঁর হয়নি। তাই তিনি একেবারে নিবে গেছেন।'

সঞ্জয়ের প্রায় সব কথাই সত্য। কোন একটি কথারও প্রতিবাদ করতে পারে না সুনন্দা। কিন্তু মন অন্য কথা বলে। সুনন্দার মন চায় ওই পরাজিত পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সঞ্জয় আর একটু কম নিষ্ঠুর হোক, আর একটু সহানুভূতিশীল হোক। কিন্তু সঞ্জয় তা হতে পারে না। পরিতোষবাবুর নাম শুনলেই সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। অন্যায়ের প্রতি তার যে ঘৃণা সেই ঘৃণাই হয়তো তাকে এমন উত্তেজিত করে। সেই ঘৃণা সুনন্দার মনেও কম ছিল না। তাঁর অসততা অসাধুতার প্রতিবাদ সেও কম করে নি। কিন্তু আজ যখন পরিতোষবাবু দুর্বল হীনবল, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখনও কি সঞ্জয় ঠিক আগের মতই তাঁর নির্মম সমালোচক হয়ে থাকবে? সঞ্জয় তো এত উদার, এত মমতায় কোমলতায় ভরা ওর মন! এমন সংবেদনশীল মানুষ সুনন্দা খুব কমই দেখেছে। কিন্তু পরিতোষবাবুকে ক্ষমা করতে পারেনি সঞ্জয়। তাঁর প্রতি সামান্য সহানুভূতিও যদি সুনন্দা দেখায় সঞ্জয়ের মুখ ভার হয়ে ওঠে। ভার ভাষা নুন হয়, আচরণ বিকৃত হয়। সঞ্জয় তখন সুনন্দাকে ক্ষমা করতে পারে না সে বেশ বুঝতে পারে। তখন সঞ্জয়ের ভাষা তুল হয়ে যায়, আচরণে অশোভনতা আসে। শিক্ষা রুচি সভ্যতার সংস্কৃতি যে কী বস্তু তা তো সঞ্জয়কে দেখেই শিখেছে সুনন্দা। সঞ্জয়ের চেষ্টা আর আগ্রহেই সে এম. এ. পাশ করেছে, এখনো পড়াশুনোর চর্চা করতে পারছে। পড়াশুনোয়, আলাপ আলোচনায় তারা পরস্পরের সঙ্গী। তাই সঞ্জয়কে দিয়েই সঞ্জয়ের বিচার করতে পারে সুনন্দা। ওর উদারতা দিয়েই ওর অনুদারতা সংকীর্ণতার বিচার করে। পরিতোষবাবুর ওপর এই স্থায়ী বিদ্বেষের কারণ যে কিছু কিছু না আছে তা নয়। তিনি সঞ্জয়কে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার ভাষা খুবই আপত্তিকর। কোন কোন চিঠি প্রায় সব চিঠিই দেখেছে সুনন্দা! সেগুলি ইতরতার পর্যায়ে নামে। সঞ্জয় সেগুলি সব সঞ্চয় করে রেখেছে। নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রেখেছে সুনন্দাও ভালো করে জানেনা। কোন কোন দিন হেসে বলেছে, 'ওগুলি রাখবার মত নয়। ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও সব রেখে আর কি হবে।' সঞ্জয় বলেছে, 'ছিঁড়ে ফেলব একদিন।' সুনন্দা জানে, তা সে ফেলেনি। চিঠিগুলি রেখেই দিয়েছে। যেমন সুনন্দাও পুরোন চিঠিগুলিও রেখেছে তেমনি তার পূর্ব স্বামীর চিঠিগুলিও দলিল হিসাবে নজীর হিসাবে সংগ্রহ করে রেখেছে। আশ্চর্য মানুষ সঞ্জয়। সুনন্দা এক এক দিন ভাবে। প্রত্যেকটি পুরুষের চরিত্রেই কিছু না কিছু দুর্বোধ্যতা থাকে। সঞ্জয়েরও আছে।

এই কিছুদিন আগেও সঞ্জয় একদিন এসে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'জানো সুনন্দা মনাকিনীতে আমার যে সব লেখা বেরিয়েছিল সেগুলি দিয়ে পরিতোষবাবু একখানি বই করেছেন। সে বই তাঁর নিজের নামে চলছে। সে বইয়ে পরিতোষবাবুর দু'একটা আর্টিকেল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লেখাই আমার।'

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারেনি। একটু পরে হেসে বলেছে, সে সব কাঁচা লেখা দিয়ে, তুমি আর কী করবে।'

সঞ্জয় জলে উঠে বলেছিল, 'কাঁচা লেখা বলেও লেখাগুলি তো আমারই। যতই বল, পরিতোষ-বাবু একটুও বলবেন না। এখন ক্ষমতায় তুলোয় না, তাই চৌরাস্তা করেছে। দাঁত পড়ে গেছে তাই নিরামিষাশী!'

সুনন্দা তবু হেসে ব্যাপারটাকে লঘুকা করে দিতে চেয়েছিল, 'কেউ একজনের বই ছেলে চুরি করে আবার কেউ একজনের বই খাতা চুরি করে।'

কিন্তু রসিকতাটা সঞ্জয় বুঝতে পারেনি কি বুঝতে চায়নি। তেমনি চটে উঠে বলেছিল, 'তুমি ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা দিতে চাও? আশ্চর্য! আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি এই তোমার ধারণা? আমি যে তা করিনি ম্যারেজ রেজিষ্টারের খাতা তার সাক্ষী।'

সুনন্দা বলতে পারত, 'আজ না হয় সেই খাতা সাক্ষী, তার আগে তো আর আমরা কোন সাক্ষী রাখিনি। তাঁর বাড়িতে তাঁরই শোবার ঘরে আমরা দুজনে দিব্যি কেটেছি।'

কিন্তু সুনন্দা এসব কথা বলেনি। এত বড় ঝাপটার পর যে ছোট একটি নীড় সে বেঁধে তুলেছে তাকে সুনন্দা আর কোন বিপদের মুখে ফেলতে চায় না। সঞ্জয়ের মনে কোন সংশয় এনে দিতে চায় না সুনন্দা। তাকে আর কোন অশান্তি দিতে চায় না।

সঞ্জয় তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক দুঃখ বরণ করেছে। অনেক দিয়েছে তাকে সঞ্জয়। তার যৌবন তার যৌবনস্বপ্ন আর সেই যৌবনের একনিষ্ঠ প্রেম। সেই নিষ্ঠা সুনন্দার কাছেও সে যদি আজ দাবি করে খুব অন্যায় করবে বলা যায় না। যদিও আর একটু উদার সঞ্জয় হতে পারত। এসব সত্ত্বেও ধ্রুবর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারত। কিন্তু সঞ্জয় যদি না চায় সুনন্দার কি যাওয়া সম্ভব হবে? তাছাড়া একা একা যেতে তার সাহসও নেই। সেই মানুষটিকে আজও বড় ভয় করে সুনন্দা। শুধু তাঁর অনিষ্ট করবার ক্ষমতাকেই ভয় করে না, তাঁর তীব্র বাসনাতরা ভালোবাসাকেও ভয় করে।

'মা কার চিঠি?' ধ্রুব এসে ঘরে ঢুকল?

সুনন্দা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর বাবার।'

এ কথা শুনে ধ্রুব চুপ করে রইল। বাবার কথা মার কাছে অনেকদিন সে শোনেনি। এ বাড়িতে বাবার নাম উচ্চারিত হওয়া নিষেধ তাঁর নামের সঙ্গে কোথায় যেন একটা অকল্যাণ, অশুচিতা জড়িয়ে আছে।

ধ্রুব বলল, 'কার কাছে লিখেছেন!'

সুনন্দা বলল, 'আমার কাছে।'

ধ্রুব বলল, 'ও।'

সুনন্দা বলল, 'তুই দেখতে পারিস।'

ধ্রুব এবার একটু লজ্জিত হল। মার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'আমি আবার কী দেখব। কী লিখেছেন।'

সুনন্দা বলল, 'লিখেছেন তিনি খুব অসুস্থ। এর আগে স্ট্রোক হয়ে গেছে দুবার। সবাইকে দেখতে চান। যেতে লিখেছেন।'

ধ্রুব বলল, 'তোমরা যাবে তো?'

সুনন্দা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কী জানি।'

ধ্রুব চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কত বেলা হল। তোমরা খাবে রাঁধে কখন?'

'রান্না তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তুই এখন বসবি?'

ধ্রুব বলল, 'আমি এখা বসব কেন! তোমরা সবাই যখন বসবে তখন বসা যাবে।'

সুনন্দা বলল, 'তাহলে যাই ওঁকে একটু তাসিদ দিয়ে আসি। সেই যে বাথরুমে ঢুকেছেন তো ঢুকেই বসে আছেন। বেরোবার আর নাম নেই। কতক্ষণ লাগে চান করতে। যাই দেখে আসি উনি বেরোলেন কিনা।'

ভিতরের দিকে চলে গেল সুনন্দা।

আশ্চর্য, চিঠিটা ফেলেই গেল মা। এ সব চিঠি কি এভাবে ফেলে রাখতে হয়?

চিঠিটা তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখল ধ্রুব।

বাবার হাতের লেখাটা ভালো। ইংরাজী বাংলা দুই লেখাই ভালো। খারাপ মানুষের হাতের লেখা কি ভালো হয়? গ্রাফোলজি কি বলে? ঠিক জানেনা ধ্রুব। তবে এইটুকু বলতে পারে একজন লোক যে মুহূর্তে সুন্দর করে একটি অক্ষর লেখে সেই মুহূর্তে সে সুন্দর। একজন লেখক যে মুহূর্তে একটি সুন্দর বাক্য রচনা করেন সেই মুহূর্তে তিনি সুন্দর। তার পরের মুহূর্তগুলির কথা কি আগের মুহূর্তগুলির কথা অবশ্য বলা যায় না। জীবন একটি নিটোল স্বচ্ছ মুহূর্তের মত নয়, একটুকরো রত্নের মত নয়। একগুচ্ছ গোলাপ ফুলের মত নয়। যদি হত তাহলে কিন্তু বেশ হত।

বাবা যত খারাপ মানুষই হন ফুল বড় ভালোবাসেন। তাঁর মধ্যে যে কতকগুলি ভালো ভালো মুহূর্ত আসা যাওয়া করে এ তার প্রমাণ। সুন্দর বস্তুকে দেখবার, তাকে উপভোগ করবার যে শক্তি তাকি মানুষের এক মুহূর্তের ব্যাপার? তার জন্যে অনেকদিনের অভ্যাস দরকার। হাতের সুন্দর একটি অক্ষরও তাই। তার পিছনে অনেকদিনের যত্ন আছে। একটি সুন্দর বাক্য রচনার জন্যে কতদিনের সাধনা করতে হয় কে জানে।

বাবা ফুল বড় ভালোবাসেন। ধ্রুবর হস্টেলে গিয়ে লুকিয়ে তাকে বই দিয়ে আসতেন। ঠিক জন্মদিনের দিন যেতেন না। জানতেন সেদিন ভিড় হবে। তাছাড়া সেদিন তো বাড়িতেই চলে আসত। জন্মদিনের দু একদিন আগে যেতেন কি দু একদিন পরে।

'আপনি কেন আমাদের বাড়িতে আসেন না?'

ছেলেবেলায় যখন কিছু বুঝত না তখন জিজ্ঞাসা করত। বাবাকে আপনি বলত ধ্রুব, এখনো বলে। বাবা তো কাছের মানুষ নন। তিনি দূরে থাকেন, দূরে থেকে ভালোবাসেন।

'আপনি কেন আমাদের বাড়িতে আসেন না?' জিজ্ঞাসা করত ধ্রুব।

'তোমাদের বাড়ি? সে বাড়ি তো আমাদের বাড়ি নয়।' বাবা হেসে বলতেন।

'আপনি কেন আপনাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান না?'

বাবা বলতেন, 'তাইতো ভাবি মাঝে মাঝে। তাবি
যার বড় কষ্ট হবে।'

'মাকেও নিয়ে যান না কেন?' ধ্রুব তখন কিছু বুঝত না তাই জিজ্ঞাসা করত।

বাবা ঠিক উত্তর দিতে পারতেন না। কোন কোন বার হয়তো বলতেন, 'তাতে সবাইরই কষ্ট

কিসের কষ্ট তা ঠিক বুঝতে পারত না ধ্রুব। বুঝবার পরে আর জিজ্ঞাসা করেনি।

প্রথম প্রথম বাবার এই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে আসাকে খুব রোমান্টিক মনে হত ধ্রুবর। তারপর সব যখন শুনল, সব বুঝতে পারল তার মন গ্লানিতে ভরে উঠত। ইচ্ছা করত এদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে সে দূরে অনেক দূরে চলে যায়। পরে বুঝেছে দূরে যাওয়ার জন্যে দূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না। একটু আড়ালই যথেষ্ট। চোখের আড়ালই যথেষ্ট। তেমন আড়াল রচনা করবার সুযোগ যা তাকে দিয়েছেন, সঞ্জয় কাকাও দিয়েছেন ধ্রুব নিজেই সে সুযোগ করে নিয়েছে। বাবা ভালো মানুষ নন, তাঁর অনেক দুর্নাম অনেক বদনাম যার সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হয়নি, মা আর একজনকে ভালোবেসেছেন, ভালোবেসে বিয়েও করেছেন—এর প্রত্যেকটি তথ্য এক সময় ধ্রুবকে সহস্রদংশের মত বিঁধত। এই সব চিন্তা কত যে তার পড়াশুনোর ব্যাঘাত করেছে, রাতের পর রাত তাকে জাগিয়ে রেখেছে তার ঠিক নেই।

কলেজে সহপাঠী বন্ধু চিত্ত সহানুভূতির সঙ্গে বলত, 'কী কিরে ধ্রুব কী হল তোর?

'কিছু হয়নি।'

চিত্ত কিছু কিছু জানত। একদিন ওকে বলেছিল ধ্রুব, খুব কম ছেলের সঙ্গেই সে মিশেছে। কারো কাছেই সে মনের কথা সে বলে না। তবু দুএকজন বন্ধু ছাড়া জীবনে চলে? একেবারে কারো কাছেই কি সব না খুলে পারা যায়? ধ্রুব চিত্তের কাছে মন খুলেছিল। চিত্ত সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। কাউকে এসব কথা জানায়নি। এসব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে এই সিকস্ ইয়ার পর্যন্ত চিত্তের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অটুট আছে।

চিত্ত তখনই একদিন তার বিছানার পাশে এসে উঠে বসেছিল। চিত্ত তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'ধ্রুব তুই ভাবিসনে। আমরা আজকালকার ছেলে। আমরা কেন ওসব গ্রাহ্য করব? মহাভারতের সেই কর্ণের কথা মনে আছে তোর? আমরা আমাদের জন্মের জন্যে দায়ী নই আমরা আমাদের কর্মের জন্যে দায়ী।'

চিত্তের বাবা মার জীবন সুখের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন। ওকে এসব দুঃখ ভোগ করতে হয়নি। তবু চিত্ত ধ্রুবর দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বলেছিল, 'আমরা'। বন্ধুকে আলাদা করে দিয়ে বলেনি 'তুই।'

এমন আশ্বাস এমন সান্ত্বনা আর কারো কাছে পায়নি ধ্রুব। মার কাছে না, সঞ্জয় কাকার কাছে যাবার তো কথাই ওঠে না।

বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতেন না, বরং সান্ত্বনা পেতে আসতেন। আশ্বাস আর ভরসা পেতেন তার কাছে।

একদিন বাবা বললেন, 'তোমার একখানা ফোটো আমাকে দেবে?'

ধ্রুব অবাক হয়ে গেছিল, 'কী করবেন আপনি সে ফোটো দিয়ে ?'

'টেবিলের ওপরে স্ট্যাণ্ডে বাঁধিয়ে রাখব।'

ধ্রুব মনে মনে হেসেছিল। বড় তরুণী মেয়ের ছবিই না আনি বাবার দেরাজে আলমারিতে রয়েছে। কি টেবিলের স্ট্যাণ্ডেও থাকতে পারে। ধ্রুব তো কোনোদিন গিয়ে দেখেনি ? তবু ধ্রুবর একখানি ছবিও তাঁর চাই।

ধ্রুব তার একখানা ফোটো বাবাকে দিয়েছিল। না দিয়ে পারেনি।

বাবা দেখে খুসি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ তারি সুন্দর উঠেছে তো। এত ভালো ছবি দেখলে আমারও ভালো হতে ইচ্ছা করে।' বাবা একটু কৌতুকের সুরে বলেছিলেন।

ধ্রুব জানে তার সবটুকুই কৌতুক নয়। হয়তো কিছুই কৌতুক নয়। কৌতুক শুধু বাইরের আবরণ মাত্র।

তারপর আরো বড় হয়ে বাবার চরিত্র নিয়ে অনেকদিন ভেবেছে ধ্রুব। মাঝে মাঝে যেসব অনুশ্রুতি কানে এসেছে তা প্রীতিসুখকর নয়। পিতৃনিন্দা ধ্রুবকে চঞ্চল করে তুলেছে। তা যেন আত্মনিন্দার মত। অন্যের জন্যে ধ্রুব দায়ী নয়। কিন্তু জনকের দায়িত্ব যেন সবটুকু অস্বীকার করা যায় না। তাঁর অসম্মানে নিজের মাথা হেঁট হয়। তাঁর দুষ্কৃতির বোঝা নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে।

কেন এমন হয়না হয় ? ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হত ধ্রুব। বাবার সঙ্গে শুধু রক্তের সম্পর্কের মিলটুকু আছে। আর কোন সম্পর্ক তো নেই। তাঁর সঙ্গে রুচির মিল নেই, বৃত্তির মিল নেই, প্রবৃত্তির মিল নেই, কোন মিল নেই ধ্রুবর। তবু কিসের এই মমতা এই একান্ত আত্মীয়তাবোধ ?

মিশনারী কলেজের মিশনারী হষ্টেলের কয়েকজন ফাদারের সঙ্গে বরং বেশি ঘনিষ্ঠতা ধ্রুবর। কেউ কেউ বলেন ধ্রুব তাঁদের ভাবশিষ্য। ধ্রুবকেও তাঁরা ছেলের মতই ভালোবাসেন, শুধু ছাত্রের মত ভালোবাসেন না।

তবু বাবাকে দেখলে, বাবার কথা ভাবলে ধ্রুবর মনে যে আবেগের সঞ্চার হয়, শ্রদ্ধের সঞ্জয় কাকাকে দেখলে তা হয় না, ফাদারদের দেখলে তা হয় না।

এই রহস্যের মূল কোথায় ? এর নামই কি জন্ম-রহস্য ? মৃত্যুর মতই যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ?

বাবার ওপর মমতা আছে বলে ধ্রুব যে তাঁর সব কাজ সমর্থন করে তা নয়। বাইরে সে পিতৃনিন্দা করে না। করে লাভ কি। কিন্তু মনে মনে কঠিন সমালোচনা করে। তাঁর যৌন-জীবনের, তাঁর কর্ম-জীবনের তাঁর সমগ্র জীবনের সে নির্মম সমালোচক।

একদিন সে বাবার সামনেই তাঁর সমালোচনা করেছিল। বাবা সেদিন তাকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন, শুধু পকেট খরচা নয়, মাসে মাসে পড়ার খরচা দিতে চেয়েছিলেন।

ধ্রুব বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার ও টাকা আমি নিতে পারব না।'

তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কেন ? আমার টাকা কী দোষ করল ?'

ধ্রুব বলেছিল, 'আপনার টাকার দোষ আছে। আপনার টাকার জাত নেই।'

বাবা রুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটি সরষে হয়ে উঠেছিল। সেই হষ্টেলের ঘরে সেদিন আর কেউ ছিল না। ধ্রুবর মনে হয়েছিল প্রবল শক্তিতে তিনি ধ্রুবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। নিজের

সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন, তিনি। যে দুর্দম হিংস্র পুরুষের গল্প শুনেছে ধ্রুব সেই মুহূর্তে তাঁকে সে প্রত্যক্ষ করেছিল।

কিন্তু একটু বাদেই সেই রুদ্র মূর্তি শান্ত হয়েছিলেন। একটু হেসে বলেছিলেন, 'কে বলেছে তোমাকে এসব? যেই বলে থাকুক সব কথা সত্যি বলেনি। আমি তোমার কাছে নিজের দোষ ক্ষালন করতে চাইনে। আমি নিষ্কলঙ্ক এমন মিথ্যা কথাও তোমাকে আমি বলব না। তবে আমার সব অপরাধই ইচ্ছাকৃত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা creature of circumstance. আমাদের অনেক অপরাধই unrepented যায় না। আর প্রকাশ্যে হোক গোপনে হোক সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'

ধ্রুবর মনে হয়েছিল অনেকেই তার বাবার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ছেলের হাত থেকে যে আঘাত সেদিন পেয়েছিলেন তেমন আঘাত আর কারো কাছে পাননি বোধ হয় ধ্রুব যার কাছেও না।

কিন্তু আশ্চর্য সেই আঘাত যেন আত্মীয়তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপরেও বাবা আসতেন। কিন্তু টাকার কথা আর বলতেন না। বই দিতেন, ফুল দিতেন আর কিছু দিতে চাইতেন না।

বাবার কাছ থেকে আর কিছু নিও না ধ্রুব কিন্তু তাঁর স্নেহটুকু নিও। পিতার দুষ্কৃতি থেকে কি পিতৃস্নেহকে আলাদা করা যায়?

ধ্রুবর কখনো মনে হয় যায় না, কখনো মনে হয় যায়। ধ্রুব ভাবে, 'আমরা কখনো মানুষের গুণগুলিকে তার দোষ দিয়ে ঢেকে রাখি। একেবারেই দেখতে পাইনে। কখনো বা দোষের সঙ্গে জড়িয়ে দেখি। কিন্তু কোন কোন মানুষের বেলায় কোন কোন সময় গুণ আর দোষকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারি। চাল আর ধানকে আলাদা করে রাখি, কাঁকরগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিই! কোন্ দেবা আমাদের সত্যিকারের দেবা কে জানে?'

ধ্রুব মাঝে মাঝে ভাবে।

সঞ্জয় কাকা ঠাট্টা করে বলে, 'তুমি তো Born philosopher ধ্রুব। তুমি কেন কিলজফি নিয়ে পড়তে গেলে? এর পরে তো সাত ডাকেও তোমার আর সাড়া পাওয়া যাবে না। তুমি বড্ড বেশি ভাবো।'

তা ঠিক। ধ্রুব ভাবে। ভাবতে ভালোবাসে। 'আমরা ভাবতে পারি আর সেই ভাবনার একটা রূপ-রঙ আছে। লিখি আর না লিখি, কাউকে বলি আর না বলি সেই ভাবনা স্বপ্রকাশ। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। ভাব বিলাস ছাড়া আর কোন বিলাস আমার নেই, আর কোন বিলাস আমি চাইনে।' ধ্রুব ভাবে।

বাবাকে সে আঘাত দিয়েছিল। কে জানে সেই আঘাতই তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়েছে কিনা। কিন্তু বাইরের আঘাতে কি কিছু হয়? কি আদেশে উপদেশে?

বাপও ছেলেকে ফেরাতে পারেন না, ছেলেও বাপকে ফেরাতে পারেন না যদি তিনি নিজে না ফেরেন।

বাবা হয়তো নিজেই ফিরেছেন কিন্তু বড় দেরি করে ফিরেছেন। ফিরেছেন যে সে প্রমাণ কি আর তিনি রেখে যেতে পারবেন?

॥ আসন্ন শারদীয়ার নবীন সাহিত্যোপহার ॥

আশাপূর্ণা দেবীর
এ যুগের নবীন উপন্যাস
**রাণী শহরের কানাগলি ৪॥**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর
নবতম তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস
**ঢল ঢল কাঁচা ৬॥**

শম্ভু মহারাজের
নূতন ভ্রমণ কাহিনী
**পঞ্চ প্রয়াগ ৫৲**

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
পরিণত লেখনীর নবীন অবদান
**নিবেদনমিদং ৭৲**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**শহরে-বন্দরে ৪॥**

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
নূতন উপন্যাস
**বহুত মিনতি ১০৲**

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নবতম উপন্যাস
**দ্বৈত সঙ্গীত ৩॥**

বিমল করের
নূতন উপন্যাস
***জীবনায়ন ৫৲***

মহাত্মা গান্ধীর
নূতন অনুবাদে
***আমার ধর্ম ৫৲***

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের
বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস
***ফর হুম্ দি বেল্ টোল্স্ ৮৲***

শচীন্দ্রলাল রায় সংকলিত একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ
**বাবরের আত্মকথা**
সাড়ে পাঁচ টাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস ৷ শিশু উপন্যাস ৷ গল্প ৷ ভ্রমণ : কবিতা :
ডায়েরী ৷ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের খণ্ডাংশ। বিচিত্র রচনার
নিদর্শন হিসাবে বিপুল একটি সংকলন গ্রন্থ
**বিভূতি-বিচিত্রা ১২॥**
বেশম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৫৲

স্বামী ওঙ্কারানন্দের
**উপনিষদ কথা ৪॥**
উপনিষদ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আমিতে চান —
উপনিষদের বিখ্যাত কাহিনীগুলির সহিত যাঁহারা
পরিচিত হইতে চান — তাঁহাদের জন্য সহজ সরল
বাংলা ভাষায় বইটি লেখা হইয়াছে।

॥ ছোটদের নূতন বই ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
কিশোরদের জন্য লেখা চারটি বিখ্যাত বই
একত্র সংকলিত
**কিশোর-গ্রন্থাবলী ৪৲**
চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—বড় সাইজ

সুখলতা রাওয়ের
**বনে ভাই কত মজাই ২৲**
**নানান দেশের রূপকথা ৩৲**
**মৌমাছির রূপকথার ঝুলি ৩॥**

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তাঁর সেই মোড় ফেরার কথা আর কেউ হয়তো জানতেই পারবে না। বিশ্বাসই করবে না। ভাববে ক্লান্ত হয়েছেন বলেই তিনি ফিরলেন বুড়ো হয়েছেন বলেই তিনি জুড়োতে চাইলেন।

কিন্তু তা তো নয়। অনেক দিন আগে থেকেই তিনি ফিরি ফিরি করছিলেন। তিনি ফিরতে চাইছিলেন। ধ্রুব তার সাক্ষী।

মানুষ একই বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ ফেরে আর একবার ওপাশ ফেরে। একবার নীতির দিকে যায় আর একবার দুর্নীতির দিকে যায়।

ধ্রুব তার সাক্ষী।

'কি কিশলয়কার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

সঞ্জয় কাকা স্নান সেরে মাথা ঝাঁচড়ে এলো। অবশ্য ঝাঁচড়াবার মত চুল আর নেই। প্রায় মাথা জুড়ে টাক পড়েছে।

সঞ্জয় কাকার গায়ে সেরি মুখে প্রসন্ন একটু হাসি। স্নানের পর মানুষকে স্নিগ্ধ আর শান্ত দেখায়। সুন্দরও দেখায় বোধহয়।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সঞ্জয় ফের একটু কৌতুকের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

ধ্রুব তাঁর দিকে তাকাল। তাঁর দিকে চেয়ে একটু হেসেই বলল, 'না ঘুমোইনি। যখন তখন ঘুমোব কেন? আমি কি বুড়ো হয়েছি?'

সঞ্জয় বলল, 'আহা তুমি অল্পবুড়ো। জ্ঞানবৃদ্ধ।'

সুনন্দা এসে তাদের সামনে দাঁড়ায়, হেসে বলল, 'হ্যাঁ ধ্রুব হল জ্ঞানবৃদ্ধ আর তুমি কর্মকিশোর। যুবক বৃদ্ধ সবাই এবার চল। খেতে দিয়েছি।'

ধ্রুব উঠে দাঁড়াল, বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা।'

সঞ্জয় বলল, 'কী কথা?'

ধ্রুব বলল, 'বাবার চিঠি এসেছে জানেন বোধ হয়।'

অনেকদিন বাদে মনে হল জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সে ওদের দুজনের সামনে বাবার নাম করল। তাঁর প্রসঙ্গ তুলল।

সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানি। শুনেছি।'

ধ্রুব বলল, 'তিনি অসুস্থ। তিনি আমাদের সবাইকে দেখতে চেয়েছেন।'

সঞ্জয় বলল, 'বেশ তো তুমি—তোমরা যাবে।'

ধ্রুব বলল, 'আপনি যাবেন না?'

সঞ্জয় বলল, 'না।'

'কেন?'

সঞ্জয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমাকে বলতে বাধা নেই। তোমরা যাও। আমি গেলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না।'

ধ্রুব একটুকাল স্থির দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি যদি পারেন তিনিও পারবেন।'

সুনন্দা সভয়ে বলল, 'ছিঃ কী হচ্ছে ধ্রুব? এসব কী হচ্ছে তোমাদের? চল, এবার তোমাদের খেতে দিই।'

ধ্রুব বলল, 'হ্যাঁ চল।' তারপর সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বাকি কথাটুকু শেষ করল, 'সবাই সইতে পারবেন। এখন আর না সইবার কিছু নেই। তাছাড়া আমি তো থাকব সঙ্গে। আমার জন্যে সবাই সইবেন। আমি তো সবাইকেই সইতে পেরেছি।'

ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

এ যেন তার আর একটি যৌবযাত্রার সুরু।

---


আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

• প্রবন্ধ ও সমালোচনা •

রাজশেখর বসুর
লঘু গুরু
বুদ্ধদেব বসুর
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা
রবীন্দ্রনাথ ৫·০০
বিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত
রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০
অবনীনাথ মিত্রের
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ১·৫০
ডঃ নীহাররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সংগীত ও সাহিত্য ৭·০০
অমূল্যনাথ চক্রবর্তীর
ভারতে শক্তি-সাধনা ৭·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
দেখা ৩·০০ অপ্রমাদ ৩·০০
শুভ ঠাকুরতার
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা ৬·০০
কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা ২·০০

• উপন্যাস •

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মনুষ্যাদশ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পথের দাবী ৬·৫০
বিপ্রদাস ৫·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
বসুন্ধরা ৩·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
মেঘের উপর প্রাসাদ ৭·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
অমিমিতা ৪·৫০
প্রবোধকুমার সান্যালের
মনে রেখ
প্রতিভা বসুর
অতল জলের আহ্বান
বিমল মিত্রের
অন্তরূপ
আশাপূর্ণা দেবীর
দিনান্তের রঙ
দীপক চৌধুরীর
পাতালে এক ঋতু
সুশীল রায়ের
ত্রিনয়না
প্রাণতোষ ঘটকের
রাজায় রাজায় ৯·০০

• কবিতা-গ্রন্থ •

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্য-সঞ্চয়ন ৬·০০
পরশুরাম
পরশুরামের কবিতা ২·০০
বুদ্ধদেব বসুর
দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি
ও অন্যান্য কবিতা ৪·০০
আধুনিক বাংলা কবিতা
(সঙ্কলন) ৬·০০
যে আঁধার আলোর অধিক ২·৫০
বিষ্ণু দে-র
অন্বেষা ২·৫০
হুমায়ুন কবীরের
স্বপ্নসাধ ২·০০ সাথী ১·৫০
অজিত দত্তের
জানালা ২·০০
মণীন্দ্র রায়ের
সংকলিত কবিতা ৪·০০
অমিল থেকে মিলে ১·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# মোহ মুক্তি

হরেন্দ্রনাথ রায়

সমরেশের মতে বিবাহ জিনিষটা বাস্তবধর্মী, এ কমন্যালিটি।

সমরেশ বলে, সমাজ জীবনে—ইট্ ইজ্ এ নেসাসিটি।

বিজয়া বলে, না, এ সাকসারি।

নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিজয়া উঠে পড়ে লাগে। মেয়েদের একটা ক্লাব আছে। এখানে সপ্তাহে একদিন তারা মিলিত হয়। তাই নাম রেখেছে "মিলনী"। পুরুষেরা বাঙ্গ করে বলে, লেডিজ্ পার্লামেন্ট। মিলনীর বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা আছে, জলসা আছে, ভোজ আছে। এই অনুষ্ঠানেই বক্তৃতা করে বিজয়া। জোরাল বক্তৃতা, ওজস্বিনী ভাষা। ঝিমঝিমে গলা যখন সপ্তমে চড়িয়ে বলে, বিবাহ একটা সামাজিক কমন্যালিটি, একটা সাকসারি—নিছক বিলাসিতা, তখন মিঠে হাততালিতে ঘরখানি যেমন ভরে উঠে তেমনি একটা চাপা হাসি, একটা ব্যঙ্গের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়।

সমরেশের বন্ধু নিখিলেশ বলে, ধ'ড়ি টান কর ভায়া। সুরটা বড় ভাল ঠেকছে না। বিলাসিতার ভূত শেষ পর্যন্ত পথে না বসায়।

জনার্দন বলে, পথ হ'লেও ভাল ছিল। এ একেবারে বিপথ। এখন থেকে সামাল দাও সমরেশ, তা না হলে ঠকবে।

সমরেশ আর বিজয়া, স্বামী আর স্ত্রী। একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পথ এদের এক হ'য়েছে কিন্তু মত এক হয় নি। আজও হ'তে পারে নি। এক হওয়া দূরে থাক, ফাটল ক্রমেই বিস্তৃত হ'য়ে চলেছে: স্বামী উদারপন্থী হ'লেও মতটা একটু সেকেলে। কিন্তু স্ত্রী পুরোপুরি একেলে। হয়ত এ কালেরও পরবর্তী যুগের।

দ্বন্দ্ব এইখানে। স্ত্রীর বিলাসিতার খেসারত যোগাতে যোগাতে সমরেশ আজ ক্লান্ত। তবুও ক্লান্ত সুরকে গোপন করে বলে এ মত তোমার ভ্রান্ত। এ মত তোমায় পাল্টে নিতে হবে বিজয়া।

বিজয়া সক্রোধে প্রশ্ন করে, কেন? এ শুধু আমার মত নয়। পরিণামদর্শী মাত্রেরই মত এই। এ ছাড়া দ্বিতীয় মত আর কিছু থাকতে পারে না।

—পারে। অভিমানে তুমি অন্ধ হয়ে আছ বলে, আসল সকলের পার্থক্য তোমার চোখে পড়ছে না। তা না হলে বুঝতে পার্থক্য কোনখানে।

বিজয়া মাথা নাড়ে। বলে, না, অভিমান আমি করিনি। আর কেন করব। তোমার আমার মতের মিল যদি না থাকে, তাকে আমি অভিমান বলে উড়িয়ে দিতে যাব কেন? একটু

যেতে আমার বলে, তোমার কাছে যেটা নেসাসিটি, একেবারে অপরিহার্য আমার কাছে তা নাও হ'তে পারে। তোমার যা নেসাসিটি আমার তা বিলাসিতা।

এত দিন এ অমিলের বোঝা কোন রকমে বয়ে আসছিল সমরেশ কিন্তু সেদিনের বন্ধুদের খোঁচা খাওয়ার পর আর পারল না। স্ত্রীকে ডেকে বলল, মত যদি তোমার না পাল্টায় বিজয়া, পথ আমাদের পাল্টাতে হবে।

বিজয়া চোখের পলকেই উত্তর দেয়, বেশ, আমি রাজি, আমার আপত্তি নেই। সমরেশ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। বলে, ভুল কর না বিজয়া। ভেবে দেখ একবার। ও মত কখনও সত্য হতে পারে না।

—পারে, পারে, পারে। আমি দেখিয়ে দেব পরে। তোমাদের মাতুলি বুলি আর আমাদের জোর করে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

সমরেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, তোমায় দাবিয়ে রাখবার কোন বাসনা আমার নেই। কিন্তু তোমায় ভালবাসি। তাই তোমার বিপথগামিতা আমায় পীড়া দেয়। বিবাহটা একটা লোক দেখান ব্যাপার এ ধারণা আর যে কোন দেশের মেয়েদের মনে ঠাঁই পাক না কেন, আমাদের দেশের মেয়েদের মনে যে পায় নি এ আমি জানি। এতখানি অধোগতি এদেশের মেয়েদের আজও হয় নি।

বিজয়া ফুঁসিয়ে ওঠে, অর্থাৎ অধোগতি হয়েছে শুধু আমারই। বেশ তাই হক। এই অধঃপতিত জীবন নিয়ে তোমায় আমি বিব্রত করতে চাই না। পথ যখন তুমি পাল্টাতে চেয়েছ, আমি বাধা দেব না। তবে যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। তারপর একটু ব্যঙ্গ করে মাথা দুইয়ে বলে, হে বন্ধু, নতুন পথে যাত্রা তোমার শুভ হ'ক এই কামনা করি।

সমরেশ বলে, কিন্তু এ কামনা আমার নয় জেনে। নতুন পথের কোন পরিকল্পনা আমার নেই। নিজের ভাল মন্দের ভাবনাও আমি ভাবিনা। ভাবনা তোমার জন্য। যে পথে যেতে চাইছ সে পথ বড় বিপদ সঙ্কুল। নতুনত্বের আস্বাদন লালসায় এখন বুঝবে না। বুঝবে পরে, মোহ ভেঙে গেলে।

বিজয়া ঘাড় নাড়ে। দৃঢ়ভঙ্গীর ঘাড় নাড়া। বলে, এ মোহ ভাঙবার নয়।

—নয়?

—না। আমার মতের মধ্যে কোন গলদ নেই। মৈত্রিক বলে আমরা বন্দী নই বলেই আমরা অত্যাচারিত। বিবাহের শুভ্র বেষ্টনে, তার পবিত্রতার নাম নিয়ে আমাদের হাত পা, চোখ কান সব বেঁধে রাখ। আজ সে বাঁধন আমি খুলে ফেলেছি। তাই বুঝেছি এ সব তোমাদের ধোঁকা। বিবাহ আর বিলাস বিভিন্ন জিনিষ নয়।

সমরেশ হতাশ ভঙ্গীতে শুধু ঘাড় নাড়ে। কোন কথা বলে না।

পার্বত্য নদী আর দাম্পত্য জীবন—এ দুয়ের মধ্যে হয় ত কিছুটা সাদৃশ্য আছে। নদী ঝির ঝির করে বয়ে চলে, কিন্তু বোশেখের ক্ষীত দুর্বার হয়ে উঠে। নিঃশব্দ দাম্পত্য জীবনও তেমনি সময় সময় দুর্বার হয়ে উঠে।

সমরেশদের দাম্পত্য জীবনও দুর্বার হয়ে উঠল। নিঃশব্দ জীবনযাত্রায় একদিন বিদ্যুৎ চমকাল তারপর মেঘ গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ল।

এই গর্জনের তাড়নায় বেচারী সমরেশকে বেশ কিছুদিন উকীলবাড়ী ছুটোছুটি করতে হ'ল তারপর একদিন বিজয়াকে জানিয়ে দিল, ভাববার তোমার কিছু নেই বিজয়া। তোমার বাসনাই পূর্ণ হবে। যেমন তুমি চেয়েছ, তেমনি ব্যবস্থাই করে এসেছি আমি।

—অর্থাৎ। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বিজয়া ফিরে দাঁড়াল, দুচোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলহের ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

আজকাল এমনই হয়। কলহের কালো মেঘ দুজনার আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। সময় নেই, অসময় নেই মেঘ সামনে এসে দাঁড়ায় তারপর তার যা স্বভাব কখনও তর্জন কখনও গর্জন এবং সময় সময় বর্ষণও সুরু হয়ে যায়।

এ সব আজকাল সমরেশের গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই সে নির্লিপ্তকণ্ঠে বলতে পারে, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সাপ মরুক কিন্তু লাঠি যেন না ভাঙে। আমাদের মতের অমিল নিয়ে পথের গরমিল হয় হ'ক কিন্তু লোক জানাজানি যেন না হয়। তোমার নতুন পথের নিত্য নতুনত্বের আস্বাদনে কোন বাধার সৃষ্টি যেন না হয়।

বিজয়া কঠিন কণ্ঠে বলে, ধন্যবাদ। আমার নতুন পথের নতুনত্ব নিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই দেখছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা, মহাপ্রভুর পদযাত্রা নিয়ে কোন অভাগিনীর নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেছে কি?

—না। কারণ আজকের অভাগিনী কালকের সুভাগিনী হবার আশায় মশগুল। তারই স্বপ্নে রয়। সেই জন্যেই ঘটেনি।

—ভাল কথা। সুভাগিনীর এ স্বপ্ন সার্থক হবার আর বিলম্ব কত?

—বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু হাঁ, একটু ধৈর্য তোমায় ধারণ করে থাকতেই হবে। আমার যা করণীয় করেছি। ত্রুটি কোন দিকেই রাখিনি। ডিক্রী যাতে এক তরফা হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি। সেরা উকীল দিয়েছি তোমার পক্ষে। আমার পক্ষে আছে মাত্র একজন কাঁচা বোকার। শুনতে বিশেষ কিছু পায় না। তবুও বলে দিয়েছি তোমার উকীলের সব কিছু আবদারই মেনে নিতে।

—আমার মানে?

—মানে তোমার কল্পিত অকল্পিত সব কিছুই

তাতেও যেন অরাজি না হয়।

বিজয়া একেবারে ফেটে পড়ে। বলে, খোরপোষ? কেন? ভেবেছ এতে আমি রাজি হব? না, কিছুতেই না। যাঁদের কেটে যাচ্ছে তা একেবারেই যাক। তাতে এতটুকু যেন ঘাঁটন না থাকে। খোরপোষ মানে ত ইতরোমির পরাকাষ্ঠা। খবরদার ও দিক দিয়ে গেলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—না, ও চিন্তা করনা তুমি। যাতে ভাল হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি! সেই জন্যে উকীলও ঠিক করেছি দু রকম। এক পক্ষে প্রবল, আর এক পক্ষে দুর্বল। এর জন্যে যত অর্থই লাগুক, সে বিষয়ে কোন কার্পণ্যই করি নি।

বিজয়া একটু সন্দিগ্ধ হয়। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, বটে! কিন্তু জানতে বাসনা হয়, মহারাজের অহেতুক এ অনুগ্রহ কেন?

# বিনোদ বিহারী দত্ত

## জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমরেশ বলে, অনুগ্রহ নয়, এ আত্মনিগ্রহ মহারাণী। প্রিয়ার অন্তরে প্রিয়র যদি ঠাঁই না হয়, তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? তাই ভাবলাম, এ বিচ্ছেদে তুমি যদি সত্যই সুখী হও, তাই হ'ক। এর জন্য কোন কার্পণ্যই আমি করব না। তবে এইটুকু অনুরোধ করব তোমায়, যদি অসুবিধে কিছু না হয়, তবে কোর্টের রায় না বেরুন পর্যন্ত এইখানে তুমি থেকে যাও। তাতে লোক জানাজানির আশঙ্কা থাকবে না।

বিজয়া বলে, বেশ তাই হ'বে। আমিও চাই না ঘরের কেলেঙ্কারী বাইরে প্রকাশ পায়।

শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় বেরয়।

সংবাদটা সমরেশই দেয় বিজয়াকে। বলে, আসামীর ফাঁসির আদেশ হ'য়ে গেল তাতে।

বিজয়াকে কোর্টে হাজির হ'তে হয়নি। তাকে হাজির হ'তে দেয়নি সমরেশই। বলেছিল, বাড়ীবয়ে হ'য়ে আমি। তুমি শুধু শুনবে। তাই অপেক্ষা করে বসেছিল বিজয়া। তাকে একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সে বিবর্ণ মুখে সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সমরেশ আবার বলল, যাক, সব শেষ। তোমার কৌতূহলীর মুখের তোড় কি? সাধ্য কি আমার কালা মোক্তারের সে তোড়ের সামনে দাঁড়াতে। এক ধমক খেয়েই সে যেতড়া মেরে মেরে এক কাণ্ড করে বসল। তারপর হ'ল এক তরফা সওয়াল। সে কি প্রলয়ের বক্তৃতা কি বলব। শুনতে শুনতে আমারই মনে হচ্ছিল, সত্যি বুঝি আমি এমনি অত্যাচারী, এমনি কলঙ্ক প্রকৃতির লোক। বিচারক রায় দিলেন সওয়ালের ওপর। একেবারে মোক্ষম রায়—আসামীর ফাঁসি।

বিজয়া নিজেকে সামলে নেয়। বলে, রায় যদি পছন্দ না হয়, উঁচু আদালতে আবেদন করতে পার।

—উঁহু। কোন আদালতের সাধ্য নয় এ রায় রদ করে। ফাঁসি হবেই।

—বেশ, আদালতের ওপর আছেন রাষ্ট্রপতি, তাঁর সাধ্য নিশ্চয়ই হবে।

—হয় ত হবে। আর কোন পতি বা পত্নীর ঘাবড়ে যাবার বাসনা আমার নেই আমি ফাঁসি মেনে নেব।

বিজয়া নিরুত্তরে শুধু সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমরেশ বলে চলে, না মেনে উপায়ও নেই।

—কেন? প্রশ্নটা নিজের অজ্ঞাতেই বিজয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

সমরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, রাজা যদি প্রজার ভালবাসা না পায় সে রাজার কোন সার্থকতা নেই। তেমনি স্বামী যদি স্ত্রীর অনুরাগ না পায়, সে স্বামীরও কোন সার্থকতা নেই। স্বামীর প্রয়োজন আমাকে, আমাকে নয়। শুধু শুধু আমার ভার বহন করতে চায় কে?

বিজয়া নির্লিপ্ত ভাবে বলতে যায়, বেশ, কর না।

সমরেশ একটুখানি হাসে। ম্লান করুণ হাসি, কথা না বলার আর প্রশ্ন ওঠে না জেনে। আজ সবেরই সমাধি হ'ল। আদালত মেনে নিয়েছে তোমার দাবী। তাই তোমার স্বপক্ষেই রায় দিয়েছে। এখন থেকে তুমি মুক্ত, স্বাধীন।

বিজয়া এ কথার কোন উত্তর দেয় না। নিরুত্তরে থাকে।

# কলিঙ্গ টিউব্‌স

জল ও গ্যাসের জন্য

**কলিঙ্গ টিউব্‌স লিমিটেড্‌**

৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

কারখানা :

চৌদ্বার, কটক, উড়িষ্যা।

সমরেশ প্রশ্ন করে, খুশি হয়েছ নিশ্চয়ই? স্বপ্ন সার্থক হয়েছে তোমার?

—জানি না। এ লোকটা যাঁরা থেকে না বেরুন পর্যন্ত বলতে পারি না। কিন্তু তোমার?

—স্বপ্ন আমার ছিল না। তাই সার্থক বিশ্লেষকের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে—।

—তবে?

—তোমার কাছে লুকোব না। যে সত্যকে আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে, তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তে দেব না।

—অর্থাৎ? বিজয়ার তির্যক চাহনী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

—অর্থাৎ যাকে অপরিহার্য বলে জানি, তাকে হয়ত আবার বরণ করে নিতে হবে।

—হুঁ। আর একবার টোপর পরবার সাধ হয়েছে।

—সাধ নয়, আদর্শবাদ। একজনের যাতে অরুচি, আর একজনের যে তাতে রুচি হবে না, এ ত কথা নয়। লাল চেলীতে আজকাল তোমার বীতরাগ, কিন্তু এ বীতরাগ সকলের নাও থাকতে পারে। সকলের দৃষ্টিকোণ যদি তোমার সঙ্গে একবিন্দুতে এসে না মেলে, তারা নিন্দনীয় হবে না নিশ্চয়ই।

বিজয়া অবাক হয়ে বলে, নিশ্চয় না। কিন্তু এ কথা কেন? লাল চেলী আর আমার দৃষ্টি-কোণের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ কি?

—আছে। তোমার দৃষ্টিকোণের কাছে লালচেলীর মূল্য আর কিছু নেই। কিন্তু সকলে তুমি নও। তাদের কাছে লাল চেলীর মূল্য অনেক। তাদের কাছে এটা চিরন্তনী জিনিষ, জীবন যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য।

এতক্ষণে বিজয়া রহস্যটা বোঝে। চোখ সিঁদে বলে, বুঝেছি তোমার লালচেলীর রহস্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কে এই সৌভাগ্যবতী যিনি লালচেলীর মোহে টোপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন।

সমরেশ বলে, ঠাট্টা ক'র না। সে তোমার হিংসার যোগ্য নয়, বরং করুণার যোগ্য। কারণ লাল চেলীর প্রতি তোমার বীতরাগ যতখানি, তার অনুরাগ ঠিক ততখানি। এইখানে তার সঙ্গে আমার মিল।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলে আমার লাভ কি? সুষ্ঠ সামাজিক জীবনে বর নারীর বিবাহ যে অপরিহার্য, এ মতের গোড়া সমর্থক সে। আর আমিও যে এ মতের সমর্থক এ কথা জেনেই সে এগিয়ে আসছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। অবশ্য জানা জানি আমাদের বেশী দিনের নয়। কিন্তু আশ্চর্য, যেযনাম সে আমাদের সব খবরই রাখে।

বিজয়া ভ্রু কুঞ্চিত করে। বলে, বটে! কিন্তু জানতে পারি, এ হেন অনন্তটি কে? তাকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

—অনন্তটি তোমার অচেনা নয়। একদা তোমারই সহপাঠিনী ছিলেন দেবী মহুতাষিনী। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে পরিচয়—অবশ্য তুমিই করিয়ে দিয়েছিলে একদিন। অভিনন্দন জানাবার বাসনা যদি জেগে থাকে, তাকে জানাতে পার।

সরল বিস্ময়ে বিজয়া যেন ফেটে পড়তে চায়। চোখ দুটিকে কপালে তুলে বলে, কে? মধু পোদ্দারনী। ক্লাসে যার নাম ছিল মধুসর্দ্দারনী তাকে বিয়ে করতে চাও তুমি!

—কেন, অপরাধ তার?

—অপরাধ! আর মেয়ে জুটল না তোমার? শেষ পর্যন্ত—। কী কাণ্ড! সেই ত ছিল আমাদের লীডার। বিয়ে কেউ তাকে করতে চায়নি বলে বিয়ে তার হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে হ'ল স্কুল মাষ্টারনী।

—হয় ত তোমার কথাই ঠিক! তবে সর্দ্দারনী বা পোদ্দারনী সে নয়। নাম তার মধুভাষিণী পোদ্দার। উপস্থিত বুদ্ধি স্কুল মাষ্টারনী।

বিজয়া উত্তেজিত ভাবেই বলে চলে, সেই মধুসর্দ্দারনীই ছিল আমাদের নেতা। নিজের বিয়ে হ'ল না বলে বিয়ের দিকে আমাদের মনটাকেও সে বিষিয়ে তুলছিল ধীরে ধীরে। বলতে কইতে পারত ভাল। যা বলত মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যেত। সেই আমাদের সভার মধ্যে ঢুকিয়েছিল, বিবাহ একটা বিলাসিতা, একটা লোক দেখান সামাজিকতা। দু হাত মুঠো ক'রে বাতাসে ছুঁড়ে বিয়ে যখন বলত ইট্ ইজ্ এ লাকসারি, এ ফরম্যালিটি, তখন তার কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকত না। আমাদের মত সব নেত্রীদের মাথাই সে খুরিয়ে দিয়েছিল। সকলেই মেনে নিয়েছিলাম তার কথাটা।

—আশ্চর্য! কি বোকা তোমরা। কিন্তু মধু ত এ সব কথা কিছুই বলে না এখন। বলে না ত বিয়েটা একটা বিলাসিতা।

—বলে না? কি বলে সে? প্রশ্ন করে সমরেশের মুখের দিকে বিজয়া তাকিয়ে থাকে।

—বলে, কিন্তু বিবাহ বড় পবিত্র জিনিষ। কি ছেলে কি মেয়ে সকলের পক্ষেই এ অপরিহার্য। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, ইট্ ইজ্ এ নেসেসিটি। যা বলে বাতি আমি।

—অসম্ভব। এ কথা সে বলতে পারে না কখনও।

—বলে। আর বলে বলেই ত তার সঙ্গে আমার মতের আশ্চর্য মিল। সে মেনে নিয়েছে আমার মতকে, আমি মেনে নিয়েছি তার মতকে। সুতরাং প্রতিবন্ধক আমাদের মধ্যে কিছু নেই।

—আছে! বিজয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

সমরেশ বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, কিসের প্রতিবন্ধক।

বিজয়া তেমনি ভাবেই বলে, আমার। প্রতিবন্ধক হ'ব আমি। মধু, অনুভভাষিণী, প্রতারক। নিজে যা বিশ্বাস করে না, তাই সে অপরকে করিয়েছে। অপরের মনকে সে বিকৃত করেছে দূষিত করেছে। তার কাজে বাধা দেব আমি।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি।

—কিন্তু ভদ্রে, আবার ভুল করছ তুমি। এ বিলাসিতা নয়, এ অপরিহার্য। আমাদের মত, আমাদের পথ অ্যামিতির সমবাহু ত্রিভুজের মত পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে লীন হয়ে গেছে। অতএব এ রাজযোটক মিলে অমিল হবার সম্ভাবনা কিছু নেই।

—আছে। সমবায় ত্রিভুজের মধ্যে বিসমবাহুর আবির্ভাব হবে আর তাইতেই মিল

—বল কি ?

—মিথ্যে আমি বলি না। তুমি মধুকে বিয়ে করতে পারবে না। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বিয়ে কর, শুধু মধুকে না। সে আমাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে। তার মাথায় সিঁদুরটি কখন আমি সহ্য করব না।

—কি করবে তুমি ?

—বিশেষ কিছু না। শুধু তাকে জানিয়ে দেব, এ বিবাহ হবে না। আমার মত নেই।

—হবে না ? বল কি ? কিন্তু তোমার মতামতের সঙ্গে আমাদের এ বিবাহের সম্বন্ধ কি। আদালত ত আমাদের সম্বন্ধে রায় দিয়ে দিয়েছে। তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ।

—না, কিছু পাই নি। এ সবই তোমার কারসাজি। আমার পক্ষে ভাল কৌঁসুলী দিয়ে আর তোমার পক্ষে কৌঁসুলী না দিয়ে আদালতকে ভুল বুঝিয়েছ। মধুকে বিয়ে করবার জন্যেই তোমার এ বিবাহ বিচ্ছেদ। এইটাই তোমার উদ্দেশ্য।

সমরেশ অবাক হ'য়ে বলে, কি বলছ তুমি ? আদালতকে ভুল বুঝিয়েছি আমি! তুমি চাওনি এ বিচ্ছেদ ?

—না। আমা সোড়া তুমি আমাকেও ভুল বুঝিয়ে এসেছ। এবার সেই কথাই আমি আদালতকে জানাব।

—আর উপায় নেই। আদালত তার চরম রায় দিয়ে দিয়েছে।

—দিক। সে রায়কে আমি নাকচ করাব। বড় আদালতে আপীল করে বলব, বিশু বিবাহ বড় পবিত্র বিবাহ। সাত পাকের যে বাঁধন তাকে চোদ্দ পাকেও খোলা যায় না। অতএব একটা কলমের খোঁচায় এ বিবাহ অসিদ্ধ হ'তে পারে না। আর তা ছাড়া সময়ও আছে এক বছর। আদালতকে জানাব, আমার মত পাল্টে গেছে। এর সবটাই কারসাজি। এ ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাকে সমর্থন করা উচিত হবে না।

—কি কাণ্ড দেখ। এখন কেমন করে মধুকে আমি মুখ দেখাব।

—তার প্রয়োজন হবে না। যাতে আর কোনদিন তোমাদের মুখ দেখাদেখি না হয় সে ব্যবস্থা আমিই করব।

সমরেশ আঁৎকে উঠে। বলে, বল কি! না, না এ অন্যায়। ভারী অন্যায়। আমাদের মত পথ সব এক হ'য়ে আছে। আমি যা বিশ্বাস করি সেও ঠিক তাই করে।

—না, করে না। করলে এমন বিষের বীজ সে আমাদের মনে গেঁথে দিত না। তাকে আমি বুঝিয়ে দেব, আজকাল অ্যামিতি তার সেকেলে ধর্ম ছেড়ে একেলে হয়েছে। এতদিন সে নিজেকে সীমিত করে রেখেছিল শুধু তার দৈর্ঘ আর প্রস্থের গণ্ডীর মধ্যে, এখন উচ্চতারও অধিকারী হতে চলেছে সে। তাই সব কিছু এক হওয়া সত্ত্বেও তারা এক হ'য়ে আর মীন হ'তে চায় না। তাকেও বুঝিয়ে দেব, এতদিন সে তার বিকৃত মতকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে অনেক উপদ্রব করেছে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

বাংলা সংবাদপত্র

# যুগান্তর

স্বাধীন * নিরপেক্ষ * নির্ভীক

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ

ও

আকর্ষণীয় বাংলা সাপ্তাহিক

# অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

গল্প, কবিতা উপন্যাস. প্রবন্ধ, খেলাধূলা, ছায়াছবি প্রভৃতি রচনায়

সমৃদ্ধ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকগোষ্টিকে প্রকৃত আনন্দ দান করে

আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৩

এবার তার মত তারই ঘাড়ে চাপবে। বিজয়া যাবে। একটু দম্ নেয়, তারপর আবার বলে, শোন, কালকে আমায় নিয়ে যেতে হবে আমার কৌসুলীর কাছে।

সমরেশ অবাক হয়ে বলে, কারণ ?

বিজয়া বলে, তাকে একটু ধন্যবাদ জানিয়ে আসব যে কাজ তিনি আমার জন্যে করেছেন।

সমরেশ একটু নিরস কণ্ঠে বলে, তার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

—আছে। শুধু ধন্যবাদই দেব না, সেই সঙ্গে একটা অনুরোধও করে আসব অনুরোধ করব, আর একবার তাকে সওয়াল সুরু করতে হবে। তবে এবার করতে হবে উল্টো দিক থেকে।

—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝবে। বুঝিয়ে দিলে বুঝবে। এবার তাকে সওয়াল করতে হবে, বিয়ে জিনিষটা কাঁচের বাসন নয় যে স্বামী বা স্ত্রীর একটু খুশি খেয়ালেই ভেঙে চুর হয়ে যাবে।

—তাই নাকি, সেখানে মতের মিল থাক আর না থাক ?

—তা কেন। মতের মিল অবশ্যই থাকবে। যে জিনিষটা শ্বাশ্বত, চিরদিনের তার মধ্যে বিকৃতি নেই। পরের প্রয়োচনায় হয় ত একটু আধটু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু তার শোধনও ত আছে।

—হয় ত আছে। তবে সে প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়।

কথাটা বিজয়াকে বিঁধে। সে কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর পরাজয়কে মনে মনে মেনে নিয়ে কয়েক পা সমরেশের দিকে এগিয়ে আসে। চোখে চোখ রেখে বলে, তুমি সন্দেহ ক'র না। আমার মোহ কেটে গেছে। অহংকার টুটে গেছে। আদালতে জয়ই আমার পরাজয়ের কারণ হয়েছে। মুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি আমার লোকসানের বিরাটত্বটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই অন্তরের মধ্যে কোন উল্লাস বোধ করিনি। তারপর এল তোমার মহুতাষিণী। বল, এমন একটা চক্রী মেয়েকে সব জেনে শুনে কি স্থান ছেড়ে দিতে পারা যায়, না তার কাছে পরাজয় মেনে নিতে পারা যায়। তার চেয়ে তোমার কাছে আমার পরাজয় শতগুণে শ্রেয়ঃ। বলতে বলতে বিজয়া একেবারে সমরেশের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। স্বামীর হাতখানিকে ধরবার জন্য নিজের ডান হাতখানি প্রসারিত করে দেয়।

সমরেশ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করে না। স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে বলে, মহু চক্রী, তুমি চক্র। তোমার চক্রাঘাতে সে আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল জয়। আজ আমি নতুন করে তোমাকে আমার জীবনে স্বাগত জানাই।

---

# অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a; sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

*C. C. Biswas*
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীদুয়ারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

# দুঃস্বপ্নের রাত

ভবানী মুখোপাধ্যায়

খট করে একটা শব্দ হল হঠাৎ।

সেই সঙ্গে ঘরের আলোটাও জ্বলে উঠল ধপ্ করে। আমি কিন্তু তখনই ঘুরে দাঁড়াইনি। ঠিক সেইভাবেই ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। সেই সঙ্গে একটু রাগও হয়েছিল মনে মনে, ভয়ের কারণ, এই-ভাবে ধরা পড়ে গেলাম বলে, আর রাগ আমার অদৃষ্টের ওপর। সব-কিছুতেই কি এমন একটা দুগ্রহ জড়িয়ে থাকবে। যেখানে আমি সেখানেই কি বিপদ!

—ঘুরে দাঁড়াও, সাবধান! আমার হাতে আছে গুলিভরা পিস্তল। কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের, বেশ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। নিরুপায় হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। এই অবস্থায় সবাই যা করে সেই অসহায় আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গী!

ঘুরে দেখলাম, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক মনোহারিণী নারী, সুন্দরী বটে। শুধু যে রঙের চটক তা নয়, ঠোঁট দুখানি পাতলা, নাকটা তীক্ষ্ণ, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। পরণে কিংকে অয়েল রঙের চটকদার ঢুরে শাড়ি। ডান হাতে পিস্তল, লক্ষ্য আমার বুক, বাম হাতে শঙ্কানাশনের বরাভয় নেই। বেশ কঠিন ও কঠোর তাঁর মুখভঙ্গী।

কি আর বলি। বললাম—বোকার মত ঢুকে পড়েছি। জানলাটা খোলা ছিল।

—জানলাটা আমার বেড়ালের যাতায়াতের জন্য সব সময় খোলা রাখি, তা বলে সেটা ত' সাধারণের সদর রাস্তা নয়।

জবাবটা বেশ সহজ ও শান্ত গলায় এল। কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতর আরো একটু এগিয়ে এলেন, তারপর আমার রক্তহীন মুখের পানে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, দৃষ্টিটা অতি তীক্ষ্ণ।

আমার কীর্তিটা স্বচক্ষেই দেখেছেন, এখন দেখছেন আমাকে, আমিও দেখছি আমার প্রকৃত রূপ। ওঁর চোখের আয়নায় আমার মুখচ্ছবি প্রতিফলিত। আমি কিন্তু তা বলে করুণার ভিখারী নই। করুণায় আমার ঘৃণা।

করুণা এবং অনুকম্পার ভাবখানা ক্রমশঃ ওঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল, যেমন করে অন্ধকার কেটে গিয়েছিল তেমনই হঠাৎ। এদিকে আমার হাত দুটি টন্ টন্ করছে, সিনেমায় ঠিক এমনই হয়ে থাকে।

এইবার মহিলাটি বললেন—আচ্ছা, এবার হাত নামাও—

কী গম্ভীর গলা, যেন মেঘেদুলের বজ্র নির্ঘোষ।

হাত নামালাম, অমান্য করার সাধ্য কই!

এতক্ষণে মুখে হাসি ফুটল, অতি ক্ষীণ হাসি। বললেন—এই ব্যবসা কতদিনের—?

এই বলে রিভলবারটা চেয়ারের ওপর রেখে ভদ্রমহিলা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

আমি শুধু বলি—এই আমার হাতে ঘড়ি—

—হুঁ, ঘরে কি লক্ষ্য করি, না ছেলে তিন দিন খায় নি, ও-সব চের শুনেছি, নতুন কিছু বলার থাকে ত' বলতে পারো!

কণ্ঠস্বর অনেক মোলায়েম।

আমি বললাম—এর আগে আর কখনও এতটা দুঃসাহস হয় নি। লোকে পড়ে দু-একটা মোটর পার্টস সরিয়েছি। এই প্রথম বাড়ি চড়াও হয়েছি।

—এটা তার বাড়ি জানো? এটা একজন পুলিশ অফিসারের বাংলো। হাফ-বদমাস থেকে ছিঁচকে চোর সকলের নাম ওদের খাতায় থাকে, চোর-ডাকাতের হিসেব ওদের মুখে মুখে—

একটু হাসবার চেষ্টা করি। মুখে বলি—এ পাড়ার সব বাড়িই ত' বড় সাহেবের বাড়ি, আজ পর্যন্ত আমি থানায় ঢুকিনি, এইবার সেই রিপোর্ট মুখে পড়লাম—

মহিলাটি দৃঢ়স্বরে বলেন—না না, তা কেন? আমি অত সব হৈ-চৈ ভালোবাসি না, পুলিশের হাতে আমি দেব না—

বিস্মিত হলাম, আনন্দও হল মনে মনে, সেই সঙ্গে একটু বিরক্ত হলাম। গলার সুর চড়িয়ে বললাম—কথা আমি চাই না, শাস্তি দিন, দোষ করেছি, ধরা পড়েছি।

—ওসব আমি জানি। যেন আমার মধ্যে একটা কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন, আমাকে যেন আরো একটু জানতে চান। কথাগুলি হয়ত ভালোভাবেই বলেছেন, ব্যাপারটি লঘু করার চেষ্টা হয়ত।

তবু বলি—দেখুন, আমি যে কি তা জানি। বরাবরই জানি। আপনার কথার অর্থ কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।

কণ্ঠস্বরে কৌতূহল মিশিয়ে মনস্বিনী বললেন—একটা কাজ-কর্ম করলেই ত' পারো, পুরুষ মানুষ, স্বাস্থ্যও মন্দ নয়, লেখা পড়া জানো বলে মনে হচ্ছে, চুরি করার চেয়ে ভিক্ষা করা অনেক ভালো।

আমি আবার সবিনয়ে বলি—চাকরি একটা করি, ছাপাখানায় কম্পোজিটর, যা পাই তাতে পেট ভরে না। ইলেকট্রিকের কাজও কিছু কিছু জানি—আজ ক'দিন ধরে ছাপাখানায় লক্ আউট চলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন, মাঝখানে চেয়ারটুকুর ব্যবধান। আর সেই চেয়ারে পড়ে আছে পিস্তলটা। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাই।

তিনি যেন আমার অস্বস্তি বুঝলেন, বললেন—ওটা ধরো ড্রয়ারে তুলে রাখো, সামনে থাকলে কথা বলতে বাধবে তোমার—

প্রস্তাবটা মোটেই হুকুমের মত শোনালো না, তাছাড়া আর বন্দুক, পিস্তল আমার সয় না, সন্তর্পণে সেটি ড্রয়ারে উঠিয়ে রাখলাম। এরপর উনি একটা পাখর বসানো আঙটি আমার হাতে তুলে দিলেন। মূল্যবান বলে মনে হয়। বন্ধু সেলসম্যানের ভঙ্গীতে আঙটিটা আমার দিকে প্রসারিত করে বললেন, কেমন পছন্দ হয়? আমার তেমন ভালো লাগে না এসব, তুমি এটা নাও।

দান। রীতিমত করুণার দান। তবু দান ত'—

আমি ক্ষুব্ধ গলায় বলি, মাফ করবেন! চুরি করতে এসেছি, ভিক্ষা নিতে আসিনি।

মাথাটা নীচু করলাম। ঐ দৃষ্টির পানে তাকান কঠিন।

মহিলাটি বললেন—বিক্রী করে অন্তত পাঁচশো টাকা পেতে পারো।

আমার চোখ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আর ইতস্তত: না করেই তিনি সেই আংটিটা আমার মলিন সার্টের পকেটে ফেলে দিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি।

মহিলাটি ক্লান্ত গলায় বললেন—চেষ্টা করে এই টাকায় যা হয় কিছু একটা করবে, কেমন?

পালাবার প্রবল বাসনা, তবু পা যেন চলে না। করুণা আমাকে কাহিল করেছে। ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই—আচ্ছা, এখন তাহলে যেতে পারো—

জানলার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি যেন আপন মনেই বললেন—মনে হয় সুযোগ নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এসেছে, কাজে লাগাতে পারো নি।

ওঁর কথায় সহানুভূতির আমেজ অনুভব করি। যেন কথা বলতে হয় তাই বলছেন, ভালো লাগছে না। এ ভাবে কথা বলতে।

আমি অতিকষ্টে বলি, সুযোগ জীবনে আসেনি, কারণ আমার তিন-কূলে কেউ নেই, আমি অতি দরিদ্র—

বিরক্ত হচ্ছেন বুঝি, তবু যে কেন যেতে বলছেন না, বুঝতে পারি না। আমার ভাবভঙ্গী দেখে বুঝছেন যে যাওয়ার জন্য আমি পা বাড়িয়ে আছি। এমন সময় তিনি বললেন—কেউ নেই মানে? কেউ না কেউ ত' থাকবেই।

—আপনাদের সমাজে হয়ত তাই, আমাদের কেউ নেই।

মহিলাটি হাসলেন, বললেন—তোমাদের সমাজটা তাহলে কি?

—আমাদের আবার সমাজ। কেউ কোথাও নেই, চার দিক ফাঁকা।

হতাশাব্যঞ্জক গলায় মহিলাটি বললেন—তাহলে ত' কোনোদিনই কিছু মিলবে না। মানুষ জন্মায়, বড় হয়, কাজ করে, ঘর-সংসার করে, তারপর বুড়ো হয়ে মরে, এই ত' জীবন!

শান্ত হল তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠ।

আমি বললাম—জীবনের এ সব ঘোর-পাঁচ, গলি-ঘুঁজি আমারও জানা আছে।

তিনি বললেন—আমি তাই বলি, মানুষ নিজেই নিজের জীবনটা গড়ে নেয়, জীবনটাকে গড়ে তুলতে হয়, অবশ্য সেই ইচ্ছাটা থাকা চাই।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বলি, আমার যাওয়ার অনুমতিটা দিন!

উনি আবার হাসলেন। এই হাসিতে আর মাধুরী নেই। সরু পাতলা ঠোঁটে অতি কঠোর হাসি। বললেন—এই বয়সেই এত স্বার্থপর! মনের মত কথা হচ্ছে না, তাই যেতে চাও।

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীটুকু তিরস্কারের।

আমি মোলায়েম গলায় বলি, ঠিক তা নয়,

মহিলাটি বললেন—তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছে, একা একা তেমন ভালো

লাগছিল না এতক্ষণ। কেন কে জানে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না, কি ভালো লাগে, আর কি ভালো লাগে না।

এতক্ষণে বোঝা গেল, তাই এত সব কথা। একটা অশ্রদ্ধার ভঙ্গী ওঁর মুখে। ওঁর মুখের পানে একবার তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিলাম। কেমন যেন লজ্জা ও হতাশার ভাব সেই মুখে।

আমি চুপ করে থাকি।

তিনি আবার কথা সুরু করেন, সেই একই কথার জের টেনে বলেন—যদি সুবিধা পাও ত' কি করবে?

—কি আর করব! কিছুই করার নেই। কোনো আশা নেই, ভরসাও নেই।

হয়ত—কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, চোখে করুণার নায়াময় দৃষ্টি। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন।

বাইরে একটা মোটর এসে থামল, ইঞ্জিনটা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, তারপর সজোরে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। মহিলাটি বললেন—ওঁরা এসেন। তুমি এবার পালাও, যে রাস্তায় এসেছ বরং সেই পথেই পালাও—

এক রকম তাড়িয়েই দিলেন। পালাবার সময় চাপা গলায় একটা ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। সেই ঘন অন্ধকারে আমার মনটা নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। পকেটে পাঁচশো টাকা। ধরা পড়েও মুক্তি। পাঁচশো টাকা আমার নিজস্ব। পকেটের আণ্ডটিটা অনুভব করি। পদক্ষেপ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে।

অন্ধকারের ভেতর থেকেই কে একজন আমার জামাটা চেপে ধরল। ঠাট্টা করে বলে—বড় ছাড়া দেখ্‌ছি, চলেছ কোথায়?

—বাড়ি যাচ্ছি।

—তাই নাকি! বাড়িটা কোন্ দিকে?

পাহারওলা আমার মুখের ওপর টর্চটা ফেলে ভালো করে দেখে।

আমার কণ্ঠে আর স্বর নেই, কে যেন সব হঠাৎ হরণ করে নিয়েছে। তাই ত' আমার বাড়ি কোথায়? নীরব হয়ে থাকি।

এইভাবেই আইনের হাত মস্ত কবলে জড়িয়ে পড়লাম।

বেশী কথার প্রয়োজন ছিল না। এই গভীর রাতে এই অভিজাত পল্লীতে যে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসিনি সে কথা জানার জন্য 'থার্ড ডিগ্রি' এর প্রয়োজন নেই। সে প্রশ্ন করে—নামটা কি?

—রাধানাথ দাস।

—বাড়ি?

ঠিকানা একটা দিলাম।

পকেটে খানাতল্লাসী করে পরিচয় জ্ঞাপক কোনো নিশানা না পেলেও সেই আণ্ডটিটা পাওয়া গেল।

—এটি কি! চুরি করেছ নিশ্চয়ই—এখন চলো আমার সঙ্গে—

আমি বললাম—অন্ধকারের ভেতর পেয়েছি, আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলাম।

ভদ্রমহিলাটিকে আর এর ভেতর জড়াতে চাইনি।

নির্জন জেলের কুঠুরিতে বসে একদিন শুনলাম সনাক্তিকরণ হবে। আমাকে সারে দাঁড়াতে হবে। ভদ্রমহিলাটিকে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এইবার আমার মুক্তি। আততায়ী স্বয়ং উপস্থিত। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন—হাঁ, এই সেই লোকটা।

তারপর চলে গেলেন।

এই কথা কটি বলে চলে গেলেন। ঘৃণায় যেন কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুলিশ অফিসর তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন।

ডিটেকটিভ লোকটি কিন্তু ভালো মানুষ। তিনি বললেন—তোমার বাঁচবার কোনো চান্স নেই। কোনো জুরি তোমার আত্মগুবি অবানবন্দী বিশ্বাস করবেন না।

—আমি কিন্তু কাউকে খুন করিনি। এই কথাটা বোঝাতে পারছি না। এমন কি লোকটা কেমন দেখতে তাও জানি না।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মুণ্ড নেড়ে পনরর ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর মাথা নাড়লেন। বললেন—রিভলবারে তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। পকেটে হীরের আংটি। খুনের কিছুক্ষণের ভেতরই তোমাকে ওদের বাড়ির কাছে ধরা হয়েছে। এখন আর সত্যি কথা বলতে আপত্তি কি! সত্যি কথা বললে ফাঁসীটা হয়ত হবে না, দ্বীপান্তর হবে।

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—দেখো এসব কেসে সত্যি কথা বললে তোমার ক্ষতিটা কি! মারা ত' যাবেই। বুকটা হালকা করে আরাম করে যাও।

আমার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একজন ছোকরা উকীল। নিছক দয়া করে। একবার আমার সঙ্গে দেখা করে তিন ঘণ্টা গামছা কাচা করে ছেড়েছেন।

—কোন হাত দিয়ে রিভালবারটা তুলে রেখেছ মনে নেই! তাঁর কণ্ঠস্বরে ঘৃণা, অথচ সন্তোষ। ভদ্রলোকের মুখভঙ্গী আমাকে করাতের মত কাটে।

বিচার ভালোই হয়েছিল। সরকারি উকীল তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে ও সরলভাবে বলে গেলেন—আসামী নীচের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। জানালাটা বন্ধ ছিল, আটকানো ছিল না। মৃত শিবশঙ্করবাবু আর তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এই ঘরে এসে পড়েন, ফলে আসামী হতভম্ব হয়ে পড়ে। আসামী মিঃ চৌধুরীর বুকটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। তবে আসামী আনাড়ি, ছিঁচকে চোর, এই কাজ বোধ হয় ওর প্রথম।

তারপর বললেন—কারো বিশ্বাস হয় মিসেস চৌধুরী এই আসামীকে জানলা খুলে ডাকলেন? তারপর গুলিভরা রিভালবার হাতে তুলে দিলেন! আমি আর কিছু বলব না।

আমার উকীলবাবু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ভদ্রমহিলাকে জেরার জেরবার করেছেন। মহিলাটির অনমনীয় ভঙ্গী। এমনভাবে কথা বলছেন যেন যা বলছেন সবই সত্যি।

—কোন্ হাতে আসামী রিভালবার ধরেছিল?

—ডান হাতে।

—ঠিক বলছেন?

—হাঁ।

—কি করে ঠিক বলছেন। কি করে আপনি লক্ষ্য রাখলেন?

—ঘরের ভিতর ঢুকতেই দেখলাম। দুয়ার থেকে হাতের আঙটি বাঁ হাতে তুলে নিল, আর ডান হাতে রিভালবার—মিঃ চৌধুরী অবস্থাটা বুঝতে পেরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু বেশীদূর যেতে হলনা, তারপর এই কাণ্ড—

কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস চৌধুরী!

আমার উকীল কিছুক্ষণ থেমে আবার সেরা করলেন।

—তাহলে আসামী আগেই মিঃ চৌধুরীর রিভালবারটা হাতিয়েছিল! আপনাদের রিভালবার কি ব্রেসিং টেবলেই থাকে বরাবর?

—হাঁ, সেদিন তাই ছিল!

—লোকটা ডান হাত দিয়ে রিভালবারটা ধরেছিল, আর কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল কিনা বলতে পারেন না? কিন্তু আপনার বাড়িতে সেদিন অশোক মজুমদারকে আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন কি!

—নিমন্ত্রণ আমি কাউকেই করিনি!

—তিনি কি এসেছিলেন? কখন এসেছিলেন? এখন তিনি কোথায়?

—এ কথার জবাব আমি দেব না! তিনি কোথায় আমি জানিনা।

—বেশ! তাঁর কাছে লেখা আপনার একখানি চিঠি আমার হাতে আছে। সেই চিঠিতে কিছু জবাব হয়ত পাওয়া যাবে! আচ্ছা এইবার কিংগার প্রিণ্ট ইন্‌স্পেক্টরকে ডাকা হোক—

আবার সুরু করে ছোকরা উকীল, সবাই মুখ টিপে হাসছে। আদালতের ভয়ে কেউ কথা বলছে না। যেখানে সরকার পক্ষে নরোত্তম হাজরা সেখানে এই ছোকরা উকীল বলিনাক সরকার কি করবে!

ছোকরা উকীল প্রশ্ন করেন—আসামী ছাড়া আর কারো আঙুলের ছাপ আপনি রিভালবারে পেয়েছেন। হাঁ আরো দুটো ছাপ আছে, তার সঙ্গে আসামীর হাতের ছাপ মেলেনি!

—আসামীর ছাপ, ডান হাতের না বাঁ হাতের?

—বাঁ হাত! অন্য দুটি ছাপ ডান হাতের!

আদালতের কামরার সারাঁতে দুটি চড়ুই পাখীর কলরব শোনা যায়। আদালতের সকলের চোখ এখন মিসেস চৌধুরীর দিকে। তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সে চোখে করুণার ছাপ নেই, সে চোখ এখন হাসছে।

আমার উকীল বললেন—এইবার তাহলে মিসেস চৌধুরীর এবং অশোক মজুমদারের আঙুলের ছাপটা পরীক্ষা করা হক। ভুলটা লেগেছে ডান হাত থেকে এমনই ধারণা এক্সপার্টের।

মিসেস চৌধুরী কি যেন মুখে পুরলেন। চিউইং গাম, সুপুরি না চকোলেট?

পর মুহূর্তেই তাঁর চেতনাহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল চেয়ারে। সাদা পাউডারটাকেই কি পটাসিয়াম বলে?

# একটি তরুণ আর কার্নেশন ফুল

মূল: আইজাক ডিনসেন

অনুলেখন: গৌরীশংকর দে

বেলজিয়ামের ছোট্ট এলাকার একটা ছোট্ট, ছিমছাম হোটেল। কুইনস্ হোটেল। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের অনেকে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। সস্ত্রীক থাকেন।

মার্চ মাস। সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসছে। ক্লান্ত পা ফেলে হোটেলের দিকে যাচ্ছে একটি ইংরেজ যুবক। বিষণ্ণতা তার চোখেও।

যুবকের নাম চার্লি ডেসপার্ড। গায়ের আর চুলের রং একই রকম। বাদামী চোখ দুটি মধ্য-গ্রীষ্মের আকাশের মতো নীল। পরনে নতুন পোশাক। হাতে সুটকেস।

বয়েস তিরিশের বেশি নয়। দেখাচ্ছে আরো ছোট।

চার্লি সাহিত্যিক। সুটকেসের ভেতরে আছে ওর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। এর শেষ দু-তিনটি অধ্যায় লিখবে বলে সে যাচ্ছে ইটালীতে। স্ত্রী-ও আছে সঙ্গে। সে চলে এসেছে আগেই। চার্লির জন্যে অপেক্ষা করছে কুইনস্ হোটেলে।

ফেলে-আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে চার্লির। বড় গরীব ছিল ওর মা-বাবা। প্রতিদিন ওদের খাবারও জুটতনা। তারপর একেবারে রূপ-কথার নায়কের মতো রাতারাতি বদলে গেল অবস্থা। একখানা বই লিখেই নাম ক'রে ফেলল চার্লি। নামের সঙ্গে সঙ্গে এল অর্থ। শুধু কি রাজত্ব? রাজকন্যাও। এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সুন্দরী মেয়ে ওকে বিয়ে করল। ছিল চার্লি একেবারে ঘরের ছেলে, হ'য়ে গেল ওদের ঘরের একজন। ভাগ্য-লক্ষ্মী তার হাতের দীপের আলো সব টুকুই যেন ধরলেন ওর মুখে।

শুধু এক বিষয় বিষম তার রক্তের ভেতরে খেলা করে রাত্রি দিন। চার্লি বড় ক্লান্ত। ছকে বাঁধা প্রতিটি মুহূর্ত। মনে হয় সব ফুল ছুটে গেছে এক সঙ্গে, উপবনের পথে প'ড়ে আছে, শুধু মলিন পাপড়ি। ডানা হারিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে মুমূর্ষু কল্পনা। নিভে এসেছে বুকের ভেতরকার আগুন। মনের পর্দায় ভেসে ওঠেনা নতুন ছবি, রক্তের ভেতরে কোলাহল আনে না নতুন শব্দ। সব ক্ষমতা, সব দীপ্তি হারিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে-রাখা তরবারির মত বিবর্ণ আজ মন। প্রথম লেখাতেই নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে তার শক্তি। আর কি সে পারবে দ্বিতীয় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে? বলার যা ছিল সবইতো বলা হয়ে গেছে। তোরঙ্গের ওই পাণ্ডুলিপি তো ক'য়েক বিস্তা কাগজ। আর লিখতে পারবেনা চার্লি। সাদা কাগজ এখন থেকে শুধু বিদ্রূপ করবে ওর দিকে তাকিয়ে। এখন যা সে লিখছে সে-তো খবরের কাগজ, পাঠক, আর সমালোচকের চাহিদামতো। নিজের সজীব হৃৎপিণ্ড সে-সব লেখার কোনোটিতেই তো সে পারছেনা ছুড়ে দিতে। নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে ও পরের আবদার রাখছে। একটা ষড়যন্ত্র চলেছে চার্লিকে ঘিরে। জেনেশুনেও তাতে সে জড়িয়ে

পড়েছে। এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে সবাই : পাঠক, সমালোচক, এমন কি ওর স্ত্রী লরাও। চার্লি রক্ত-মাংসের মানুষ ওরা তা ভুলে গেছে। সবাই ভাবছে ও লিখবার একটা যন্ত্র।

কেন এত বিখ্যাত হ'তে গেল চার্লি! তাই তো এখন ওর আত্মহত্যার অধিকারও নেই। এর আগে, ছেলেবেলায়, স্কুলের জ্বালায় যখন সে ছটফট করত তখনও অনেকবার মরতে চেয়েছে নদীর জলে ডুবে। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ। তখনকার আত্মহত্যা হত নিছকই অখ্যাত, অজ্ঞাত কিশোরের আত্মহত্যা। তার খবর বিশেষ কেউ রাখত না। আর এখন? যশের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে মুখে। তার দিকে অনবরত তাকিয়ে আছে ক'শো হাজার চোখ। ওর কোনো ব্যাপারই যেন এখন আর ব্যক্তিগত নয়। এতটুকু আড়াল নেই কোথাও। খ্যাতি ডেকে এনেছে সমতলের মাঝখানে, সেখানে এতটুকু ঝোপ-ঝাড় পর্যন্ত নেই। সব গোপনতা অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশার মতো। কিছুই আর নেই যা তার একার, যা তার ব্যক্তিগত। আজ যদি সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে, সে ব্যর্থতা, সে আত্মহত্যা হবে একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের।

ওর এখন বই লেখা বিচারে কি টিকে থাকবে? শ্বশুর মশাই তো সেদিন পরিষ্কার ব'লেছেন "একেবারেই হাল্কা, চটুল, আর ফাঁপা আধুনিক সাহিত্য। ওজন নেই, মহত্ত্ব নেই। একেবারে ভাসা-ভাসা। যা একবারও স্পর্শ করতে পারল না গভীরতা, কী হবে তা লিখে?" এ প্রশ্ন শুধু তার শ্বশুর মশাইয়ের নয়, এ প্রশ্ন চার্লির নিজেরও।

হঠাৎ চার্লি ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল। যে ঘরে লরা অপেক্ষা করছে ও এসে পড়েছে তার সামনে। নিচের দারোয়ান বোধহয় এই ঘরটার কথাই ব'লে দিয়েছিল।

একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘর প্রায় অন্ধকার। ড্রেসিং টেবিলের ধারে শুধু মৃদু একটা গ্যাস-বাতি জ্বলছে। ঘরের বাতাসে ক্লোরোফর্মের গন্ধ। একদিকের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। আশমানি রঙের কাগজে মোড়া। জানালায়, দরজায় লাল পর্দা।

ঘরে দুখানা খাট। একটিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে লরা। নিঃশ্বাসের তালে তালে ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করছে ওর বুক। ওকে মনে হচ্ছে শাদা সোনালির কোরকের মতো।

লরাকে আর জাগাতে চাইলনা চার্লি। ওরে পড়ল দূর বিছানায়। ঘুমের আমেজে বুজে আসছে চোখ। এমন সময় দরজায় একটা শব্দ হল। কে যেন কাতর ডাকছে। ওই তো টোকা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিস। লরার ঘুম ভেঙে যাবে যে।

বিছানা থেকে উঠে, গায়ে সবুজ রাত্রিবাসটা চাপিয়ে আস্তে দরজাটা খুলল চার্লি। টানা বারান্দার দেয়ালে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আর সেই আলোর ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্যরূপ রূপবান যুবক। দীর্ঘ দেহ, স্বপ্নাতুর চোখ। পরনে বিকেলে বেড়াবার রঙমহলে পোশাক। বুকের ওপর, বোতামের ঘরে একটা সোনালি কার্নেশন ফুল। আশ্চর্য শান্তির আভাসে উদ্ভাসিত যুবকের মুখ। এমন শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী এর আগে চার্লি কোনোদিন দেখেনি। মধ্যরাতের কুইন্স্ হোটেলের বারান্দায় এল এ কোন দেবদূত!

আগন্তুকও কম অবাক হয়নি। একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে উঠল "একটা ভুল হ'য়ে গেছে। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাফ চাচ্ছি।" কথা তো নয়, যেন গান গেয়ে উঠল।

আবার ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল চালি। সঙ্গে সঙ্গে মন হ'য়ে উঠল অশান্ত সমুদ্র। মনে হল প্রভাত আলো এক মুহূর্তের জন্ত তার মুখে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে। এখন সামনে শুধু সীমাহীন তমসা।

মনে হল যে শান্তি, যে গৌরব, যে আলো, যে পরমার্থ এতদিন ধ'রে সে খুঁজে এসেছে পৃথিবীতে অন্তত একজন তা পেয়েছে। পেয়েছে ওই যুবক যার বুকের ওপর মহার্ঘ রত্নের মতো জলজল করছে কার্নেশন ফুল, যার মুখশ্রীতে অনন্ত শান্তির জ্যোতি। আর, একজন যখন সেই আনন্দ-লোকের সন্ধান পেয়েছে চালির পক্ষে এখনো সম্ভব হতে পারে সেই স্বপ্ন-রাজ্যের নিশানা বের করা। সেই নক্ষত্রলোকে কবেই তো সে যেতে পারত। পারেনি নিজেরই দোষে। গ্রহ-তারকা, সাগর, গিরি পরিত্রাস করে সে সন্তুষ্ট থেকেছে কেবল সেই সব শব্দে যা শুধু ঈশ্বরের ওই সব উপহারে বর্ণনা করে। আর শব্দের দাসত্ব নয়। এবার চালি বেরিয়ে পড়বে বিপুলা পৃথিবীর মাঝখানে, আনন্দের সন্ধানে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। পেছনে প'ড়ে থাকুক খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রেয়সীর অশ্রুচোখ। মরা যাকে বিয়ে করেছে সে রক্তমাংসের মানুষ চালি নয়, সে হল মরারই মনের কল্পনা, একজন বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাই তাকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হওয়া উচিত নয় চালির। প'ড়ে থাকুক সাহিত্য। চালি সাহিত্য সৃষ্টি করুক এ তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। এবার পালে লাগুক হাওয়া। শেষ হ'য়ে এসেছে বন্দরের কাল।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ল চালি। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ ক'রে। কী যেন বলতে চায় হাওয়া। একেবারে সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছে ও। তাকাল জলের ভেতরে। নাবার ওপর ঝিকঝিক করছে তারা। নিচে গভীর, অন্ধকার সমুদ্র। দীর্ঘ বাতিগুলির ছায়া পড়েছে জলে। একেবেঁকে খেলা করছে নতুন দোমড়ানো সাপের মতো। আকাশ থেকে নেমে আসছে অঝোর বাদলধারা, গায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে অবিরাম লবণাক্ত জল। কাছেই ভাসছে কয়েকখানা জাহাজ। বৃষ্টি-ঢেকা অন্ধকারে মানুষগুলো মনে হচ্ছে অতিকায়। জাহাজগুলির রহস্যময় গর্ভে বিচিত্র পণ্য, অনন্ত সম্ভাবনা, বহুজনের সৌভাগ্য। এরা অকূল পাথারের যাত্রী। যেখানে যেতে চায় সেখানেই এদের নিয়ে যায় লবণ-সমুদ্র! এরা সব দিক দিয়েই চালির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর মনে হল ওই বিশাল হালগুলি থেকে সহানুভূতির প্রবাহ এসে তার ভেতরে অলৌকিক অনুভূতি সঞ্চার করছে। কী অমৃত-বাণী শোনাতে চাচ্ছে তার কানে-কানে। অনেকক্ষণ সেই বাণী রইল অস্পষ্ট। তারপর যেন একখানা কালো পর্দা চকিতে উঠে গেল মন থেকে: বিশাল জাহাজগুলিও তো ভেসে আছে জলের ওপর। ভেসে থাকাতেই ওদের ক্ষমতার পরিচয়। গভীরতা রইল অনেক নিচে, রইল অন্ধকার সমুদ্র গর্ভ। তা স্পর্শ না করাতেই জাহাজের মঙ্গল। ভূমি স্পর্শ মানেই সর্বনাশ। ওরা ভাসা—এই তো ওদের অস্তিত্বের রহস্য। যতক্ষণ ওরা ভাসা ততক্ষণই সমুদ্র ওদের ক্রীতদাস। তাহলে নিজের সাহিত্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন চালির!

ওর ভারি দুঃখ হল কেন এতদিন আসেনি সমুদ্রের ধারে! জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে বলল: "সিন্ধু-বিহারিনী, দেবদূতী! তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো চিরকাল। আমাকে আর তোমাদের যেন চিরকাল ভাসিয়ে রাখেন ঈশ্বর। দরকার নেই আমাদের গভীরতায়।"

চালির সমস্ত শরীর বৃষ্টিতে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। তবু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন শক্তি পেয়েছে ও এই রাত্রিশেষের সাগর-পাড়ে এসে। নতুন আনন্দ, নতুন উন্মাদনায় কানায় কানায়

ভরে উঠেছে চারি। বেড়ে উঠেছে বর্ষায় জলের উদ্ভিদের এখন ফুল ফুটতে শুরু করবে ওর ভেতরের সব অন্ধকার থেকে। আর দুঃখ নেই। যেখান থেকে চ'লে এসেছে স্বার্থপরের মতো, আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে ফুল ফুটেছে ও লরাকে। তার কাছে ক্ষমা চাইবে অকপটে। ফুইনস্ হোটেলের দিকে আবার পা বাড়ায় চারি।

ভোর হ'য়ে এসেছে। রাস্তার সারি-সারি বাতিগুলি হাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙছে শহরের। দু'চার জন লোকে চলাচল শুরু হয়েছে রাস্তায়। এখনো আলো জ্বলছে ফুইনস্ হোটেলের জানালায়।

ফলঘর পেরিয়ে নিজের কেবিনে যাবে এমন সময় চারি দেখলে লরা ব'সে আছে ফলঘরের পাশেই ছোট খাবার ঘরে। কাচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছটফটে লিলি ফুলের মতো ওর মুখ। লরার সমুদ্র-নীল চোখে ভাবনার ছায়া।

চারিকে দেখতে পেয়েই লরা ব'লে উঠল : 'এত দেরি করে এলে তুমি!'

কোনো উত্তরই দিতে পারলনা চারি। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। আলোর রেখা এসে পড়েছে ছেঁড়া কার্পেট আর লাল মখমল-ঢাকা চেয়ারের গায়ে। সাদাটে ঘরে কফি আর তাজা রুটির গন্ধ। সাদা টেবিল ক্লথ আর রকমারি কফির সাজ মিলে রচনা করেছে উৎসবের দিনের ভোরের বেলার পরিবেশ। লরার গায়ে 'নীল পোশাক'। সোনালি চুল ঝিলমিল করছে আলো লেগে।


নতুন বই ! নতুন বই !!

*প্রেমদাস তীর্থংকর ( গুহাবাসী ) প্রণীত*

# দেবভূমি বক্রেশ্বর

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত গ্রাম 'বক্রেশ্বর'—যার তীর্থ-মহিমা ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থভূমির সমকক্ষ। সর্বত্যাগী মহাপুরুষ প্রেমদাস তীর্থংকর ( গুহাবাসী ) ভারতের সর্বতীর্থ পরিক্রমার শেষে এইরূপ দেবাদিষ্ট হন, "কাশীতে কাশী মাহাত্ম্য, জগন্নাথে জগন্নাথ মাহাত্ম্য, তদ্রূপ বক্রেশ্বরে, বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা আবশ্যক। তৎসঙ্গে এ তীর্থের লুপ্তপ্রায় সপ্ত মনিষীগণের জীবনী সংযোজিত রহিবে।" এই দৈবাদেশে লিখিত, তীর্থভূমির আলোক-চিত্র সম্বলিত প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে। দাম : ৪·০০

১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

পরিবেশক :

**জিজ্ঞাসা**

৩৩এ, কলেজ রো, কলিকাতা

চার্লিকে তার দিকে তাকাতে দেখে লরা ব'লে উঠল : "কী ভাবছ অমন ক'রে ?"

চার্লি বলল : "তোমাকে মনে হচ্ছে বাহিবর। তোমার স্থির আলো আমাকে দেবে পথের নিশানা।"

লরার গোলাপি মুখ আরো গোলাপি হ'য়ে উঠল। ও শুধু বলল : "চলো, আমাদের কেবিনে যাই।"

ঘরে ঢুকে কিন্তু চার্লি অবাক হ'য়ে গেল। কাল রাতের ভায়োলেটের গন্ধ তো ঘরে নেই। বিছানার ওপর যে চাঁদোয়া ছিল সে-টা কোথায় গেল! দেয়ালে ওই যে ছবিটা টাঙানো রয়েছে কাল তো তা চার্লির নজরে পড়েনি। চার্লির মনে আর সন্দেহ নেই। কাল রাতে সে ভুল ক'রে অন্য কারুর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। জোরে নিঃশ্বাস টেনে ও মনে মনে ব'লে উঠল : "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! স্বর্গ যেমন মর্ত্যের থেকে সেরা, তেমনি আমাদের ছোটগল্পের চাইতে সেরা তোমার ছোটগল্প।"

এমন সময় কুইন্স্ হোটেলের সেই ছোট কেবিনে চার্লির চোখের সামনে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন। বললেন : "চার্লি, এখন থেকে তুমি প্রেমের গল্প লিখবে তো? এমন গল্প যা চিরকাল বেঁচে থাকে যে তরুণ-তরুণীর মনে?"

চার্লি বলল : "তাই হবে প্রভু।"

ঈশ্বর আবার বললেন : "তোমাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। পাঠকদের জন্যও নয়, সমালোচকদের জন্যও নয়, আমার আনন্দের জন্য।"

চার্লি কি বলতে যাচ্ছিল। দেখল ঈশ্বর অন্তর্হিত হয়েছেন। লরা কখন ঘুম থেকে উঠেছে জানালা। বাইরে থেকে আসছে ভোরের হাওয়া, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, চড়াই পাখির কিচিরমিচির, মানুষের কথাবার্তা, ধোঁয়ার গন্ধ। চার্লি তাকিয়ে দেখল আকাশে চিক চিক করছে রোদ। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ। একটি রূপসী তরুণী গায়ে সবুজ রঙের শাল জড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।

এই জাগরণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চার্লি মনে মনে বলল : "ঈশ্বরের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। তিনি অন্তত একবার আমাকে করুণা করেছেন। যার বুকে গোলাপি কার্নেশন সেই যুবকের স্বপ্নের কুহকে আমার ভুল হাতের স্পর্শ পড়েনি। একেবারে আমার হাতের কাছে ছিল, তবু।" জানালা দিয়ে চার্লি চেয়ে দেখল হোটেলের বাস-যাত্রীদের নিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

---

শ্রীহামীর [illegible] বসু পল্লিক
[illegible]
[illegible]

# মেয়েদের কথা

শান্তা দেবী

আজ মেয়েদের বিষয় কয়েকটা কথা বলব।

মেয়েদের জীবনে কত রকম নূতন আদর্শ, নূতন সমস্যা, নূতন সমাধান আজকাল দেখা দিয়েছে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলে সে বিষয়ে বলবার অনেক কথা আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি খবরের কাগজ আর মাসিক পত্র ছাড়া কলকাতা সহরের নারী সমাজের পরিচয় বড় বেশী পাই না। কাগজে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের ডিঙিয়ে যাচ্ছে। টাকার অভাবে ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা চাকরী করতে ঢুকছেন। ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মায়ের যত্ন মায়ের সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ভাল করে গড়ে উঠতে পারছে না। আবার কখনও বা দেখি পয়সার অভাবে শিশু সন্তানকে খেতে দিতে না পারায় দরিদ্র মায়েরা অসহুপায়ে টাকা রোজগার করতে চলেছেন। এসব জিনিষই ভাববার জিনিষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা যে ছেলেদের ডিঙিয়ে যাচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রেই সেটা ছেলেদের পক্ষে সত্যই লজ্জার কথা। তাঁরা পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর জীব বলে যে তাঁদের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার তা আমি বলছি না। বলছি যে, যত মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে থাকে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ছেলেরা পরীক্ষা দেয়। সেই সংখ্যার অনুপাতে অনেক মেয়ের প্রথম স্থান অধিকার করার কারণ এই দাঁড়ায় যে, বেশীর ভাগ ছেলেরা পরীক্ষা দিলেও পড়াশুনা কম করে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের কম, জ্ঞান লাভের ইচ্ছাও তাদের কম বলতে হবে। নাহলে পরীক্ষার হলে ওতারি করে ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করতে চেষ্টা করত না। বহু ছেলের মধ্যে এই যে অভদ্র ও অন্যায় মনোবৃত্তি আজকাল জেগে উঠেছে তার কারণ অনেকে বলবেন—বর্তমান যুগের হাওয়া। কিন্তু হাওয়াটার অর্থাৎ অক্সিজেনে বা নাইট্রোজেনে আজকাল এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি যার জন্য কলেজের ছেলেদের অধ্যক্ষকে ঘরে বন্ধ করবার বা আফিসের কর্মচারীদের ম্যানেজারকে তালা বন্ধ করবার প্রেরণা আসতে পারে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষার যে হাওয়া তরুণ মানবদের এই রকম উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে তার উৎপত্তি কতক ঘরে কতক বা বাইরে। ঘরের শিক্ষার জন্য প্রধানত মায়েরাই দায়ী। আগেকার মায়েরা ছেলেমেয়েদের যতটা কষ্টসহিষ্ণু করে মানুষ করতেন, এখনকার আরামের দিনে তা কোনো মা করতে চান না। আমরা বহু খ্যাতনামা মানুষের কথা শুনেছি যাঁরা রাস্তার আলোর তলায় দাঁড়িয়ে রাত্রে পড়াশুনা করেছেন, মুড়ি-মুড়কি খেয়ে ছয় মাইল হেঁটে স্কুলে গিয়েছেন। বই না থাকাতে পরের বই ধার করে এবং কপি করে অনেককে পড়তে হত। কাপড়-চোপড় যথেষ্ট না থাকাতে নিজের কাপড় নিজে সাবানে কেচে স্কুলের পোষাক পরিষ্কার রাখতে হত। কিন্তু আজকালকার মায়েরা কি করেন? পয়সা একটু থাকলেই ছেলেদের জন্য ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্প, কেতা দুরস্ত ইউনিফর্ম, নানারকম ফাউন্টেন পেন, ব্রিওয়াচের বস্তা বইয়ে দেন। হেঁটে স্কুলে যাওয়া ত স্বপ্নেও এরা

তাবে না। মোটরে, সাইকেলে, বাসে, ট্রামে, ট্রেণে ক'রে বহু বহু ছেলেরা স্কুল কলেজে চলেছে দেখা যায়। সময় অবশ্য তাতে সংক্ষেপ হয়। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত সময়টা কি সৎকাজে ব্যয় করা হয়? না সিনেমা, থিয়েটার, আড্ডা আর গুতানিতে নষ্ট হয়? মায়েরা সে কথা কি ভেবে দেখেন? ছেলেদের কি সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন? ছেলেদের এই যে আরাম ও বিলাস মেয়েদের বেলায় সেটা অনেক ক্ষেত্রেই কম থাকে। তাই বোধহয় তারা প্রাত্যহিক জীবনের পরিশ্রমের মত আমোদের পরিশ্রমটাকেও করতে ভয় পায় না অত। পরীক্ষার জন্য পড়া মাসে দুদিনের মত কয়েকটি প্রশ্ন সমাধান করণ করা যদি আজ-কালের প্রথা না হত, তাহলে পাঠ্যপুস্তকগুলির ভিতর কি আছে ছেলেরা আর একটু ভাল করে জানতে পারত। তাতে শুধু যে পরীক্ষায় তারা বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিতে পারত তা নয়, বিদ্যা থেকে মানুষের চরিত্র গঠনের যে সহায়তা হয় সেটাও তাদের হয়ত লাভ হত। তারা বুঝতে পারত প্রশ্নের উত্তর চুরি করে বা পয়সা দিয়ে কিনে লিখে বিদ্যালাভ হয় না, জীবনে বিদ্যার ফলস্বরূপ যে সফলতা তাও লাভ হয় না।

মেয়েদের আমি পরিশ্রমী বলছি; কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক কালে অনেক ক্ষেত্রে সহজ করে তুলেছে বলে আগের মত পরিশ্রম মেয়েদেরও করতে হয় না। আমেরিকার মত বোতাম টিপলেই খাবার ব্যবস্থা অবশ্য এ দেশে হয় না, ফলে বাসন মাজা কাপড় কাচাও চলে না বটে। কিন্তু পুরাকালের মেয়েদের মত ক'জন আজকাল ঘড়া কাঁকালে করে জল আনে? কজন ধান ভানে, গুঁড় ভাঙে, ঘর নিকোয়, ছেলের আলো সাজায় আর পুরুষদের খাবার সময় তাল পাখা দোলায়? গ্রামে এ সবই আছে, কিন্তু সহরে কুঁড়ে ঘরেও অনেক বিলাস আয়োজনের পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। উদ্বাস্তুতে সহর ভরে না গেলে হয়ত গ্রামের জীবনের অনেক কিছুই কলকাতা সহরে দেখা যেত না। উদ্বাস্তুদের কল্যাণে কলকাতা সহরের অভিজাত পল্লীতেও গ্রামের দৃশ্য সর্বদা দেখা যায়। সেখানে মেয়েরা কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, জল আনা, ঘর নিকোনো, ঘুঁটে দেওয়া গুল দেওয়া সবই করে ছেলে কোলে করেই। পুরুষরা কেবলমাত্র উপার্জনের চেষ্টায় যতটা কাজ করতে হয় তাই করে। কাজের পর বাড়ী ফিরে এসে তারা আবার সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে।

যে সমস্ত মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়ে তাদের সাংসারিক পরিশ্রম গ্রামের মেয়েদের মত বেশী সহ্য করতে হয় না। শুধু কলেজে পড়া তাই বসে বসে বাড়া ভাত খায়, সেখানে কলেজে পড়া বোন মার সঙ্গে দুটো একটা রান্নাও করে, সংসারের অন্য কাজেও সাহায্য করে। শুধু এই বোনেদের পড়ায় মন বেশী দেখা যায়।

সন্তানবতী মায়েদের চাকরীর কথাও আজ কাল একটা ভাববার কথা। কারণ দুচার জন নয় বহুজনই সন্তান পালন আধাআধি করে চাকরীতে আজ কাল বেরোন। তার ফলে সন্তান হয় কি চাকরের হাতে পড়ে থাকে, নয়ত এমন কারুর হাতে মানুষ হয় যার পালন করা বা আদর করেন না। সুতরাং নিতান্ত টাকার অভাবে সংসার অচল দেখলেই এমন মায়ের চাকরী করা উচিত। নতুবা যতদিন ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি না হয় ততদিন মাকে সর্বদা তাদের কাছে কাছে থাকতেই আমি বলব। শিশুরা যতক্ষণ স্কুলে থাকে সেই সময়টুকুর মায়ের বাইরে কাজ করা উচিত, তার বেশী নয়।

অনেক উপার্জন-ক্ষম স্বামীদের স্ত্রীরাও আজকাল চাকরীতে ঢোকেন, টাকায় কুলোয় না বলেই শুধু নয়। তাঁদের যেসব ইচ্ছা বা সখ স্বামীর টাকায় মেটে না সেইগুলির জন্যও তাঁরা উপার্জন করেন,

অথবা উচ্চশিক্ষা তাঁদের যে সব ভাবের ঘোরা করে গড়ে তুলেছে, শিশু সন্তান আছে বলেই তাঁরা নিজেদের সেইসব কাজ ছেড়ে দিতে রাজি নন। তাঁদের ঘরের বাইরেও একটা অন্যরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বদা থাকে। জীবনের কয়েকটা বছর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভুলে থাকবার জন্য যতটা মানসিক জোর থাকা দরকার সকলের তা থাকে না। তাঁরা ভাবেন দশ বারো বছর কাছে কাছে রেখে যে মা সন্তান পালন করেন তাঁর সন্তানও ত নিখুঁত হয় না, তবে কেন আমার বাইরের কাজে জলাঞ্জলি দেব? তাদের থাকলে এমনি করেই ছেলেমানুষ হবে। কিন্তু আজকাল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দেশের যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে ভয় হয় সভ্য সমাজ আর বেশীদিন টিঁকবে কিনা সন্দেহ। যেখানে বয়স অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান লোকদের উপদেশ ও পরামর্শ ১০।১২ বছরের ছেলেরাও শুনতে চায় না সেখানে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে কে? সুতরাং সবার আগে ঘরকার বাইরের ছেলেমেয়েদের শান্ত সংযত ও কর্তব্যপরায়ণ করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা। চেষ্টা করেও দু'চারজন যদি বিফল হন, তবু নিষ্ঠা থাকলে আর দশজন সফল হবেনই। এবং তাতেই দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়রা সভ্য ও শিষ্টসংস্কৃতি সুসংযত মানুষ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

অন্নবস্ত্রের যারা সুষ্ঠুর সমাধান করে তাদের বিষয় এক কথায় একটা কিছু বলে দেওয়া যায় না। তাদের নীতিশিক্ষা দেবার উপদেশ দেওয়া সোজা কিন্তু তা কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে সন্তুপায়ে তারা যেন অন্ন পায় আগে এর ব্যবস্থা দেশের কর্তা-কর্তাদের করতে হবে। দেশে আজকাল যেরকম সমস্যার ভীড় তাতে কর্তারা কোন সমস্যাটা বড় আর কোনটা ছোট মনে করবেন তা সাধারণ লোকে বলতে পারবে না। অন্নবস্ত্র এবং উপার্জন ক্ষেত্র তিনটিই সুসম হলে তবে কতকটা ফল হয়। কিন্তু তার আশা কি আমরা করতে পারি? সমাজসেবিকারা সরকারের ভিক্ষার বাইরেও যদি এইসব অভাগিনীদের জন্য কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন কিছু কাজ নিশ্চয়ই হয়। নানাক্ষেত্রে হচ্ছেও অল্পবস্ত্র?

মেয়েদের পোষাক-আসাকের সমস্যাও আজকাল একটা সমস্যা। ফ্যাশানের নামে শালীনতাকে বর্জন করায় মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে মানুষের শ্রদ্ধা হারান। মানুষ বস্ত্র ধারণ করে শীতাতপ নিবারণ, শালীনতা রক্ষণ এবং কিছুটা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও। মানুষের বুদ্ধি নাশে বিদ্ধ হওয়ার জন্য পোষাক নয়। অন্ধকারে মানুষ মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করুক এর জন্যও বস্ত্র নয়। সুতরাং সেই বুঝে মেয়েদের পোষাক-আসাক ব্যবহার করাটাই শোভন।

মেয়েদের পোষাক-আসাকে শালীনতার অভাবটা ত অল্পবস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে যে মানুষ ভদ্রতা সভ্যতা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করাকে আগে যত মূল্য দিত এখন তা দেয় না। মানুষের অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মনোভাব আগের চেয়ে অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে, উচ্চ চিন্তা, প্রাণধারণের গাম্ভীর্য এসব যেন সেকালের জিনিষ। সকলেই কচি খোকা ও কচি খুকী এইভাবে চলাফেরার একটা সংক্রামক ব্যাধি এসেছে। তার ফলে অসৎপথে যাওয়াটাও সহজ হয়েও উঠেছে। আজকাল বালক বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক কার যে সমাজে কি স্থান বোঝা শক্ত।

বিবাহ সমস্যাও একটা বড় সমস্যা। চিরকালই এদেশে সমস্যাটা কোনো না কোনো আকারে ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রায় সব মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। যখন কুলীনদের যুগ ছিল তখন দুচারজন বাদ্দি থাকলেও দুচার পুরুষ নামমাত্র মেয়েদের বিবাহ কোনোরকমে কারুর সঙ্গে দেয়ে দেবার আগ্রাণ

ছেলে ছিল এবং হয়েও যেত প্রায়ই। আজকাল বিবাহটা নামমাত্র চেষ্টায় সম্ভব হয়ে দিয়েছে। সত্য বিবাহ না হলে মান রক্ষার জন্য সধবা করার দিন নেই। বালবিবাহও শিক্ষিত সমাজে প্রায় উঠে গিয়েছে। আইনের চৌদ্দ বছরে বিয়েও দেওয়া যায় না। ফলে সময় বেশী লেগে অনেক দিকে সুবিধা হয় বলে কুড়ি বাইশ বছরটা স্বাভাবিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার থেকে ৩০ বছরের কন্যার বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যায়। বয়স বাড়ার জন্য মেয়েরা শিক্ষিতা হচ্ছে যোগ্যতার করছে। কাজেই তাদের পছন্দ অপছন্দের কথাও বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। বিয়ে অধিকাংশ মেয়েই করতে চায়। কিন্তু এমন মেয়ে এবং মেয়ের মা বাবাও আছেন যাঁরা বরের বাড়ী ঘরটা নিয়ে সাধারণ অসুবিধা বোধ করেন। যাতে ভাল ছেলে আপনা থেকে আসে তবেই বিয়ে করে এমন মনোভাবও আজকাল কিছু কিছু কন্যাপক্ষের দেখা যায়। যে দেশে কন্যাপক্ষ দেখেও অনেক ঘাটাঘাটি না পোড়ালে বিয়ে হওয়া শক্ত সেখানে আপনা থেকে ক'জন ভাল ছেলে মেয়ের বাড়ী বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠাবে? তার উপর আজকাল এমন ছেলের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছে যারা বিয়ে মোটেই করতে চায় না। আমাদের বাল্যকালে—পঞ্চাশ বছর আগে—একজন ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনতাম "বাংলা দেশে হিন্দু সমাজে দুজন মাত্র চিরকুমার আছেন।" কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়, তবু আংশিক সত্য। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে দুজনের নামই আমরা জানতাম। কিন্তু আজকাল ত প্রায় প্রতি মোড়েতেই দুই একজন শিক্ষিত চিরকুমার দেখা যায়। এইভাবে বরের সংখ্যা কমে গেলে কন্যাদের বিয়ে আরও শক্ত ত হবেই। অর্থনৈতিক কারণে অনেক ছেলে বিয়ে করে না, অনেকে ইচ্ছাকৃতি ক্ষেত্রে এত যেতে থাকেন যে বিবাহের সময় হয় না, অনেকে সুবিধাবাদী বলে বিবাহের বন্ধন ও দায়িত্বনিতে চান না। আবার বিবাহের বয়সও অনেকে বড় পিছিয়ে দেন—চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বিয়ে করেছেন এমন মানুষ অনেক আছেন। অথচ মানুষের আয়ুই বা কত?

অল্প বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা কমে যাওয়াতে অনেক মেয়েই নিজেরা নিজেদের বিবাহের উদ্যোগী হন। তাতে সফল হবার মত ক্ষমতা সকলের থাকে না। এবং সব মেয়েই তার পছন্দমত পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় না। যেমন পাত্রই হোক বিয়ে একটা করবই—এরকম প্রতিজ্ঞা থাকলে অবশ্য সফলতা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু নিজের মূল্য খুব বেশী করে ধরলে বিয়ে হওয়া শক্ত এবং হলেও সংসারে শান্তি পাওয়া যায় না। বিয়েতে সুখী হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ভাগ্য মানতে ইচ্ছা করে। সবচাল যাকে মনে করা যায় সেও কোন না কোন দিকে দগ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার যার কিছুই গুণ নেই মনে হয় সেও জীবনটা পূর্ণ করে তুলতে পারে। এমনও হয় যে কন্যা স্বামীর নিজের দোষে জীবনটা মাটি করে বসেন।

তাই মনে হয় বিবাহটা ভাবী বংশধরদের কথা ভেবেই, নিজের সুখের কথা ভুলে, করা ভাল। অবশ্য উপদেশ দেওয়া যত সহজ কাজ তত সহজ নয়। চোখের সামনের বর্তমানকে ভুলে ক'জন ভাবী বংশধরদের কথা ভাবতে পারে? পিতামাতা মেয়ের বিবাহের সময় মেয়ে যেন সুখে থাকে এই কথাই আগে ভাবেন। মেয়ে স্বয়ং বর নির্বাচন করলেও মনের মত বর চায়। কে কবে ভবিষ্যতে বংশপ্রবাহ রক্ষা করবার জন্যে আসবে সে কথা তারা ভাবে না। যদি বা কেউ ভাবে তাকে তাহলে ভাবী বরদের আগে প্রত্যেককে ডাক্তার দেখিয়ে পরে অন্য কথা পাড়তে হবে।

---

# শ্রীআয়ুর্বেদমের
# মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

## শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

# হাউসফুল

বিজন ভট্টাচার্য

উৎসবের আনন্দে ও
যে কোন অনুষ্ঠানে

# খাটাউ

ভয়েল

দি খাটাউ মাকাপ্পী স্পিনিং
এণ্ড উইভিং কোং লিঃ

যুটবা ক্লথ হাউস
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
ফোন : ৩৪-১২৫৯
১৮এস, পার্ক ষ্ট্রীট, প্রবেশ পথ
মিডলটন রো, কলিকাতা-১৬
( ঈষ্টার্ণ মিটিঙ্গ )
ফোন ২৩-৪২৮৩

[ পর্দা উঠতেই দেখা যায় কালিকা মেস বোর্ডিং-এর সুপ্রশস্ত একখানি ঘর। সামান্য কিছু কাঠের আসবাব—ছোট্ট একখানি টেবিল, চেয়ার, একটি আয়না কেয়ারা একটি স্টেসিং টেবিল ও একখানি আলনা। বাঁ দিকে একখানি খাট—তবু পরিষ্কার পাতা। দেওয়াল ঘেঁষে একটি কাঠের ওয়ার্ডরোব। ঘরটি খালি অর্থাৎ কোন বোর্ডার নেই। নতুন বোর্ডার আসবে। আর সেই সুবাদেই মেসের চাকর দে'লগোবিন্দ ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়পোঁছ করছে। দুদিকে দুটো জানালায় পর্দা। মাঝামাঝি চওড়া দরজায় ভারি পর্দা—গোটানো।

পেছনে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি ও ঘরের মাঝখান দিয়ে টানা করিডর। পর্দার আড় সরিয়ে দিলে লোক চলাচল দেখা যেতে পারে।

সিঁড়ির নীচে কালিকা মেস বোর্ডিং-এর স্বত্বাধিকারী—প্রোপ্রাইটর 'কাম' ম্যানেজার—মুকুন্দমুরারি বাবুর অফিসঘর। টেলিফোন, ফাইল পত্তর, পুরোনো দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি যাবতীয় দরকারে এই অপ্রশস্ত অফিসঘরটি ঠাসা। তাতা একখানি টিনের চেয়ারে বসে ক্যাসবাক্স আর কোন আগলে মুকুন্দমুরারি সব কিছু তদারক করেন। আপাততঃ তিনি, খাতাপত্তরে ব্যস্ত। সামনেই অপেক্ষমান দু-তিনজন পাওনাদার—কেউ মাছ মাংসের, কেউ দুধের, কেউ ঘি-এর—বুঝি অনুযোগ প্রভৃতির ঝুলো ঝাড়িয়ে পাওনাগণ্ডার আশায় বসে আছে।

করিডর দিয়ে ঘি চাকর বোর্ডারদের—ইতস্ততঃ চলাফেরা করছে। সিঁড়ি ধরে ওঠানামাও চলছে। সিঁড়ির গায়ে লটকান বোর্ডারদের নামধামের ফিরিস্তিটাও সযত্ন রক্ষিত। দরকার মত 'ইন' 'আউট,—টেনে দিয়ে বোর্ডাররা আসছেন, যাচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি কাজ করে যাচ্ছেন, পাওনাদারের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনে বসে, দাঁড়িয়ে আছে। কাঁসোলো সদরার শব্দের সঙ্গে নেপথ্যে ঠাকুর চাকরের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে। বিকেল বেলা। অফিস অন্তে পঞ্চাননবাবু মেসে ফিরলেন। যথারীতি করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে মুকুন্দমুরারির দপ্তরের সমুখ দিয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাবেন, হঠাৎ বিড় বিড় করে হিসেব করতে করতে মুকুন্দমুরারির টনক নড়ে ওঠে। ]

মুকুন্দমুরারি : ( সামনের পাওনাদার নরেন ঘোষালকে উপলক্ষ্য করে ) ব্যবসা বা হবার হয়ে গেছে। ব্যবসা করে আর খেতে হবে না কাউকে।···

নরেন ঘোষাল : যা বলেছেন।

মুকুন্দমুরারি : ···এখন, এখন শুধু টিঁকে থাকা। ···করে ফেলিছি পাপ কাজ ঢেঁকে বসে! কি করবো! মুখের গ্রাসের কারবার। তিন চার গুণ কমসে কম চার পাঁচা কুড়ি, হাঁতা সে হু শ' মুখ তো যুটেই, হাঁ করে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, বন্ধ করে দেবো যন্নেই তো আর তুমি হাঁড়ি শিকেয় তুলতে পারছো না। মাছ নেই, দুধ নেই, চাল নেই, ডাল নেই আবার শুনছি নুনও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না···

হাজ পয়লা : না না যাচ্ছে, নুন পাওয়া যাচ্ছে।

মুকুন্দমুরারি : আহা-হা এই পাওয়া যাচ্ছে, এই

পাওয়া যাচ্ছে না—আমি এমনি কথার কথা বলছি। নিরাকার হতে আর কতক্ষণ?

নরেন দালাল: যথার্থ কথাই।

মুহুন্মুরারি: তা সে মাছ নেই, দুধ নেই, তরি-তরকারি কিছু নেই অথচ বোর্ডারবাবুরা বলবেন, ঐ তো বসে আছে মুহুন্মুরারি—পাঁজাকোলা করে ধরে ডেকচিতে বসিয়ে দাও, ছেড়ে কথা কইবে? তা সে হোটেল বিজনেসের অনেক জ্বালা। এই চলছে চলছে একদিন এসে দেখবে শিশি বোতলগুলা ভেকে সেয় ঘরে সব মালপত্তর বেচেবুচে···, কথার মাঝখানে এক ঠোঙা ফল আর শশা হাতে বোর্ডার পঞ্চানন বাবু করিডর ঘরে ঢুকে 'ইন আউট' টেনে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। পঞ্চানন বাবুকে চশমার ফাঁক দিয়ে চকিতে লক্ষ্য করে হাঁক-ডাক পেড়ে ওঠেন মুহুন্মুরারি)···কিনি গেলেন? পঞ্চানন বাবু না? (হাঁক পাড়েন) বলি ও পঞ্চাননবাবু স্যার, ও পঞ্চানন বাবু! আরে মশাই শুনে যান, দেখে যান।

পঞ্চাননবাবু: (স্যুট পরা প্রৌঢ় অফিসার ঘুরে এসে বলেন) কি ব্যাপার?

মুহুন্মুরারি: 'না মানে কথা'—বলবার সময় তো বলবেন, টু হাণ্ড্রেড পারসেন্ট দাত! টাটকা টাটকা খেয়ে অভ্যেস, রান্না করা কোলের মাছ তা-ও নাকে শুকে বলে যেন বাসিপচা, এই দেখুন ঘর ঘরেছে কত করে ভাটা গোনার নরেন দালাল!

পঞ্চাননবাবু: কত করে?

মুহুন্মুরারি: সাড়ে পাঁচ, ছয়। তা-ও পাইকিরি!

পঞ্চাননবাবু: Criminal. পুলিসে দিন।

নরেন দালাল: তবেই তো মাছের মায়েরা আর বিয়োবে না কাল থেকে স্যার।

পঞ্চাননবাবু: কেন, কন্ট্রোল রেট সাড়ে তিন!

নরেন দালাল: কোন জেলের বাচ্চা যেচে দাদা! আপনি আমায় পুলিসেই দিন স্যার। তবু জেল-হাজতে দুটো খেতে পাবো।

পঞ্চানন বাবু: Fantastic!

নরেন দালাল: তাঁরা তাঁরা পাইকারদের কথা বার দিন, তাদের আমিও দেখিনি, আপনিও দেখেন নি, পুলিসও দেখেনি—ব্রহ্মা বিষ্ণুর মতই তারা নিরাকার, কিন্তু আমরা যারা ছোট কারবারী মানুষ, বেচে কিনে খাই···

পঞ্চাননবাবু: তাই বলে ছ' টাকা দর।

নরেন দালাল: পড়তায় না পোষালে আর কি করবো বলুন? আপনি খরচটা দেখুন!

পঞ্চাননবাবু: খাবো না ম'ছ।

নরেন দালাল: এ তো আর আপনি গিয়ে চরিত্তির শুদ্ধির কথা বলেন। সে হলে অনেক কিছুরই তো দিয়ে হতো আমাদের।

পঞ্চাননবাবু: হ্যাঁ তাই করতে হবে। নইলে চারদিকের এই সব জাল জোচ্চুরি·····

নরেন দালাল: আপনি স্যার দেখেন নি তাই এতবড় কথা বলছেন। বাজারে গিয়ে দেখুন গিয়ে মামদোবাবু আর শ্রীমতী শাঁকচুন্নী পান তো কাঁচা মাছ লাইনেই চিবিয়ে খান। (হাসে) বল্লে না বিশ্বাস যাবেন মুহুন্মুরারিবাবু, আমার চোখে স্যাখতার সত্যি, সে দিনে বাপের বয়সী একজন ভোমরা চোখরা ভদ্দরলোক, পরনে সে রেওয়াজ ধোপভাঙ্গা ধুতি পাঞ্জাবী, লাইনে দাঁড়িয়ে মাছ নেবেন না বসে ঠিক তার পাশের মহিলা লাইনের—তেনার মেয়ের বয়সী একজনা বৌমেয়েকে কি বলে শাপান্ত করলেন জানেন···

পঞ্চাননবাবু: হ্যাঁ সে কেচ্ছা অনেক রকমই হচ্ছে শুনছি।

নরেন দালাল: না না ভদ্দরলোক যে মেয়েটিকে কি বলে গালাগালটি দিলেন শুনুন না!

মুহুন্মুরারি: শুনি শুনি।

নরেন দালাল: ভদ্দরলোক তার মেয়ের বয়সী বৌটাকে বল্লেন, তুই বিধবা হবি। ভাবতে পারেন?

পঞ্চাননবাবু: আর তুমি দাঁড়িয়ে শুনলে?

নরেন দালাল: ভদ্দর লোকের কথা শু:

ছেলের ছেলের বটিখানা অবধি বিজলী বাতির আলোয় ঝিলিক মেরে হেসে উঠলো। ভদ্রলোক দেখি তখনও শাপান্ত করছেন! (মুকুন্দমুরারিকে) তা সে হিসেব না হয় পরে করবেন'খন এখন শত খানেক টাকা ছাড়ুন তো, এখনও বহু বরাতার বন্ধ দিতে হবে।

পঞ্চাননবাবু: Abominable. [প্রস্থান

মুকুন্দমুরারি: তা সে বন্ধ দিলেই যখন হাতে টাকা তখন সে বন্ধ দিয়েও সুখ আছে।

নরেন দালাল: আর আপনি দাদা যে বসে বসে খিঁচছেন!

মুকুন্দমুরারি: কি! হুঁ! (পঞ্চাননবাবুদের লক্ষ্য করে) সব পুরোনো বোর্ডার। পাঁচ শ হাজারের নীচে কেউ মাইনে পান না। অথচ প্রত্যেকের কাছে ছ মাস চার মাস করে বাকি পড়ে আছে—টাকা চাইলেই চশমখোর।.....

[ক্যাস বাক্স থেকে টাকা নেন নরেন দালালকে। নরেন দালাল চলে যেতেই এগিয়ে যায় হাক গয়লা]

(হাঁক দেন) ঘোলগোবিন্দ! ঘোলগোবিন্দ!

(হাক গয়লাকে) কি! ক্যাসে টাকা নেই। ...ঘোলগোবিন্দ!

হাক গয়লা: বাসি বাঁট টানলে কি দুধ বেরুবে?

মুকুন্দমুরারি: মানে।

হাক গয়লা: গরু খাবে কি?

মুকুন্দমুরারি: গরু খাবে কি সে ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে? —নাও ধর। ধর আর কামেলা করো না।

হাক গয়লা: কত দিচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি: কত দিচ্ছেন ওরে দেখ। ঘোল গোবিন্দ!

ঘোলগোবিন্দ: যাই বাবু!

(হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন মুকুন্দমুরারি)

মুকুন্দমুরারি: যাই বাবু, কি এখনও তুই চেয়ারের হাতল ঘসছিস? বলিহি না একবার ঝাঁটা মেরে দিবি।

ঘোলগোবিন্দ:
মারবো।

মুকুন্দমুরারি:
মারবি?

ঘোলগোবিন্দ: সে আপনি যেমন বলিবেন।

মুকুন্দমুরারি: বলিলেন, বলি ঝেড়িছিস?

ঘোলগোবিন্দ: হঁ।

মুকুন্দমুরারি: আপনা ওখানে যেন? আপনা পেছনে যাবে। খাটের পাশে।

(ঘোলগোবিন্দ তখনকার মত কাজ করে) টেবিল থাকবে সেন্টারে। চেয়ারটা টেনে দে।...আরাম কেদারা ওদিকে। ডান দিকে দুটু ঝাঁড়িকা।..

[হোটেলের দালালের প্রবেশ]

...কি? আসেন নি।

দালাল: মালপত্তর সমেত বসে আছেন।

মুকুন্দমুরারি: ট্যাক্সিতে বসে আছেন কি reception দিতে হবে নাকি! আসতে বলো, ভেতরে নিয়ে এসো মাল, ঘনশ্যাম রঘু এরা সব গেল কোথায়? ট্যাক্সিতে বসে আছেন! হাতায় ঝাঁকা মুটে কি চুলীটুলি কেউ নেই? এমন সব কথা বলো যে শুনলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। (ঘোলগোবিন্দকে) যা তো, ট্যাক্সি থেকে হাতে হাতে মালপত্তর সব ঘরে তুলে দে। তুমি যাও সঙ্গে।

[ঘোলগোবিন্দ ও দালালের প্রস্থান

[মুকুন্দ মুরারি ঘরের আসবাব পত্র ঠিকঠাক করেন। ওয়ার্ড রোবের পাল্লাটা বন্ধ করে চেয়ারটা টেনে দেন একটু। সুইচ-টা টিপে পরখ করে দেখেন। ইতিমধ্যে নতুন বোর্ডার সমেত ঘোলগোবিন্দ ও দালাল এসে উপস্থিত হয়।

নতুন অভ্যাগত বোর্ডার বয়সে নবীন। তরুণ

যুবক! সুশ্রী চেহারা। পরম নতুন চাকরীতে বহাল হয়ে শহরের মেস বোর্ডিং-এ এসে উঠেছেন। নাম তরুণকান্তি ব্যানার্জি। বর্তমানে সীট্-এর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও স্পেশাল রেট দিয়ে একখানি ঘর নিয়ে নিয়েছেন, ভবিষ্যতে তাঁকে পেলেই মুকুন্দমুরারি সীট এর বন্দোবস্ত করে দেবেন এই আশ্বাসে ]

মুকুন্দমুরারি: নমস্কার! আসুন স্যার, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। বসুন। ট্রেন কি লেট ছিল?... পরম এককাপ চা খাবেন তো? এই গোলগোবিন্দ! ঝট করে স্পেশাল এক কাপ চা নিয়ে আয় তো! ঘাঁ করে যাবি আসবি।

( প্রস্থানোদ্যত গোলগোবিন্দকে দেখিয়ে )

ওটি স্যার আপনার জন্যেই। খুব বিশ্বাসী। কেটে কেলে দিন—মুখ দিয়ে রা কাড়বে না। আপনি সব কিছু ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি থাকতে পারেন। কোন কিন্তু করবেন না। আর এমন তেমন হলে আমি আছি। তবে কেন না একটু খোকা। তা যা দিনকাল পড়েছে একটু খোকা হাবা হওয়া ভাল। কাঁড়ি পোঁছ থেকে ডলাই মলাই সব কিছুই চলতে পারবে। টাকা কড়ির কথা আপনি কিছু বলতে যাবেন না। আমি সব ঠিক করে নেবো। একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে আজকালকার বাজারে...

( চা নিয়ে গোলগোবিন্দর প্রবেশ )

এনিছিস! দে! ( নিজে এগিয়ে নেয় ) আসুন স্যার!

তরুণকান্তি: ( চা নেয় ) আপনি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি: কিছু না কিছু না। যা ব্যস্ততা আমার এই আপনাদের নিয়েই। পেশা বলুন নেশা বলুন। আর আমি ব্যস্ত না হলে চলবে কেন। পঞ্চাশ জনের পঞ্চাশ রকম সত্যি মিথ্যে হাজারো বায়না চোখ বুজে থাকলেও কানে শুনতে হয়, কান চেপে রাখলেও চোখে দেখতে হয়—এ তো আমাকে করতেই হবে।

তরুণকান্তি: তা বটে। ( ঘড়ি দেখে ) আচ্ছা মনে করা যাবে তো?

মুকুন্দমুরারি: বিলক্ষণ, সে কি কথা! খোলা মেলা কলতলা কি ঢাকা চাপা বাথরুম সব কিছুরই বন্দোবস্ত আছে। গোলগোবিন্দ আপনাকে সব দেখিয়ে দেবেখন।

তরুণকান্তি: গোলগোবিন্দ; নামে গোলে যে গোবিন্দ। নামটি খাসা কিন্তু বড্ড বড়। আগের টুকু ছেঁটে দিলে হয় না! মানে সুবিধে হয় ডাকতে টাকতে।

মুকুন্দমুরারি: স্বচ্ছন্দে। সামনে পেছনে যে দিকে খুশী ছাঁটতে পারেন।

তরুণকান্তি: না মানে পেছনটা ছাঁটলে নামটার আবার কোন ইয়ে পাওয়া যায় না।

মুকুন্দমুরারি: তা হলে গোবিন্দ বলেই ডাকবেন।

তরুণকান্তি: গোবিন্দ-ই ভাল। (গোলগোবিন্দকে) কি রে, আপত্তি নেই তো?

মুকুন্দমুরারি: ও আবার কি আপত্তি করবে, মাথা ভেঙে দেবো না!

তরুণকান্তি: না না বাপ মায়ের দেওয়া নাম, ওর মতামতটা চাই বৈ কি। কি রে, গোবিন্দ!

মুকুন্দমুরারি: হুঃ, খাসা শোনালো তো!

তরুণকান্তি: গোবিন্দ নাম তো ভাল। (গোবিন্দ হাসে)

মুকুন্দমুরারি: লোকে কথায় বলে, গোবিন্দ গোবিন্দ। ষোল গোবিন্দ আবার কেউ বলে নাকি? তোর নাম আজ থেকে গোবিন্দ।

তরুণকান্তি: তা হলে বাপ গোবিন্দ, এইবার এসো হাতে সঙ্গে ঘরখানা আমায়া গুছিয়ে ফেলি। 'হোল্ড অল' টি খুলে ফেল তো।

মুকুন্দমুরারি: হ্যাঁ যেমন যেমন বলেন তেমন তেমন দেখে শুনে করবি। আর না বলে এক পা-ও

নড়বি নে। নে হাত লাগা চটপট। (তরুণকান্তিকে) তো আর অ্যাডভান্স কিছু করবেন নাকি?

তরুণকান্তি: Oh sure. কত দেব? (ব্যাগ খোলে হিপ পকেট থেকে)

মুকুন্দমুরারি: দিন খান দুয়েক বড় পাত্তি।

(টাকা দেয়। মুকুন্দমুরারির প্রস্থান। সার্ট খুলে রেখে ট্রাউজার আর গেঞ্জি গায়ে তরুণকান্তি গোবিন্দর সহযোগিতায় ঘর গুছোতে লেগে যায়।

জানালা থেকে হোটেলের অন্যান্য বি চাকর নতুন বোর্ডারকে লক্ষ্য করে। পুরোনো বোর্ডাররাও কৌতূহলী হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারেন। দু চার জন এগিয়ে এসে পরিচয়ও করে যান।)

[ অবিনাশবাবুর প্রবেশ কোট প্যান্ট পরা। মোটা—মোটা গোঁফ। টাক আছে। পেশা সেসরকারী অফিসের পদস্থ কেরানী। ]

অবিনাশ: (গোবিন্দকে উদ্দেশ্য করে) হোল গোবিন্দ আমার জামা কাপড়গুলো এনেছিলি লণ্ড্রি থেকে? না কি আজও ভুলে গেছিস?

গোলগোবিন্দ: বৃহস্পতিবার কাপড় দিবে কে?

অবিনাশ: সেরেছে! (তরুণকান্তিকে) আপনি তাই বুঝি নতুন এলেন?

তরুণকান্তি: (নমস্কারান্তে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবিনাশ: বেশ বেশ। (ঘরটি দেখে) এটি ছিল অফিস কাম গোডাউন। মুকুন্দমুরারিবাবু এবার এটিও কাজে লাগালেন। ভদ্রলোকের মাথা আছে। এবার বোধ হয় ওপরের করিডর আর বাথরুমগুলোতেও বোর্ডার এনে ঢোকাবেন।··· খাটি ইয়ার্স ব্যাক আমি যখন প্রথম আসি এই হোটেল মেসে, বোর্ডারের সংখ্যা ছিল ওনলি ফাইভ।—আমি, রাধাবল্লভবাবু, হরেকৃষ্ণ, ভ্রমর ঘোষ আর চাটুজ্যে। সেই জায়গায় আজ বেশুমার বোর্ডারের সংখ্যা ফাইভ ইনটু ফাইভ্—ফাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ্। তা ছাড়া উঠছো যাচ্ছে—আসছে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে আর সেটএর ব্যাপার যে কত তার তো কোন ইয়ত্তাই নেই। লাল হয়ে গেলেন মুকুন্দবাবু এই হোটেল বিজনেস করে।

তরুণকান্তি: ম্যানেজমেন্ট কি রকম?

অবিনাশ: ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি দেখতে ভালই, তবে ঐ, ট্রাডিশন যাবে কোথায়—ও বেলার ডাল এ বেলা মেশাল হচ্ছে, পচামাছ পেঁয়াজ লংকা বাটার তরিবতে এমন একটি মোগলাই রেসিপি হিসেবে চলে যাচ্ছে যে নাইনটি পারসেন্ট বোর্ডার ডাইরেক্টলি সাকারিং ফ্রম ক্রনিক ম্যালিনারিশমেন্ট এণ্ড পারনিসাস টাইপ অব কোলাইটিস।

তরুণকান্তি: বলেন কি?

অবিনাশ: বলবার আর অপেক্ষা কি আছে ব্রাদার;—একটা অবজারভেশন করে দিলে মুকুন্দমুরারি। অথচ বলতে যাও তক্ষুনি বলা হবে—অন্য হোটেল মেস দেখতে পারেন না গোবরাগে! এখন হোটেল মেসে আজকাল যে কি রকম প্রেসার সে তো ব্রাদার বুঝতেই পারছো রাস্তায় ভিড় দেখে···

তরুণকান্তি: সেই সুযোগটা নিচ্ছেন আর কি।

অবিনাশ: আবার কি! তোমার আমার লিভার খারাপ হলে মুকুন্দবাবুর কিছু এসে যাবে না।···কলকাতার শহরে এই করে ভদ্রলোক তিন তিনখানা বাড়ী করে ফেলেন। তবে ঐ টাকাই করেছেন আর বাড়ীই তুলেছেন। ভোগ করতে পারলেন না কিছুই। নিজে তো ঐ সিঁড়ির তলায় দিন রাত্তির বসে আছেন, বৌটি সেজে মারা, নাবালক একটি ছেলে বড় জামাইএর কাছে থাকে, তিন মেয়ে তিনটে বাড়ী ভোগদখল করে বসে আছে। আচ্ছা ব্রাদার পরে দেখা হবে।

তরুণকান্তি: হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

অবিনাশ: নামটিই জানলুম না।

তরুণকান্তি: আজ্ঞে তরুণকান্তি ব্যানার্জি।

অবিনাশ: ব্যানার্জি, আমরা সান্যাল। আমার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্যাল।

তরুণকান্তি: আলাপ করে খুশী হলাম।

অবিনাশ : না তার আর কি কারণ ঘটলো। পিকচার-টা যা প্রথম পরিচয়েই বিলুপ্ত তাতে করে আনন্দিত হবার আর কি কেহু থাকতে পারে। তবে সহ-অবস্থান যখন লগাট লিখন তখন নাস্ত পন্থা অন্যায়। তবে সেই হিসেবে আমি খুব খারাপ নই। তাদের ছুটীতে তো বটেই, এমনিতেও নই।

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই নন, কি আশ্চর্য্য।

অবিনাশ : তবে হয় তো একটু বেশী বকি। বয়স হচ্ছে তো!

তরুণকান্তি : Oh you talk so candidly.

অবিনাশ : হয় তো একটু appreciated হতে চাই। ঠিক বুঝতে পারি না। যা হোক···তা কি অফিস না বিজনেস?

তরুণকান্তি : অফিস।

Williams.

অবিনাশ : ইঞ্জিনিয়ারিং?

তরুণকান্তি : হাঁ, Technical.

অবিনাশ : বিদেশ পাঠাবে?

তরুণকান্তি : দেখি।

অবিনাশ : Excuse me, married?

তরুণকান্তি : আজ্ঞে না।

অবিনাশ : Prospective candidate no doubt, আচ্ছা ভাই, পরে কথা হবে।···By the by, আমার কিন্তু কোন মেয়েটেয়ে নেই। আর কোন মেয়ের ব্যাপারেও interested নই। কথাটা তুলাম বলেই নিজের position-টা explain করে গেলুম।

তরুণকান্তি : ও তো, আচ্ছা আচ্ছা!

(অবিনাশবাবুর প্রস্থান)

(স্বগতঃ) ···খুব interesting লোক তো! (গোবিন্দকে) আচ্ছা গোবিন্দ, আর কিছু আজ্ঞা নয়। এবার কাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে হবে। তুই এক কাজ কর, পর্দা টেনে দরজাটা বন্ধ করে দে।

গোলগোবিন্দ : হাঁ, এ বাবু বড় আজ্ঞাদার বাবু।

তরুণকান্তি : খুব আজ্ঞাদার না?

গোলগোবিন্দ : আর খুব হাসি খুশী।

তরুণকান্তি : খুব হাসিখুশী?

গোলগোবিন্দ : আনোদ করবেন আর পুজো করবেন।

তরুণকান্তি : পুজোও করেন নাকি?

গোলগোবিন্দ : এই তো এখন সুরু হবে। পুজো করবেন, তারপর খোল নিয়ে নেচে নেচে গান করবেন, সব একা একা।

তরুণকান্তি : একা একা নাচবেন? ঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না।

Cool, Comfortable Breeze
with AirOn FANS

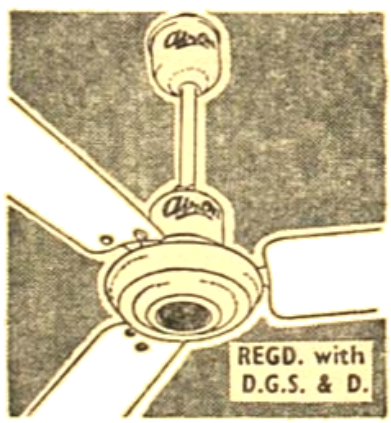


Low Power Consumption
Trouble Free Service
Double ball bearing

Manufactured by
PANDAY INDUSTRIES (P) LTD.
336, N. S. CHANDRA BOSE ROAD.
Calcutta-47
PHONES :
Factory and Office : 46-0067
Sales Office : 23-7821

দোলগোবিন্দ : কিমিতি ঢুকিবেন! দরজা বন্ধ।

তরুণকান্তি : আচ্ছা। আবার কেউ হয় তো ঢুকে পড়বেন, তুই আমাদের দরজাটাও বন্ধ করে দে।

[ গোবিন্দ দরজা বন্ধ করে। তারপর প্রভু ভৃত্য মিলে ঘরগুছোনোর পাট সুরু হয় হাতে হাতে মহা আনন্দে—অভূতপূর্ব উত্তেজনায়। কর্মচাঞ্চল্যের মাঝখানে দৃশ্যটি শেষ হয়।

অবিনাশবাবুর নৃত্যসম্বলিত নাচগানের সুর খোলের বোলে তখন ঘরের ভেতর আছড়ে এসে পড়ছে ]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

তরুণকান্তির ঘর। ইতিমধ্যেই ঘরটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলা হয়েছে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, দেওয়াল ঘড়ি। জানালায় দরজায় রং বাহারী পর্দা —কোন কিছুরই অভাব নেই।

সকালবেলা। দোলগোবিন্দ জুতো পালিশ করছে। কিন্নি সভা গান তার মুখে। আর তরুণকান্তি গলায় তোয়ালে জড়িয়ে চা খাচ্ছে আর দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছে।

তরুণকান্তি : গোবিন্দ বাপ একটু হাত চালাও। স্নানের জল দিতে হবে, লণ্ডি যেতে হবে, তোমার এখন অনেক কাজ।

[ মুকুন্দমুরারির প্রবেশ। হাতে এক তাড়া চিঠি। দোলগোবিন্দর প্রস্থান ]

মুকুন্দমুরারি : আপনার চিঠি।

তরুণকান্তি : চিঠি! ( আগ্রহে চিঠি নেয় ) দেখি…

মুকুন্দমুরারি : চিঠির তাড়া। সম্পর্কের মানুষ দেখি ছিটিয়ে রেখেছেন সংসারে।

তরুণকান্তি : ( হেসে ) হ্যাঁ, এটি হলো জ্যাঠামশাই …এটি মধি পিসীমার ছেলের, এটি …

মুকুন্দমুরারি : তবু তো বলেন সংসার করেন নি।

তরুণকান্তি : কে আর দিচ্ছে বলুন!

মুকুন্দমুরারি : আমাকে তার বিশ্বাস করতে বলেন এ কথা! হুঁ: মুখ দিয়ে একবারটি হ্যাঁ বলুন তো দেখি ক'মুঠো প্রজাপতি ঘরে এসে আপনার ঘরে ছেড়ে দেই।

তরুণকান্তি : বলেন কি!

মুকুন্দমুরারি : আমি কি আর বলি, লোকে সব বলাবলি করে আমি সেই শোনা কথা বলি।

তরুণকান্তি : কি বলে?

মুকুন্দমুরারি : সে কথা শুনে আর আপনি করবেন কি!…রংবেরং খামে পাঁচ রকমারো সব দিল্লি দিল্লি চিঠি আসবে, তা না সব পোষ্টকার্ড আর বুকপোষ্ট।

তরুণকান্তি : আপনার এত interest কেন?

মুকুন্দমুরারি : interest…interest মিলিয়ে দিয়ে। মেলবার যখন বয়সকাল চলে যায় তখন মিলিয়ে দিলেও আনন্দ হয়। এটা বুঝতে পারেন না?

তরুণকান্তি : আপনি খুব রসিক লোক।

মুকুন্দমুরারি : রসিক কিনা জানিনে, তবে রসের সন্ধান করি, এইমাত্র। যাই দেখি আবার ওদিকে কি হলো, নইলে সব রসটাই আবার কড়াই শুকিয়ে যাবে।

তরুণকান্তি : ম্যানেজার বাবু!

মুকুন্দমুরারি : বলুন স্যার।

তরুণকান্তি : আমার দু'একজন গেষ্ট আসতে পারে। If so please look to their comforts.

মুকুন্দমুরারি : বিলক্ষণ বিলক্ষণ। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যার। তক্ত তাত আর পকব্যঞ্জন আমার সব সময় ready থাকবে।

[ দ্রুত প্রস্থান ও দোলগোবিন্দের প্রবেশ। সঙ্গে ধোপদোরস্ত জামা প্যান্ট ইত্যাদি।

দোলগোবিন্দ খাবার দাবার এনে তড়িঘড়ি টেবিল সাজায়। জামা প্যান্ট জুতো ঠিক করে। আর ইত্যবসরে তরুণকান্তি স্নান সেরে এসে অফিস যাবে বলে তৈরী হয়ে নেয়। তরুণকান্তি যখন সার্ট

পরে, রোলগোবিন্দ তখন তরণকান্তির পায়ে মোজা পরিয়ে দেয়। কর্মচকল কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে তরণকান্তি রোলগোবিন্দের জিম্মায় সব কিছু বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে অফিস রওনা হয়।]

তরণকান্তি : চাবিটা।

[রোলগোবিন্দ চাবি এগিয়ে দেয়। তরণকান্তি চলে গেলে রোলগোবিন্দ 'সিলোন' রেডিও ধরে। গান শোনে, গান গায় আর সংসারের কাজকর্ম করে।

একটু পরেই স্যুটকেশ, kit bag আর ঝোলানো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অতি কম আট দশ জন যুবক—এরা সবাই তরণকান্তির বন্ধু হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢোকে এবং কুমুদ হট্টগোল সুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরটি চরমতম অগোছাল হয়ে যায়। রোলগোবিন্দ হকচকিয়ে যায়।]

পরেশ : তোর নাম কি রে ?

রোলগোবিন্দ : রোলগোবিন্দ···( জিব কাটে ) গোবিন্দ।

পরেশ : তেতানোর ব্যাপারটা কি হলো ?

রোলগোবিন্দ : আমার আগের নাম রোলগোবিন্দ। বাবু ডাকেন গোবিন্দ।

পরেশ : অ, বুঝলাম। তা তোর বাবু কখন আসবে ?

রোলগোবিন্দ : সন্ধ্যার পর। কোন কোন দিন রাত্তির-ও হয়।

জগপতি : আমাদের কথা কিছু বলে গেছে ?

[ হন্তদন্ত মুকুন্দমুরারির প্রবেশ ]

মুকুন্দমুরারি : এই যে দাদা, আমার সঙ্গে কথা বলুন।

পরেশ : আপনি···

মুকুন্দমুরারি : আমি···আমারই এই হোটেল। তরণবাবু অফিস যাবার আগে আমাকে সব কথা বলে গেছেন। আপনারা আসবেন, থাকবেন, এখন কি করতে হবে তাই বলুন।

ইন্দ্রনাথ : বাস বাস তবে তো সব পাকাই আছে।

মুকুন্দমুরারি : একেবারে সব পাকে বন্দোবস্ত কোন অসুবিধে হবে না আপনাদের। এইবার বলুন !

যোতন : আগে দাদা চা-টা সারাই করুন।

মুকুন্দমুরারি : শুধু চা !

যোতন : এই তো যেমন ব্যবস্থা করেন, কষ্ট একটা রাউণ্ড হয়ে যেতে দিন না। তারপর চা-এর সঙ্গে না হয় টা-এর ব্যবস্থা করবেন।

মুকুন্দমুরারি : বেশ ভাই যেমো। তবে অর্ডারটা আগে থেকে গেলে পরে, তৈরী হতে তো সময় লাগবে।

অসীম : বেশ তো বেশ তো, ড্রাই কি আছে।

মুকুন্দমুরারি : আজ্ঞে ড্রাই, চপ কাটলেট আমলেট মামলেট দোপেয়াজি ফ্রাই—যেমন আপনারা অর্ডার করবেন।

ঘনশ্যাম : চিকেন ফ্রাই, হবে ?

মুকুন্দমুরারি : আজ্ঞে চিকেন ফ্রাই, রোষ্ট-এর কথা বলছেন ?

ঘনশ্যাম : না না।

মহিম : আরে স্যার তোর চাইনীজ ডিসকিস ছাড় না, ( মুকুন্দমুরারিকে ) আপনি স্যার স্রেফ মামলেট চা পাঠান।

মুকুন্দমুরারি : শুধু চা মামলেট !

কুমুদ : আচ্ছা একটা করে চপ আর রুটি যেমন পিস করে সঙ্গে।

মুকুন্দমুরারি : এই তো কেমন পরিষ্কারটি বললেন। প্রথমে যেমো এক রাউণ্ড চা।

যোতন : পয়লা রাউণ্ড।

মুকুন্দমুরারি : এখুনি পাঠাচ্ছি।

[ জগপতি খাটে আধশোয়া হয়ে গান ধরে। কুমুদ টেবিল বাজিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গত করে। মহিম করে আবৃত্তি। অন্য সবাই ভাগে ভাগে শুয়ে বসে গল্প গুজব করে। ইতিমধ্যে চা এসে পড়ে।

প্রথম ট্রে চা হাতে হাতেই লোফালুফি হয়ে যায়। আবার চা আসে তারপরই কটি নামকেট, চপ। বিছানার ওপর, টেবিলের ওপর, ওয়ার্ডরোবের ওপর সর্বত্র ছিটিয়ে পড়ে ট্রে ভিস কাপ প্লেট কাঁটা চামচ। ]

পরেশ : দেখি সিগারেট দেখি।

কুমুদ : ( শেষ সিগারেট ধরায় ) Sorry.

জগপতি : গোবিন্দ তোর বাবু পান খায় না ?

গোলগোবিন্দ : হঁ।

জগপতি : তো সেই দোকান থেকে তোর বাবুর নাম করে দু দোনা পান নিয়ে আয় তো বাবাধন।

ঘনশ্যাম : দু দোনা নয়, চার দোনা।

পরেশ : আর এক প্যাকেট উইলস্।

ইন্দ্রনাথ : আটটা পান আর এক প্যাকেট উইলস্—কি বরাত ?

গোলগোবিন্দ : আটটা পান আর এক প্যাকেট উইলস্।

ইন্দ্রনাথ : ঠিক আছে। ছুটে যাবি।

( গোলগোবিন্দ সহাস্যমুখে ইঙ্গিতের অভিবেশ নিয়ে পান আর সিগারেট আনতে চলে যায়। )

[ মুকুন্দমুরারির প্রবেশ ]

মুকুন্দমুরারি : রাত্রে স্যার খাবার অর্ডারটা! আপনারা দেবেন, না তরুণবাবু এলে পরে।…

জগপতি : যাব আমরা, তরুণ এসে কি অর্ডার দেবে!

মুকুন্দমুরারি : না তবু আমার একবার জিজ্ঞেস করবার কথা।…

পরেশ : আমি বলছি। আপনার মেন্যু কি ?

মুকুন্দমুরারি : মেন্যু যা থাকেন। তবে আজকের স্পেশাল চিকেন গ্রিল।

পরেশ : সেটি আবার কি বস্তু!

মুকুন্দমুরারি : খেলেই বুঝতে পারবেন।

পরেশ : বেশ, এরমিতে যা মেন্যু আছে আপনার রাত্রে খাবার অর্থাৎ কিনা ভাত ডাল মাছ তরকারি জল গুন…

মুকুন্দমুরারি : তার সঙ্গে চিকেন গ্রিল।

পরেশ : হ্যাঃ ; ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ?

মুকুন্দমুরারি : পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

পরেশ : যান, ভাতুন।

[ মুকুন্দমুরারির প্রস্থান।

( গোল গোবিন্দ পান সিগারেট এনে দেয় )

কুমুদ : বাবা গোবিন্দ, তোর বাবুর লুঙ্গি আছে ?

গোলগোবিন্দ : লঙ্গি।

কুমুদ : লঙ্গি না লুঙ্গি লুঙ্গি। রাত্রে পরে না! সেই যে কাপড়ের থোল মত।

গোতম : আবার বাবুর লুঙ্গি ধরে টানাটানি কেন বাবা! বাথরুম করবে তো!

কুমুদ : আছে তোর ?

ইন্দ্রনাথ : দরকারটা কিসে হচ্ছে তোর। যদি দরজাটি বন্ধ করবি, কাজটি সেরে চলে আসবি। এ কি আর তোর খোলা মাঠ ? জানিয়ে দিলে লাইরী।

কুমুদ : গোবিন্দ বাপ একটু পথ দেখাও কানাকে।

নন্দী : দাঁড়া আমিও যাবো।

কুমুদ : একসঙ্গে দু'জনে চলবে কি করে!

নন্দী : না চললেও চালাতে হবে। গরজ বড় বালাই তাই।

[ গোলগোবিন্দের অনুসরণে বেরিয়ে যায় ]

( ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। অবিনাশবাবুর কীর্তন গান খোলসমেত শোনা যায়। )

জগপতি : ওপরে কীর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ : আখড়া কাখড়া হয় তো আছে কোথাও।

জগপতি : আখড়া যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ : তাও আসতে পারে। এর নাম বাবা শহর কলকাতা।

জগপতি : একটা সিনেমা টিনেমা গেলে হতো।

ইন্দ্রনাথ : তরুণটা এখনও এলো না।

[ ইতিমধ্যে কীর্তন এসে গেছে। সিঙ্কের জোড় পরে অবিনাশবাবু অপূর্ব ভাবমূর্ছনা নিয়ে মালা গলায় রাধাভাবে তরুণকান্তির ঘরে ঢোকেন। হাতে নৈবেদ্য। আগন্তুকদের প্রতি। ]

অবিনাশ : কই ব্রাদারকে দেখছি না।

নন্দী : তরুণবাবুকে খুঁজছেন।

অবিনাশ : না। আমি শুধু ভাই এক বাবুকেই খুঁজি। তরুণবাবু নয়, অরুণবাবু নয়, হরেন কিংবা কিরণবাবু—কোন বাবু নয়। কিন্তু তার সন্ধান আমি আজও পেলাম না।

( কথাটা শেষ করেই অপূর্ব ভঙ্গী নৈবেদ্য বিতরণ করতে করতে অবিনাশবাবু নৃত্যছন্দে কীর্তনগান গান। দু কলি গান গাইবার পরই আবার ব্যক্ত করেন মনের কথা )

…তরুণ না হয় নাই থাকলো, তবু তো তোমরা আছ ব্রাদার। এ সন্ধানের সন্ধানী হতে কারুরই তো মানা নেই।…

( আবার নেচে গান ধরেন। দু কলি গেয়েই আবার কথা বলেন অবিনাশ )

…এ-ও ব্রাদাররা বলতে পারো একরকম Twist. কিন্তু এখন কোন বীটলে Bitnick-কে দেখলাম না যে এই Bikini-র ব্যথা বুঝতে পারে। তরুণকুমারের বাড়খানে আমি আমার সেই পরম বীটনিকের আংশিক প্রতিভাস দেখতে পেয়েছি। ভক্তি-ই তো ভক্ত-কে খুঁজবে।

( অবিনাশবাবু আবার নৈবেদ্যের থালা উঁচু করে ধরে গান গাইতে গাইতে আর প্রসাদ বিতরণ করতে করতে এর ওর তার মাথখান দিয়ে গলে নৃত্যপরা ছন্দে বেরিয়ে যান )

( গামছা ও তোয়ালে পরা অবস্থায় কুমুদ ও নন্দীর প্রবেশ )

ইন্দ্রনাথ : ভাবের পাগল।

জগপতি : শালা বুড়ো খচ্চর।

ইন্দ্রনাথ : তাথ যা বুঝিস না তা নিয়ে কোন তর্ক করিস না। কত বড় একটা synthesis-এর কথা বল্লেন তদ্দরলোক idea করতে পারলি ?

জগপতি : তোর idea নিয়ে তুই থাক। una-dulcerated বেলেল্লাগিরি আর বলেছে কাকে ?… তুই বলতে চাস এটা সদাচারে পড়ে না ?

ইন্দ্রনাথ : কদাচারটা তুই দেখলি কোথায় যে সদাচারের আওতায় ফেলছিস ?

নন্দী : ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা কি ?

ঘোতন : Angry young men-রা তুমি তার এক বিন্দুও বুঝতে পারবে না।

নন্দী : রাখ রাখ, যন্ত্রণা যা তোদের তা তো দেখি দুটো চারটে জৈবিক প্রবৃত্তির চারপাশ দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। Angerটা কোথায় দেখলি ?

ইন্দ্রনাথ : গামছা ছাড় গামছা ছাড়।

জগপতি : কেন গামছায় কোন synthesis আসছে না ?

ইন্দ্রনাথ : তাথ don't simplify Idiot.

নন্দী : But where is that Anger, সেই Anger ! মানে সেই ক্রোধ ! সেই ক্রোড ! সেই বেদনা। বেদনার দানার মত এক বিন্দু অশ্রুনীরে যৌমুখী যে সমুদ্র ঘুমায় ? কোথায় সে উচ্ছ্বাস ? কোথায় সে উন্মাদনা ? কোথায় সে… ; নে সিগারেট ছাড়।…

[ ইন্দ্রনাথের হাত থেকে সিগারেট ছিনিয়ে ধরায়। সকলে হেসে ওঠে। ]

পরেশ : নাঃ, এরপর আর এক রাউণ্ড চা না হলে একেবারেই জমছে না।

ঘনশ্যাম : ( হাঁকে ) গোবিন্দ !

( গোলগোবিন্দ সামনেই ছিল )

আর এক রাউণ্ড চা, কুইক।

ঘোতন : কিন্তু যে জন্যে কলকাতায় আসা তারই কোন আলোচনা হচ্ছে না।

পরেশ : হ্যাঁ, এইবার সব গোল হয়ে বসো।

ঘনশ্যাম : কিন্তু তরুণটা না এলে···

পরেশ : তোর খালি তরুণ আর তরুণ! তরুণ এসে কি করবে? সে তো করবে finance. আর্টিষ্ট বুঝ করবো তো আমরা। Executive body কি করতে আছে?

ঘনশ্যাম : ঠিক আছে।

ধৌতন : আগে ঠিক করো মেলা হবে, না কনফারেন্সের ওপর জোর দেবে?

পরেশ : মানে?

ধৌতন : মানে সাংস্কৃতিক দিকটার কথা বলছি। অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা চোমরা বক্তাদের বিদেয় যাওয়া, সেমিনার arrange করা···

ঘনশ্যাম : আমি একটা কথা বলবো?

ননী : আলবাৎ।

ঘনশ্যাম : আমি যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে করো, কিন্তু মেলাটার ওপর জোর দাও। মানে Exhibition-টার ওপর টাকা ওঠা চাই তো?

ননী : right, right.

ইন্দ্রনাথ : এটা কি তোমার পরিশুদ্ধ সেই Anger এর অভিব্যক্তি হলো বুঝি?

ননী : Practical side টার কথা ভাবছি তো? Don't mix up issues ইন্দ্রনাথ। এই জিনিষটাকে আমার খুব immature মনে হয়।

কুমুদ : A Daniel. A Daniel came to Judgement.

[ মুকুন্দমুরারির প্রবেশ

মুকুন্দমুরারি : একটু disturb করতে এলাম স্যার।

ননী : বলুন।

মুকুন্দমুরারি : খাবার সব ready. আপনারা ভেতরে টেবিলে গিয়ে বসবেন না এখানেই দেবে?

ইন্দ্রনাথ : কোন option-ই তো রাখবেন না দেখছি। হয় ভেতরে নয় বাইরে—মানে খেতে এখন হবেই।

মুকুন্দমুরারি : না না পরেও খেতে পারেন। তবে বুঝতেই তো পারছেন, মেস হোটেলের ব্যাপার! ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেলে জিনিষ তো আর তেমনটি পাচ্ছেন না! তাই বলছিলাম, আপনারা আবার তরুণবাবুর পেট, খাইয়ে না যদি তৃপ্তি দিতে পারি

( নিম্বরে আলোচনান্তে ঠিক হয় খাওয়া হবে )

ননী : ঠিক আছে দিয়ে দিন খাবার।

অমপতি : গ্রীল স্টীল ready তো?

মুকুন্দমুরারি : কিছুটি ভাববেন না, একদম full course.

ঘনশ্যাম : চালাও পানসী।

ধৌতন : তা হলে মোদ্দা কি দাঁড়াল হলো? কনফারেন্স না মেলা?

ননী : মেলা।—কি ভাই ঠিক হলো তো?

ধৌতন : হাত, হাত।

( বেশীর ভাগ সভা হাত তোলে )

ননী : Passed বাকিটা কাল।

ইন্দ্রনাথ : কেন খাবার পর?

কুমুদ : খাবার পর কি আর Cultural আলোচনা চলে?

( ট্রে ভর্তি খাবার দাবার এসে পড়ে )

ঘনশ্যাম : এসে গেছে গ্রীল। No more culture

ননী : uncultured-এর মত চেঁচাচ্ছিল কান বলতো? জন্মে বোধ হয় গ্রীল খাস নি!

ঘনশ্যাম : যুবতীর আবার গ্রীল হয়, এই প্রথম শুনলুম।

ননী : তুমি শালা Proletariat, গ্রীলের কি জানবে! : Ox tongue খেইছিস?

ঘনশ্যাম : কি?

ননী : Ox tongue, ox tongue?

ঘনশ্যাম : না।

ননী : Hot Dog?

ঘনশ্যাম : দরকার নেই আমার খেয়ে।···কই আমার প্লেট কোথায়?

কুমুদ : আসছে আসছে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন! (গ্রীন রুম) বিছানার ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে। টেবিলে, মেঝেতে, রেডিও-র ওপর, ওয়ার্ড রোবের ওপর চড়ে বসে—যে যার মত খেয়ে সুরু করে প্রেপ্রেশন।

মুকুন্দমুরারি মাঝে মাঝে এসে তদারক করেন।

মুকুন্দমুরারি : একেবারে আলমারির ওপর চড়ে বসেছেন?

ঘনশ্যাম : এ খাওয়ায় কি আনন্দ জানেন?

মুকুন্দমুরারি : তা বটে। পাঁচজনে মিলে একসঙ্গে হৈ চৈ করে খাওয়া।

জগপতি : মিষ্টি কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করেছেন?

মুকুন্দমুরারি : ব্যবস্থা মানে—বলেন আনিয়ে দি।

কুমুদ : মাংসের পর মিষ্টি খেতে হয়, জানেন না?

মুকুন্দমুরারি : তা সে কথা বলবেন তো! কি খাও। তা কি সন্দেশ না··

জগপতি : না না, রসের কোন কিছু।

মুকুন্দমুরারি : তা হলে রসোগোল্লাই আনি।

জগপতি : ব্যস, স্রেফ রসোগোল্লা।

ননী : কাই হবে বাবা একটু!—গ্রীনের কাই? আর দুটি ভাত।

মুকুন্দমুরারি : দেখছি।

ননী : তোকা বানিয়েছেন বাবা। যাবার সময় certificate লিখিয়ে নেবেন।

মুকুন্দমুরারি : তা নেবেন। বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

( হাসতে হাসতে মুকুন্দমুরারির প্রস্থান )

[ পরিবেশন চলে। খাওয়ার পাট শেষ হতে না হতেই মিষ্টি এসে পড়ে। তারপর পান—সিগারেট। রেডিও জোরে বাজে। তারপর রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়ে। হাসি ঠাট্টা কলগুঞ্জন ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে আসে। ঘুম নামে সকলের চোখে। শুয়ে পড়ে সবাই সারাদিনের পরিশ্রমে। ঘুমিয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল ভাবে।

[ রাত হলে তরুকান্তি পা টিপে ঘরে ঢোকে। ]

( আলো জ্বালতেই ধড়মড়িয়ে ওঠে ঘনশ্যাম। )

ঘনশ্যাম : nonsense, কে রে?

[ সঙ্গে সঙ্গে তরুকান্তি আলো নিভিয়ে দেয়। আবার প্রশান্তি। কেউ ঘুমের ঘোরে কথা বলে, কেউ নিবিয়ে নাক ডাকায়। ঘর আলোয় নিরুপায় ভাবে জামা কাপড় ছাড়ে তরুকান্তি। ]

মুকুন্দমুরারি : আপনার খাবারটা Sir,

তরুকান্তি : খাবারটা আপনি-ই খেয়ে ফেলুন! অনেক রাত হয়ে গেছে।

মুকুন্দমুরারি : আপনি—না খেয়ে থাকবেন স্যার?

ননী : আঃ!

ইন্দ্রনাথ : কথা বলে কে এত রাতে? Horror.

[ তরুকান্তি হাতের ইশারায় মুকুন্দমুরারিকে তাড়িয়ে দিয়ে খাটের এক কোণে কোনমতে বসে নিরুপায়ে একটা সিগারেট ধরায়।

রাত গভীর হয়। নিস্তব্ধ হয় চারদিক। একটার পর একটা সিগারেট টেনে রাত কাটে তরুকান্তির। সৌহার্দ্যের দায়—মুখ ফুটে সে একটা কথাও বলতে পারে না।

ঘুমন্ত মানুষের চালচলন বলা যায় না। তরুকান্তির পা ঘেঁষে ঠ্যাং উঠে আসে ইন্দ্রনাথের। আলগোছে সেই উদ্যত পাটিকে সংযত করে চুপ করে বসে থাকতে হয় তরুকান্তিকে কাষ্ঠপুত্তলির মত।

নিস্পলক রাত কাটে তরুকান্তির। সকালবেলা। ঘুম ভেঙে ওঠে জগপতি। বন্ধু তরুকান্তিকে বসে থাকতে দেখে বলে :

জগপতি : তুই দেখছি আমার চাইতেও early-riser! কখন উঠলি?

তরুকান্তি : এই সবে।

জগপতি : চায়ের অর্ডার দিইছিস?

তরুকান্তি : না, মেস। ( গোবিন্দকে ) গোবিন্দ দু-কাপ চা পাঠিয়ে দে তো। ( জগপতিকে ) তারপর তোদের কোন অসুবিধে হয়নি?

জগপতি : অসুবিধে মানে মালিক-ই নেই ! তবে manage করে নেয়া গেছে। গোবিন্দটা wonderful .....আছে সিগারেট ?

( প্যাকেট এগিয়ে দেয় তরুণকান্তি )

তরুণকান্তি : ইন্দ্রনাথের ব্যাপারটা আর কিছু এগিয়েছে ?

জগপতি : এগিয়েছে মানে ইরাণী তো দেখি একুণি রাজী। অথচ ইন্দ্রনাথের complain হচ্ছে ইরাণী নাকি তার বৌদির ভাইকে ভালবাসে।

তরুণকান্তি : বৌদির ভাই মানে ?

জগপতি : তুহুর তুহুম, তুহুমকে চিনিস না ?

তরুণকান্তি : এ development-টা আবার কবে থেকে হলো ?

জগপতি : অবিশ্যি এসবই ইন্দ্রনাথের কথা।

তরুণকান্তি : তোদের কি মনে হয় ?

জগপতি : বুঝতে পারছো না ? ইন্দ্রনাথ এখন পরিষ্কার মেয়েটিকে gi't করছে !

তরুণকান্তি : This is really bad.

জগপতি : Bad মানে, awful. মুখেই সব বড় বড় কথা। কোন backbone আছে ?

তুহুর : ( জগপতিকে ) টেংরিটা সরা না ? জেগে আছিস অথচ পা-খানা চালিয়ে দিয়েছিস হিপ্‌বোনের ওপর দিয়ে। প্যারেলাইসিস-টা কন্ কন্ করছে। ( হঠাৎ তরুণকান্তিকে দেখে ) তারপর গুরু, চা-এর অর্ডার-টা দাও !

তরুণকান্তি : ( হাঁক দেয় ) গোবিন্দ ! চা !

( চা-এর কথা শুনে লাফিয়ে ওঠে নন্দী ও ঘোঁতন )

নন্দী : কি, চা হয়ে গেল নাকি ?

ঘোঁতন : শালা মাটিতে শুয়ে পা হাত পা ভারি হয়ে গেছে। ( হাঁচে ) নির্ঘাত ফ্লু হবে।

নন্দী : তফাৎ যাও তফাৎ যাও। infection ছড়াচ্ছে !

ঘোঁতন : এই তরুণ, আদার রস দিতে বলিস তো একটা কাপে।

তরুণ : বলে দিচ্ছি।

নন্দী : বাড়ী গিয়ে খেলে মেড়ে বিশল্যকরণী খাওয়ে, আদার রস দেবে !

ঘোঁতন : ফাট্ ফাট্ করিস নি তো ! কথা বলেই humour হয় না।

নন্দী : Reader's Digest-এ কি আর no humour লেখা থাকে !

( ঘোঁতন হাঁচে )

ইন্দ্রনাথ : ( লাফিয়ে ওঠে ) Horrid. কি করছিস্ বল তো ?

নন্দী : ( ইন্দ্রনাথকে ) ও কি করবে ? ফ্লেড্ ওকে নিয়ে humour করছে। ( ঘোঁতনকে ) আর একটু অপেক্ষা কর, tickling-টা বুঝতে পারবি হাড়ে হাড়ে।

( আবার হাঁচে ঘোঁতন )

( ইতিমধ্যে চা এসে পড়ে )

তরুণকান্তি : ( গোবিন্দকে ) একটা আদা দিয়ে নিয়ে আয়।

নন্দী : বাসি পেটে চা, বিস্কুট টিস্কুট নেই ?

তরুণকান্তি : গোবিন্দ, এক প্লেট বিস্কুট।

নন্দী : ( তরুণকে ) তোর কি আজও অফিস ?

তরুণকান্তি : মানে ? মানার বাড়ীর আবদার নাকি ?

নন্দী : আলোচনাটা আমাদের শুনিছিস ?

তরুণকান্তি : কখন শুনলাম।

জগপতি : কমফ্রীয়েন্স মিটিং-কিটিং-এর ওপর জোর না দিয়ে মেলাটার ওপর concentrate করবার কথা হয়েছে।

নন্দী : কথা নয়, resolution passed.

তরুণকান্তি : তবে তো হয়েই গেছে। এইবার programme কি হবে সেটা তোরেরা বসে ঠিক করো। আমার যে কর্তব্য সেটা আমি তো বলেইছি করবো।

নন্দী : হ্যাঁ সেই কর্তব্যের কথাতেই আসছি। এক নম্বর—আর্টিষ্ট contact—তোমার।

তরুণকান্তি : এখন কাকে কাকে দরকার তোমাদের সেটা ঠিক না জানলে

ননী : আসছি, আসছি। এক এক করে আসছি। সে জন্যই তোমাকে আজই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Advance যা করবার আপাততঃ সে-টি তুমি করছো।

তরুণকান্তি : সে তো বিস্তর টাকা।

ননী : বিস্তর কিন্তর লাগবে না, তুমি তোমার influenceটা exert করবে। কিছু অবশ্য দিতেই হবে—booking-এর সময়। বাকি টাকা on the night of performance right on the Dias. এটুকু তাই তোমাকে করতেই হবে।

তরুণকান্তি : কি করে হবে বুঝতে পারি না। ঘুষি তো আর কাটতে পারবো না।

ননী : দরকার হলে তাও কাটবে। একটা জনকারেন্সের ব্যাপার, Public involved. জনসাধারণ মেরে খালা তক্তা করে ছেড়ে দেবে।

জগপতি : কেন না তাদের কাছে তুমি টিকিট বিক্রী করছো।

ননী : চালাকি কথা? তবে হ্যাঁ, যে টাকাটা তোমার involved হচ্ছে Executive নিশ্চয়ই সে টাকার দায়িত্ব নিচ্ছে;—এটা তুমি assured থাকতে পারো।

তরুণকান্তি : কিন্তু কি দিয়ে কি করবো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

ননী : সে এখন তাই তোমার ব্যাপার, তুমি ভাবো।

তরুণকান্তি : Any way, ভাবি।

ইন্দ্রনাথ : না না এর মধ্যে আর ভাবাভাবি করো না। এমনিতেই time short. অনেক কিছু করতে বাকি আছে। We must take it as accepted.

তরুণকান্তি : ধরে রাখো।

ননী : Ambiguity করছিস কেন? Yes or no.

তরুণকান্তি : Yes.

ননী : That's like a good boy. তাহলে passed.

ধীরেন : Passed, Passed.

ননী : Artist list-টা তাহলে জগপতি তুমি তরুণকে আজই দিয়ে দিচ্ছ। That's your affair.

জগপতি : দিয়ে দিচ্ছি।

তরুণকান্তি : তোমাদের কাজ কারবার আজই হয়ে যাচ্ছে না থাকছো তোমরা আজ?

ননী : কিছু যাচ্ছে, কিছু হয়তো থাকবে। কেননা chief guest-এর ব্যাপারটা ঠিক করতে হচ্ছে তো! তোর কোন suggestion আছে?

তরুণকান্তি : কাকে বলি!

ধীরেন : আমি বলি ডক্টর হরিধন ভট্টাচার্য-কেই নাও। লোকে সাংঘাতিক নেয় ভদ্রলোককে।

ননী : নেয় বলেই তো হলো না, কিছু পায়


'রূপা'র বই

উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রাণপাখের—দেবব্রত রেজ | ৭.৫০ |
| চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায় | ৬.০০ |
| এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী | ৫.০০ |
| বাতাসী বিবি—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.] | ৪.০০ |
| এখানে মৃত্যুর হাওয়া—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ | ৪.০০ |
| শেষ বসন্ত—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.] | ৪.০০ |
| প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩.০০ |

গল্প সংগ্রহ

| | |
|---|---|
| বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩.০০ |
| অনেক বসন্ত দুটি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি | ৩.৫০ |

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আবার তা-ও দেখতে হবে। People-এর ওপর আমাদের একটা responsibility আছে—সেটা ভুললে চলবে না।

কুমুদ : তাহলে ডাঃ খাসনবীশকে ডাকো।

ইন্দ্রনাথ : Impossible. একটা ডাইহার্ড রিঅ্যাকশনারী!

ঘনশ্যাম : তবে তারক বন্দ্যোপাধ্যায়-ই ঠিক থাক।

ননী : Extreme right হয়ে পড়ে। People নেবে না।

তরুণকান্তি : অত right left করতে গেলে কিন্তু কাউকেই তোমরা ঠিক করতে পারবে না।

ননী : ব্যাপারটা সত্যিই খুব ঝামেলার।

তরুণকান্তি : কেন ডাঃ হরিধন ভটচাজকে তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না কেন?

ননী : হচ্ছে না মানে···

তরুণকান্তি : বেশ হোল্ড করে রাখতে পারেন mass-কে।

ননী : মুস্কিলটা হচ্ছে বিষয়বস্তু কিছু না থাকার দরুণ mass যে একবিন্দুও hold করে না। বলার না?

থোতন : হাত, হাত।

( প্রায় সকলেই হাত তোলে )

ননী : এক দুই তিন চার পাঁচ—So passed. হরিধন ভটচাজ-কেই আমরা chief guest হিসেবে ডাকছি।

তরুণকান্তি : কটা বাজে?

জগপতি : ন'টা বাজতে পনেরো।

[ সঙ্গে সঙ্গে শিব টেনে লাফিয়ে ওঠে তরুণকান্তি ]

তরুণকান্তি : অফিসের রক্ত আর রক্ত। গোবিন্দ! স্নান খাওয়া কিছু হবে না।

নেপথ্য কণ্ঠ : যাই বাবু।

[ গোবিন্দর প্রবেশ ]

তরুণকান্তি : আমার জুতো জোড়া, জলদি।

( মুহূর্ত কালের মধ্যে তৈরী হয়ে নেয় তরুণকান্তি )

ননী : স্নান খাওয়া হলো না তো!

তরুণকান্তি : খাওয়াটা কিছু না, স্নানটাই করতে পারলাম না।···যাহোক, মোটামুটি আমার কাজ আমি করছি। তোমাদেরটা তোমরা কর। ফিরতে রাত হবে। হয়তো তোদের সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হচ্ছে না।

ননী : সেটা immaterial, আসল কথা কাজটা। সেইটি খেয়াল রেখো।

তরুণকান্তি : আচ্ছা so long. ( হাতে ) গোবিন্দ! এই যে গোবিন্দ। এঁরা সব রইলেন। সব দেখাশুনো করবি। ঘরটা ঝাঁট দিস।

ইন্দ্রনাথ : সত্যি না নোংরা হয়েছে। ঘরখানাকে astray হিসেবে ব্যবহার করবার কি কোন মানে হয়?

ননী : সিগারেট খাচ্ছিস আর ফেলছিস—তুই-ই তো নোংরা করছিস বেশী।

ইন্দ্রনাথ : ( ছাইদান উঁচু করে দেখায় ) কি, সেটি বলতে পারবে না। সে অভ্যেসদোষ আমার নেই।

তরুণকান্তি : ( চিরুনী রেখে ) আচ্ছা তাই, দেখা হবে। দেখে শুনে একটু manage করে নিস।

ননী : বড্ড formality করছিস তুই তরুণ।

তরুণকান্তি : বাঃ, Guests !!

[ তরুণকান্তির প্রস্থান ও মুকুন্দমুরারির প্রবেশ ]

মুকুন্দমুরারি : তরুণবাবু চলে গেছেন?

ননী : কেন বলুন তো?

মুকুন্দমুরারি : নার্ভাস ফিল করছি, বলি আপনারা কি আজও থাকছেন?

ননী : কেন আপনার আপত্তি আছে?

মুকুন্দমুরারি : দেখুন মেশি, আপনারা ঘরের, ঘরের লক্ষ্মী···

থোতন : কান্তিক বলুন। আমরা সব বেটাছেলে।

মুকুন্দমুরারি : না সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

ননী : শুনুন শুনুন, ম্যানেজারবাবু!

মুকুন্দমুরারি : বলুন স্যার।

নন্দী : এ বেলাটা আমরা সবাই আছি। আছি এবং বিশেষভাবে আছি।

মুকুন্দমুরারি : বেশ তো।

জগপতি : শুধু ও বেলাটা আমাদের কিছু ঠিক নেই। যেতেও পারি আবার থাকতেও পারি।

মুকুন্দমুরারি : যেমন অভিরুচি।

[ মুকুন্দমুরারির প্রস্থান ]

নন্দী : তা হলে চল বেরিয়ে পড়া যাক।

ইন্দ্রনাথ : in batches. যে যার কাজে করো।

জগপতি : আমি কোন কাজে আসছি? আসছি না।

কুমুদ : তুমি শালা নিশ্চয়ই সিনেমা যাবার তাল করছো। ওটি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে বড়বাজার যাচ্ছো।

জগপতি : My goodness. Why at all in Barabazar?

কুমুদ : হরিদাস আগরওয়ালার গদিতে যেতে হবে। এমনিতেই Patron করা হয়েছে নাকি?

নন্দী : And that is very vital. জগপতি তুমি কুমুদের সঙ্গে যাবে। নিজেকে shield করো না।

জগপতি : Shield আমি করছি না। কিন্তু আমায় গিয়ে কি কোন লাভ হচ্ছে?

নন্দী : হচ্ছে।

জগপতি : কি লাভ হচ্ছে? কুমুদ সেখানে একলাই একশ'।

নন্দী : I detest this mentality. সেক্ষেত্রে তো আমিও বলতে পারি Dr. Haridhone Bhattacharya is best known to যৌতন, আমার সেখানে যাবারই কোন মানে হয় না। না না, এ ভারি অন্যায় কথা।

জগপতি : বেশ যাচ্ছি, তবে ইন্দ্রনাথকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

ইন্দ্রনাথ : Insist করো যাচ্ছি কিন্তু তাহলে আর আমার বাদুড়বাগান যাওয়া হয় না।

জগপতি : বাদুড়বাগান, ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।

( দুচারজন হো হো করে হেসে ওঠে )

নন্দী : জগপতিটা সত্যি এত blunt! ( যমকে ) বাদুড়বাগানে ইন্দ্রনাথের interest-টা তুমি দেখবে না রাসকেল?

যৌতন : (গান করে) তুমি চলে গেলে, পাখাদের দুঃখ লিখে রেখে যাবো নাম।

ইন্দ্রনাথ : ( যৌতনকে ) খুব কাজলামি হচ্ছে, না?

যৌতন : প্রেমের গান গাইতে মানা করো বন্ধু?

জগপতি : I am really sorry. ইন্দ্রনাথ ভাই কিছু মনে করিস না। ( পায়ে পড়ে ) ব্যাপারটা করি দুই বাদুড় বাগান যা।

ইন্দ্রনাথ : Limit. কি হচ্ছেটা কি বলবি?

কুমুদ : ( টেনে টেনে ) Speak him not, touch him not, leave him alone and he will fly.

( সকলেই যে যার মত তৈরী হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে )

কুমুদ : ( চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জগপতিকে) Just a moment জগপতি।

[ ইন্দ্রনাথ বাদে জগপতি ও কুমুদের প্রস্থান ]

( ইন্দ্রনাথ সিগারেট-টা টেনে শেষ করে। তারপর যোগযোরস্ত গিলে করা পাঞ্জাবী আর ধুতি পড়ে প্রসাধন শেষ করে। যাবার আগে গোবিন্দকে হাসতে হাসতে বলে )

ইন্দ্রনাথ : গোবিন্দ, যে কোন একটা আড়ুল ধর। ধর।

[ গোবিন্দ একটা আড়ুল ধরে। ইন্দ্রনাথ সস্নেহে তার গালে একটা চড় মেরে ব্যাগ খুলে বকশিস করে চলে যায়—পাক খেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ]

( জয়গোপাল ও মুকুন্দমুরারির প্রবেশ )

[ জয়গোপালবাবু সম্পর্কে তরুণকান্তির জামাইবাবু। বক্তৃতা থাকেন। ব্যবসায়ী মানুষ। সওদা করতে

এসেছিলেন। মালপত্র কিনে শুরু করবার ব্যাপারে তরুণকান্তির সহযোগিতা চেয়েছেন। কেনাকাটি শেষ হলেই বাড়ী চলে যাবেন। মালকোচা মারা, তাঁতি জুতো পায়ে, সার্টের ওপর মুতির ওপর রেশমী কোট, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। বয়স গোটা পঞ্চাশেক।

মুকুন্দমুরারি জয়গোপালবাবুকে আপ্যায়ন করতে করতে ভেতরে নিয়ে আসেন ]

মুকুন্দমুরারি : আসুন আসুন, এই হচ্ছে তরুণ-কান্তিবাবুর ঘর।

জয়গোপাল : বাঃ, চমৎকার বন্দোবস্ত।

মুকুন্দমুরারি : এই তো, খানিকক্ষণ আগেও ছিলেন সবাই। কিছুক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছেন। আপনার পরিচয়টি…

জয়গোপাল : বলতে যে, জামাইবাবু। তরুণ আমার শালা এবং একমাত্র শালা।

মুকুন্দমুরারি : ও।

জয়গোপাল : দেখা না করে গেলে, বুঝতেই পারছেন, সিল্লী তো একেবারে অভিমান করে তুলবেন প্রাণ—যে এতদিন পর কলকাতা গেলে অথচ ভাইটির আমার কোন খবরই নিয়ে এলে না, দেখাটি অবধি করলে না তার সঙ্গে…

মুকুন্দমুরারি : তা তো বলতেই পারেন। রক্তের রক্ত। কথায় বলেছে…

জয়গোপাল : না শুধু সম্পর্কের টান-ই সব না। এরের ভেতরে, আকর্ষণটা—বুঝতে পারলেন কি না, কি বলবো আপনার সিরে এই চুম্বকের মত। বোন তো আমারও আছে; কিন্তু এ বোন সে কি বলে বোঝাবো আপনাকে তাই বলতে অজ্ঞান। তাই ভাবছি দেখা না করে চলে যাবো!

মুকুন্দমুরারি : তা সে রকম মনে করেন রাত্রের ট্রেনেও যেতে পারেন। রাত্রে এলেই তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

জয়গোপাল : তা হলে থেকে যেতে বলছেন?

মুকুন্দমুরারি : না মানে ভাইবোনের টান যেখানে এই রকম সাংঘাতিক একটা কিছু বলছেন তখন—বাড়ী গিয়ে আবার জবাবদিহি হতে হবে তো?

জয়গোপাল : সেই তো হয়েছে মুস্কিল। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমার সঙ্গে কিছু মালপত্তর আছে, ওগুলোকে তো তা হলে সাময়িকভাবে তুলে দিতে হয়।

মুকুন্দমুরারি : তা তুলে দিন। পাশের ঘরে তরুণবাবুর জিনিষ, তাল কেতাদুরস্তই থাকবে। তা ছাড়া চাকর আছে, সব দেখে শুনে রাখবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (হাঁক দেন) ওরে গোবিন্দ! গোবিন্দ!

(গোবিন্দর প্রবেশ)

আয় তো বাবা, গাড়ীতে কি মালপত্তর আছে সব এনে গুছিয়ে রেখে দে ঘরে। একা না পারিস রঘু, জগন্নাথকে ডাক।

জয়গোপাল : কয়েক ঘটার মামলা।

মুকুন্দমুরারি : তবু তো আর রাস্তায় থাকতে পারে না জিনিষ। আপনি তার একটু কষ্ট করে দেখে শুনে নিন।

জয়গোপাল : ঠিক আছে ঠিক আছে। মালটা রেখে আমি অবিশ্যি একটু বেরুবো। তারপর সন্ধ্যে-সন্ধি ঘুরে আসবো।

মুকুন্দমুরারি : যেমন খুসী। তো আজ্ঞা! চা-টা কিছু খাবেন?

জয়গোপাল : না আমি বাইরেই খেয়ে নেবো। বেলা হয়েছে তো?

মুকুন্দমুরারি : তা সে যদি অনুমতি করেন খাওয়া এখানেও হতে পারে।

জয়গোপাল : তা হলে তো কোন কথাই নেই।

মুকুন্দমুরারি : জামাইবাবু, আপনি বাইরে খেতে যাবেন কেন? মালপত্তর গুছিয়ে আপনি একটু সুস্থির হয়ে বসুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জয়গোপাল : অশেষ ধন্যবাদ।

মুহুন্মুরারি : জামাইবাবু মানুষ!

( ইতিমধ্যে মালপত্র এসে পড়ে মাথায়। সবই ছুতো। বাস্ত ভরতি ছুতোর বাক্সের পাহাড়। ঘরের ঠিক মাঝখানে ডাঁই করে নামিয়ে দিয়ে যায় কুলীরা। তাড়া চায় হাত বাড়িয়ে )

জয়গোপাল : তাড়া তো! দেগা। লেকিন পিছু দেগা। শুনো, রাতকো আয়েগা। তখন ফিন্ সামান উঠায়েগা গাড়ীমে। তুম্ তিন আদমী। ঐ টাইম তুমকো ডবল তাড়া মিল যায়েগা। সমঝা?

কুলী : রাতকো কয় বাজে বাবু।

জয়গোপাল : কয় বাজে, হিয়াই তো রতা হায়। দেখকে যায়েগা। হাম তো হি হাই রহেগা।

কুলী : তো ঠিক হ্যায়। চা খানেকে লিয়ে কুছ আরো মিল যায় বাবু।

জয়গোপাল : অবেলা করে চা! ( পয়সা দেন ) নে, তিন আনা নে।

[ সেলাম করে কুলীদের প্রস্থান ]

...এক পর্ব শেষ হলো। গোবিন্দ, তুমি বাবা এখন ডান হাতের জোগাড়টা চটপট করে ফেল দিকি। ম্যানেজার বাবু তো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বলেই হাওয়া কন্টলেন। আখ, চটপট করো।

( গোবিন্দর প্রস্থান )

... যাক্, মালপত্তর তলো যে safely dump করা গেল একটা Secure place-এ এই হলো কাজের কাজ!

[ শুয়ে পড়ে গড়ান জয়গোপাল বিছানায় হিপোপটেমাস-এর মত। হাত দিয়ে চাপড়ে নরম গদী অনুভব করেন। নাকিয়ে উঠে আবার বাস্ত গুণতি করেন। ইতিমধ্যে ভাতের থালা এসে পড়ে ]

জয়গোপাল : বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে home comfort :—ভাজা, ছ্যাচড়া

( গোবিন্দকে জল গড়িয়ে দেয় )

( গোবিন্দকে ) তুই কি? হোটেলের চাকর না বাবুর চাকর।

গোবিন্দ : আমি বাবুর চাকর।

জয়গোপাল : বাবুর চাকর? তুই তো দেখছি তা হলে চাকরের চাকর। তোর বাবু আমার কি হয় জানিস? শালা।

গোবিন্দ : ছি।

জয়গোপাল : ছি কি রে বেটা, সালাগালি দিচ্ছি ভাবলি?

গোবিন্দ : আমার বাবুর নাম তরুণকান্তি বাবু।

জয়গোপাল : তরুণকান্তি হলে বুঝি কারো শালা হতে নেই?

গোবিন্দ : ছিঃ!

জয়গোপাল : আবার বলে ছিঃ। তুই বেটা কথাটাই বুঝলি নে। জল দে।

( গোবিন্দ জল দেয় )

জয়গোপাল : ও জল না। আঁচানোর জল।

গোবিন্দ : কলঘরে যাও।

জয়গোপাল : সে-টা আবার কোন দিকে?

[ পথ দেখায় গোবিন্দ আঙুল দিয়ে। একটু পরেই পুনঃ প্রবেশ করেন জয়গোপাল এবং যথারীতি চুল আঁচড়ে, পান খেয়ে বেরিয়ে যান ]

জয়গোপাল : সব থাকলো দেখিস বাবা। ও সব তোর বাবুরই জিনিষ।

[ প্রস্থান

[ জয়গোপালবাবুর নিষ্ক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তরুণকান্তির বন্ধু বান্ধবের দল হুড় মুড় করে ঘরে ঢোকে এবং পরিশ্রান্তির কারণ দুম দাম শুয়ে-শুয়ে পড়ে। ]

মনী : ( পান চিবোতে চিবোতে ) এখানে 'ফিস'

গুলো সব নষ্ট হলো। খাব না বলে গেলেই হতো ভাল।

খোকন : চাইনীজ ডিস চাইনীজ ডিস বলে তুই-ই তো ক্ষেপে উঠলি। অনর্থক গাঁটগচ্চা চলে গেল কতকগুলো টাকা।

জগপতি : এটা কিন্তু কনফারেন্সের খাতে যাওয়া উচিত।

ননী : হতে পারে যে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে যদি বাড়তি টাকা থাকে।

কুমুদ : আমার কিন্তু আবার খিদে খিদে পাচ্ছে।

ঘনশ্যাম : পাচ্ছে তো? আমারও। চাইনীজ ডিসের স্পেশালিটিই-ই এই।

ননী : জীবনে তো এই প্রথম খেলি, আবার অত কপচাচ্ছিস কেন?

ঘনশ্যাম : থাক এ ব্যাপারে আর কথা বলিস না। তবে খাবার অত্যন্ত deteriorate করেছে। সেই চিলি চিকেন আর চিকেন চাউ চাউ, সে জিনিষই নেই।

গোবিন্দ : আপনাদের সব খাবার হয়েছে।

কুমুদ : Already served. চল যাচ্ছি। জগপতি আয়।

ঘনশ্যাম : এমনিতেও নষ্ট ওমনিতেই নষ্ট, চাট খেয়েই আসি।

ননী : খিদে পেলে খাবি নে কেন? চলে যা।

ঘনশ্যাম : তুই সত্যিই খাবি না?

ননী : চল, company দিচ্ছি।…( জুতোর র‍্যাকের ওপর নজর করে ) কিন্তু এ বস্তুটি যে কি তা তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি!

ঘনশ্যাম : জুতোর র‍্যাক বলেই তো মনে হচ্ছে।

ননী : এত জুতো!

ঘনশ্যাম : হ্যাঁ জুতো। কারো। রয়েছে। তুই খামখা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

ননী : না মানে এমনও তো হতে পারে যে জুতোর কারখানা আছে এমন কোন Patron আমাদের Club কে donate করেছে। হতে পারে তরুণের কোন contact…

( তিনজন কুলীর প্রবেশ )

…কেয়া মাংতা বাবা।

১নং কুলী : কুছ নেহি বাবা, বাবু হামকো বোলা।

ননী : কোন বাবু?

১নং কুলী : জুতাওয়ালা বাবু।

ননী : জুতোওলা বাবু? সেটা আবার কে?

১নং কুলী : কেয়া জানে কোন বাবু। পড়ে )

২নং কুলী : দেখিয়ে বাবু, ভাড়া না মিলল তো সামান হাম না ছোড়েব—হঁ।

ননী : গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে ( কুলীকে ) তা না ছোড়বে তো বৈঠে যাও, জুতাওয়ালা বাবু যব আয়েগা তব পাওগে।

৩নং কুলী : হঁ, ও কি বাত বোলতা না!

ননী : বেশ বসে থাকো জুতো আর কিছুতে হাতটাত দিও না কিন্তু বাবা!

১নং কুলী : দেখিয়ে বাবু, মুনুক সে আয়া পেটকে লিয়ে। হাম চোর ডাকু নেই হ্যায় বাবুজী। হামারা জমীন উমীন সব নাশ হো গিয়া বর্ষাতে। আব তো ভুখা মরতে রহে বালবাচ্চা।

( এত জোরে চেঁচিয়ে আবেদন করায় কুলীরা যে ননী বিব্রত বোধ করে )।

ননী : ঠিক আছে, ঝামেলা তো বস। জুতোওলা বাবু এলে ছাড়বেন। গোবিন্দ তুই এখানে বসে থাক। ( কুলীকে ) যাদের এ বাচ্চা তুমলোগোকো দেখ ভাল করেগা আর কি। ( ঘনশ্যামকে ) ঐ যে অন্য কোন জিনিষে হাত টাত দিও না বলিছি, সেইজন্যে ক্ষেপে উঠেছিল। Proletarian গোসাটা একবার দেখলি?

ঘনশ্যাম : মানে এরাই Revolution করবে বলছিস ?

ননী : এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়। Whiskerগুলো দেখেছো ? ইয়া মোটা মোটা। বাঘের মতন।

ঘনশ্যাম : আর আমাদের !

ননী : সেটি বুর্জোয়া গোঁফ। দু দিকে দুখানা কালো রেখার আইডিয়া। কোন পুরুষের ছাপ আছে বলতে চাস ?

ঘনশ্যাম : সে চল খানি চল।

ননী : না, হুলুমু বিহারের এই দৃশ্য দেখবার পর দুদু বার করে খাওয়া আমি immoral মনে করি। আমার ঠিক ভাল লাগবে না খেতে।

ঘনশ্যাম : যা বলেছিস।

( দুজনে বসে সিগারেট ধরায়। সময় যায়। একটু পরেই ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে সবাই ঢুকে পড়ে। নতুন আগন্তুক তিনজনকে দেখে সবাই হকচকিয়ে যায় )

ধৌতন : এরা কারা ?

ননী : ওয়ারিশান। ওরা থাকবে।

ধৌতন : মানে ?

ননী : চেঁচামিচি করো না, আবার যদি চেঁচাতে সুরু করে তা হলে আর তিষ্ঠোননা যাবে না ঘরে।

কুমুদ : কি ব্যাপার কি ?

ধৌতন : Situation.

কুমুদ : But why grave ?

ধৌতন : Because it is grave.

কুমুদ : Baffling.

জগপতি : কিন্তু আমরা আর দেরী না করে তো রওনা দিলেই পারি।

ননী : ইন্দ্রনাথের জন্যে অপেক্ষা করছি।

জগপতি : সে থেকে সোজা প্লেনে যাবে।

ননী : তা হলে Pack up your troubles. রওনা হয়ে যাই আমরা। গোবিন্দ, তোর বাবুকে বলিস—আর ( বকশিষ দেয় ) এটা তুই রাখ। মিষ্টি কিনে খাবি।

[ যে যার মত মালপত্র নিয়ে রওনা হয়ে যায়—এক ঝাঁক পায়রার মত, যেমন এসে ঢুকেছিল।

ত্রিমূর্তি সমুখ করে বসে ঘর আগলায় গোবিন্দ। ]

( তরুণকান্তির প্রবেশ )

তরুণকান্তি : কি ব্যাপার গোবিন্দ !—এরা সব চলে গেছে ? ( জুতোর স্তূপ দেখে ) এটা কি ? ( কুলীদের ) তোমরা কারা ?

১নং কুলী : নেহি সাব, হ্যামলোই বৈঠা হ্যায়।

তরুণকান্তি : বৈঠা হ্যায় তো ইহাঁর কিঁউ ?

১নং কুলী : সামান-কা ভাড়া না মিলি বাবুজী।

তরুণকান্তি : কি সামান ? কার সামান ?

১নং কুলী : জুতাওয়ালা বাবুকা।

তরুণকান্তি : জুতাওয়ালা বাবু !

২নং কুলী : জী হুঁজুর।

তরুণকান্তি : মুকুন্দবাবু কোথায় ? আরে ইয়ে, ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু ? [ প্রস্থান ]

১নং কুলী : কেয়া পরেশানি !

২নং কুলী : কা জানে !

৩নং কুলী : ( গোবিন্দকে ) মোকাম কা মালিক হো বা ?

গোবিন্দ : আমার বাবু।

৩নং কুলী : ও জুতাওয়ালাবাবু কোন হো বা ?

গোবিন্দ : আমি কিছু জানে না।

৩নং কুলী : তু কৌন হো।

১নং কুলী : নোকর তৈল বা।

( হঠাৎ তরুণকান্তির নেপথ্য কণ্ঠ কেটে পড়ে )

[ তরুণকান্তির কণ্ঠস্বর : আপনি আমাকে টেলিফোন করতে পারতেন। আপনি আমার Office-এর টেলিফোন নাম্বার জানেন। ]

( মুকুন্দমুরারি সহ তরুণকান্তির পুনঃ প্রবেশ )

মুকুন্দমুরারি : টেলিফোন করলাম না মানে, বললেন আপনার জামাইবাবু।

তরুণকান্তি : না আমার কোন জামাইবাবু নেই।

মুকুন্দমুরারি : কি কাণ্ড দেখুন অথচ পকাশবার ঘরে তার স্ত্রী অর্থাৎ কিনা আপনার বোনের সঙ্গে আপনার যে কি পরিমাণ ভাব সেই কথাই বলতে লাগলেন সারাক্ষণ।

তরুণকান্তি : কি যেন মশাই আমি তো ভাবতেই পারছি না। আমার বোন…

মুকুন্দমুরারি : আর একবার না, অতিকষ্ট মশায় করে আপনার নাম ধরে বল্লেন যে তরুণ হচ্ছে আমার একমাত্র শালা। কি করে অবিশ্বাস করি বলুন ?

তরুণকান্তি : আমি কারো শালা কালা নই।

মুকুন্দমুরারি : আর সেই সুবাদে মালপত্তরগুলো পর্য্যন্ত রেখে দিয়ে গেলেন। বল্লেন, রাত ছাড়া যখন যাওয়া হবে না তখন আমিই বা খামখা বসে থেকে কি করবো, একটু ঘুরে আসি। এখন এত কথার পরও কি লোককে অবিশ্বাস করতে মন যায়, আপনিই বলুন ? ভদ্রলোক খেলেন বিশ্রাম করলেন…

তরুণকান্তি : কি, এখানেই খেলেন ?

মুকুন্দমুরারি : বলছেন জামাইবাবু, এখন আমি কি করে বলি বলুন দেখি যে না, আপনি বাহিরেই খান গিয়ে !

তরুণকান্তি : যাই হোক, ( কুলীদের লক্ষ্য করে ) কিন্তু এরা, এরা কি জন্যে ঘরের ভেতর এসে উঠেছে !

মুকুন্দমুরারি : উঠেছে, ( তাড়না করেন ) এই, দিয়া কেয়া মাংতা। তুম লোগ ঘরমে কেঁউ ঘুসা। জাল্লা হাম হাম তুম লোগকো পুলিশমে দেনে সকা।

কুলীদের সমস্বর : হামারা কেয়া কসুর হায় বাবুজী, তাড়াকে লিয়ে হাম বৈঠা হায়—কহা কি আভি হাম তুমকো তাড়া নহি দেগা—রাতকো সব সামান উঠায়েগা, উসবখত ডবল তাড়া সে দেগা একসাথ।

তরুণকান্তি : কেয়া নিলেগা তুমকো।

১নং কুলী : জী তিসাবসে দেখিয়ে তিন্ তিন আদমী—এয়া মাল…

তরুণকান্তি : ঠিক আছে কত, তোমাদের হিসেবে তাড়া কত ?

১নং কুলী : জী তিন রুপেয়া।

মুকুন্দমুরারি : এখান থেকে এখানে তিন রুপেয়া ? নগের মুটুক !

২নং কুলী : দেখিয়ে বাবুজী…

তরুণকান্তি : ঠিক আছে তিন রুপেয়া ; এই নাও তিন রুপেয়া। ( তাড়া দেয় )

১নং কুলী : দেখিয়ে সাব কেয়া খুস মে…

তরুণকান্তি : ঠিক আছে বাকা আর বলতে হবে না, বাইরে যাও।

[ কুলীদের প্রস্থান ]

মুকুন্দমুরারি : এ যে দেখছি ভোজবাজীকেও হার মানালো। কিন্তু ভদ্রলোক কে আবার কিছুতেই অবিশ্বাস হচ্ছে না।

তরুণকান্তি : থামুন আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে। এখন মোদ্দা বিলটা আমার কত হয়েছে জানাবেন কি ? সেই কেই ঘরে ?

মুকুন্দমুরারি : খুব বেশী হবে না।

তরুণকান্তি : তবু কত ? approximate ?

মুকুন্দমুরারি : তা সত্তর আশী হবে।

তরুণকান্তি : বলেন কি ?

মুকুন্দমুরারি : তা তো হবেই ! আমি আপনাকে বিল দেখিয়ে দেবো, item by item.

তরুণকান্তি : ঠিক আছে। এখন ছুতোওয়ালা জামাইবাবুটি যে কে সেইটিই আমার জানতে বাকি রইল।

মুকুন্দমুরারি : দেখুন। অবিশ্যি দেখেই যে চিনতে

পারবেন—আপনার কথা শুনে সে-ও আমি ভাবতে পারছি না।

তরুণকান্তি : আমিই পারছি না, তার আপনি কি করে পারবেন?

[ জয়গোপালের প্রবেশ ]

মুকুন্দমুরারি : এই তো বলতে বলতে এসে পড়েছেন। আসুন, জামাইবাবু আসুন।

জয়গোপাল : তরুণকান্তি কিরেছে?

তরুণকান্তি : আমিই তরুণকান্তি।

জয়গোপাল : অ, আমাকে নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে না। আমি তোমার জামাইবাবু হই। আশ্চর্য্য লাগছে তো?

তরুণকান্তি : না মানে, আপনি বসুন?

জয়গোপাল : হ্যাঁ, বসেই কথা বলি। এক কাপ চা পাওয়া যেতে পারে?

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই, ( মুকুন্দমুরারির প্রতি ) ম্যানেজারবাবু, আপনি এখন যান। গিয়ে বরং দু কাপ চা পাঠিয়ে দিন।

জয়গোপাল : সুরেন আঠারশাইকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো।

তরুণকান্তি : কে সুরেন আঠারশাই?

জয়গোপাল : কেষ্টনগরের নরেন বাড়ুয্যের দাদা সুরেন বাড়ুয্যে!

তরুণকান্তি : বিলক্ষণ বিলক্ষণ।

জয়গোপাল : নবিপিসীমার ভাসুর!—আমি তাঁরই পিসতুতো বোনের ননদাই। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। ছোটবেলায় তুমি আমাদের বাড়ী নবিপিসীমার সঙ্গে কতবার গেছ? রাণী, অর্থাৎ আমার স্ত্রী তোমাকে খুব চেনে।

তরুণকান্তি : মানে মাঝখানে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তো?

জয়গোপাল : তোমার অবিশ্যি সে কথা মনে থাকবার নয়।

তরুণকান্তি : হ্যাঁ, কত ছোটবেলার কথা!

জয়গোপাল : তা এবারে নবিপিসীমার সঙ্গে দেখা হতে তাঁর ঠেঁড়ে তোমার কথা জানতে পারলুম। রাণী তোমার কথা শুনে ভারি খুশী। আর যাবার কথা। তার-ও তো এখন হয়েছে—যেতেও কেউ নেই! তাই এবার যখন কলকাতা আসি তখন সে বিশেষ করে আমাকে তোমার সঙ্গে একবারটি দেখা করে যেতে বলেছে। তাই ..

তরুণকান্তি : খুব ভাল করেছেন।

জয়গোপাল : আর সম্পর্ক জিনিষটা রাখলেই থাকে, না রাখলেই থাকে না। ভাবলুম যাই, রাণী যখন বলছে এত করে।

( গোবিন্দ চা দেয় )

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে আপনাকে চিনতে না পেরে।

জয়গোপাল : আমি জিনিষটা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক

*With Season's Greetings*
From Manufacturers of :
CROWN BRAND
ALUMINIUM WARES &
ANODISED ARTICLES
Brighten your home with our
choicest articles
*IN EYE PLEASING COLOURS*
Visit Our Showroom
For Your Festival Shopping
JEEWANLAL (1929) LIMITED
Crown Aluminium House
23, Brabourne Road, Calcutta-1.

রেখে চলি। প্রত্যেকের বাড়ী অন্ততঃ বছরে একবার করে যাই-ই যাই।

তরুণকান্তি: এ তো খুব ভাল কথা। দেখা সাক্ষাৎ না থাকলে ··, by the by আপনার কুলী ভাড়া কিন্তু আমি মিটিয়ে দিয়েছি। বেটারা বড্ড জ্বালাতন করছিল এখানে এসে।

জয়গোপাল: তাই নাকি? কিন্তু আমার তো রাত্রে রওনা হওয়ার কথা। কুলী না পেলে, মানে ঐ জন্যেই আর কি আমি তখন তাড়া মেটাই নি।

তরুণকান্তি: কিন্তু আপনার তো দেরী হয়ে গেছে। এখন রওনা হয়ে আপনি কেইনগর যাবার গাড়ী ধরতে পারবেন কি?

জয়গোপাল: Risky হয়, না? তা হলে···

তরুণকান্তি: কাল Early morning চলে যান। আর রাত করে এত মালপত্তর নিয়ে·····

জয়গোপাল: কিন্তু এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না?

তরুণকান্তি: কিছু না। এত বড় ঘর। কি অসুবিধে?

জয়গোপাল: তা হলে সেই ভাল। আর সারাদিন ঘোরাঘুরির পর।

তরুণকান্তি: আপনি বিশ্রাম করুন। আসুন। Relax করুন।

জয়গোপাল: একবার শুলে আর উঠতে পারবো না।

তরুণকান্তি: বেশ তো, আপনি বরং খেয়ে নেয়েই শুয়ে পড়ুন। (ডাকে) গোবিন্দ! ঠাকুরকে জামাই-বাবুকে ভাত দিতে বল। দেরী না করে। হাত মুখ ধোবেন তো?

জয়গোপাল: হাঁা, একটু।

তরুণকান্তি: গোবিন্দ, বাবুকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।

(গোবিন্দর সঙ্গে জয়গোপালের প্রস্থান)

[নিরুপায় তরুণকান্তি হাত না ছেড়ে দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। পরক্ষণেই উঠে বিছানা তৈরী করতে লেগে যায় খাটে। নিজের জন্যে একটি সতরঞ্চি পেতে নেয় মেঝেতে। গোবিন্দ তাকে সাহায্য করে।]

তরুণকান্তি: (কাজ করতে করতে) গোবিন্দ, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।···রোজ সেই রোজ সেই—এমনি করলেই হয়েছে আর কি?···নতুন চাকরী,···নে চাকরটা ধর।·····কাল থেকে যে-ই আসুক, স্রেফ বলে দিবি বাবু কলকাতার বাইরে টুরে চলে গেছে। আর ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখবি। কি বলার?

গোবিন্দ: তালা মেরে দিব।

তরুণকান্তি: তালা মেরে চাবি ম্যানেজারবাবুকে জিম্মা করে দিবি।···কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। বুঝতে পারলি?

গোবিন্দ: কাউকে আমি ঘরে ঢুকতে দিব নাই।

তরুণকান্তি: খেয়াল থাকে যেন।···সরাই যেন ধর্মশালা পেয়েছে! বলা নেই কওয়া নেই, এসে উঠলেই হলো! একটা সাধারণ Sense বলে কারো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! এর চাইতে সংসার পেতে বসলেই পারতাম! এত ঝামেলা হতো না। এ যেন নিজের ঘরে নিজে চোর হয়ে থাকার অবস্থা। কোন মানে হয়?···

(গোবিন্দ শোনেই, কিন্তু কোন কিছুই সে নিরাকরণ করতে পারে না)

স্বার্থপর দুনিয়া···খালি স্বার্থের সম্পর্ক···বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, তার জামাইবাবু···(জয়গোপালকে দেখেই) জামাইবাবু খাটে শোবেন (গোবিন্দকে) বুঝতে পারলি? (জয়গোপালকে) আপনি জামাই-বাবু খাটে শোবেন।

জয়গোপাল : তা এইবার তুমি খাওয়া দাওয়া কর। তারপরই তো আবার light off করতে হবে।

তরুণকান্তি : তা করুন না। আমি সব off করে দিচ্ছি।

জয়গোপাল : শুধু fan-টা full force-এ চালিয়ে দাও।

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই। ( ঘুরিয়ে দেয় )

জয়গোপাল : কালী করাল বদনী।

[ তানা সঙ্গীত করেন এক কলি। উত্তেজনায় তরুণকান্তি চেয়ারটা উল্টে ফেলে দেয় ]

জয়গোপাল : ( অন্ধকারে ) কি হলো ?

তরুণকান্তি : চেয়ারটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে অন্ধকারে। আপনি ঘুমোন।

[ নিশ্চিন্তে কলির বাকি অংশটা শেষ করে চুপ করে যান জয়গোপাল। ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্ধকারে হাতড়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ে তরুণকান্তি।

কাছে পিঠে কোথাও বিয়ে হচ্ছে। শঙ্খধ্বনি ও জোকার পুকার সমেত শিলু বারোয়াঁ-র শানাই বাজছে। ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক

[ তরুণকান্তির ঘর। সুসজ্জিত একটি ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ঝাড় রাতকে দিন করেছে। জানালায় ঘরজার নতুন পর্দা। মুকুন্দমুরারি আর অবিনাশবাবু ঘোপতাস্ত জামাকাপড় পরে খাটের ছত্রীতে ঠেস দিয়েছেন। পঞ্চাননবাবু ও অন্য দুচার বোর্ডার চেয়ার টেবিলে সোজা হয়ে বসে মমপিশ করছেন আর কোকা-কোলা খাচ্ছেন নলে টেনে।

সব চাইতে আনন্দ আজ গোবিন্দর। সে স্যাস সিল্কের জামা পরে ঘর বার করছে ছুটে ছুটে। ]

পঞ্চানন : মুকুন্দমুরারি বাবু কিন্তু এই কাজটি করে খুব বড় একটা স্টার্ট দিলেন। মেস বোর্ডিং-এ পরিবার পত্তন—এ বড় সচরাচর একটা দেখা যায় না।

মুকুন্দমুরারি : (ঘুলের ডাঁটা হাতে) শুধু স্টার্টই দেখলেন, ফলের কোন প্রমাণ পেলেন না ?

পঞ্চানন : না না ফল তো বরাবরই আপনার সহায়। কি বলেন অবিনাশবাবু ?

অবিনাশ : মুকুন্দ তার মুরারি। এখন বাঁশীটি হাতে দিয়ে বসিয়ে দিলেই যোল কলা পূর্ণ হয়।

মুকুন্দমুরারি : যমুনা উজান করালুম তো ! সেটি বলুন।

পঞ্চানন : একশোবার ছেড়ে হাজার বার। এই বার যেমন অবিনাশবাবুর যদি একটা গতি করতে পারেন।

মুকুন্দমুরারি : ঐটিই পারবো না। উনি যে নিজের সিঁথেতেই নিজে সিঁদুর টেনে আগোছে রক্ষা করে নিয়েছেন।

পঞ্চানন : কঠিন তপস্যা।

মুকুন্দমুরারি : সেই জন্যে সাইনসও সারছে না। এত নাচ, এত গান অথচ বংশীর কোন নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

অবিনাশ : ( মুকুন্দকে ) হ্যাঁ, ওটি আপনারই আর একটি অবদান।

মুকুন্দমুরারি : কেমন গাইয়ে বলছেন ?

অবিনাশ : পাগল! আপনি মুহুরুরারি আপনার ওপর এ অভিযোগ শত্রুরও করবে না।

[ হঠাৎ নেপথ্যে শাঁখ বেজে ওঠে। গোবিন্দ শাঁখ হাতে পাখীর মত ছুটোছুটি করে। পঞ্চাননবাবু প্রমুখ সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠেন। চেয়ার ছেড়ে দরে ছুটে যান অবিনাশ। মুহুরুরারি পেছনে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে অগ্রবর্তী হন।

পাশ কাটিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তরুণকান্তি। হাতে একটি নতুন চামড়ার সুটকেশ। সঙ্গে ছলনাময়ী বোড়শী স্ত্রী। সঙ্গে অনূঢ়া একটি তালিকা ক্রত পরা।

তারপরই ঢোকে সারি সারি চাকা চাপা দেওয়া সন্দেশের থালা, দই-আর মিষ্টির ভাঁড়। ]

পঞ্চানন : আমাদের কর্তব্যটি এইখানেই শেষ করি।

[ কনের হাতে সিল্কের শাড়ী তুলে দেন কাদম্বের বাক্সে মোড়া। অন্য দুচারজন বোর্ডারও কনের হাতে সৌহার্দ্যের নজির রাখে। হাত তুলে তুলে নমস্কার করে বৌ। মুহুরুরারি যেন একখানি গয়না-লাল বাক্সে—রঙীন ফিতে বাঁধা ]

তরুণকান্তি : ম্যানেজারবাবু, আপনি kindly মিষ্টিগুলো সব ঘরে ঘরে distribute করে দিন। কি, চাকর, ঠাকুর—কেউ যেন বাদ না পড়ে। ( স্ত্রীকে ) পরে আলাপ করোখন। হোটেলের তো বটেই, তোমার আমারও একমাত্র ম্যানেজার। মানে উনি যদি বর না দিতেন আমি তোমাকে এখানে আনতেই পারতুম না বিয়ে করে। ( তালিকাকে ) রোলনচাপার বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে না তো?··· আমাদের গোবিন্দ, ( স্ত্রীকে ) তোমাকে বলেছি। ( গোবিন্দ টিপ্ করে একটি প্রণাম করে বসে )

[ হাতে হাতে কাজ এগিয়ে যায়। মুহুরুরারির নির্দেশে মিষ্টির ভাঁড় আর সন্দেশের থালা বেরিয়ে যায় সব ঘর থেকে। কৌতুহলী বোর্ডারদের ভিড় দূরে যায়। রাত হয়। এখন নিশুতি। ঘরে নীলচে আলো জ্বলে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর বাসরঘরে যাবার রচনা করে ভাব ভাব করে তাকিয়ে থাকে রোলনচাপা। ]

তরুণকান্তি : রোলনচাঁপার ঘুম আসছে না বুঝি?

রোলনচাঁপা : জামাইবাবু, কলকাতার একলা থেও না, জানলা দিয়ে বউ পালাবে দেখতে পাবে না ( ছড়া কেটে খুকুর মত খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ে )

কনকচাঁপা : ( বোনকে ) আ, কি হচ্ছে কি রোলন এত রাতে! ঘুমিয়ে পড়।

রোলনচাঁপা : আমি গল্প শুনবো জামাইবাবুর কাছে।

তরুণকান্তি : কি গল্প শুনতে চাও বলো।

রোলনচাঁপা : ভূতের গল্প।

তরুণকান্তি : আচ্ছা বলছি।

রোলনচাঁপা : তুমি দিদির দিকে মুখ করে বলবে না।

তরুণকান্তি : আচ্ছা তোমার দিকে মুখ করে বলবো।···

( গল্প বলে ) আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। এই আর কি একটু নীচু ক্লাসের দিকে। ক্লাস ফোর কি ফাইভ হবে।···

কনকচাঁপা : কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর আমি মাটিতে গিয়ে শুচ্ছি।···

তরুণকান্তি : সে কি, মাটিতে! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে।···( রোলনচাঁপাকে ) দেখলে তো ভূতের গল্প বলবার আগেই তোমার দিদি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!

রোলনচাঁপা : দিদিটা ভীষণ ভীতু।

তরুণকান্তি : এখন কি হবে।

মোদনচাঁপা : দিদি শুনছে, তুমি আমার কাছে গল্প বলো।

তরুণকান্তি : তোমার দিদি ভয় পাবে, সেটা কি ঠিক হবে? ( উদ্দেশে ) ঠিক আছে আমরা ভূতের গল্প বলছি না,—কনক তুমি খাটে উঠে এসো।

কনকচাঁপা : আমি বেশ আছি মাটিতে।

তরুণকান্তি : বেশ আছি আবার সকালবেলা দেখবে গা গতোরে ব্যথা হয়ে ডেঙ্গুতে ধরেছে। কলকাতায় এখন ভীষণ ডেঙ্গু চলেছে।

কনকচাঁপা : হোক ডেঙ্গু।

তরুণকান্তি : ( উঠে বসে ) এই, কি হচ্ছে কি?

কনকচাঁপা : ঠিক আছি।

তরুণকান্তি : তবে আমিও এসে মাটিতে শুচ্ছি।

কনকচাঁপা : তোমার খুশী।

তরুণকান্তি : বেশ।

( নীচে শোয় বালিশ ফেলে )

[ সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর উঠে দাঁড়ায় মোদনচাঁপা ]

মোদনচাঁপা : আমিও মাটিতে শোব।

কনকচাঁপা : না।

মোদনচাঁপা : হুঁ।

কনকচাঁপা : না।

মোদনচাঁপা : আমি কিছুতেই বিছানায় শোবনা।

কনকচাঁপা : তুমি এইবার আমার কাছে পিটুনি খাবে।

মোদনচাঁপা : বারে, তোমরা মাটিতে শুয়েছো আর আমি বুঝি মাটিতে শুতে পারি না জামাইবাবুর কাছে।

কনকচাঁপা : জামাইবাবুকে ওপরে গিয়ে শুতে বল না?

তরুণকান্তি : মোদন তুমি ভীষণ গণ্ডগোল করছো। নীচে শুলে তোমার অসুখ করবে।

মোদনচাঁপা : আর তোমাদের বুঝি অসুখ করবে না।

তরুণকান্তি : আমরা বড়। বড়দের মাটিতে শুলে অসুখ করে না।

মোদনচাঁপা : একটু আগে যে বল্লেন দিদির ডেঙ্গু হবে মাটিতে শুলে।

কনকচাঁপা : কার সঙ্গে কথা বলছে? কথার তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবে। ঐ জন্যেই আমি ওকে সঙ্গে আনতে চাইনি।

তরুণকান্তি : যাগগে থাক, একবার যখন এসে গেছেই তখন··· এসো মাটিতেই এসো।

( মোদনচাঁপা লাফিয়ে মাঝখানে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে )

তরুণকান্তি : শাবি তো!

মোদনচাঁপা : এইবার গল্প বলো?

তরুণকান্তি : আবার গল্প কিসের?

মোদনচাঁপা : ভূতের বলতে বলছি না তো! রাজারাণীর গল্প বলো।

তরুণকান্তি : This is too much মোদনচাঁপা। রাজারাণীর গল্প শোনবার তোমার বয়েস নেই।

কনকচাঁপা : ও ভাবছো সরল মনে এই সব কথা বলছে? ইচ্ছে করে with some purpose আমাদের জ্বালাতন করছে। ওকে আমি জানি না!

( মোদনচাঁপা এই অভিযোগের উত্তরে দিদিকে জড়িয়ে ধরে ওঠে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে )

তরুণকান্তি : ছি মোদনচাঁপা; ও রকম করতে নেই। ঘুমিয়ে পড়।

মোদনচাঁপা : আমার ঘুম আসছে না।

তরুণকান্তি : ঘুমিয়ে পড় কাল আবার আমাদের নেমন্তন্ন আছে, সিনেমা আছে।

( কনকচাঁপার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে উঠে বসে )

কনকচাঁপা : বাবাঃ, এখানেও সেই ঝামেলা। নাঃ, শুতে দেবে না। ( বসে থাকে )

[ সঙ্গে সঙ্গে মোদনচাঁপাও উঠে বসে। তরুণকান্তিও অগত্যা একটি সিগারেট ধরায়, উঠে বসে।

বসে বসেই রাত কাটে। সকালবেলা। তরুণকান্তি ষোলনচাঁপাকে কোলপাঁজা করে খাটে শুইয়ে দেয় ]

তরুণকান্তি : ( কনকচাঁপাকে ) আমি তোমায় এক্ষুণি বন্ধুর মাটিতে শুয়ে কাজ নেই। ( কপালে হাত দেয় ষোলনের ) ঘুঁ, রীতিমত temperature run করছে।

কনকচাঁপা : সেই ডেঙ্গু তো ?

তরুণকান্তি : জ্বর হলেই যে ডেঙ্গু হবে এমন কোন কথা নেই। তবে কলকাতায় এখন epidemic চলেছে ডেঙ্গুর। বিশ্রী একটা type of flue···এই তো সেদিনই তো শুনছিলাম—সাত বছরের ভাগড়া ছেলে, কথা নেই বার্ত্তা নেই ইস্কুল থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। বাড়ীর লোকেও হয়তো অতটা লক্ষ্য করেন নি প্রথমটা কাজেকর্মে। রাত্রে হয় সেই temperature সাত।

কনকচাঁপা : সাত মানে ?

তরুণকান্তি : Hundred and seven. প্রকৃতিই তো ডেঙ্গুর এই।

কনকচাঁপা : কি কাণ্ড, তারপর ?

তরুণকান্তি : তারপর আর কি ? ডাক ডাক্তার, আনো বস্তি, সার্জন, নার্ভ puncture করা হলো, বরফ ঘরে রাখা হলো কিন্তু কণী বাঁচানো গেল না। Just within forty eight hours collapse.

কনকচাঁপা : এখন কি হবে ?

তরুণকান্তি : এটা যে ডেঙ্গু সে কথা তোমায় কে বল্লে ? আমি বল্লাম তোমায় একটা ঘটনার কথা।

কনকচাঁপা : Temperature-টা দেখবে ?

তরুণকান্তি : থাক। আর কিছু হলে ডাক্তার তো পাশেই আছে। ভয় পাবার কি আছে ?

(কনকচাঁপা থার্মোমিটার লাগায়)

···নেমন্তন্ন, সিনেমা—সব মাথায় উঠে গেল।

কনকচাঁপা : ওকে না নিয়ে এলেই ভাল হতো।

তরুণকান্তি : এখন বলছো। এইরকমটি যে ঘটবে সেটি কে জানতো ? থাক।

কনকচাঁপা : ( বিস্ফারিত দৃষ্টি ) হাণ্ড্রেড এণ্ড···

তরুণকান্তি : ( ছিনিয়ে নেয় ) কত ?

কনকচাঁপা : পাঁচ ছয় বলে মনে হলো।

তরুণকান্তি : কোথায় ? পাসলের মত যা তা বকছো,—দুই।

কনকচাঁপা : সেটাও কিছু কম নয়।

তরুণকান্তি : না Temperature নেই। একদম উঠতে দেবে না।

কনকচাঁপা : ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকলে হতো না ?

তরুণকান্তি : সব ব্যবস্থা হচ্ছে। ভেবো না।

কনকচাঁপা : ওগো, জ্বর যদি আরও বাড়ে।

তরুণকান্তি : Ordinary flue বলেই তো মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগেছে।

কনকচাঁপা : আর যদি ডেঙ্গু হয় !

তরুণকান্তি : ডেঙ্গু হলে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ষোলনচাঁপা সে কথা কিছু বলছে ?

কনকচাঁপা : বলবে কি। একেবারেই যে বেহুঁস, অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।···ষোলন !

তরুণকান্তি : ডেকো না।

কনকচাঁপা : আর একবার Temperature নেব ?

তরুণকান্তি : এই তো দেখলে।

( চা সহ গোবিন্দর প্রবেশ। দুজনে চা নেয় )

তরুণকান্তি : গোবিন্দ তোমাকে এক্ষুণি একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বলবি—

কনকচাঁপা : তুমি নিজে গেলে হতো না ?

তরুণকান্তি : আচ্ছা আমি নিজেই যাচ্ছি। তোকে যেতে হবে না গোবিন্দ। তুই বৌদির কাছে কাছে থাক। ষোলনের জ্বর হয়েছে।

( গোবিন্দ সমবেদনায় চুক চুক শব্দ করে )

কনকচাঁপা : গোবিন্দ তুমি বরং জলটা ঘরে নাও কুঁজোয়, কেমন ?

তরুণকান্তি : জল ভর, পড়ি, যা—এইসব কর দেখে দেখে। আমি আসছি। ( প্রস্থান )

গোবিন্দ কাজ করে। কনকচাঁপা আবার থার্মোমিটার লাগায়। উত্তেজনার কয়েকটি মুহূর্ত। একটু পরেই থার্মোমিটার দেখতে থাকে। বিশ্বাস হয় না। বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে ছুটে যায়। অবাক হয়। সুইচ জেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। নির্ভুল রেখা—একশ চার। রোগীর কাছে ছুটে যায়।)

কনকচাঁপা : দোলন? দোলনা? বলু?

(কোন সাড়া নেই? অস্থিরভাবে রোগের মাথার ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে)

(স্বগত:) বলুন, এসে কাজ নেই। এখন এই বিদেশ বিভূঁইএ আমি কি করবো! দোলন? দোলনা? বলু?…

…(গোবিন্দ জলের কুঁজো রাখে) গোবিন্দ, ম্যানেজারবাবু আছেন?

গোবিন্দ : পরে আসবেন।

কনকচাঁপা : কখন আসবেন?

গোবিন্দ : আমি দেখছি।

কনকচাঁপা : কি বিপদেই

(মাথার কাছে গিয়ে বসে)

…দোলন, দোলনচাঁপা?

(ডাক্তার সহ তরুণকান্তির প্রবেশ)

ডাক্তার : (তরুণকে) জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এ কেউই বলতে পারে না। আর বিয়ে না করেই যে নিষ্কৃতি পাবেন এমন কথাও আপনি হলপ করে বলতে পারবেন না। ও আমরা হাজার কেন বলি না, নিয়তির ওপর কোন কথা নেই। কর্মগুণ একটা অবিশ্যি আছে, তবে সেটা কিছু বড় কথা নয়—বুঝলেন কি না?…জ্বর দেখেছেন?

তরুণকান্তি : জ্বর নেই।

কনকচাঁপা : না বেড়েছে, চার।

তরুণকান্তি : কি করে? আবার দেখলে নাকি?

কনকচাঁপা : তুমি চলে যেতে।

ডাক্তার : বেশ তো লাগান না আর একবার। দেখি…(নিজের থার্মোমিটার লাগান) Temperature-টা অবিশ্যি বড় কথা নয় ওটা একটা Expression মাত্র—that gives a clue to the actual disease. অবিশ্যি সব সময় তাও আবার সত্যি না। That might be the resultant effect of some secondary infection. সত্যি কথা বলতে কি আমরা ডাক্তার বদ্যিরা—কি করি জানেন, chance নেই। লাগে তুক্ না লাগে তাক্। মুখে অবিশ্যি সবাই আমরা বড় বড় কথা বলি। আসলে আমরা ঠিক করে কিছু বলতে পারি নে।

কনকচাঁপা : হয় নি?

ডাক্তার : আমি ঘড়ি দেখছি।…তা সে যে কথা বলছিলাম—ডাক্তারী করি আমরা অথচ দেখুন সেটা জিনিষটাই একটা wrong hypothesis-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বাঁধা কতকগুলো বলদের মত আমরা শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছি—Just groping in the fathomless darkness. অথচ এর superstructure দেখলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।…Science, কি করতে পেরেছে science? বলুন না?

কনকচাঁপা : এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

ডাক্তার : টাটুন। Hundred four point six. প্রায় পাঁচ-এর কাছাকাছি। বরফ দিচ্ছেন মাথায়?

তরুণকান্তি : বলেন নিশ্চয়ই দেব।

ডাক্তার : একটু বরফ দিন। আর ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে নিংড়ে গাটা বেশ ভাল করে মুছিয়ে দিন।

কনকচাঁপা : ডেঙ্গু বলে মনে করেন কি?

ডাক্তার : (হেসে) দেখা যাক না? অবিশ্যি একটা virus infection হচ্ছে আজকাল, ডেঙ্গু বলেই চলছে বাজারে তবে আরও বিভিন্ন ধরণ আছে। ডেঙ্গু মানেই সাংঘাতিক একটা কিছু নয়।

( চোখেমুখে পাগান ) না:, কোন congestion নেই। মাথাটা বেশ করে দুইয়ে দিন আগে। তার পর আইসব্যাগে করে···ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই temperature করে যাবে ····বধি কাশক দিন ····

[ তরুণকান্তি নোটবই বের। ডাক্তার Prescription লেখেন ]

···কিছু worry করবেন না।

তরুণকান্তি : আমি খবর দেবখন।

ডাক্তার : ট্যাবলেটটা দুটো করে তিনবার। আর mixture-টা every three hours বিকেল নাগাদ একটা খবর দেবেন—কেমন থাকে না থাকে। আচ্ছা!

( ডাক্তারের প্রস্থান )

[ ডাক্তার চলে গেলে বালতি বালতি জল ঢালা হয় মাথায়। কনকচাঁপা কাঁপতে কাঁপতে ধাতস্থ করে মোলনচাঁপার মাথায় ]

তরুণকান্তি : গোবিন্দ, তুই পাড়ের দোকান থেকে দশ সের বরফ ( টাকা নে ) আর ডাক্তারবাবুর দোকান থেকে একটা আইসব্যাগ—চট করে নিয়ে আয়।

[ গোবিন্দর প্রস্থান ]

·· গা-টা মুছিয়ে দিতে বললো ডাক্তার, কিন্তু এত জ্বরের ওপর ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। তুমি কি বলো?

কনকচাঁপা : দরকার নেই স্নান করে।

তরুণকান্তি : হ্যাঁ যদি আবার টাণ্ডা টাণ্ডা লাগে! ডাক্তাররা অমন অনেক কথা বলে।

কনকচাঁপা : আচ্ছা মা বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করলে হয় না?

তরুণকান্তি : আমিও ভাবছিলাম কথাটা।

কনকচাঁপা : আমি বলি করে দাও। যদি এমন তেমন হয়!

তরুণকান্তি : না না, অতখানি ভাবছো কেন? এমন তেমন হলে তাঁরা এসেই কি ঠেকাতে পারবেন? ···করে দিচ্ছি টেলিগ্রাম।

কনকচাঁপা : আর শোন, মোলনচাঁপার কথা টেলিগ্রামে কিছু বলবে না। জানলে, অথবা খারাপ একটা রওনা হয়ে এসো। এখন যা বুঝুন তাতে।

তরুণকান্তি : ঠিক আছে। তাই টেলি করে দেই। ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না। After all তাঁদের মেয়ে!

কনকচাঁপা : ওগো, কি হবে বল তো?

তরুণকান্তি : ভাবছো কেন! সব ঠিক হয়ে যাবে। টেলিগ্রামটা করে দিয়ে আসি।··from frying pan to fire—ব্যাস্!

( তরুণকান্তির প্রস্থান )

[ গোবিন্দ বরফ ও আইসব্যাগ আনে। বরফ ভেঙে মাথায় দেয়া হয় মোলনচাঁপার। বিকেল নাগাদ তাপ কমে যায় মোলনচাঁপার ]

"শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা'রে হৃদয় আনন্দ গান গা'রে।"

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

এই আনন্দ মুখর দিনে—
নানা রংয়ের, রূপের ও
বৈচিত্রের
শাড়ী
নানা রুচির ও বর্ণের
রু-সিল্ক
অফুরন্ত রকমের ছেলেমেয়েদের
তৈরী পোষাক পরিচ্ছদ
এখানেই পাবেন
বেঙ্গল ষ্টোর্স লিঃ
৮এ, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-২২৫৩

তরুণকান্তি : আমি বলছি, তুমি ওঠ।

কনকচাঁপা : গা হাত পা একেবারে টন্ টন্ করছে।

তরুণকান্তি : এক মাগাড়ি বসে আছো তো!

কনকচাঁপা : আমি ভাবছি তোমার কথা। এতটুকু ঘর হচ্ছে না তোমার।

( তরুণকান্তির মুখে মাথার হাত দেয় )

মোহনচাঁপা : দিঁ দিঁ।

[ চোখ বুজে পড়ে থাকে রুগী। সামনে গিয়ে পা-টিপে উঠে যায় কনকচাঁপা। তরুণকান্তি বসে রুগীর কাছে। সন্ধ্যাসন্তি ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন ]

ডাক্তার : জ্বর তো বিশ্যি কমে গেছে দেখছি। আর কোন ভয় নেই। ( নল লাগান )…ঠিক আছে। ঐ ওষুধই চলবে।

কনকচাঁপা : একদম সাড়া নেই।

ডাক্তার : ঘুমুচ্ছে তো? তা এত বড় একটা অসুখের পর একটু অবসন্নতা আসবেই। আর তা ছাড়া mixture-এ Bromide পড়েছে। ঘুমুক, ঘুম তো ভাল। আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

তরুণকান্তি : আপনি খুব save করেছেন।

ডাক্তার : ও বিনি রক্ষে করবার তিনিই করছেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা!

( Visit নিয়ে প্রস্থান )

কনকচাঁপা : (ঘনিষ্ঠ হয়ে) এখন দেখছি টেলিগ্রাম না করলেই-ভাল হতো।

তরুণকান্তি : কি করে বুঝবো বল? সেবটার তুমিই বলতে…

কনকচাঁপা : না গো না, আমি তোমার তেমন বউ নই!

( দুজন দু জনের দিকে চেয়ে থাকে )

তরুণকান্তি : ( আবেশে ) কনক!

কনকচাঁপা : ( আশ্লেষে ) ব-লো!

মোহনচাঁপা : দিঁ দিঁ।

( ছিটকে সরে যায় দুজন দুদিকে )

[ রাত হয়। ওষুধ ও পথ্য দেবার পর মশারী খাটিয়ে দেওয়া হয় রোগীর। নীচে গোবিন্দ বিছানা পেতে। বাসি সন্দেশ আর মিষ্টি এ ওর মুখে পুরে দেয় প্রাণের খুশীতে। আজ মধুরাত।

লাল সিল্কের চেলী মুড়ে কনকচাঁপা শুয়ে আছে ঘুমের ভান করে। সিগারেটটা শেষ করে পাশেই শুয়ে পড়ে তরুণকান্তি। ]

তরুণকান্তি : ঘুমোলে?

[ কনকচাঁপা পাশ ফিরে শোয়। তরুণকান্তি তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় ]

কনকচাঁপা : আমায় তোমার ভাল লেগেছে?

তরুণকান্তি : প্রমাণ চাও?

কনকচাঁপা : হুঁ—উ—উ।

[ হঠাৎ দরজায় করাঘাত। ঘুম ঘাম শব্দ। তারি তারি কি সব জিনিষ যেন পড়ছে মাটিতে। সঙ্গে হাঁক ডাক।

লাফিয়ে ওঠে তরুণকান্তি। জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দেয় কনকচাঁপা।

দরজা খুলে দিতেই মোটঘাটরা, বিছানা, বাক্স ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢোকে শ্বশুরবাড়ী,—তরুণকান্তির শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, শালী—সংখ্যাক্রমিক পাঁচ ছটি।]

ক্ষেত্রমোহন : ( শ্বশুর ) এখন কেমন?

তরুণকান্তি : Crisis কেটে গেছে।

[ শাশুড়ী কোলেরটিকে কনকচাঁপার কাছে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে যান মোহনচাঁপার শিয়রে। আর কাটা মশারী তুলে অন্য দিক থেকে খাটে গিয়ে ওঠে ]

ক্ষেত্রমোহন : আমি ভাবলাম সন্ধ্যাকালই রওনা হয়ে গেল আর এর মধ্যেই; জৈব জৈব।

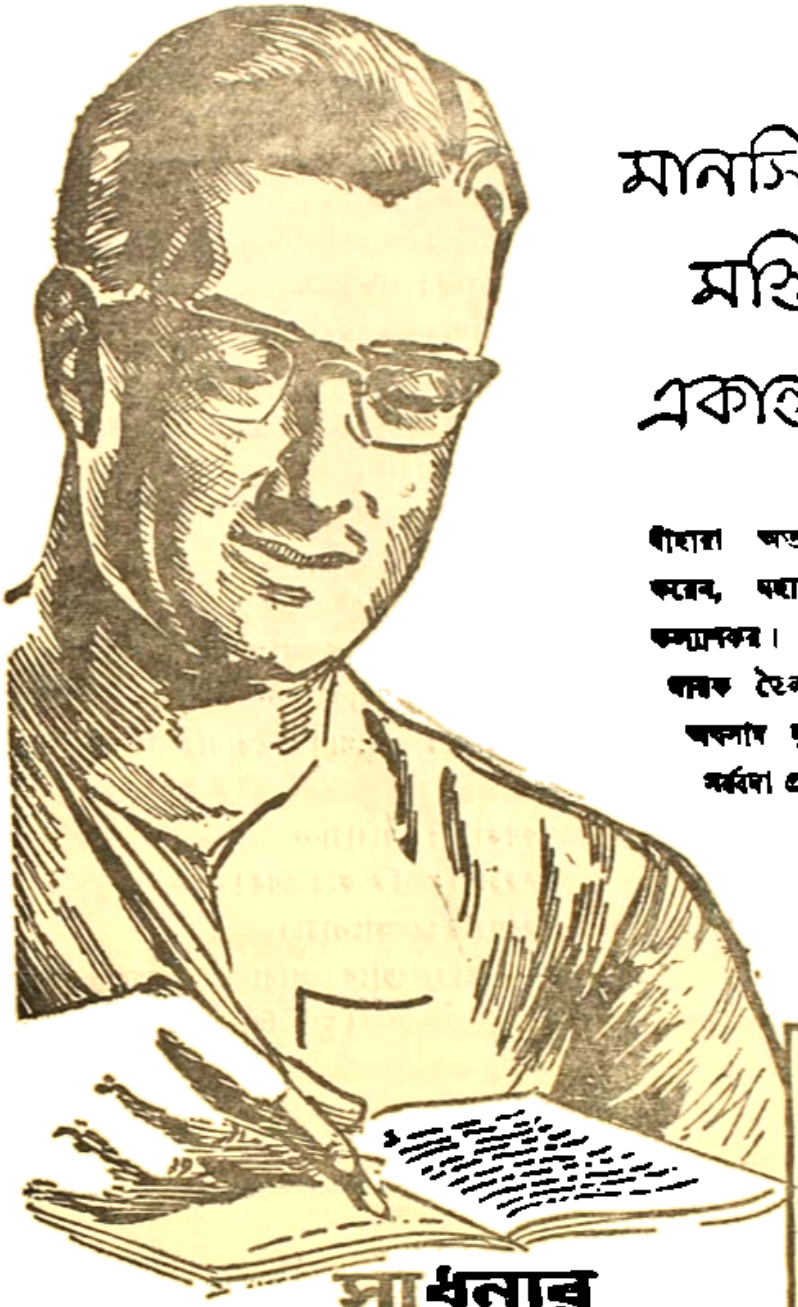

# মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

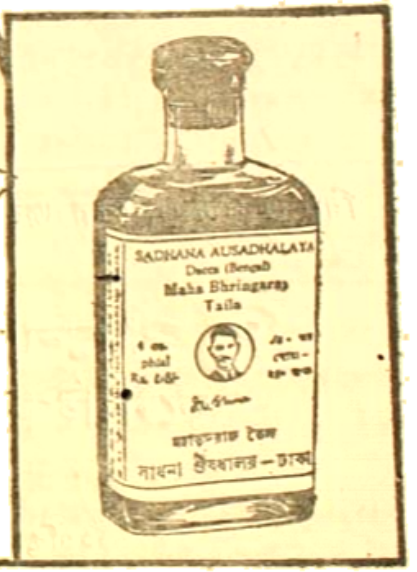


## সাধনার মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয়ের রোড কলিকাতা-৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এল, পি, পি, এস, ( কলি ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এফ, সি, এস. (লণ্ডন) এল, সি, এস (আমেরিকা)
ঢাকা কলেজের প্রাচ্য শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

( বাসংশয্যা টান মেরে শুটিয়ে ওয়ার্ড রোবের ওপর ফেলে দেয় তরুণকান্তি )

কনকচাঁপা : আমার এমন ভয় করেছিল! ডেঙ্গু হলে নাকি চব্বিশঘণ্টাও কাটে না। তাই

ক্ষেত্রমোহন : কি জানি? আজকালই শুনছি। ছোটবেলায় আমাদের কত ডেঙ্গু হয়েছে। এখনও তো টিঁকে আছি। নাকি বাবাজী?

তরুণকান্তি : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তবে সব ডেঙ্গুই ডেঙ্গু না। ( স্ত্রীকে ) ডাক্তারবাবু যেমন শুনলে না?

[ তরুণকান্তি ও কনকচাঁপা বাদে সবাই মশারীর ভেতর খাটে গিয়ে ওঠে।

তরুণকান্তি ভেঙে পড়ে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে। ]

কনকচাঁপা : কি হলো? শরীর খারাপ লাগছে?

তরুণকান্তি : ( নাড়ী টিপে ) জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে।

কনকচাঁপা : কি বলছো?

তরুণকান্তি : নির্ঘাত ডেঙ্গু।

কনকচাঁপা : হ্যাঁ!!

তরুণকান্তি : হুঁ!

কনকচাঁপা : যাঃ!

তরুণকান্তি : কি?

কনকচাঁপা : এ ডেঙ্গু সে ডেঙ্গু নয়।

তরুণকান্তি : মানে?

কনকচাঁপা : দেখো আমি বলছি তোমায়।

তরুণকান্তি : তবে আবার কি? এর চাইতে আর কি হবে বলতে চাও? জানি—মরবো না, তবে সারবেও না।—এই, এই হচ্ছে সেই সাংঘাতিক ডেঙ্গু ডাক্তাররা যেটাকে ঠিক আজও ধরতে পারছে না অসুখ-বিসুখ কিছু নেই, অথচ···

কনকচাঁপা : ওগো। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

তরুণকান্তি : মাথাটা···

কনকচাঁপা : কি করি এখন।

তরুণকান্তি : আলোটা।

কনকচাঁপা : চোখে লাগছে? অন্ধকার করে দেবো। ( ছুটে গিয়ে সুইচটা টিপে দেয় )

—যবনিকা—

নিখুঁত সুন্দর ব্লকের জন্য

সি গ নে ট

ফটোটাইপ

ডিজাইন
হাফটোন
লাইন ব্লক
কালার ছাপার জন্য
ট্রিপ্রিণ্ট
ম্যাট

১২৩বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

ফোন : ৫৫-২৬৭৯

# হারানো আয়না

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি এল।

এদে তো এলই, যাওয়ার আর কোনো লক্ষণই কোথাও নেই। কখনো একটু ঝাপ্সা হয়ে আসে, মনে হয় এইবার থামবে, তারপরেই চারদিক ভেঙে আবার তীরের মত ধারায় পড়তে থাকে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক একটা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম। সেখানেও জলের ছাট আসছে, জুতোটা ভিজে একাকার হয়ে গেল। আমার আবার সর্দির ধাত, একটুতেই টাণ্ডা লাগে —প্যাচপেচে জুতোটার অনুভূতি এমন বিশ্রীভাবে সারা শরীরে ছড়াতে লাগল যে মনে হল এখুনি বোধ হয় আমার জ্বর আসবে।

যা থাকে কপালে—লাফিয়ে নেমে পড়লুম। খানিকটা ছুটে দেখতে পেলুম ট্রাম ডিপো। লাল দিয়ে গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে, ইলেকট্রিকের আলো আর অন্ধকার বর্ষণে সাদা সাদা ট্রামগুলোকে যেন এক ঝাঁক তিমির মতো মনে হল

উঠে পড়লুম প্রথম গাড়ীটাতেই। ট্রাম চলবে কিনা জানি না, টালীগঞ্জ ব্রীজের তলায় এর মধ্যেই যে কতটা জল দাঁড়িয়ে গেছে তা-ও অনুমান করা অসম্ভব। তবু বারান্দার চাইতে ট্রাম ভালো। অন্তত বসবার জন্যে নরম গদী আছে, বৃষ্টির ছাট আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, নিশ্চিন্ত ভাবে চলবে না না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসেও থাকা যায়।

ভিজে গিয়েছিলুম– সেটা অপরিহার্য। রুমাল দিয়ে মাথা-টাথা মুছে এক জায়গায় বসে পড়া গেল। দুদিকে জানলা তুলে দেওয়া, কাচের সংকীর্ণ ফালিগুলোর ওপর দিয়ে যেন বন্যা বইছিল।

ড্রাইভারের দেখা নেই, একজন বুড়ো গুজন কণ্ডাক্টার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আমার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখল একবার। বললুম, ট্রাম যাবে?

—যাবে। একটু দেরী হবে। বসুন।

বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে আর একজন অল্প বয়সী কণ্ডাক্টার লাফিয়ে উঠল। দাঁড়ালো বুড়োর পাশে গিয়ে।

—দাদা, কী ভাবছেন?

—দেশের কথা।

বর্ষাতি খুলে রেখে ছেলেটি বুড়োর মুখোমুখি বসে পড়ল।

—ষোলো বছর আগে তো দেশের মায়া কাটিয়েছেন। এখনো ভুলতে পারলেন না?

—সারা জীবনেও কেউ ভুলতে পারে?

—দাদা, ও-সব ভাবনা এখন ছাড়ুন। এখন পশ্চিম বাংলাই আপনার দেশ। এখানকার সবাইকে নিয়েই সুখী হতে চেষ্টা করুন।

—তোর হাওড়া জেলা যদি পাকিস্তানে পড়ত, তা হলে বুঝতে পারতিস—বুড়োর দীর্ঘশ্বাস পড়ল : সেই সুপুরির বন, ধানের ক্ষেত, ইল্‌শা নদী, ইলিশ মাছ—

নদীর নাম শুনে আমি উৎকর্ণ হলুম। বুড়ো তা হলে আমারই জেলার লোক। মনে পড়ল কালাবদরের কালো জল আর ইল্‌শার সৈকত যেন মিশেছে একসঙ্গে—দুদিকে তীরের চিহ্ন দেখা যায় কি দেখা যায় না—অফুরন্ত আকাশ আর দিগ্‌দিগন্ত ছড়ানো নদীর কী আশ্চর্য তটভূমি। বাইরের বৃষ্টির শব্দে ইল্‌শা-কালাবদরের মিলিত কলতান আমার কানে এল।

—ইলিশ মাছের কথা আর বলবেন না দাদা—আমি উলুবেড়ের লোক হয়েও আজ তিনমাসের মধ্যে একটা মাছের আঁশ চোখে দেখিনি।

—উলুবেড়ের আবার ইলিশ!—দাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন।

খোঁচা খেয়ে ছেলেটি একটু উত্তেজিত হল। বললে, পাকিস্তানের জমিদারীর গল্প ছাড়ুন দাদা—শুনে শুনে কান কালাপালা হয়ে গেছে। আমরা তো মেনেই নিয়েছি যে দেশে আপনারা সবাই জমিদার ছিলেন, ক্ষেতভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গোরু ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল—রাজার হালে কাটাতেন। কিন্তু আমাদের এই গরিব দেশে যখন এসেই পড়েছেন, তখন কষ্টে সৃষ্টে এখানেই কাটিয়ে দিন—কী আর করবেন!

—তুই চটে যাচ্ছিস—দাদার হাসিটা মিলিয়ে গেল : না, সবাই আমরা জমিদার ছিলুম না। আমাদের খোড়ো ঘর দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ত, চেয়ে-চিন্তে আমাদের দিন কাটত, আমার বাবা রাজমিস্ত্রীর কাজ করত—দু'বেলা পেটের ভাতও জোটাতে পারত না। কাঠা তিনেক জমি, দুখানা খোড়ো ঘর, একটা ডোবা আর তিনটে নারকেল গাছ ছাড়া আর কিছুই আমাদের খোয়া যায় নি।

—তা হলে এখানে অনেক ভালো আছো বলো।—ছেলেটির গলায় বিজয়ের সুর পাওয়া গেল।

—ভালো তো নিশ্চয়ই। সেই অল্প বয়েসে পেটের জ্বালায় পালিয়ে এসে যখন কলকাতার ট্রামে চাকরি নিলুম, নিজের থাকা খাওয়ার আর বাড়ীতে দু-দশটা টাকা পাঠানোর সংস্থান যখন হল, তখন ভাবতুম, দেশের পাড়াগাঁয়ে আবার মানুষে থাকে! কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, কলকাতায় একটা বাসা করেছি, দেশ থেকে সবাইকে নিয়ে এসেছি—

—সে স্বপ্ন তো ফলেছে দাদা। অবশ্য-যখন জমিতে টিনের চালা তুলেছ, বৃষ্টির জল আর পড়েনা। কষ্ট তো আমাদের আছেই—কিন্তু দু মুঠো পেটের ভাতের জোগাড় একভাবে হয়েই যায়। তা ছাড়া তুমি তো এবার ইন্‌ক্রিমেণ্টার হচ্ছ, মাইনে বাড়বে, পজিসন বাড়বে। তোমার কিসের দুঃখ?

—না, দুঃখ কিছুই নেই—দাদা একবার মাথা নাড়ল : হয়তো এই ভাবেই সুখে আছি। দেশে যখন ছিলুম, দেশকে তখন ভালো লাগত না। গ্রামের সব লোকের সঙ্গে তখন আমিও কলকাতার স্বপ্ন দেখতুম, কলকাতায় এসে চোখ জুড়িয়ে যেত। আজ—আজ কী?

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ অনেক খানি থেমে এসেছে, এবার সত্যি সত্যিই ধরে যাবে বলে মনে হয়। আমি পাশের একটা জানলা খুলে দিলুম। মেঘের একটা কোনায় আকাশ উঁকি দিয়েছে, জ্বলে উঠেছে কয়েকটা তারা।

দাদা বললে, আজ ভাবি, ইল্‌শা নদী আর দেখতে পাব না, আর কোনোদিন রয়ানী গান শুনতে পাবনা, ত্রিনাথের মেলা দেখবনা, সুপুরির বনে আর তেমন করে ঝড় আসবেনা। আসল

কথাটা কী, জানিস? গ্রামের আয়না দিয়ে কলকাতাকে দেখতে গেছুম, জীবনটাকে দেখতুম। সেই আয়নাই গেছে ভেঙে—এখন সব অন্ধকার, নিজেকে আর চিনতে পারছিনা।

আমি চমকে উঠলুম। এ তো কণ্ডাক্টারের মুখের কথা নয়!

দাদা আবার বললে, আমার গ্রাম ছিল, তার মধ্য দিয়ে কলকাতাও ছিল। আজ গ্রাম নেই—কলকাতাও না।

ছেলেটি চুপ করে রইল। বুড়োর কথা সে বুঝতে পারছিল কিনা জানি না, কিন্তু একটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। আমি দেখলুম, তার তরুণ মুখের ওপর কিসের একটা ছায়া নেমে এসেছে।

এমন সময় ট্রাম গুমটি থেকে হাঁক উঠল: তিনশো এগারো—তিনশো এগারো নম্বর—

ড্রাইভার এগিয়ে এসে নিজের জায়গায় উঠে পড়ল।

ছেলেটি বললে, নাও দাদা চলো এবার। ও নিয়ে মন খারাপ করে আর কী হবে!

—না, কিছুই হবে না। শুধু এই বৃষ্টিটাই কেমন আনমনা করে দিয়েছিল।

ঘণ্টি বাজল, ট্রাম চলল। ছেলেটি তার বর্ষাতি নিয়ে নেবে চলে গেল সেকেণ্ড ক্লাসে।

বাইরে বিদ্যুতের আলোয় চারদিকে ঝলমল করছে বৃষ্টির জল। যেন ইস্‌পা নদী হলকে উঠছে কিছুক্ষণের জন্যে। সেই জলে হারিয়ে যাওয়া আয়নাটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ফিরে এসেছে আবার, অন্তত একবারের জন্যে চিনিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

কিন্তু এ জল আজ রাতেই নেমে যাবে। কাল সকালে এর চিহ্নও থাকবেনা।

আর আপাতত কলকাতার ট্রামের এক বুড়ো কণ্ডাক্টার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়িয়ে বলছে: টিকিট?

বিষ হেমলক্ খাওয়ার পরে সক্রেটিস্ ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলেন। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তিনি হাসিমুখে শিষ্যদের বললেন: এইবার পা দুটো ভারি হয়ে আসছে। এর পরে কোমর—তারপরে পেট—তারপরে বুক—তার পরে সব শেষ।

হো—হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি।

অবধারিত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক দেখিয়ে গেলেন মৃত্যুর আনন্দ।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

দেবীর অর্ঘ রচনায় অপরিহার্য্য ভীম নাগের সন্দেশ

# বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

"মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে, এক-একদিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, একদিন খরচ করে; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়; প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব।"

রবীন্দ্রনাথ

# বৃক্ষরোপণ উৎসব

মীনাক্ষী ঘোষ

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান,
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-পাত্রে।"

আদিপ্রাণ বৃক্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ বন্দনা গান করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনবাণী' গ্রন্থের সূচনা করেছেন। 'বনবাণী'র প্রতি পৃষ্ঠার অন্তরালে শোনা যায় বেবধাক বীথির মর্মরধ্বনি, যখনও বা শুনতে পাই উদার বিশাল শালকুঞ্জের অভ্রান্ত আন্দোলনের গান।

আমাদের ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার সঙ্গে প্রকৃতির যোগ চিরকালীন। এই দেশের সৌম্যশান্ত ধ্যান-স্তিমিত ঋষিরা প্রকৃতির উদার উন্মুক্ততায় ধ্যানের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন "গাছগুলি ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি।"···বৃক্ষের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও মমতাবশতঃই সম্ভবতঃ বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল প্রাচীনতম কালে—যার পরিণতিরূপে এসেছে আজকের বনমহোৎসব।

বর্তমান বনমহোৎসবের মধ্যে রবীন্দ্র সৃষ্ট ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে যেন গীতিকবিতার সৌরভ লেগে আছে।

সুন্দর সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট সীমায় বিরাজ করছে পূজা মন্দিরের শুচি শুভ্রতা। বনবালার বেশে সজ্জিতা বালিকারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু বৃক্ষটিকে অভিষিক্ত করে রোপণ করছে—অতিথি বালক তাকে ঘিরে চলেছে মধুর সঙ্গীতের গুঞ্জরণ; এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে—যেখানে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসবের কথা বর্ণিত—

"তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হ'ল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হ'য়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল—শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা-চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হ'ল।···তারপরে বর্ষামঙ্গল গান হ'ল···।"

বৃক্ষরোপণ উৎসব কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহু প্রাচীনকাল থেকে নানাভাবে বৃক্ষবন্দনা ও রোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। তার মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের Vegetation উৎসব উল্লেখযোগ্য। দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ গুচ্ছ মঞ্জরিত লতাকে ঘিরে এই গান ও আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। বনভাণ্ডারের প্রাচুর্যকে বন্দনা করে এই উৎসবের সার্থকতা।

ইংল্যাণ্ডের রোম্যান্টিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধা ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর প্রকৃতি প্রেমিকতার জন্যেই বিশেষরূপে খ্যাত। সে সময়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ না থাকলেও ছোট্ট একটি চারা গাছ ও তার প্রথম ফুল ফোটাকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্যবিকাশের প্রচুর নিদর্শন মেলে। য়ুরোপের বৃক্ষপ্রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে আলেকজাণ্ডার ডুমার 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ' গ্রন্থের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে

টিউলিপ গাছে ফুল ফোটানোর উৎসবকে সেদিন জাতীয় উৎসবের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। এখনও য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে বিশেষ একটি দিনে ফুল-দিবস পালিত হ'য়ে থাকে—প্রত্যেক পথচারী সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি করে পুষ্প ক্রয় করে থাকেন।

ভারতবর্ষে আদিকাল থেকে বৃক্ষবন্দনা ও বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে—বিভিন্ন তার প্রকাশ ভঙ্গী। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নানা বিধ বৃক্ষবরণ, পুষ্প আহরণ উৎসবের কথা উল্লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে 'নবপত্রিকা' উৎসবের কথা স্মরণীয়।

নব শস্যোদ্গমে প্রথম বর্ষায় যে বনভোজন—তা-ই 'নবপত্রিকা' উৎসব এবং সেই উৎসবের প্রধান অংশ পিচ্‌কারী যোগে তরুশ্রেণীতে জল সিঞ্চন।

এই উৎসবকে বর্তমান বনমহোৎসবের আদিতম রূপ বলা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে সম্রাট অশোক ও শেরশাহ পথের মাঝে মাঝে বৃক্ষ রোপণ করতেন—পথচারীদের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া দান ও বৃক্ষ-শিশুর সবুজ বর্ধন—দুই-ই হোতো একসঙ্গে। বর্তমানেও আমাদের দেশের প্রস্তরময় রাজপথের একাংশে মহাসমারোহে বৃক্ষ রোপণ হয়।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ভাষায় 'কোনো অরসিক পথকর্তার চেলা' পাষাণের বুকে বকুলচারা রোপণ করেছে কাননরাণীর শিশুকন্যাকে হরণ ক'রে। কিন্তু এই হরণের অন্তরালে যে সেই শিশু চারাগাছের প্রতি মমতাও আংশিকভাবে জড়িত একথা অবশ্য স্বীকার্য। গাছের প্রতি স্বাভাবিক মমতা আছে বলেই নাগরিক জীবনের উষরতায় সেই শ্যামকান্তির অভিষেক। তা-ই প্রতি বছর সংঘবদ্ধ গাম্ভীর্যে বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান।

এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্যে আছে এক পবিত্র গাম্ভীর্য। যে গাম্ভীর্য তরুশ্রেণীর সঙ্গে অন্বিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ওই গাছগুলো বিশ্ববীণার একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।" প্রথম প্রাণের বেগ নিয়ে এসেছে যে বৃক্ষ তার বরণ উৎসব তাই আনন্দ-উৎসব শুধু নয়—সে প্রাণের মন্ত্রে জীবনের নব অভিষেক।

আজ যে শিশুবৃক্ষ রোপিত হচ্ছে পবিত্র উদার গাম্ভীর্যে, নগরীর কোলাহলময় রুক্ষতায় সে-ই জানাবে প্রাণের নিমন্ত্রণ, পাথরের বুকে আসবে শ্যামলশ্রী। অঙ্কুর থেকে মহীরুহে প্রকাশমান বৃক্ষের মধ্যে যে আদিতম প্রাণস্পন্দন আছে—বৃক্ষরোপণ উৎসব সেই প্রাণের মন্ত্রে সাড়া জাগাবার উৎসব; আনন্দে তার জন্ম আনন্দে তার প্রতিষ্ঠা—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।
যৌবনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে
হে মোহন প্রাণ।"

# বহ্ন্যুৎসব

নীলিমা দে

কালো পটে লাল রং দিয়ে কে যেন ক্ষিপ্র হাতে এঁকে চলেছে ছবি। অন্ধকার রিলা, উঁচু ঢিবি, পাহাড়ের চূড়া, আর মাঠের মাঝখানে জ্বলে উঠেছে আগুন, লেলিহান শিখা মেলে গ্রাস করতে চায় বুঝি আকাশের তারা। দাবানল নয়, আলেয়ার আলোও নয়। য়ুরোপের গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপন করছে। এই দৃশ্য সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে বসন্তকাল আর মধ্য গ্রীষ্মে। তবে শরতের-শেষে আর শীতের মাঝামাঝি সময়েও দেখা যায়। বসন্তকালের বহ্ন্যুৎসব হয় সাধারণত লেন্ট-এর রবিবার, ইষ্টার ইভ এবং মে দিবসে। য়ুরোপের সাধারণ মানুষ, বিশেষ ক'রে কৃষকদের মধ্যে এই উৎসব চ'লে আসছে খ্রীষ্টজন্মেরও আগে থেকে।

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ আগুনকে দেবতা ব'লেই মনে করত। বিশ্ববাসীর কাছে আগুন ছিল সূর্য-দেবতার প্রতিভূ। মিশর, গ্রীস আর রোমের মন্দিরে প্রজ্জ্বলিত থাকত অগ্নি। বৈদিক আর্যদের কাছে আগুন ছিল একাধারে দেবতা এবং গৃহের অতিথি। সুদূরকাল থেকে পৃথিবীর নানা দেশে এমন অনেক উৎসব চ'লে এসেছে যে সব অনুষ্ঠানের প্রধান ভূমিকা অগ্নির।

বহ্ন্যুৎসবের উদ্দেশ্য প্রায় সব অঞ্চলেই এক। প্রচুর পরিমাণে ফুল-ফল, শস্য উৎপন্ন হোক, নিরাপদ হোক মানুষ এবং গৃহপালিত পশু —অগ্নি উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই লৌকিক প্রার্থনা। আবার ঝড়, বৃষ্টি, শিলাপাত, বজ্র, কীট-পতঙ্গ, আধি-ব্যাধি, ডাইনী ইত্যাদি অশুভ শক্তির হাত থেকে মানুষ, পশু আর শস্য যাতে নিরাপদ হতে পারে তার জন্যও অগ্নি-উৎসবের আয়োজন।

**য়ুরোপের বহ্ন্যুৎসব :** আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বহ্ন্যুৎসবগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বৌরা সবাই ঘুরে ঘুরে নাচে আগুনের চারধারে কিংবা লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় আগুন। আগুনের চারদিকে বা মাঝখান দিয়ে টানা হয় সবাদি পশু। কৃষকরা জ্বলন্ত মশাল হাতে প্রদক্ষিণ করে আসে ক্ষেত, খামার, গোশালা আর বাগান। তারা শূন্যে নিক্ষেপ করে কিংবা পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয় জ্বলন্ত চাকা। খড়ের মানুষ কিংবা "ডাইনী" পোড়ানোও হয় অনেক এলাকায়।

বেলজিয়মের কৃষক-শিশুরা বহ্ন্যুৎসবের প্রায় পক্ষকাল আগে থেকেই খামার থেকে খামারে ঘুরে সংগ্রহ করে জ্বালানি কাঠ। কেউ যদি উৎসবের কাঠ দিতে অস্বীকার করে তবে উৎসবের পর দিন শিশুদের সামনে পড়লে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। শিশুরা দল বেঁধে তাকে তাড়া করে, উৎসবের আগুনের ছাই দিয়ে কালো করে দেয় তার মুখ। উৎসবের দিনে শিশুরা সব ঝোপ-ঝাড়, বিশেষ করে জুনিপার আর ঝাঁটা-ঝোপ কেটে-ছুটে সাফ করে ফেলে। নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেলে বরফের ওপরই জ্বালানো হয় উৎসবের আগুন।

ফ্রান্সের কয়েকটি জেলায় বহ্ন্যুৎসবের আগুন জ্বালাবার প্রথম সুযোগ পায় সেই ছেলে কিংবা মেয়ে যার বিয়ে হয়েছে গ্রামের মধ্যে সবার শেষে। কৃষকরা বিশ্বাস করে উৎসবের সময় নাচ যত ভালো হবে ততই ভালো হবে শস্য। গ্রামের ছেলেরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, থামে কেবল সেই সব বাড়ির সামনে যে সব বাড়িতে মেয়ে আছে। ছেলেরা উৎসবের কাঠ ভিক্ষে ক'রে আনে সেই সব বাড়ি থেকে। কয়েকটি জায়গায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে কত নিপুণভাবে অগ্নি-শিখা লাফ দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টায়। যার জামা-কাপড় একটুও পুড়ে যাবে না, অথচ লাফ দিয়ে অগ্নি-কুণ্ড পেরিয়ে যেতে পারবে

তার নাকি এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে। দক্ষিণ ফ্রান্সে একটা লম্বা গাছের কাণ্ড ফাঁপা করে তার মধ্যে জ্বালানী কাঠ, খড় ইত্যাদি পুরে দেওয়া হয়। গাছের ডগায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় ফুলের মালা। গাছে আগুন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সদ্য বিবাহিত যুবক বই বেয়ে উঠে গাছ থেকে নামিয়ে আনে ফুলের মালা।

সোয়াবিয়াতে ছেলে-মেয়েরা হাত ধরাধরি করে লাফ দিয়ে যায় আগুনের ওপর দিয়ে। সেখানে অবশ্য বছ্যুৎসব হয় মধ্য গ্রীষ্মে। বোহেমিয়ার লোকেরা বিশ্বাস করে মধ্যগ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা যে মেয়ে পর পর ন'টি বছ্যুৎসব নিজের চোখে দেখবে সেই মেয়ের বিয়ে হবে বছর ঘুরতে না ঘুরতে বছ্যুৎসবের এমনি সব বিচিত্র আঞ্চলিক রীতি প্রচলিত রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, সিসিলী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হাঙ্গারী, সুইডেন ইত্যাদি নানা দেশে। য়ুরোপের আকাশ বেশিরভাগ সময়েই ঢাকা থাকে মেঘে। সেই ধূসর পরিবেশে বর্ণ আর তাপ সঞ্চারের জন্যই বোধ হয় রাতের অন্ধকারে য়ুরোপের লোকেরা জ্বালে উৎসবের আগুন।

**আফ্রিকার বছ্যুৎসব :** উত্তর আফ্রিকার মরক্কো এবং আলজেরিয়াতে মিডসামার ডে বা মিডসামার ইভ উপলক্ষ্যে মুসলমানরা বছ্যুৎসব উদ্‌যাপন করে। বাড়ির উঠোনে, রাস্তার মোড়ে, ক্ষেতে কিংবা শস্য ঝাড়বার ঘরের মেঝেতে জ্বালানো হয় আগুন। যে সব গাছ পোড়ালে ঘন ধোঁয়া বেরোয় কিংবা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধ, উৎসব উপলক্ষ্যে সেই সব গাছ বেছে বেছে জড়ো করে তাতে আগুন দেয়। লক্ষ্য রাখা হয় যাতে সেই ধোঁয়া শস্যের ক্ষেত আর ফলের বাগানের দিকে যায়। এখানেও আছে লাফ দিয়ে আগুন পেরিয়ে যাবার রীতি। আরোগ্যলাভের আশায় বিশ্বাসী রোগীরা এসে বসে আগুনের ধারে। উৎসবের আগুন নিভে গেলে অনেক মরক্কোবাসী চুলে ছাই মাখে এই বিশ্বাসে যে তাহলে কখনো মাথায় টাক পড়বে না। এখানকার লোকেরও বিশ্বাস অগ্নি-উৎসব পালন করলে বৃদ্ধি পায় মানুষ, পশু, ফল আর শস্য। তবে এরা আগুনের চাইতে আগুনের ধোঁয়ার শক্তিতেই বেশি বিশ্বাসী।

**ভারতের বছ্যুৎসব :** শুধু য়ুরোপ বা আফ্রিকাতে নয় এশিয়ার নানা দেশে, বিশেষ করে ভারতে বছ্যুৎসবের প্রচলন রয়েছে। ভারতের অনেক অঞ্চলে হোলি উৎসবের ঠিক আগের সন্ধ্যায় উদ্‌যাপিত হয় বছ্যুৎসব। এই উপলক্ষ্যে অনেক জায়গায় খড়কুটো দিয়ে তৈরি করা হয় 'বুড়ির ঘর।' বাড়ির মেয়েরা পিটুলি দিয়ে বুড়ির মূর্তি তৈরি করে তা রেখে যায় ওই কুঁড়ে ঘরে তারপর ওই ঘরে ধরিয়ে দেয়া হয় আগুন। এই ভাবেই পোড়ানো হয় 'হোলিকা'কে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব অশুভ শক্তি।

পঞ্জাবে জানুয়ারী মাসে লোহ্রি উৎসব হয়। সেই উপলক্ষ্যে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে চাঁদা আদায় করে। সেই ফসলের সন্ধ্যাবেলা উদ্‌যাপিত হয় বছ্যুৎসব। পবিত্র আগুনের চারদিকে সমবেত শিখ নর-নারী আগুনে নিক্ষেপ করে মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাবার। কয়েকজন পরিবেশন করে জনপ্রিয় লৌকিক গানগুলি। সমবেত সকলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পরস্পরের সঙ্গে।

জীবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ আনন্দ। আনন্দ প্রকাশের অন্যতম পথ বিভিন্ন জাতির বিচিত্র উৎসব। বছ্যুৎসব বহু উৎসবের মধ্যে আবার বিশিষ্ট। এর বর্ণাঢ্য রূপ, উত্তেজনা, কোলাহল মানুষের মনের উল্লাসেরই প্রতীক। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাগরিক সভ্যতা বিস্তারের জন্যই হোক, কিংবা মানুষের মনের আনন্দ কমে যাওয়ার জন্যই হোক, বছ্যুৎসব উদ্‌যাপনের রীতি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, কিংবা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে নিতান্তই গণ্ডগ্রামের মধ্যে।

। আমেরিকা

(কোলম্বাস বিরচিত ইতিহাস)

লোকরঞ্জনে
আমেরিকার
লোক-উৎসব

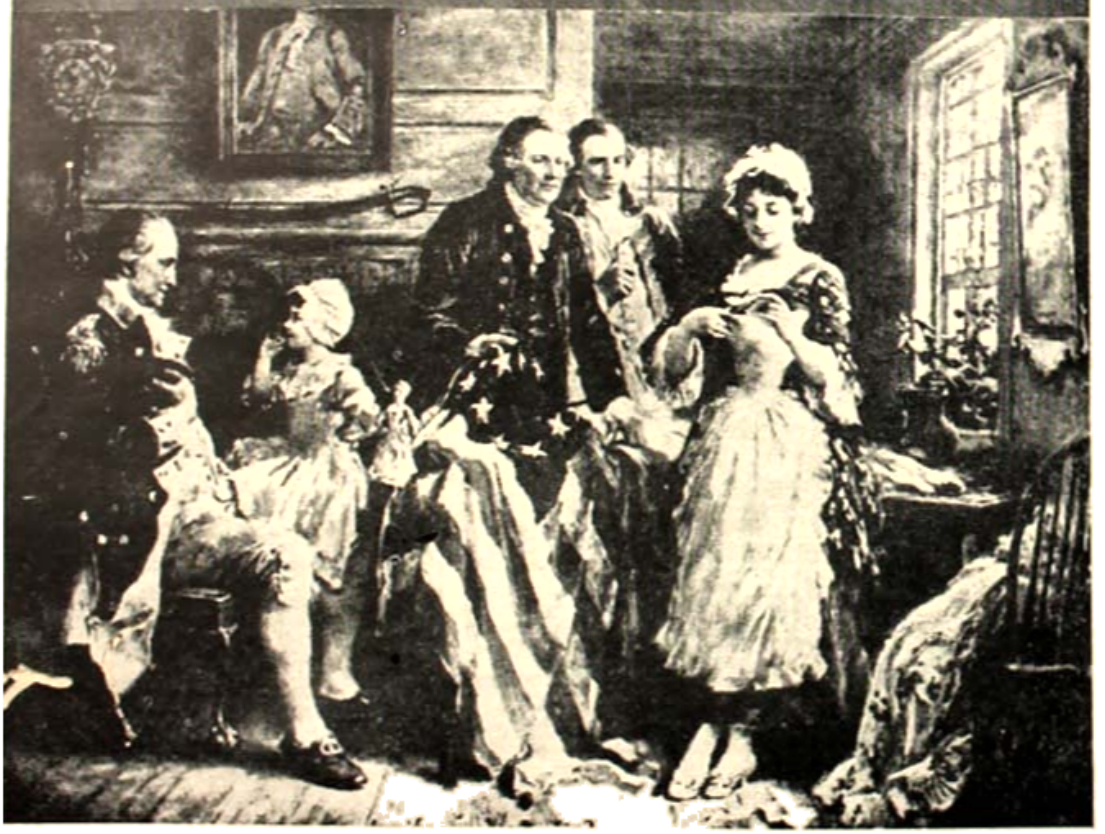

উৎসবের সাজে
প্রাচীন আমেরিকার
একটি পরিবার।

॥ ফুলের ঘোলা লাগলো গায়ে ॥

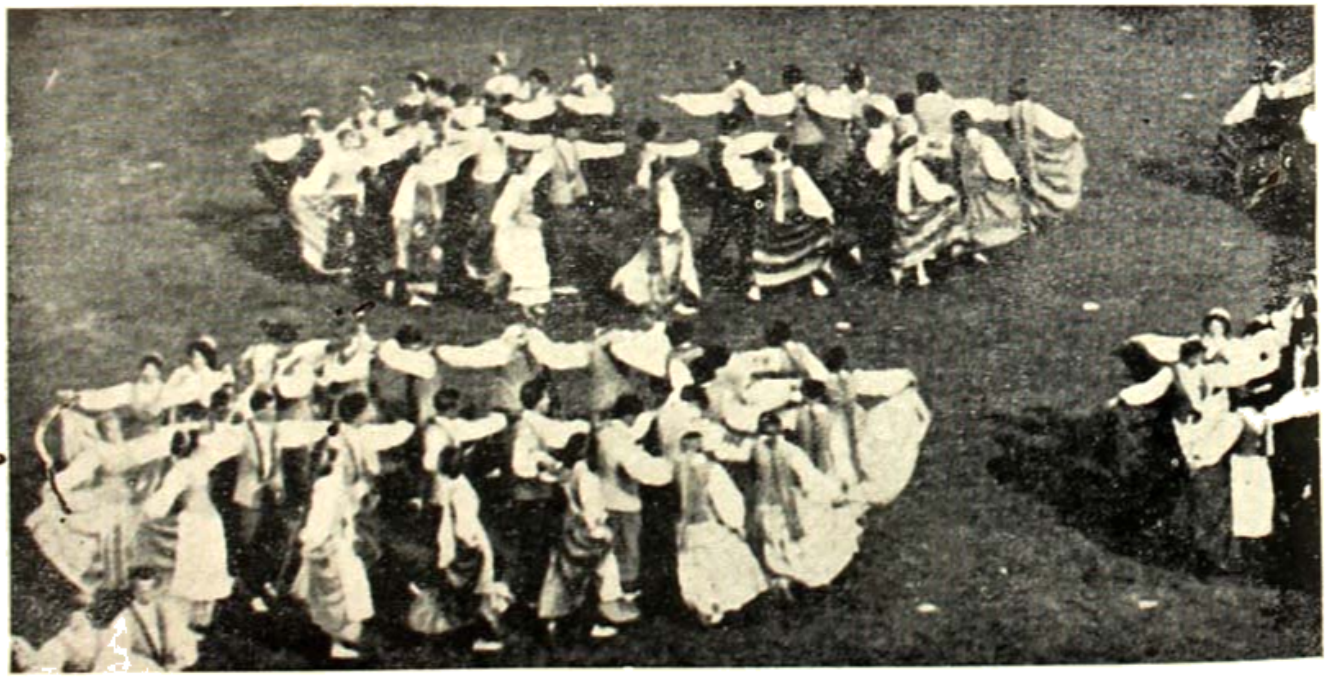

। সঙ্গীত-উৎসব ।

। রাশিয়া ।

। সঙ্গীত-উৎসব ।

। ভূমি সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ।

ব্রিটেন।

বড়দিন উৎসবে হুক সন্তা

১ সেদিনের খৃষ্টীয় উৎসবের দুটি প্রাণবন্ত দৃশ্য।

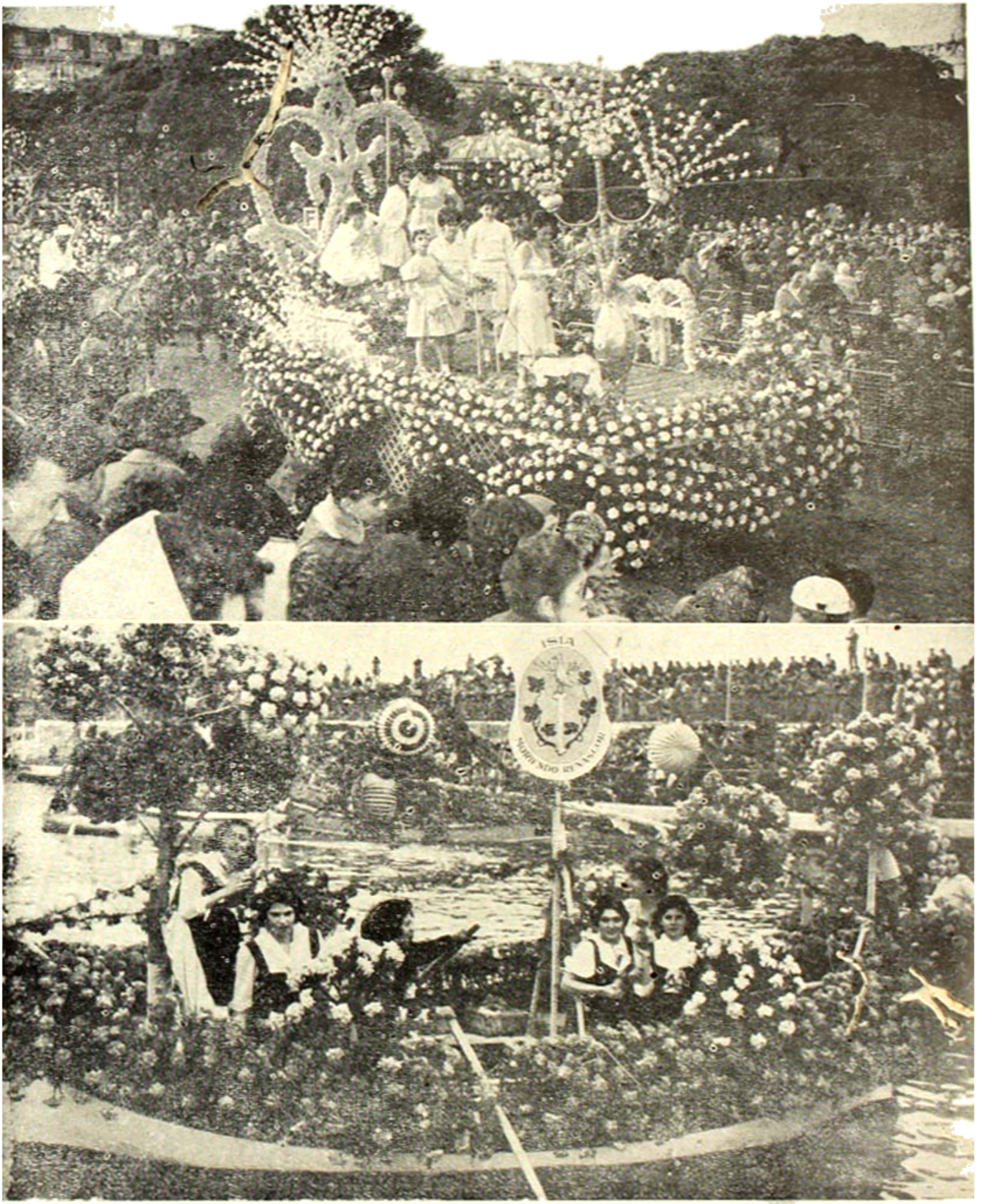

'মিলন'-এর কার্নিভাল উৎসব

। ফ্রান্স ।

জার্মানী ।

। কার্নিভ্যাল উৎসব।

ছাত্রীবৃন্দ

১৯৫৮ সালে আমার কর্মজীবনের শুরুতে

জাপান ।

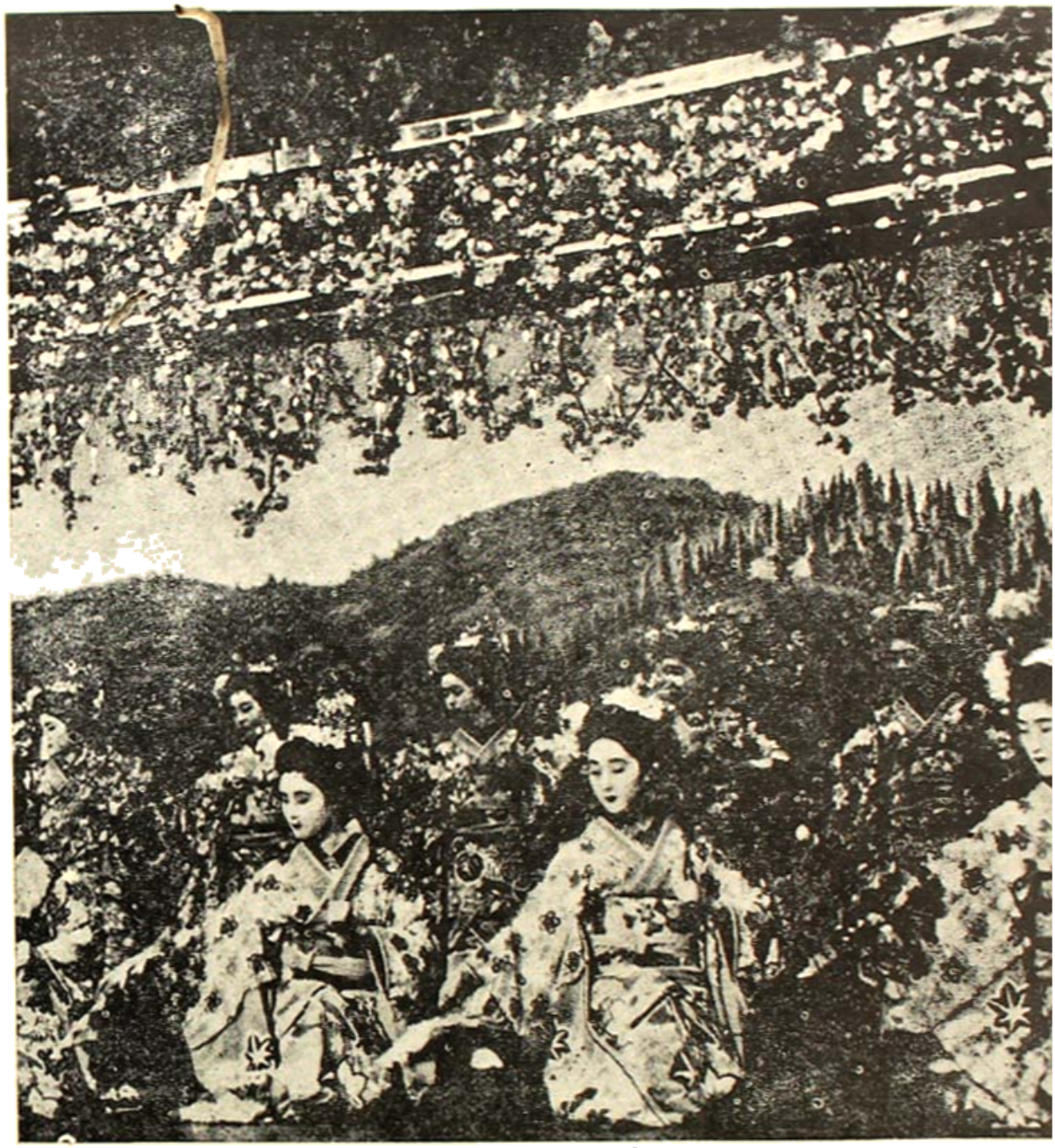

। গে-ই-সা উৎসব-রতা বিনোদিনী জাপানী নর্তকী।

। জাপান

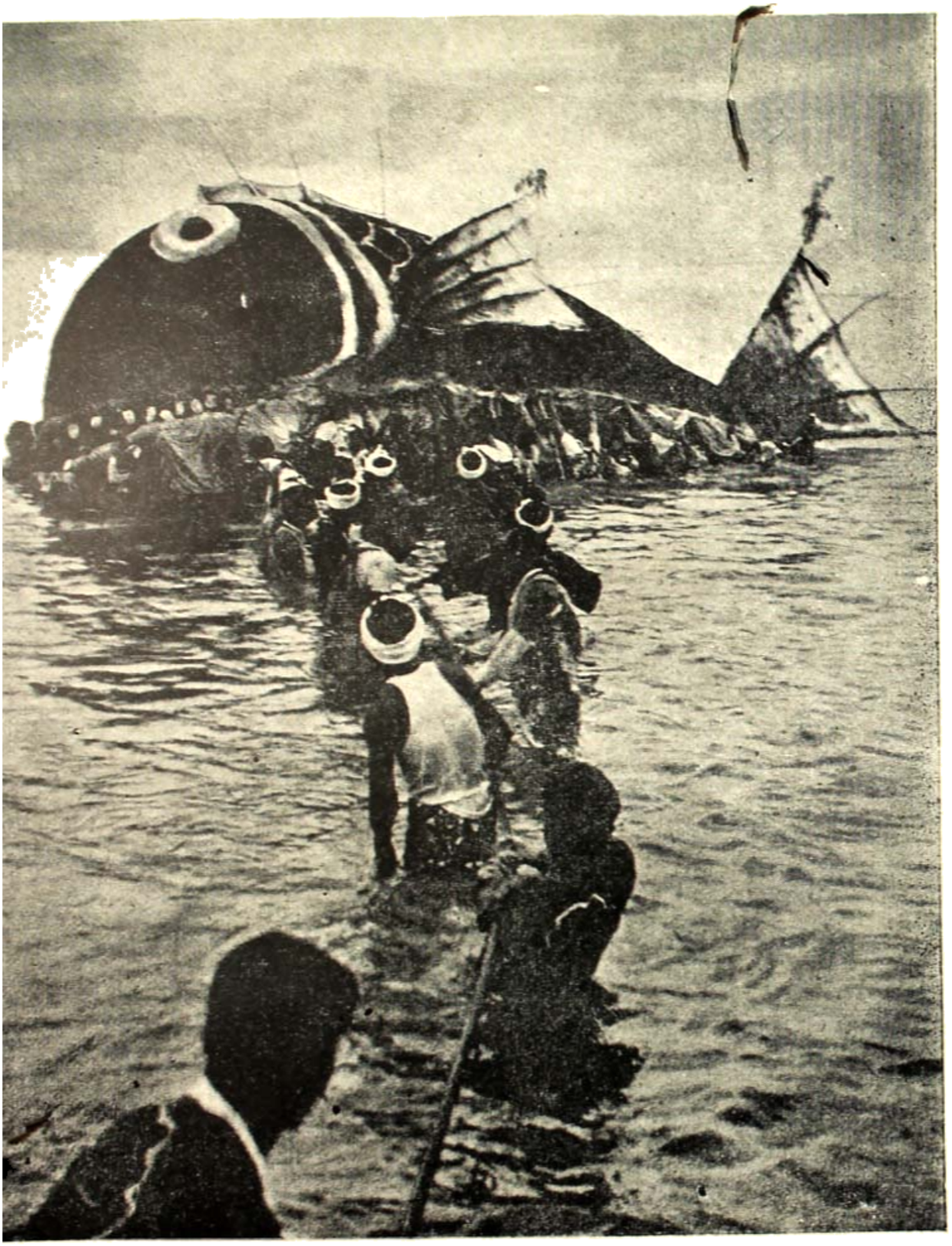

। সাগর, সাগর বন্দি।
সমুদ্র-বন্দনা উৎসবে সুচিত্রিত মৎস।

# বর্ণ উৎসব

## নীলাদ্রি সোম

আকাশের ইন্দ্রধনু থেকে ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা—সকলেই যেন কথা বলছে রঙের ভাষায়। বর্ণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় সুন্দরের অমৃতনিস্যন্দী বাণী। প্রকৃতির রাজ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য সব চেয়ে বেশি আলো আর ফুলে। সুন্দরের উপাসক মানুষ। তার সৌন্দর্যের উপাসনা বিশেষরূপে দেখা দেয় নানা উৎসবের ভেতর দিয়ে। তাই তো উৎসব প্রাঙ্গণ সাজাবে সে লতা-পাতা, ফুলে-ফলে, আলোক-মালায়। বছরের বিশেষ ক'য়েকটি দিনে রং বেরঙের পোশাক পরে পথে বেরোয় শিশু-বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ, সবাই। তাই তো কোনো-কোনো উৎসবে মানুষ প্রীতি বিনিময় করে একজন আরেকজনের দেহে রং মেখে, রং দিয়ে পরস্পরকে ভিজিয়ে দেয়। রং, ফুল, কি আলো নেই—এমন উৎসবের কথা যেন কল্পনাও করা যায় না। উৎসব কখনো নিরাভরণ হতে পারে না।

শহরের অধিবাসীদের চাইতে গ্রামের লোকেরা, বিশেষ করে আদিবাসীরা প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। তাই উৎসবে ফুলের ব্যবহার তাদের মধ্যেই সব চাইতে বেশি। প্রকৃতির দুলাল-দুলালী সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা শুধু তাদের উৎসবের গানে নয়, চলতি গানেও ফুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাঁওতাল তরুণীরা খোঁপায় পরে ফুলের মালা, কানে গোঁজে ফুলের ঝুমকো। সাঁওতালরা ফাল্গুন মাসকে বলে 'বাহাবঙ্গা' বা ফুলের মাস। যারা আরণ্য বা পাহাড়ী পরিবেশে মানুষ তারা রং বেরঙের পোশাক পরতেও ভালবাসে সবচেয়ে বেশি। নেফা-অঞ্চলের অধিবাসীরা উৎসব উপলক্ষ্যে পরে বহু বর্ণের পরিচ্ছদ। তরাইয়ের নোহানার ধারে যারা বাস ক'রে সেই চৌধরী আদিবাসীদের বিবাহ উৎসবে সন্ধ্যাসমাগমে বধূকে বিবাহবাসরে নিয়ে যাওয়া হয় পুষ্পস্তবকে সজ্জিত ক'রে। আষাঢ়ের ঘোল উৎসবের এক নামই হল ফুল-ঘোল। ফ্রান্সের কার্নিভাল উৎসবে ফুলের প্রাচুর্য দেখার মতো।

সিংহলীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব 'পেরহারা'। এতে ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয় বৃক্ষরাজ (আষাঢ় গাছ)। সৌন্দর্যের আর আনন্দের মূর্ত প্রতীক ফুল। ফুলের ভাষা সার্বজনীন। তাই পৃথিবীর প্রতি দেশের প্রায় উৎসবের প্রাঙ্গণই পুষ্প-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল।

"জানেনা যেন——কে দিয়েছে তাদের আলোর ফুলের সমান করে ফুটিয়ে, অন্ধকার রাতে এনিভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে লক্ষ কোটী তারার প্রদীপ। ……ঘরের প্রদীপ কে জ্বালে শুধু রহস্য——" লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। পূজো-পার্বণে, কি অন্যান্য উৎসবে প্রদীপ ছাড়া আমাদের চলে না। দেবালয়ে স্ফটিক দীপ জ্বালিয়ে দেবতাকে আহ্বান করে ভারতবাসী। আর উৎসবের দিনে তো কথাই নেই।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন উৎসব দীপান্বিতা বা দেওয়ালি। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রায় সর্বত্র। দীপালি উৎসবের সন্ধ্যায় আলোকসজ্জিত পর্ণকুটিরগুলিও মনে হয় একটি আলোর স্বপ্ন-দীপ, অন্ধকারের সমুদ্রে ভাসছে। একান্ত নাস্তিকদেরও ভালো লাগে সে দিকে তাকিয়ে থাকতে। ভাগ্যলক্ষ্মীর বর পাবার আশায় ধনী-দরিদ্র সবাই নিজের নিজের সাধ্য মতো ঘরে ঘরে জ্বালে মাটির প্রদীপ, মোমবাতি, কিংবা নানা রঙের ইলেকট্রিক বাল্‌ব। বাংলার দীপান্বিতা-ই এখন বাংলার বাইরে দেওয়ালির রূপ নিয়ে পরিণত হয়েছে জ্বালো আর বাজির উৎসবে। আমাদের দেশে সারাটা কার্তিকমাস ধ'রে জ্বালানো হয় আকাশ প্রদীপ।

সিংহলের কার্তি উৎসব হিন্দু দীপাবলীরই একটি সংস্করণ। পেরহেরা উৎসব-উপলক্ষ্যে সিংহলীরা রাতে শোভাযাত্রা ক'রে পথে বেরোয় মশাল হাতে নিয়ে।

এশিয়ার অন্য কয়েকটি দেশেও রোশনাই ধরণের আলোক-উৎসবের প্রচলন আছে। জাপানীরা উদ্‌যাপন করে 'লণ্ঠন উৎসব'। জাপানীদের বিশ্বাস ওই উৎসবের রাতে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা ফিরে আসেন যে যার বাড়িতে। উত্তর-পুরুষদের কাছ থেকে তারা আশা করেন শ্রদ্ধা আর তারা তাদের করেন আশীর্বাদ। সুন্দর-সুন্দর বাতি তৈরির ব্যাপারেও জাপানীদের বেশ নাম আছে। উৎসবের রাতে বিরাট আর উজ্জ্বল জাপানী হাউইগুলি উঠে যায় নীল আকাশের আঁধার চিরে। সঙ্গে সঙ্গে চলে বাতি পোড়ানো। বানে ভাসা দেবার উপক্রম হয় পটকা ফাটার শব্দে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় 'কান-হায়ুন' উৎসব। উৎসবের রাতে চারদিকে ছোট-ছোট কাঠির মাথায় কাঁচা ডাবের খোলার মধ্যে নারকেল তেল কিংবা শুয়োরের চর্বির আলো মিটমিট করে জ্বলে। রাত খুব অন্ধকার হ'লে নাচের আঙিনা আলোকিত হ'য়ে ওঠে সারি-সারি নারকেল-খোলের লেলিহান শিখায়।

আন্তর্জাতিক নৌকা প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্যারিসের সেইন নদীর ধারে ক'য়েক বৎসর ধ'রে চ'লে আসছে আন্তর্জাতিক বাতি পোড়ানোর উৎসব। এতে যোগদান করে 'বোমবাতির কাউ' বিশেষজ্ঞ জার্মানী, রং মশাল বিশেষজ্ঞ বেলজিয়াম, আলোকিত উইণ্ডমিল তৈরিতে দক্ষ হল্যাণ্ড, জলপ্রপাত বিশেষজ্ঞ ফ্রান্স। তাছাড়া স্পেন, ইটালি, এমন কি দূর প্রাচ্যের জাপানও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের তরুণীরা নাচের উৎসবে যাবার আগে মণি-মুক্তার পরিবর্তে তাদের পোশাক আর চুলে জোনাকি ব্যবহার করে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে অসংখ্য জোনাকি ধরে তা-ই দিয়ে ঘোড়াগুলিও সাজানো হয়। তারপর রাতে অন্ধকারে যখন শোভাযাত্রা বেরোয় মনে হয় অনেকগুলি আলো যেন এক সঙ্গে পথ দিয়ে চলেছে।

মুসলমানদের মধ্যেও আলোক-উৎসবের প্রচলন আছে। তাদের শবে-বরাত বা 'ভাগ্যের রাত্রি'-তে ছাদে আর দুয়ারের পাশে অতিরিক্ত আলো জ্বালানো হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস এই 'ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ'-এর রাত্রিতে আল্লাহ্-তালা মানুষের সারা বছরের ভাগ্য-লিপি ঠিক ক'রে যেন।

ভারতের সর্বপ্রধান বর্ণ উৎসব হোলি। বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিত' থেকে জানা যায় যে সেকালের বসন্তোৎসবে রং খেলা হত। আবির আর পিচকিরি এই দুই-ই চলে হোলি উৎসবে। বাংলা দেশে দোল উৎসবে শ্রীকৃষ্ণকে দোলায় বসাবার বদলে নানা রকম রং ব্যবহার করা হয়। বোধ হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হোলির অনুকরণেই দেখা দিয়েছে রং ব্যবহারের এই বাহুল্য।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর শিল্পীদের যে উৎসব হয় তাতে নিজেদের হাতে তৈরি সুন্দর সব রথ নিয়ে রং মেখে সং সেজে পথে বেরোয় ছাত্র-ছাত্রীরা। জুলাই মাসে যে উৎসব হয় তাতে নিজের খুশিমতো রং মেখে পথে ঘুরে বেড়ায় তরুণ চিত্র শিল্পীর দল। আলেকজাণ্ডার, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি ঐতিহাসিক নানা চরিত্রের ভূমিকায়।

অন্যদিনে যেমনটি থাকুক, উৎসবের দিনে মানুষ স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে, মানুষের মনের আনন্দ বাইরে প্রকাশ করতে সাহায্য ক'রে আসছে আলো, রং আর ফুল। প্রকৃতির রাজ্যেও তো যে মুহূর্তে পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হয় বোধনের বার্তা, বনের পলাশ রক্তপ্রদীপে সাজায় আরতিপাত্র, প্রচুর পরাগ আর রক্তিমরাগে প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে দাড়িম্ববন।

---

# ভারতের উৎসব

হিরণ্ময়ী বসু

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত উৎসবের অভিনবত্ব যেন জাতির প্রাণশক্তিকেই নবীন করে তুলছে। বৈশাখ থেকে সুরু করে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে তের পার্বণ তো এদেশের চলতি কথা। কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রে দীপদান উৎসব ভারতের কোন প্রাদেশিক উৎসব নয়। সূর্য তখন ধান তুলারাশিতে; আর ঐ দিন শেষ রাত্রে জৈনদের মহাবীরের নির্বাণলাভও হয়েছিল। কাজেই এই উৎসবটি শুধু হিন্দুর উৎসব নয়—জৈনদেরও উৎসব।

"সাজাও আলো—সাজাও আলো—জ্বালাও আলো দীপালিতে"—ঘরে ঘরে এই ডাক এসে পৌঁছয় আর ধরণী সেজে ওঠে আলোর মালা প'রে। আগুন নিয়ে খেলা হয় মানুষের—আগুনের রঙের যেন প্রদর্শনী সুরু হয়। কালিপূজাকে কেন্দ্র করে এবং মহাবীরের নির্বাণোৎসবে সারা নগরীতে দীপদানকে উপলক্ষ্য করে সারা ভারত যেন আপন প্রাণের দুঃসাহসিকতাকেই আগুনের প্রতীকে ঘরে ঘরে অনুভব করে।

ভারতের আর একটি উৎসব নবান্ন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মমূলক। শুধু ভারতের কেন—পৃথিবীর সর্বদেশের সর্ব উৎসবই মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত। ধর্মেই তো মানুষ মুক্তি খুঁজেছে চিরকাল—পেয়েছে অভয় আশ্রয়। সভ্যতার বিবর্তনে এই ধর্ম যে কতদূর প্রভাবশালী তা আজ আর আমাদের চোখে পড়ে না সত্যি কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্যিও আর কিছু নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে আগুন আছে ব'লেই পৃথিবীর বহিরঙ্গে এত রঙময় প্রাণের উত্তাপ। নবান্ন উৎসবেও আমরা একটি মৌল সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি। আমাদের কোনো উৎসবই জীবনের কোনো অঙ্গকে অস্বীকার করে না—এমনকি মৃত্যুকেও সে অস্বীকার করে না। তাই নবান্নে বছরের প্রথম ফসল ধরে দেওয়া হয় প্রথমে তাঁদেরই উদ্দেশ্যে যাঁরা ছিলেন আমাদেরই পরম প্রিয়। সুগন্ধি আতপচাল, নতুন গুড় আর নারকেলের সংমিশ্রণে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত, ঘরে ঘরে চলে পার্বণ। বাংলাদেশে ঐ দিন ধানের মরাইয়ের চারপাশে আলপনা এঁকে সারারাত ধরে গৃহলক্ষ্মীরা জেগে থেকে গান করেন—উৎসবে উৎসবে তাঁদের জীবনে একটি নূতন স্বর্গ রচনা করেন।

মানুষ জীবনে চায় সিদ্ধি—চায় সফলতা। এই সফলতা আসে সাধারণের ধূলিময় পথে—গণেশ তাই গণজনের দেবতা। গণেশপূজা একটি সর্বভারতীয় উৎসব। রক্তবর্ণ, পঞ্চমুণ্ড এই দেবতা—ইঁদুর-বাহন। মায়ের গায়ের ঘাম ঘুমঘুম থেকে জাত এই সন্তানটি শনির দৃষ্টিতে মুণ্ড হারিয়ে হাতীর মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করেছেন। কিন্তু ইনিই সর্বসিদ্ধিদাতা, সমস্ত সাফল্যের কারক ইনিই। তাই যে কোনো কার্য্যারম্ভের পূর্বেই গণেশের পূজা। প্রাণের স্তরে এঁর আরাধনা—জীবিকা এঁর প্রসাদ।

কিন্তু জ্ঞানের পথে আসেন সরস্বতী। এই সরস্বতী পূজাও একটি সর্বভারতীয় উৎসব। এঁর বাহন হংস—হস্তে বীণা। সর্বশুক্লা সরস্বতী—মাল্য চন্দন বসন ভূষণ—সমস্তই শ্বেতবর্ণ। জ্ঞানও শুভ্র এবং অচঞ্চল। সরস্বতী যেন আমাদের আপনার লোক। ছোট্ট ছেলেও স্বচ্ছন্দে এঁর চরণোপান্তের বীণার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারে এবং দেবী তাতে সহাস কটাক্ষে সমর্থন করেন। জ্ঞানের রাজ্যই যে নির্ভয়ের রাজ্য। সরস্বতী পূজো আসমুদ্র হিমাচলের উৎসব।

কতগুলি পূজোর উৎসব আছে যাতে প্রাদেশিকতার অনুরঞ্জন অধিক। অবশ্য প্রাদেশিকতা শব্দটি এস্থলে

নিবার্থে প্রযুক্ত নয়। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এবং পশ্চিমে হনুমান পূজা এর নিদর্শন। বাংলা দেশে তো দুর্গাপূজার চেয়ে বড় উৎসব আর নেই-ই। এখন এই দুর্গাপূজা শুধু শক্তির পূজাই নয়—সারস্বত সাধনারও সবচেয়ে বড় প্রেরণা। বাংলার সারস্বত সমাজ এই পূজাকে উপলক্ষ্য করেই তাঁদের সাধনার ফল ঢেলে দেন বাঙ্ময়রূপে।

আমি আজ বর্তমান কালে প্রচলিত উৎসবের কথা ছাড়াও আর কয়েকটি উৎসবের বিষয়ে একটু বলবো। এগুলি জাতীয় উৎসব নয় বটে কিন্তু সমাজজীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছিল তাতে তাদের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না।

পূর্বে দীপান্বিতা উৎসবের কথা বলা হয়েছে। এই উৎসবের প্রাচীন নাম ছিল যক্ষরাত্রি বা সুখরাত্রি।

কৌমুদীজাগরও আর একটি উৎসব ছিল। কৌমুদীজাগর উৎসবটি শরৎ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হত। যখন ত্রয়োদশীতে হতো সুবাস্তক উৎসব।

বসন্তে যখন আমের মুকুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠত তখন হত সহকার ভক্ষিকা উৎসব। আম্রবনে দল বেঁধে গিয়ে মুকুলভক্ষ, কাড়াকাড়ি করে খাওয়া বা লোফালুফি করা ছিল এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই উৎসবগুলির একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। ধর্মের সঙ্গে এগুলির সাক্ষাৎ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। এগুলিকে বরঞ্চ আদিম উৎসবপ্রবৃত্তির শুদ্ধ উৎসবের পরিণতিরূপে গণনা করা যেতে পারে।

শীতের মুখে যখন উঠত নতুন ছোলা তখন ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে গাছশুদ্ধ ছোলা মটর পুড়িয়ে খাওয়া হত —এর নাম ছিল অগ্ন্যধেয়িকা। এমনি আর একটি উৎসব ছিল—বিসখাদিকা। দীঘিতে নেমে দল বেঁধে পদ্মের মৃণাল তুলে নানা কৌশলে সবলে বনভোজন। বর্ষায় ছিল নবপত্রিকা উৎসব—এটি ছিল বনভোজন বিশেষ।

বসন্তে হোলির উৎসবকে আমরা জানি। আলোর উৎসব যেমন দীপান্বিতা—জলের উৎসব তেমনি হোলি—তবে রঙিন জল আর শুকনো রঙিন আবীর। এটিকে বর্ষোৎসব বলা যেতে পারে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের মনে জীবনসম্ভোগের বাসনা জেগে ওঠে—যখন ইচ্ছে হয় একটু রঙ লাগিয়ে দিতে মনে আর দেহে—তখনই হয় হোলির উৎসব। এটি এখন ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আগে এর নাম ছিল উদকক্ষেড্ডিকা। অবশ্য হোলি নামটি অনেক সুন্দর আর মধুর। এই উৎসবের প্রাচীন নাম ছিল হোলাকা। দোলা উৎসবের নাম ছিল একপাল্লঙ্কী। নাগরিকেরা ফুলে ফুলে দেহ সাজিয়ে একটি বড় শাল্মলীবৃক্ষকেও ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিত তারপর হত দোলার আয়োজন। আলোক চতুর্থী নামে আর একটি উৎসব ছিল এই দোল খাওয়ার উৎসব। শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতেও ছিল এই দোল খাওয়ার আর একটি উৎসব। মাটিতে থেকেও আকাশের স্বাদ গ্রহণ করার সুখ যেন মানুষ এতে পেত।

বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুর্থীর-দিবস হত যব চতুর্থীর উৎসব। তখন সুগন্ধি যবের গুড়ো ছড়িয়ে দিত নাগরিক—ছুঁড়ে দিত একে অন্যের গায়ে। আষাঢ়ের নবমেঘসঞ্চারে আকাশ আবৃত হলে যখন নীলবনে কদম ফুটে উঠত তখন দলে দলে নগর ছেড়ে লোকে যেত উপান্তের বনে বনে—কদম ফুল নিয়ে ছোড়াছুড়ি হত। এর নাম ছিল কদমযুদ্ধ।

ফুলের উৎসবই কত ছিল। রৌদ্রালোকিত এই দেশে শুকুতে শুকুতে ফুলের সাজি ভরে ওঠে—মানুষের মনোভূমিতে ফুল ফুটে ওঠে নানা রঙের বাসনার। পুষ্পাবচায়িকা বলে যে উৎসবটি ছিল—তাতে প্রতিযোগিতার সঙ্গে লোকে ফুল কুড়োতো। এ যেন বিলেতের বনে গিয়ে স্ট্রবেরি কুড়োবার খেলা।

ভারত উৎসবের দেশ। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উৎসবও যোগ দিয়ে এ দেশে যেন উৎসবের কোয়ারা ছুটতো। মুঠো মুঠো আনন্দের অবাধ মুক্তি জীবনকে ভরিয়ে তুলতো—চরিতার্থ করত, নিয়ে যেত সকল বেদনার অতীত এক লোকে। হোক সে সাময়িক—তবু তাতে থাকত চিরন্তনতার অঙ্গীকার।

# প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপান

## হরপ্রসাদ মিত্র

আয়তনে আর্জেন্টিনার চেয়ে বড়ো,—ইংলণ্ডের তিনগুণ প্রায়। প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসছে জাপান।

হক্কাইডো, হনশু, শিকোকু আর কিউশু—এই চারটি আসল, আর ছোটো বড়ো অনেকগুলি দ্বীপের সমাবেশে, আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ জাপান। মাত্র ছ'হাজার ফিট উঁচু গিরিশিখরের সংখ্যা সেখানে আড়াইশ'রও বেশি।

পিয়ের লোটি অনেকদিন আগে লিখে গেছেন, সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে প্রথমেই জাপানযাত্রীর চোখে পড়ে দিগন্তে ভাসমান কয়েকটি বিন্দু ক্রমশঃ সেইসব পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাত্রীর চোখের সামনে অবগুণ্ঠন খুলে দেয় দেশ জাপান।

বরফে-ঢাকা ফুজি-ইয়ামার চূড়া বারো হাজার তিনশ উনষাটফুট ফিট উঁচু। প্রতিবছর ভূমিকম্প হয় পনেরো শ বারেরও বেশি। নদীগুলির দৈর্ঘ্য কম, কিন্তু স্রোতের গতি খরধার।

সমস্ত প্রকৃতি তবু কেমন যেন কোমল। অসংখ্য উৎসবের দেশ জাপান। শস্য রোপণের উৎসব, নববর্ষ উৎসব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'বন' উৎসব, শিন্টো-ধর্মাবলম্বীদের শোভাযাত্রা,—চা-পানের উৎসব, চেরী-উৎসব। জাপানের 'গেইশা'-নর্তকীর খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত।

নববর্ষ-বন্দনার অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে। ঘর সুসজ্জিত। মেঝে তকতকে, ঝকঝকে। মাঝখানে রান্নার আয়োজন। চারদিকে আহারে বসেছেন পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ,—এমন কি সুন্দর কুড়ির মধ্যে বাড়ির ছোট্ট শিশুটিও। আর, ফুল তুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে।

মাঠে ধান বুনে দেবার পরেও অনুরূপ ব্যবস্থা। ফসল ফলুক ভালো করে—মনে মনে এই প্রার্থনা।

অগাষ্ট মাসে হয় 'বন'-উৎসব। যাঁরা স্বর্গত, সে উৎসব তাঁদেরই জন্যে।

আবার শিন্টো-মন্দির থেকে তাঁদের উৎসবের দিনে শিন্টো-যাজকদের শোভাযাত্রা বেরোয়। সেও দেখবার মতন দৃশ্য। আশ্চর্য সমারোহ তার। মিছিলের পরিক্রমা শেষ হলে ভোজ সুরু হয়। প্রসন্ন সাযেরূপ ফুটে ওঠে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে।

বসন্তকালে সারা দেশ ছেয়ে যায় চেরীফুলে। তখন ফুলের বনে বনে যুবক-যুবতী, প্রবীণ, প্রৌঢ় সকলেরই সানন্দ বিচরণ। 'সাকে' পান, আর ভ্রমণ, মনের ভার হালকা করে জীবনকে ফুলের মতন উপভোগ করবার নেশা লাগে যেন।

একজন লিখেছেন, পুরোনো শহর কিয়োটো-তে গেলে মনে হবে সেখানে যে-কোনো দিনই যেন উৎসবের দিন। চা-অনুষ্ঠান জাপানের জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। ইস্কুল থেকেই সে শিক্ষার তালিম দেওয়া সুরু হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে চায়ের আইন কানুন জানতে হয়।

সেই আনন্দের দেশ জাপান এতো উৎসবের মধ্যে 'গেইশা' বিদ্যাটি সযত্নে চর্চা করে এসেছে। শোনা যায়, আঠারোর শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর সেকালের জাপানে সামন্ত অধিপতির অধীনে ছিল একদল অনুচর। তারা পুরুষ। দক্ষ তীরন্দাজ তারা, - অশ্বারোহণে সমর্থ,—তলোয়ার চালনায় পটু। সেই দক্ষ-সেবকদের নাম ছিল 'সেইশা'। অর্থাৎ 'সেইশা' ছিল 'দক্ষ' কথাটারই প্রতিশব্দ। তারপর ১৭৮০র কাছাকাছি কোনো

সময়ে পুরুষ-'গেইশা'র প্রথা উঠে যায়। দেখা দেন বিনোদিনী রমণী! তাঁরা নৃত্যে পটু, সংগীতে মনোরমা। তাঁরাই প্রসিদ্ধ 'গেইশা' ধারার আদিপর্ব রচনা করে গেছেন।

'গেইশা' রমণীর দুই সম্প্রদায়। একদলের নাম 'হাওরি গেইশা', আর একদলের নামে 'কোয়োবি গেইশা' 'হাওরি' ধারা, তাঁরা অঙ্গ অনাবৃত রাখেন না কখনোই। তিন-তারের 'সামিসেন' বাজনা বাজিয়ে গান করেন তাঁরা, তাঁদের আদরে আপ্যায়িত হন অতিথি, কিন্তু কোনোরকম স্থূলতা নেই সে-সান্নিধ্যে। তাঁরা চিত্তরঞ্জনী। 'কোয়োবি-গেইশা'দের মতন তাঁদের বিনোদনে শারীরিক আবেদন মোটেই মুখ্য নয়।

'গেইশা' হবার জন্যে সাধনা করবার। পাঁচ ছ বছর বয়সেই নাচ, গান, আর তেতারা বাজাবার শিক্ষা শুরু হয়। 'ওকাসান' বা কর্ত্রী-মা নেন শিক্ষার ভার। প্রায় একশ পাউণ্ড খরচ লাগে শিক্ষানবীশ এক একটি মেয়ের কিমোনো আর টুকিটাকি অন্যান্য উপকরণ কিনতে। শিক্ষানবীশির সময়ে তাকে বলা হয় 'মাইকো'। বৈশোর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'মাইকো' পুরোপুরি 'গেইশা' হয়ে ওঠেন।

প্রাচীন গ্রীসের 'হে-তিরি'র hetaerae) সঙ্গে জাপানের এই 'গেইশার' মিল লক্ষ্য করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু বোধ হয়, সে অনুমান অভ্রান্ত নয়। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যে আশ্চর্য রমণীয়তা রূপ নিয়েছে প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে, 'গেইশা' বিনোদিনীর জন্ম, বোধ হয় মনোভিরাম সেই জাপানেই। শোনা যায়, ইতিহাসের ধারায় জাপান বিদেশীর সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করবার সংকল্প পালন করে এসেছে অনেকদিন। ষোড়শ শতকের আগে সেখানে ইউরোপের অভিযাত্রী বণিকদলও পা দিতে পারেনি। যেটুকু সম্পর্ক ছিল, সে কেবল চীনের সঙ্গে, কোরিয়ার সঙ্গে। এই সেদিন, উনিশ-শতকের শেষার্ধে মাত্র পাশ্চাত্য জগতের দিকে জাপানের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

শোনা যায়, জাপান ছিল কঠোর সানুরাইয়ের দেশ! কঠিন তার সংকল্প, অটুট তার সংরক্ষণশীল মন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠোর সংকল্প রক্ষা আর কূর্মবৃত্তিই বুঝি খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠোর সংকল্প রক্ষা আর কূর্মবৃত্তিই বুঝি জাপানের বিশেষ চরিত্র। কিন্তু এইসব অভ্রান্ত উৎসবই তার অন্ত পরিচয়। জাপান যে আনন্দে কৃপণ নয়, সৌন্দর্যে বিমুখ নয়,—এবং জাতি হিসেবে তার যে এই পরম সমাদরযোগ্য নিজস্ব এক পরিচয় আছে, এসব উৎসব তারই নজীর।

---

# উৎসবের দিনে মিশর

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

'জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব।' ...মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, —বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন।...প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, হীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

রবীন্দ্রনাথের এই উৎসবের ব্যাখ্যার আমরা প্রাত্যহিক জীবনের গতিবদ্ধতার উর্ধ্বে মহৎ-মুক্তির আলোকে উৎসবকে উপলব্ধি করি।

প্রতিটি জাতির প্রতিটি দেশের নিজস্ব জাতীয় উৎসব বর্তমান;—ধর্ম ও দেশাচার অনুসারে কেবল তার মধ্যে রয়েছে আচার ও আচরণের পার্থক্য। কিন্তু উৎসবের যে অন্তর্নিহিত মর্মকথা তা হচ্ছে প্রতিদিনের এক ঘেঁয়েমীর জীবন থেকে বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন। বর্তমান মিশর দেশের জাতীয় উৎসবকে এই আলোকে বিচার করলে তাদের জীবনধারায় ধর্মীয় উৎসবগুলিই বহু বিস্তৃত দেখা যাবে।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি মিশর। নীল নদীর পলিতে পলিতে শ্যামল দেশটি দেশবাসীর জীবনধারায় বহুবিচিত্র উৎসব-আনন্দের লীলা নিকেতন। প্রাচীন কালে নদীর দেশ মিশরের লোকাচারে প্রচলিত ছিল পৌত্তলিক ধর্ম। সে অবশ্য অনেক দিনের কথা; বর্তমানে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য। আধুনিক মিশরের বড় বড় উৎসবগুলি মূলত ধর্মীয়।

নীল নদীর তীরের দেশটি যেমন শ্যামল-সুন্দর, তেমনি ইসলাম-ধর্মে অনুরক্ত মিশরবাসী। মহরম, রাবেয়া, রেসেব, ইমাম এস সাহাফি, রামাডান, এস-রেট-এস-সাগীর, এস এচ এল-কেবীর প্রভৃতি ইসলামীয় উৎসব মিশরীয়দের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত। এখানের এই জাতীয় উৎসব-সকল চান্দ্র মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের দিনে মিশরীয় জীবনধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার অনুভূত হয়। তারা নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে, নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি ক'রে উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত উটের শোভাযাত্রা পথে পথে সৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরবেশদের নানা রঙের ও ঢঙের পোশাক ও আনন্দ-চাঞ্চল্য তাদের এই প্রাণ-চাঞ্চল্য তাদের জাতীয় চরিত্রেরই পরিচায়ক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা যেমন একনিষ্ঠতার দ্বারা সাফল্যের সুউচ্চ-শিখরে আরোহণ করতে চায় তেমনি তারা উৎসবের দিনগুলিকে আনন্দ মুখর ক'রে তোলে। এইখানেই মিশরীয় নরনারীর প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ।

আধুনিক মিশরীয়দের মধ্যে কায়রোর সমর সময় যে জাতীয় উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় তা প্রায়ই প্রথাগত-ভাবে। মিশরীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। তাদের জাতীয় জীবনের বহু ক্রিয়াকর্মে সেই ঐতিহ্যাশ্রিত প্রথা-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এবং এইসব অনুষ্ঠানে উৎসব হয়ে থাকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। দরবেশদের আগমনও এই সময়ে—তাদের পোশাক পরিচ্ছদও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেউ মাথায় দেন সাধারণ পাগড়ী কেউ বা তুরস্কের ফা-উক্ টুপি, পরিধানে মিশরীয় পোশাক।

মহরমের সময় মিশরীয়দের তাজিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মিত হয়। এই তাজিয়ার সোনালী-শিল্প কর্ম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন তাজিয়া বহন ক'রে মিছিল ক'রে চলে সেই সময় তাজিয়ার ধারে ধারে রূপোর ঘণ্টাগুলি মিষ্টি শব্দ তোলে—টুং টাং।

রাবেয়া উৎসবও মিশরীয়দের জাতীয় উৎসবের মধ্যে একটি। এই উৎসব মহাপুরুষের জন্ম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শেষের উৎসব মিশরে ইমাম আলীর কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়ে আসছে। এবং ইমাম এর সাকীর জন্মদিনেও এক জাতীয় উৎসবে মিশরবাসী মুখর হয়ে ওঠে। রামাডান উৎসব বছরের নবম মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের রাত্রিকে বলা হয় নব-চন্দ্র-দর্শনের রাত্রি। কোনো মক্ক অঞ্চলে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় মুক্ত আকাশ তলে উপনীত হওয়ার রেওয়াজও আছে।

বছরের দশম মাসের প্রথম তিন দিন মুসলমানদের মধ্যে আর দুটি উৎসব মিশরে অনুষ্ঠিত হয় একটি হচ্ছে এল-এড এল-সুগায়ির অপরটি মিশরের প্রধান জাতীয় উৎসবগুলির ক্ষেত্রে অপ্রধান। বছরের শেষ মাসে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় উৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম এল-এড এল্ কেবীর। এই মাসের শেষ তিন-চার দিন ব্যাপী এই উৎসব চলে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবস্থানুযায়ী নতুন পরিধান ক'রে মসজিদে নামাজ করতে পথে যাত্রা করে। এই প্রার্থনা আলোচ্য উৎসবের প্রথম দিন সূর্যোদয়ের সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের মধ্যে মসজিদে ও পথে সৌহার্দ ও উপহার বিনিময় করে, চাকরবাকরকে বকশিস্ করার রেওয়াজও মিশরে আছে।

মিশরের প্রধান প্রধান জাতীয় উৎসবগুলি ভিন্ন কতকগুলি অপ্রধান উৎসব বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলিরও ঐতিহ্য বহু প্রাচীন এবং এগুলির আড়ম্বরও দেখবার মতোই। ইষ্টার রবিবারের কপ্‌টিড্ উৎসবের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব উৎসব মিশরের কায়রো সহরে যেমন হয় তেমনি গ্রামাঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নীল নদীর জলধারার প্রবাহিত স্রোত যেমন বহু প্রাচীন তেমনি মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রতিমা এই সব জাতীয় উৎসবগুলিও বহু প্রাচীন। কর্ম-কণ্টকিত জীবনের থেকে একটু নতুন রসাস্বাদন ঘটে মিশরীয়দের এই উৎসবগুলির দিনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আমরা বলতে পারি—

> "ঈশ্বরের শক্তি বিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমবেতহই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব।"

---

# গ্রীসের উৎসব

উমা দেবী

মানুষের মনে আনন্দ-তৃষ্ণা এক আদিম প্রবৃত্তি। সভ্য বা অসভ্য—প্রাচীন বা অর্বাচীন—এমন কোনো দেশ নেই যেখানে উৎসব-অনুষ্ঠান নেই। মানুষ চিরকালই প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের সন্ধান পেয়েছে, রূপের মধ্যে রূপাতীতের। এই অপ্রত্যক্ষ ও রূপাতীত সংবেদনা সভ্যজাতির মধ্যে দর্শনে পরিণতি লাভ করেছে, আর তার একটি স্থূল অভিব্যক্তি সমাজের উৎসব ইত্যাদিতে পাওয়া গেছে। একথা আরও বিশেষ ভাবে এইজন্যেই বলছি যে সকল দেশের সমস্ত উৎসবের পিছনেই আছে দেবতাকে খুশি করবার প্রবৃত্তি—কারণ দেবতা আমাদের দেবেন—সুখ, সন্তান, ধন আর প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন গ্রীসের উৎসবেও এই কামনার ব্যতিক্রম দেখি না।

ধরা যাক গ্রীসের ঋতু-উৎসবগুলি। আনুষ্ঠানিক ভাবেই এগুলি প্রতিপালিত হতো। হোমারের সময় উৎসব ছিল মূলত এই ঋতুগত। যখন ফসল পেকে উঠত কিংবা দ্রাক্ষাকুঞ্জে গুচ্ছ গুচ্ছ পরিপুষ্ট ফলে রস ঘনীভূত হয়ে উঠত তখন সুরু হতো উৎসব। বাঁশী বীণা বাজাতে বাজাতে দেবতার স্তুতিগান করতে করতে দেবতাকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুতো। তারপর দেবপূজার বলিকর্ম শেষ হলে সেই মাংস ভোজে লাগানো হতো। দেবতাদের নিয়ে অনেক অভিনয়ও হোতো—আর হোতো ক্রীড়ামোদ। পায়ে-হাঁটার প্রতিযোগিতার সঙ্গে থাকত ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা এবং রথচালনারও। লম্ফঝম্ফ, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘুরে-দৌড়া, কুস্তি ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা চলত আর এইসব উৎসবের খরচও জনসাধারণই বহন করত।

সুরা-উৎসবের দেবতা ছিলেন ডায়োনিসাস বা ব্যাকাস। এই দেবতা মূলত ছিল থ্রেসিয়ানদের উদ্ভিদ দেবতা। ইনি জিয়াসের পুত্র ছিলেন। এর জন্ম ইতিহাসটি কৌতূহলোদ্দীপক। এঁর মা ছিলেন সেমেলি—তিনি জিয়াসকে কান্তভাবে কামনা করেছিলেন—আর দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর বজ্রমেঘবিদ্যুৎ সমন্বিত তাঁর শক্তিদীপ্ত রূপ। কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না—মারা গেলেন। জিয়াস তখন তাঁর আসন্ন ভাবী পুত্রকে উরুতে স্থান দিলেন আর এই উরু থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ব্যাকাস বা ডায়োনিসাস—সুরার দেবতা। গ্রীসে সুরার উৎসব ছিল চারটি ডায়োনিসাস-এর চারটি রূপকে কেন্দ্র করে।

এই উৎসব ছাড়াও আরো বহু উৎসব প্রাচীন গ্রীসে প্রতিপালিত হতো—এ্যাপোলো বা সূর্যদেব, আর্টিমিস বা চন্দ্রমা দেবী ইত্যাদি। এমন কি নেক্রুসিয়া বা নেমেসিয়া অর্থাৎ মৃতোৎসব—পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে—সবই গ্রীসের সমাজ জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছিল।

অবশ্য এগুলির বিবরণ এতো কম পাওয়া যায় যে কোনো স্পষ্ট চিত্র সম্মুখে ভেসে ওঠে না। এই সমস্ত উৎসব বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট দিন পালিত হোতো। তখন কাজকর্ম সব বন্ধ থাকতো রাষ্ট্রীয় আদেশে।

এখনো ফ্রান্সে বা জার্মানীতে সুরা উৎসব বা দেখা যায় তার অনুসরণে আমরা প্রাচীন গ্রীসের সুরা-উৎসবকে খানিক কল্পনা করে নিতে পারি। কৃষকেরা মশাল জেলে চীৎকার করতে করতে আর নানা ভঙ্গিমায় নাচতে নাচতে দ্রাক্ষাকুঞ্জে প্রবেশ করতো—রসের ফসল জাগানোর কাজে লেগে যেতো। নৃত্য-গীত ও চীৎকার যত উন্মাদনাময় হোতো দেবতা ততো খুশি হতেন। উৎকট আনন্দে মশাল জেলে বনভূমিতে প্রবেশ করে পশু শিকার করে তারা তা চিরে ফেলতো। সুরা-দেবতার ভক্তেরা ছিলেন মাংসপ্রিয়—বিশেষ করে ষাঁড় আর

ছাগলের মাংস। শোভাযাত্রা—সাজগোজ—আর নানান রঙের নাট্যাভিনয়—এইগুলি ছিল উন্মাদনাময় মেলা-উৎসবের রূপ।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রীসের জাতীয় উৎসবগুলি যেগুলি মূলতঃ ছিলো ক্রীড়ামোদ। অবশ্য ধর্মের সঙ্গে এগুলিরও যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। এই জাতীয় উৎসবের গুরুত্ব গ্রীসের নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কারণ সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়নে এই ক্রীড়া-উৎসবগুলির প্রভাব ছিলো অপরিসীম।

গ্রীসের এই ধ্রুপদিক ক্রীড়ামোদগুলির সূচনা হয় কোনো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো দেবপূজার অঙ্গরূপে বা স্মৃতিরূপে। বাস্তবিকই প্রথম ক্রীড়া-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পেট্রোক্লাসের মৃত্যুকে স্মরণ করে। এই সব উৎসবগুলির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত হতো কোনো মন্দির-প্রাঙ্গণে কোনো দেবতা বা বীরপুরুষকে স্মরণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের আগে কোনো জীবিত ব্যক্তি এ উৎসবগুলির কোনোটিরই কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন না।

ইলিয়ড ও ওডিসিতে এ্যালসিনোয়াসের রাজসভায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়ামোদের যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলিও মূলতঃ ছিলো মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ডায়োক্তলন, পা-বৌড এবং রথচালনা।

যাই হোক একথা বলা চলে যে এই ক্রীড়ামোদ-প্রতিযোগিতাগুলিই গ্রীসের জাতীয় উৎসবের সেরা উৎসব। ওলিম্পিয়ান, পিথিয়ান, নিমিয়ান ও ইস্থ্‌মিয়ান ক্রীড়ামোদগুলি এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির মধ্যেও ওলিম্পিয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ।

পিথিয়ান ক্রীড়া ডেল্‌ফির স্থানীয় উৎসব ছিল। এ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হোতো এবং এটি ছিল সঙ্গীতপ্রধান। প্রথমে প্রতি চার বছর অন্তর ও পরে আট বছর অন্তর এই উৎসবের অনুষ্ঠান হোতো।

সব উৎসব সকলের জন্য অবারিত ছিলো না। যেমন জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত নিমিয়ান ক্রীড়া-উৎসব, সমস্ত গ্রীসের জন্য উন্মুক্ত ছিল কিন্তু ইস্থ্‌মিয়ান ক্রীড়া-উৎসবে ইলিয়ানরা স্থান পেতো না। নিমিয়ান উৎসবে রথচালনার প্রতিযোগিতা হতো না আর এতে পুরস্কার দেওয়া হতো বুনো সেলেরির মালা। ইস্থ্‌মিয়ান্ ক্রীড়া-উৎসবে বিজয়ীর পুরস্কার ছিলো বুনো সেলেরি কিংবা পাইনের মুকুট।

ওলিম্পিয়ান্ ক্রীড়া-উৎসবই প্রাচীনতম ক্রীড়ানুষ্ঠানের নিদর্শন এবং একমাত্র এইটিই এখনো পর্যন্ত চালু আছে।

এলিসের সমভূমিতে ওলিম্পিয়া বলে একটি স্থান আছে—এর চারপাশ ঘেরা। এখানে জিউসের মন্দির এবং অ্যাটলিসের সুন্দর বিজয়ী ক্রীড়ামোদীদের মর্মর মূর্তিও আছে। গল্প শোনা যায়—এইখানেই হেরাক্লস্ রাজা অজিয়াসকে নিহত করে এলিস জয় করেন এবং এইখানেই জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পিণ্ডারের একটি কবিতায় এই কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অন্য গল্পও প্রচলিত আছে। এই গল্পানুসারে কোনো এক সময়ে গ্রীস মহামারীতে যেতে বসেছিলো। সেই সময় ইফিটাস্ দৈববাণী পেয়েছিলেন যে ক্রীড়া-উৎসবগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রীস বেঁচে যাবে। ওলিম্পিয়ার হেরার মন্দিরে একটি পিতলচক্রে এখনও ইফিটাসের নাম পাওয়া যায়।

এই সব ক্রীড়া-উৎসবগুলি যখন অনুষ্ঠিত হতো তখন গ্রীসের বিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যেও সাময়িক শান্তি-চুক্তি মেনে নেওয়া হোতো এবং এটিও শোনা যায়, ইফিটাসের চেষ্টাতেই সফল হয়েছিল।

পূর্বে ওলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসব ছিল স্থানীয় গ্রাম্য উৎসব। মাঝে কিছুদিনের জন্য এক খৃষ্টান সম্রাট এই

উৎসব বন্ধ করে দেন। পরে আবার এই অলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসব সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পায়।

এবার প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়া উৎসবের একটি চিত্র নেওয়া যাক।

সমস্ত গ্রীসে রাজদূতেরা ঈশ্বরের অনুমত শান্তি ঘোষণা করেছেন। বিবাদ তিরোহিত। শত্রুতা শান্ত। দশজন বিচারক এসেছেন গ্রীসের বিভিন্ন শাখা জাতি থেকে। শাদা রঙের শিবির বানানো হয়েছে। কর্তব্য কর্মের নির্দেশানুসারে তাঁরা এই শিবিরে সপরিবার হোলো সাময়িক বাসা বেঁধেছেন। এলিস শহর থেকে একটি রাস্তা এসে এখানে মিশেছে—আসছে সেই পথ বেয়ে জনস্রোত। ভীড় বাড়ছে। ক্রীড়ানোদীরাও এসেছেন—তাঁরা ক্রীড়াভ্যাসে রত হয়েছেন। বন্দিদের ভেট বয়ে নিয়ে পুরোহিতেরা আসছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ানুসারে মেয়েরাও যোগ দিতে কেউ কেউ এসেছেন—এঁরা ডিমিটারের স্ত্রী পুরোহিত।

ভোর হোলো। ক্রীড়ায় যোগদানকারীরা বিচারকদের সামনে এলেন তাঁদের খাঁটি গ্রীকত্ব প্রমাণিত করতে। প্রমাণ দিলেন তাঁদের আত্মিক ও নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার। শপথ গ্রহণ করলেন—ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কোনো অন্যায় পথ তাঁরা অবলম্বন করবেন না। স্টেডিয়ামে গেলেন। অঙ্গ থেকে বস্ত্রোন্মোচন করলেন। অঙ্গে অনুলেপন দিলেন—তারপর দাঁড়ালেন সার সার লাইন বেঁধে। এবার দর্শকদের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা আহ্বান জানালেন—যদি কেউ প্রতিযোগীদের কারুর সম্বন্ধে চরিত্রগত বা বংশগত কোনো সংশয় পোষণ করেন তো—এখনি বলুন। দর্শকেরা নীরব। এইবার ভেরীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ারম্ভ হোলো।

অন্তত চব্বিশ রকমের খেলা হোলো। প্রথম প্রথম একদিনেই উৎসব শেষ হোতো—পরে পাঁচদিন পর্যন্ত বেড়ে গেলো। পা-দৌড়ের খেলাতে শোনা যায় স্পার্টান যুবকদেরও কেউ কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুলাভ করতেন। যাঁরা কুস্তিগীর ছিলেন তাঁরা সর্বাঙ্গে তেল মাখার পর বালি ছিটিয়ে দিতেন। রথ প্রতিযোগিতায় রথ টানত ঘোড়া—ঘুড়ী আর খচ্চর।

অলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসবে বিজয়ী বীর পরলেন বুনো অলিভের মালা। আরো বহু পুরস্কারও পেলেন। প্রথমে তাঁর নাম ঘোষিত হোলো—তারপর তাঁর পিতা-মাতা ও দেশের নাম। সোনার কাজ করা হাতীর দাঁতের টেবিলের ওপর থেকে এর পর অলিভের মুকুট তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হোলো আর হাতে দেওয়া হোলো তাল-পল্লব। তারপর তাঁকে জিউসের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হোলো। পথের দু'ধারে দাঁড়ালেন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নানা দামী উপহার হাতে নিয়ে। পথে ফুল ছড়ানো হোলো গানের সঙ্গে। গ্রীক ক্যালেণ্ডারে তাঁর নাম থাকলো।

দেশে ফিরে তিনি পেলেন প্রচুর অর্থ ও উচ্চ পদ। তাঁর নামে কবিতা রচনা করলেন কবিরা। ভাস্করেরা তাঁর মূর্তি খোদিত করলেন রাষ্ট্রের নির্দেশে। বেদী তৈরী হোলো—তাঁর নামে বলি উৎসর্গ করা হোলো। এক কথায় অলিম্পিয়া তাঁকে দিল পৃথিবীর সর্বসুখ। তাই অলিম্পিয়ার বিজয়ীবীর সম্বন্ধে বলা হোতো—"এর পর স্বর্গে গিয়ে দেবত্ব লাভ করা ছাড়া তাঁর আর কিছু চাইবার নেই।"

# বিচিত্র উৎসবের দেশ ব্রিটেন

নির্মলেন্দু মান্না

এ যুগের পৃথিবীতে কোথাও রাজা থাকুক আর না থাকুক, শেষ পর্যন্ত পাঁচটি রাজা থাকবেই, এক প্যাকেট তাসের মধ্যে চারটি, আর গ্রেট ব্রিটেনে একটি। কথাটা বলেছিলেন ফারুক—রাজ সিংহাসন ত্যাগের সময়। এ থেকেই ব্রিটিশ চরিত্রের একটা আশ্চর্য দিক ধরা পড়ে গেছে আর সেটা হোল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে শত শত বৎসর ধরে সংগ্রাম চালিয়েও ব্রিটেনের মানুষ বিস্মৃত হয়নি তার আপন ঐতিহ্য। নানা ঘটনার সংঘাতে বিটিশ চরিত্র বিবর্তিত হয়েই চলেছে কিন্তু সেটা ঘটছে ঐতিহ্য অনুসরণ করে, বর্জন করে নয়।

ফলে গণতন্ত্রী গ্রেট ব্রিটেনের মানুষ রাণীর শোভাযাত্রা দেখার জন্যে পথের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, আধুনিকতম শিল্প ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দ্বীপবাসী প্রাচীন প্রথা ও উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। বস্তুতঃ বাণিজ্যনির্ভর ব্রিটেনের একদিকে কাজের লোকের পোষাক আর একদিকে লর্ড মেয়র অফ লণ্ডন, হেরাল্ড, নাইট অফ গার্টার কিংবা রাণীর দেহরক্ষীর পোষাকের বাহার দেখলে পাঁচশো বছর আগের ও পরের ব্রিটেনকে একসঙ্গে মনে না পড়ে উপায় নাই। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড ড্রেস তো সত্যিই দেখবার জিনিষ। কোন কোন স্কুলের ছাত্ররাও ( যেমন ক্রাইস্ট হাসপাতালের ইস্কুল ) যে পোষাক পরে ক্লাস করে তাতে মনে হতে পারে এদের বোধ হয় রোজই ফনভোকেশনের উৎসব।

যে জাতি যত বেশি ঐতিহ্যপ্রিয়, তার উৎসবের তত বেশি ঘটা। অন্ততঃ এ বছরের গ্রেটব্রিটেনকে দেখলে এ কথা স্বতঃই মনে হয়।

প্রথমেই ধরা যাক মহাকবি শেক্সপীয়রের চতুঃশতবার্ষিকী উৎসবের কথা। শুধু স্ট্র্যাটফোর্ড আপন-অ্যাভন, লণ্ডন বা চিচেস্টার নয়, সারা ব্রিটেন এমন কি সারা বিশ্ব মেতে উঠেছিল এই উৎসবে।

এরপর অগস্টের প্রথম দিকে যন্ত্র এবং রকারদের উৎসবে গেল, দলে দলে নরনারী ছুটল সমুদ্র উপকূলের দিকে। জুলাই আর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে যথাক্রমে উইণ্ডসর ক্যাসল এবং এডিনবরায় পুষ্প প্রদর্শনী হয়ে গেল।

সঙ্গীত, নাটক এবং ব্যালের নামে ব্রিটেন আত্মহারা। ওয়েলশ ( Welsh )-এর কবিতা ও সঙ্গীতের উৎসব শুধু ব্রিটেনে নয়, সারা ইয়োরোপে বিখ্যাত। আর এই প্রসঙ্গে আসে এডিনবরার বিশ্ববিখ্যাত উৎসব ও মেলার কথা। এটিকে আমরা আন্তর্জাতিক উৎসব বা বিশ্ব-মেলা বলতে পারি। সঙ্গীত, নাটক ও শিল্প-কলার এক বিরাট সমাবেশে এবৎসরের অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক উৎসব সারা বিশ্বের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উৎসবের অনুষ্ঠান সূচীতে যে সব অজস্র আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তার মধ্যে শেক্সপীয়ার প্রদর্শনী, ওল্ড ভিক কোম্পানীর অভিনয়, হাইল্যাণ্ডের নাচ ও বাজনা এবং প্রাগ জাতীয় থিয়েটারের অপেরা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

এই উৎসবের আর একটা বিশেষ দিক হচ্ছে তরুণদের অভিনয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল এই মেলার মাধ্যমে।

এ ছাড়া এই উৎসবের অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী দেলাক্রোয়-এর পেন্টিং, ড্রইং এবং লিথোগ্রাফ-এর প্রদর্শনী এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য।

আর একটি প্রদর্শনী মারফত উপস্থাপিত করা হয়েছিল সকল দেশের পুতুলের মেলা। উৎসব কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল একই সঙ্গে মেলা ও মিউজিয়ম।

এবারে বলি গ্রেট ব্রিটেনের কয়েকটি বিচিত্র মেলা ও উৎসবের কথা। খেলাধূলাকে ওদেশের লোক এক টা মেলা বলেই ধরে নিয়েছে। জুলাই মাসে হেনলি রয়্যাল রিগাটা বা হেনলি-অন-টেমসে তাই বাচ খেলা দেখতে ভিড়ের অন্ত ছিল না। আইল-অফ-ম্যান-এ মোটর সাইকেলের দৌড় প্রতিযোগিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এ যুগের ব্রিটেনের অনেক উৎসব যন্ত্রনির্ভর। আবার লর্ডসের তীরধনুকের খেলা লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা আমাদের নিয়ে যায় সুদূর অতীতে। এই সঙ্গে স্মরণ করুন ঈডস, র‍্যাকেস্টার কিংবা লণ্ডনের ওভাল ময়দানে ক্রিকেট খেলার কথা—সারা বিশ্বের দর্শক যেখানে জমায়েত হয়েছে—তাহলেই বুঝতে পারবেন ব্রিটেনের উৎসব কত বিচিত্র পথে প্রতিনিয়ত মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আনন্দের অভিসারে।

অক্টোবরে আমরা যখন মহাপুজোর আনন্দে মেতে উঠি তখন ব্রিটেনের মানুষ ছোটে ব্লাকপুলে যেখানে আলোর অক্ষরে বড় বড় করে লেখা হয় "ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড"। এত বড় মেলা ব্রিটেনে খুব কমই আছে। সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ সাত মাইল পথ জুড়ে আলোর মেলা বসে। শীত আসছে, ইয়োরোপের অঙ্গন নিতে আসছে উৎসবের আলো, অতএব চলো আলোর রাজ্য ব্লাকপুলে। এইজন্যেই লোকে আদর করে এর নাম দিয়েছে "দি লাইটস।" এই মেলার জন্যে কেবলমাত্র ব্লাকপুল কর্পোরেশনই খরচ করে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মতো, এ দেশের টাকার হিসেবে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, এ যে বিরাট বারোয়ারী চাঁদা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শীতকালে এবং শীতের অবসানে দুটি ধর্ম কেন্দ্রিক উৎসবে গ্রেট ব্রিটেন বিপুলভাবে মেতে ওঠে। এর একটি হোল ডিসেম্বরের ক্রিসমাস উৎসব এবং অপরটি ইস্টারের উৎসব। এ দুটিই খ্রীস্টধর্মকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিসমাস হোল যীশু খ্রীস্টের জন্মদিনের উৎসব। এই দিনে সবাই তাঁর প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ করে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রিয়পরিজনেরা একত্রিত হন, তারপর চলে ক্যারল গান। প্রতিটি বাড়িতে পথে এবং দোকানে দেখা যায় ক্রিসমাস ট্রি ও সান্টা ক্লস। নাচ, গান, উপহার দান-প্রতিদান এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এই উৎসবের অঙ্গ। সংসারের বাস বিসংবাদ ভুলে মানুষ এই সময় সন্ধান করে প্রেম ও শান্তি।

এই প্রসঙ্গে ক্রিসমাস মুকাভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সিণ্ডারেলা'র সেই গরীব মেয়ের গল্প, 'রবিনসন ক্রুসো'র সেই নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, কিংবা 'আলাদীন' কি 'জ্যাক অ্যাণ্ড দি বিন্‌স্টক' এর চমকপ্রদ কাহিনী যুগ যুগ ধরে ছোট বড় সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।

শীতের শেষে আসে বসন্ত, একদিকে জেগে ওঠে নিদ্রিত পৃথিবী, অপরদিকে ধর্মপ্রাণ নরনারী স্মরণ করে যীশু খ্রীস্টকে যিনি ইস্টারের রবিবার সকালে কবরের মধ্য থেকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বসন্ত কালের অ্যাংলো-স্যাক্সন দেবীর নাম থেকেই ইস্টার কথাটা এসেছে। মার্চ ও এপ্রিলের মধ্যে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এর চিরাচরিত প্রতীক হোল ইস্টার লিলি, সদ্যোজাত ভেড়ার ছানা, বাচ্চা খরগোশ এবং ডিম। প্রাচীন প্রথার দেশ ল্যাঙ্কাশায়ারে এ সময় দেখা যায় গাধা ঘোড়া সব চলেছে মাথায় রঙীন টুপি পরে আর তাদের গলায় ঝুলছে রঙীন ফিতে ও ফুলের তোড়া।

ইস্টারের সোমবারে ব্রিসটলের অ্যাডেলহ্যাম পার্কে এক আশ্চর্য উৎসব দেখা যায়। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে অবাক চোখে দেখে ইস্টারের রঙীন ডিম আর কমলা লেবু ঢালু পথ বেয়ে গড়িয়ে চলেছে।

লণ্ডনের 'ড্যান হর্ণ ইস্টার প্যারেড' এবং শোভাযাত্রা নাকি কখনো ভোলবার নয়। চকচকে ভ্যান বা গাড়ি, ঝকঝকে পোষাক পরা, রঙ করা সব ঘোড়া, ঘোড়ার ল্যাজে আবার বিনুনী, আর তাদের আনন্দই বা কতো, আর গাড়ীর চালকের পেছনে পরিবারের লোকজন, তারা আবার তাদের ঘোড়াকে টেক্কা দিয়ে সাজগোজ করেছে। সব মিলিয়ে এক রঙীন উল্লাসমুখর উৎসব।

এই হোল ব্রিটেনের উৎসব-জীবন বা দ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রার এক বিশেষ দিক। এর মধ্যে আছে ক্রিসমাস ও ইস্টারের ধর্ম-উৎসব, পুষ্প প্রদর্শনী জাতীয় ঋতু উৎসব, শেক্সপীয়র চতুঃশতবার্ষিকী ও এডিনবরা ফেস্টিভ্যালের মতো নৃত্য-গীত-অভিনয় সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসব, ম্যাটল্যাণ্ডের লোক-উৎসব, গলফ ও ক্রিকেটের ক্রীড়া-উৎসব, ধনুর্বিদ্যার প্রাচীন উৎসব ও মোটর রেসের আধুনিক যন্ত্র-কেন্দ্রিক উৎসব। শেক্সপীয়রের ভাষায় "This blessed plot, this earth, this realm, this England"—এই দেশ যে উৎসবের দেশ আনন্দের দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

---

উৎসবের দিনে

উৎসবের দিনগুলি সার্থক হয়ে ওঠে যখন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়জনদের হাতে তাদের পছন্দমত বস্ত্রসম্ভার পরিবেশিত হয়। স্বদেশী-যুগে বিলাতী লৌকীন বস্ত্র ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মহান্ ব্রত বাঙ্গালী গ্রহণ করেছিল আর সেই ব্রত সার্থক করে তুলতে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্ম হয়েছিল। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে আর তার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দেশের সেবায় ৫৬ বৎসর

বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

# উৎসবের দেশ—ফ্রান্স

## সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসবের দেশ ফ্রান্স। সেই উৎসবের বৈচিত্র্য যেমন মনোমুগ্ধকর, তার বৈভবের বিলাসও তেমনি বিস্ময়কর। দুঃখ বা শোক—যে উৎসবই হোক না কেন, আনন্দমুখর হয়ে ওঠা ফরাসীদের স্বভাব। তার প্রকাশ বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র।

নববর্ষের উৎসব দিয়ে ফরাসীরা তাদের বছর আরম্ভ করে। নিকট-দূর, ছোট বড় সকল আত্মীয়কে নিয়ে গড়ে ওঠে ফরাসীদের সংসার, বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের মতো। পারিবারিক ও সামাজিক মিলন, এবং উপহার-বিনিময় এ উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। সকালবেলা বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের তৈরী উপহার মা-বাবাকে দিয়ে দিনের উৎসব শুরু করে। ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক সৌজন্য প্রকাশ করে খরিদ্দারের বাড়ী উপহার পাঠিয়ে—মাছ-ব্যবসায়ী পাঠায় মাছ, ডিম-ব্যবসায়ী পাঠায় ডিম ইত্যাদি। আর এই ভার নিয়ে যে আসবে, সে বকশিস্ পাবে মদ ও টাকা। চাকর-ঝেরানীরা পাবে দু'মাসের মাইনে, আর প্রিয়জনদের মধ্যে আদান-প্রদান হয় চকোলেট-মিষ্টি-ফুল-ফল। নববর্ষের খানাপিনায় দূরের নিকটের প্রিয়জনেরা জমায়েত হবে সংসারের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তির বাড়ী। বিকেলে ছোটরা যাবে বড়দের বাড়ী বেড়াতে, পুরুষ যাবে তার নারী-বন্ধুর কাছে। আকাশে বাতাসে উৎসবের আনন্দ-মুখরতা ছড়িয়ে পড়ে।

৬ই জানুয়ারী "রাজার দিন", মুখ্যত ছোটদের উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন রূপ। বাচ্চাদের মধ্যে থেকে তিনজনকে রাজা সাজানো হয়, জমকালো পোষাক আর কাগজের মুকুট পরিয়ে। দুঃস্থদের এরা সাহায্য করে গান গেয়ে, আর দোরে দোরে ঘুরে ডিম কেক চেয়ে বেড়ায়। গৃহকর্তারা "ছোট অভ্যাগতদের" যেন খাদ্য-পানীয়-জামা-টাকা ইত্যাদি উপহার। "রাজার-কেক"অনুষ্ঠানে যেমন উত্তেজনা, তেমনি জমজমাট ব্যাপার। গোল ও চ্যাপ্টা ধরণের বিরাট কেক নিয়ে আসা হয় বাসনে ঢেকে ছোট একটা টেবিলে করে। কেক কাটার সময়টাই সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ কেক কেটে কেটে যখন বিলানো হয়, সভীর আগ্রহ নিয়ে সকলে অপেক্ষা করে কেকের মধ্যে, সিদ্ধ করা বন্য বা পুতুল কার ভাগ্যে পড়বে। বিতরণের পর বাড়তি কেক যেওয়া হয় প্রথম যে ভিক্ষুক দ্বারে আসবে, তাকে। এই অংশটুকুকে তারা বলে, "ভগবানের প্রাপ্য অংশ।"

এর পরের উৎসব "ফুলের উৎসব"। আমাদের দেশের হোলির খেলায় যেমন আবিরের মেলা, ফরাসীরা তেমনি ফুলের খেলায় পরস্পরের প্রতি ফুল ছোঁড়াছুড়ি করে। গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে তারা হুল্লোড় করে পথ চলে। আমাদের দেশে গাজনে যেমন সঙ সাজে, প্যারিস নগরী বা অন্যত্র তেমনি এই দিনে রথকে সাজিয়ে নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।

আমরা ওদের অনুকরণে বলি "এপ্রিল ফুল", ফরাসীরা বলে "এপ্রিল ফিস"—উদ্দেশ্য একই—পয়লা এপ্রিল বোকা-বানানো। নানা-ধরণের মাছের ছাঁচের কেক দিয়ে দোকান সাজানো হয়। বন্ধুরা পরস্পরের কাছে মাছের ছবি পাঠায়।

Mid-Lent হচ্ছে খৃষ্টানদের ৪০ দিন-ব্যাপী উপবাস-পর্ব। ইষ্টারের পূর্বের কোনও এক বুধবারে এর শুরু, এবং শেষ ইষ্টারে। এই উৎসবে ধোপানীরা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক জেলা থেকে ধোপানীরা

এক এক জনকে রাণী নির্বাচিত করে। এইসব রাণী ধোপানীরা আবার একজনকে "পাটরাণী" করে, আর সেই "পাটরাণী" স্বভাবতই একজনকে রাজা মনোনীত করে এবং তারপর শোভাযাত্রা বের হয়।

চার্চের ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায় না বিশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করতে গুড-ফ্রাইডে থেকে ইষ্টার পর্যন্ত। শিশুরা জানতে চায়—"ঘণ্টা কেন বাজে-না?" মা বলেন—"কি করে বাজবে! ঘণ্টা যে রোমে পালিয়ে গেছে।"

ইষ্টারের ভোরে শিশুরা ছুটে যায় বাগানে—আজ ভোরেই তো ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাবে; ঘণ্টার যে আজ ফেরার কথা আছে রোম থেকে! ছোটরা যখন এই রকম করে, বড়রা তাদের জন্য লুকিয়ে রাখে চকোলেট ডিম ইত্যাদি নানা ধরণের খাবার।

"কই, ঘণ্টাটা যে ফিরলো, দেখতে পেলাম না তো!" —অভিমানী শিশুরা বলে।

"ওঃ হো! আসতে দেরি করে ফেলেছো, তারা তো এইমাত্র এখান দিয়ে চলে গেল, আর যাবার সময় তোমাদের জন্যে ফেলে রেখে গেল মিষ্টি কেক, চকোলেট, আরও কত কি! শিশুরা গান গেয়ে ওঠে।

ইষ্টারের রবিবারে প্রত্যেকে একবার চার্চে যাবেই। প্রদীপ জ্বালানো হয় মঙ্গলের কামনায়, আর সেই প্রদীপ বাড়ীতে এনে তারা রেখে দেয়, ভবিষ্যতে মাঙ্গলিক কোনও অনুষ্ঠানে জ্বালাবে বলে।

ইষ্টারে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া একটা প্রচলিত সংস্কার, কারণ ইষ্টার নবজীবনের সূচনার প্রতীক।

১লা মে বিলাসী ফরাসীরা "লিলি-উৎসব" করে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে বনে-বাদাড়ে ছুটে যায় প্রথম লিলি ফুলটি তোলবার আশায়। ফুলের আতর মাখিয়ে দূরের প্রিয়জনকে পাঠানো হয় শুভেচ্ছা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রী হয় লিলি। লিলি তাদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক, মনের মানুষের কাছ থেকে লিলি উপহার পাওয়া পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। লিলি ফুলের সমারোহ এদিন ফরাসীদের মাতিয়ে রাখে।

সেন্ট জেন্স-এর নামে বছরে দুবার উৎসব হয়—১৫ই মে'র পর যে রবিবার, এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার ও রবিবার। এই দুবারেই একই ধরণের অনুষ্ঠান হয়—আর্তের জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। সেন্ট জেন্সকে কল্পনা করা হয়—তিনি যেন লাঙল হাতে জমি চষতে ব্যস্ত, আর তার সঙ্গে আছে একটি ষাঁড ও একটি নেকড়ে। প্রবাদ আছে—এই মহাত্মা দূরের এক নির্জন স্থানে চাষ করতেন একদল ষাঁড়কে নিয়ে। একবার একটি নেকড়ে একটি ষাঁড়কে হত্যা করে। ফলে শাস্তিস্বরূপ, তাকেও এখানে কাজ করতে হয় এই ষাঁড়েদের সঙ্গে।

জিপ্‌সীদের উৎসব ২৪শে আর ২৫শে মে। হাজার হাজার জিপ্‌সী সারা পৃথিবী থেকে বছরে একবার জমায়েত হয়। বাধনা বাজিয়ে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পেপে তারা মেতে উঠে নাচে-গানে-সাজে-সজ্জায়। অর্থ-পেশা-নির্বিশেষে সকলেই তারা এই উৎসবে যোগ দেয়, কারণ এখানে তাদের এক পরিচয়—তারা তীর্থযাত্রী। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস—Sara হচ্ছে কুমারী মেরীর সম্পর্কে বোন। কারুর কারুর বিশ্বাস—Sara হচ্ছেন একজন রাণী বিশেষ, মহাত্মাদের সঙ্গে তিনি একযোগে কাজ করেন ও তাদের মৃত্যু হলে তিনি সমাধিস্থ করেন। ২৫শে মে বিসর্জনের দিন। দুজন মেরীর মূর্তি নিয়ে তারা চার্চ থেকে নদীতে যায় বিচিত্র ধরণের সাজগোজ করে। যেসব পোষাক পরে মেয়েরা শোভাযাত্রা করে যায়, তাদের অনেক পোষাকই পুরুষানুক্রমে মা থেকে মেয়ের হাতে এসে পৌঁছেছে।

ইষ্টারের ১৭ দিন বাদে সমগ্র নগরবাসী দুদিন গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণে আর চড়ুই ভাতিতে কাটিয়ে আসে।

সারা জ্যান্সে নানা ধরণের উৎসব হয় বিভিন্ন সেন্টের সম্মানার্থে। তবে যে সেন্ট যেখানকে কেন্দ্র করে যে উৎসব, তাতে নানা ধরণের নানা আচার দেখা যায়। আগুনের শিখাকে ঘিরে নাচ-গানের ধুম লেগে যায়। কয়েক জায়গায় ধারণা আছে—জোয়ান লোকেরা যতদূর পর্যন্ত লাফাতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত শস্যের শীষ উঁচু হবে।

১লা ও ২রা নভেম্বরের উৎসব All Saints' day আর All Souls' day। বিভিন্ন মহাত্মার স্মরণে প্রথম দিনের উৎসব, আর দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সপ্তাহ পূর্বে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নারীরা যায় পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটিকে ফুল দিয়ে সাজাতে। উৎসবের দিনে আত্মীয়-পরিজনে মিলিত হয়ে মৃত আপনজনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বছরের শেষ বড় উৎসব ২৪শে ডিসেম্বর Christmas Eve। ফরাসীরা ছোট ছোট মূর্তি তৈরী করে রূপ দেয় শিশু যিশুকে—যোসেফ আর মেরী, মেষপালক ইত্যাদিকে। কোথাও বা এটা রূপ পায় মাটির মূর্তিতে। এগুলির মধ্যে শুধু যে পরিবারের চিত্রই রূপ পায়, তা নয়, গ্রাম্য নানা পরিচিত পরিবেশ ও চরিত্রের পুতুলের মেলা বসে। মধ্যরাত্রে চার্চের ঘণ্টাধ্বনি জানিয়ে দেয় যিশুর জন্ম-মুহূর্ত আর শুরু হয় ক্রীষ্টমাস। প্যারীনগরীর উৎসব জাঁক-জমকে ভরা আর গ্রামীণ উৎসবে সাদাসিধে ভাব। দুচাকার একটা ছোট গাড়ীতে মেষপালকেরা প্রদীপ জ্বালায়, আর সেটা টেনে নিয়ে যায় একটি মেষ। এটাকে সাজানো হয় ফুলে-মোমবাতিতে মনোহারী করে। এই প্রদীপবাহী শকটকে আনন্দ মুখরতার মধ্যে শোভাযাত্রা করে চার্চে নিয়ে যাওয়া হয়, আর মেষপালকেরা বাঁশী আর ড্রাম বাজিয়ে পুরানো নানা প্রচলিত গান গায়, বাতি জ্বালায়, ফুল-ফল দেয়। শোভাযাত্রার শেষে একজন মেষপালক বেদীতে পাদ্রীর হাতে সেই প্রদীপটা তুলে দেয়। এই অনুষ্ঠানের পর সমগ্র ফরাসী দেশের রীতি আছে পারিবারিক মিলন-অনুষ্ঠানে খানাপিনা করা।

ক্রীষ্টমাসের পূর্বদিন ছোট ছেলেমেয়েরা fire placeএর কাছে তাদের জুতো খুলে রেখে দেয়, তাদের ধারণা Father Christmas শেষ রাত্রে এখানে এসে থামবেন আর এগুলো বোঝাই, খেলনা আর মিঠাইতে ভরে উঠবে। নাচে গানে উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

২৫শে ডিসেম্বর ক্রীষ্টমাসের দিন। পারিবারিক খানাপিনা, সকলের একসঙ্গে সমবেত হওয়া অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। দুটির আমেজে সারা অনুষ্ঠান মুখরিত।

---

# জার্মানীর উৎসব

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জার্মানদেশের উৎসব বলতে ঐ এক কথাই বলতে হয়। খৃষ্টধর্মের উৎসবগুলিকে এই দেশ বিশেষভাবে পালন করে এসেছে। অন্ততঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত।

খৃষ্টধর্ম যখন জার্মানীতে প্রবর্তিত—তখন থেকেই খৃষ্টীয় উৎসবগুলিও প্রবর্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর Reformation-এর ফলে উত্তর, মধ্য এবং উত্তরপূর্ব জার্মান প্রোটেষ্টাণ্ট হয়ে পড়লো ( এই প্রোটেষ্টাণ্টদের Lutherian এবং Calivinist বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে ), আর পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব জার্মান হলো রোমান ক্যাথলিক। এই দুইদলে ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ লেগেই ছিল, ফলে খৃষ্টধর্মের প্রসার বা তাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক উৎসবানুষ্ঠান একটু ব্যাহত হতে লাগলো। তবু জার্মান জাতির মধ্যে নববর্ষের উৎসব এবং বড়দিনের উৎসব যথারীতি হতে লাগলো।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীতে যখন বিপর্যয় ঘটলো—তখন খৃষ্টধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতের মিশ্রণ ঘটে। তাতেও কিন্তু বড়দিনের উৎসবানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটে নি। ধর্মের দিক থেকে দেশে নানা ভাঙাগড়া অবশ্য চলছিল। Roman Catholic দল শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে এই শতাব্দীতে যখন ব্যাভারিয়া ( ১৯২৬ ), প্রুশিয়া ( ১৯২৯ ) এবং বাডেন ( ১৯৩২ ) প্রদেশরূপে গণ্য হয়—তখন রোমান ক্যাথলিকগণ বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। এমন কি নাজীরা পরে চেষ্টা করেও Protestant church ঠিক করতে পারেন নি।

ধর্মের বিরোধ যাই থাক না কেন, উৎসব-সূচীর কোনো বদল ঘটে নি। জার্মানের উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে বড়দিনের সময় খৃষ্টজন্মের প্রধান ঘটনাকে স্মরণ করার এক বিশ্বরূপ ব্যবস্থা। যীশুখৃষ্টের জীবন অবলম্বনে নাটকাভিনয় করার ব্যবস্থা এই উৎসবের একটি প্রাণময় বৈশিষ্ট্য। এই উৎসবে যীশুখৃষ্টের শেষ জীবনকে বিশেষভাবে রূপায়িত করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ জার্মানীর মিউনিক সহর থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে "ওবেরআমারগাউ" (Oberammergau) নামে একটি গ্রামে এই উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। যীশুখৃষ্টের শেষ জীবনকে বা জীবনের শেষাংশকে ইংরাজীতে Passion বলে। জার্মানীতে বিশেষ করে এই ওবেরআমারগাউ গ্রামে মধ্যযুগ থেকে এই 'প্যাসন প্লে'র অভিনয় করার উৎসব চলে আসছে। শোনা যায় একবার মহামারীতে এই গ্রাম প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় যীশুখৃষ্টের নাম স্মরণ করেই এই ধ্বংসের হাত থেকে 'ওবেরআমারগাউ' গ্রাম রক্ষা পায়, সেই থেকে জার্মানীর এই গ্রামে Passion play-র উৎসব প্রবর্তন করা হয়। প্রতি দশবছর অন্তর এই অভিনয় হয়। খৃষ্টের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন—নিয়ম হলো তাঁকে সাত্ত্বিকভাবে জীবনধারণ করে খৃষ্টীয় চেতনায় নিজেকে গ্রামে উদ্বুদ্ধ করে নিতে হবে এবং যীশুখৃষ্টের সাধনায় যখন তিনি দীক্ষিত হয়ে উঠবেন—তখন তাঁকে ঐ Passion play-তে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে।

শোনা যায় Passion play প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হয়, পরে তা ভাষান্তরিত হয়ে জার্মানীতে অনূদিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতকে যীশুখৃষ্টের জীবন নিয়ে নাটকাভিনয় হতো জার্মানীর সকল ধর্মোৎসবে। তবে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই Bavarian Alps অঞ্চলের ওবেরআমারগাউ গ্রামে এই Passion play-র উৎসব

শুরু হয়। খৃষ্টের জীবন, তাঁর উপদেশ, দুঃখ বেদনাকে স্বীকার করার মানবতার জন্যে তাঁর অমৃত সাধনা, এবং মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে লেখা এই Passion play. এই উৎসব প্রতি দশবছর অন্তর হয় বলে—শুধু জার্মানের নয়, খৃষ্টধর্মাবলম্বী সব দেশ থেকেই সকলে আসেন—ভাবগম্ভীর এই উৎসবে যোগ দিতে। ১৬৩৩ থেকে প্রতি দশবছর পর পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে—আজ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্যে শুধু তিনবার এই উৎসব বন্ধ থাকতে পারেনি। ১৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন মিউনিক সহরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় জার্মানীর জাতীয় উৎসবে যোগ দেবার জন্যে; তিনি মিউনিক থেকে ৪৪ মাইল দূরে ঐ গ্রামে গিয়ে জার্মান ভাষায় লেখা ঐ Passion play অভিনীত হতে দেখেন। তিনি তারপর এই উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রেরণা থেকেই The Child নামে ইংরাজী নিবন্ধ নাটকটি লেখেন।

জার্মান দেশের আর একটি লোক উৎসব আছে—সেটাকেও জাতীয় উৎসব বলা যেতে পারে। সেই উৎসবের নাম হলো Wartburg Festival. বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের জন্ম তারিখে এই উৎসব পালিত হয়—এবং তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালনই এই উৎসবের মূল কথা। Wartburg হচ্ছে একটি দুর্গ—খাড়া উঁচু একটি পাহাড়ের ওপর মনোরম ভঙ্গীতে সুন্দর কয়েকটি প্রাসাদ ও উদ্যান বিশিষ্ট দুর্গ। এই দুর্গে ১৪২১ সালের ৪ঠা মে মার্টিন লুথার Federick the Wise-এর দ্বারা আনীত হন—এবং এখানেই তিনি New Testament অংশের অনুবাদ শেষ করেন। হয়তো এই ঘটনাকে স্মরণ করেই নভেম্বর মাসে Wartburg Festival অনুষ্ঠিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা এই উৎসবে জমায়েত হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠে; এই উৎসবটি ভারতবর্ষের গ্রাম্য মেলার মতো, মিষ্ট এবং প্রাণবন্ত। মার্টিন লুথার নভেম্বর মাসের কত তারিখে (১৪৮৩ সালে) জন্মগ্রহণ করেন—তাই প্রতি বছর সেই সময় নভেম্বর মাসে এই Wartburg Festival অনুষ্ঠিত হয়।


গ্রন্থশ্রীর বই

॥ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥

অংশুমান মিত্র

ইতিহাসের নায়িকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোখের বাহিরে

প্রফুল্ল দেব সরকার

মধুর এমন

চিত্তরঞ্জন ঘাইতি

ডঃ জনসনের ডায়েরী

সুবোধ ঘোষ

মুক্তিপ্রিয়া ( ২য় মুদ্রণ )

বারীন্দ্রনাথ দাস

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

প্রফুল্ল দেব সরকার

মধুর এমন

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরনী, কলিকাতা-৬

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

যদি জানতেম

কন্যা মৃগয়া ( ২য় মুদ্রণ )

স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ

সাত দিন ২·৫০

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড

১৭০/৩, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড,

কলিকাতা-৩৩

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

দু'খানি মনোরম উপন্যাস

উপনদী

মেঘ পাহাড়ের গান

আধুনিক কবিতার বই

সাগর আকাশ

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরনী, কলিকাতা-৬

# আমেরিকার উৎসব

গোপাল ভৌমিক

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই প্রবন্ধে আমেরিকা বলতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। তেমনই উৎসব কথাটাকেও প্রয়োগ করা হয়েছে খানিকটা সংকীর্ণ অর্থে। উৎসব বলতে এখানে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎসব বোঝানো হয় নি—বোঝানো হয়েছে সামাজিক উৎসব, যে উৎসবে সাধারণত সকল শ্রেণীর নরনারী যোগদান করে থাকে। এই সামাজিক উৎসবও আবার দুই প্রকারের হতে পারে—ধর্মীয় এবং ধর্ম সম্পর্কশূন্য। ধর্মীয় উৎসব সাধারণত একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উৎসবের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সুদূর পুরাকালে এর উদ্ভব হয়েছিল এবং যুগ পরম্পরায় এগুলি চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে উৎসব পালন করি, তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসও আমরা স্পষ্ট জানি না। মানুষ যখন বনের পশু পাখী শিকার করে প্রাণ ধারণ করত, সভ্যতার সেই আদিম স্তরে তার উৎসব ছিল শিকারের সাফল্য সূচক। তারপর কৃষি সভ্যতার স্তরে মানুষের উৎসব হয়েছিল কৃষিকেন্দ্রিক। কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বৃক্ষস্তরের স্মারক উৎসবও প্রচলিত আছে। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় উৎসব অবশ্য হল ঋতুকেন্দ্রিক উৎসব। বিগত দুই তিন শতকের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে আবার কতকগুলি রাজনৈতিক উৎসবেরও সৃষ্টি হয়েছে। উৎসব কথাটির মধ্যে আনন্দের ভাব অন্তর্নিহিত থাকলেও বহুক্ষেত্রে শোকাবহ ঘটনার স্মারক হিসাবেও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগের মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণে খৃষ্টান সমাজে যে উৎসব প্রচলিত তার কথা বলা যেতে পারে।

আমার আলোচ্য প্রবন্ধে আমি আমেরিকার ধর্মীয় উৎসবের কোন আলোচনা করব না। তার কারণ আমেরিকার প্রচলিত ধর্ম হল খৃষ্টান ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীর যে যে দেশে প্রচলিত সে সব দেশের সর্বত্র একই ধরণের ধর্মীয় উৎসব প্রচলিত। এক্ষেত্রে বিভিন্নতা বড় একটা থাকে না। যেমন ধরা যাক—খৃষ্টান ধর্মের দুটি বড় উৎসব হল যীশুখৃষ্টের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিসমাস এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ ও পুনরুজ্জীবন উপলক্ষে পালিত ইস্টার উৎসব। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এ দুটি উৎসব একই সময়ে এবং একই ভাবে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় উৎসবকে একটি বিশেষ দেশের বা জাতির উৎসব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অপর পক্ষে এমন কতকগুলি জাতীয় উৎসব থাকে যেগুলি সাধারণতঃ একটি বিশেষ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকার এই ধরণের নিজস্ব উৎসব নিয়েই এখানে আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রেও আবার আমেরিকার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া ভাল। আধুনিক আমেরিকা বলতে আমরা যাকে বুঝি তা হল মূলত শ্বেতাঙ্গ প্রধান। এই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকার উদ্ভব হয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো বৎসর—কলম্বসের আমেরিকা অধিকারের পর। তারও পূর্বে আমেরিকার যারা বসবাস করত তারা রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত আদিবাসী। এই আদিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার চাপে ক্রমশ ক্ষীয়মান হলেও তারা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি—তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আজও তারা বিদ্যমান। সুতরাং এই প্রবন্ধে রেড ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ বিশেষ উৎসবের কথাও আলোচনা করতে হয়। তা ছাড়া আছে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সম্প্রদায়। আমেরিকার নিগ্রোরা সকলেই খৃষ্টান বলে তাদের

ধর্মীয় উৎসব যেভাবে খৃষ্টানদেরই অনুরূপ। জাতীয় উৎসবের ক্ষেত্রেও বর্ণগত বিভিন্নতার অবকাশ নেই। তবু আফ্রিকায় ধারাবাহী নিগ্রো সমাজের মধ্যে নিজস্ব কিছু কিছু উৎসব বর্তমান আছে।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমেরিকার জাতীয় উৎসব বলতে নিম্নলিখিত উৎসবগুলিকে বোঝায়: স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিবস ২২শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই, ধন্যবাদ দানের দিবস নবেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, কলম্বস দিবস ১২ই অক্টোবর, মাতৃদিবস ১০ই মে, পিলগ্রিম ফাদার্স দে ২২ই সেপ্টেম্বর, পতাকা দিবস ১৪ই জুন প্রভৃতি। এর বাইরেও কিছু কিছু আঞ্চলিক উৎসব প্রতিপালিত হয়—যেমন দক্ষিণাঞ্চলের মর্ম ন্যারোলিনা রাজ্যের পুষ্পোৎসব। এই পুষ্পোৎসব বর্ণাঢ্যতায় ও বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয় হলেও একটি বিশেষ রাজ্যের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যে এর অস্তিত্ব নেই। আলোচ্য উৎসবগুলির মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিবস ও স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের জাতির জনক গান্ধিজীর জন্মতিথি ২রা অক্টোবর যেমন সারা ভারতে উদ্‌যাপিত হয়, তেমনই স্বাধীন আমেরিকার জনক ওয়াশিংটনের জন্মোৎসবও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছে প্রতিবৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি। পিলগ্রিম ফাদার্স ডে ও ধন্যবাদ দানের দিবস দুটি বিভিন্ন হলেও এ দিবস দুটির তাৎপর্য একই প্রকারের এবং বিবরণও প্রায় এক। এ দুটি দিবসেরই মূলে আছে পিলগ্রিম ফাদার্স নামে পরিচিত আমেরিকার পথপ্রদর্শকারী প্রথম একদল ধার্মিক ইংরেজের স্মৃতি। ইংল্যাণ্ডে এঁরা নিজস্ব মতে ধর্মোপাসনা করতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন বলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর মে ফ্লাওয়ার নামক জাহাজে ইংল্যাণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর থেকে রওনা হয়েছিলেন আমেরিকার উদ্দেশে। তাঁরাই স্মারক হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় পিলগ্রিম ফাদার্স ডে। প্রায় দুই মাসাধিক কাল সমুদ্র যাত্রার পর এঁরা এসে পৌঁছেছিলেন আমেরিকার উত্তর পূর্ব কোণের মাসাচুসেট্‌স রাজ্য এবং সেখানে নতুন প্লাইমাউথ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এঁরা নবেম্বরে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন এবং রোগে ও খাদ্যাভাবে তাঁদের প্রায় অর্ধেক নরনারীর জীবনাবসান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যের বন্ধুভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের সহযোগিতায় তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করে কি ভাবে উক্তরাজ্যে চাষ-আবাদ ও বসতির প্রবর্তন করেছিলেন সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। তাঁদের সেই প্রয়াস প্রথম ফসল পাবার পর তাঁরা রেড ইণ্ডিয়ানদের সহযোগিতায় যে উৎসব করেছিলেন তারই স্মারক হয়ে আছে এই ধন্যবাদ দানের দিবস। তাঁদের নির্বাচিত গবর্ণর উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড এই উৎসবের দিনটিকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দানের দিবস রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তদবধি পুরুষানুক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের আদেশক্রমে নবেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ধন্যবাদ দানের দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যে।

কলম্বস দিবস উদ্‌যাপিত হয় আমেরিকা আবিষ্কারক দুঃসাহসী নাবিক কলম্বসের স্মরণে। প্রতিবৎসর ১৪ই জুন তারিখে উদ্‌যাপিত পতাকা দিবসের মধ্যে নিহিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়েছিল এবং এই প্রথম পতাকাটি জর্জ ওয়াশিংটনের অনুরোধে ফিলাডেলফিয়ার বিসেস্ বেট্‌সি রোজ নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম এই পতাকায় ছিল পরপর লাল ও শাদা রঙের ১৩টি লম্বাবাস এবং নীল রঙের পটভূমিকায় ১৩টি শাদা তারা। এই তেরটি তারা ছিল তৎসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত তেরটি রাজ্যের প্রতীক।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কংগ্রেসে স্থির হয় যে কোন নতুন রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হলে এক একটি করে তারার সংখ্যা পতাকায় বেড়ে যাবে। আজ এই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় তারার

সংখ্যা হয়েছে ৫১টি। আমেরিকার উৎসবগুলির মধ্যে মাতৃদিবস একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে মা-দের প্রতি সন্তান সন্ততিগণ কর্তৃক যথোচিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনই এই দিবসের উদ্দেশ্য। এই দিবসটির প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯০৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার মিস্ অ্যানা এম্ জার্ভিসের উদ্যোগে। বর্তমানে প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে এই দিবসই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রতিপালিত হয় এবং এই দিবসে মা-দের নানা ভাবে সম্মানিত করা হয়। মাতৃদিবসের উদ্দেশ্য শুধু মা-দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, মাতৃকল্যাণও বটে। আমেরিকার এই আদর্শে বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই মাতৃকল্যাণ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। আঞ্চলিক উৎসব গুলির মধ্যে প্রধান হল নর্থ ক্যারোলিনার ফুলোৎসব। ৪৫,০০০ অধিবাসীর সহর নর্থ ক্যারোলিনার উইল্‌মিংটনে এই উৎসব কয়েকদিন ধরে চলে। অ্যাজালিয়া ও ক্যামেলিয়া ফুলের জন্য উইল্‌মিংটন সহর সারা আমেরিকায় প্রখ্যাত। অ্যাজালিয়া ফুলের সমারোহ দেখা দিলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবৎসর এই উৎসব উপলক্ষে আড়াই লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। সভা, শোভাযাত্রা, নৃত্য, গীত প্রভৃতিতে এই ছোট সহরটি কয়েকদিনের জন্য উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

আমেরিকার উল্লিখিত উৎসবগুলির বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সাক্ষাৎ আজও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব উৎসবে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা যোগ গ্রহণ করে না—এগুলি মূলত সীমাবদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। এই সব উৎসব মোটামুটি শিকার ও কৃষি কেন্দ্রিক এবং এই সব উৎসব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রেড ইণ্ডিয়ানরা এখনও সভ্যতার আদিম স্তরে পড়ে আছে। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের রেড ইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই সব উৎসব বিভিন্ন রূপে দেখা যায় প্রবন্ধের স্বল্প আয়োজনের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। নববর্ষ, শস্যকর্তন প্রভৃতি উপলক্ষে রেড ইণ্ডিয়ানরা অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মত সঙ্গীত ও নৃত্যোৎসব করে এবং সুরাপানে মত্ত হয়। তাদের এই জাতীয় উৎসব বহু ক্ষেত্রে কয়েকদিন ধরে চলে এবং এই সব উৎসব উপলক্ষে মহিষ নৃত্য, সর্পনৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সব উৎসবের সুযোগে নরনারী অবাধ মিলনের সুবিধা পায় এবং অবিবাহিত তরুণ তরুণীর বিবাহাদির সুবিধাও হয়। সামাজিক ভোজ এই সব উৎসবের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। রেড ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম থেকে অনিষ্টকারী ভূত প্রেত অপসারণ কিংবা রোগাদির অবসান কল্পেও নৃত্যগীত প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সব রেড ইণ্ডিয়ান উৎসব এত বিচিত্র এবং এরূপ বিস্তারিত ধরণে সেগুলি অনুষ্ঠিত হয় যে একটি প্রবন্ধে সেগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রেড ইণ্ডিয়ান উৎসবের উল্লেখমাত্র করে আমি আমেরিকার উৎসব সম্পর্কিত এই আলোচনা শেষ করলাম।

# আমেরিকার লোক উৎসব

লোক উৎসব আজ আমেরিকার কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন লোক উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতে ওঠে—নাচ, গান, প্রমোদ ভ্রমণ, খাওয়া দাওয়া ও হৈ হুল্লোড়ে মা তাদিয়ে দেয়।

কিন্তু আমেরিকার এই সব লোক উৎসবের অন্য একটা তাৎপর্য আছে, শুধু বাইরের আনন্দটাই এখানে শেষ কথা নয়। উৎসব উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা যে লোকনৃত্যে অংশগ্রহণ করে তা এসেছে বৃটেন, স্কান্ডিনেভিয়া, ইতালী, পোলাণ্ড, মেক্সিকো, রাশিয়া, ইজরায়েল, ফিলিপাইন ও অন্য আরও কত দেশ থেকে। লোকনৃত্যে এই সকল দেশের নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমেরিকার মাটিতে একটা সংহতরূপ লাভ করল। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব সঙ্গীতে ও নিগ্রোদের স্পিরিচুয়াল প্রভৃতি আমেরিকার নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গীতের সঙ্গে এই সব বিদেশী সঙ্গীতের মিলন হল। সৃষ্টি হল এক নবসঙ্গীতের। কাজেই নতুন সৃষ্ট এই সঙ্গীতে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যের প্রতিফলন কিছুই বিস্ময়ের নয়। এমনিভাবে বহু দেশের উৎসবের বৈশিষ্ট্য এসে মিলেছে আমেরিকার মিলন তীর্থে।

আমেরিকার ইতিহাসের গোড়ার যুগে এই সমস্ত নাচ গান আদিম অধিবাসীদের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল। এই প্রাচীন রীতির আমোদ প্রমোদ তারা ত্যাগ করে নি। তবে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্যের নাচ গান উৎসবের মধ্যে কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া এসে লাগছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বড় প্রত্যেকটি অঞ্চলভেদে হাজার হাজার লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গার্ল স্কাউটরা দলে দলে এতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কেনটাকির অ্যাপল্যাণ্ডে প্রতি বছর গানের মজলিস বসে। পাহাড়ী পরিবেশে আসর বসে। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা এসে যোগ দেয় এ আসরে। তাদের পরণে থাকে ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়ের পোষাকের অনুকরণে প্রস্তুত পোষাক। দুই এলিজাবেথের সময়ের মধ্যে কি আকাশ জমিন পার্থক্য এখানকার এই উৎসবের গান নাচ পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে তা সুপরিস্ফুট। কেনটাকির এই গানের উৎসবকে অতীতের একটি সুন্দর পৃষ্ঠা বলা যেতে পারে। পুরানো ইংলণ্ডের সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই উৎসবের মধ্যে পাওয়া যায়।

উত্তর ক্যারোলাইনার অ্যাপলিচের পাহাড়ী নাচ আর গানের উৎসবের মধ্যে অ্যাংলো স্যাক্সন যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছে।

আমেরিকার মধ্যপশ্চিমাঞ্চলে মিনেসোটার সেণ্টপল উৎসব ঐ অঞ্চলের প্রাচীনতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। ঐ অঞ্চলে বিদেশ থেকে যত লোক এসেছে তারা ঐ দিবসে নিজ নিজ জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরে, তারপর নানা লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপের বহু অঞ্চলের বহু অধিবাসী আমেরিকার ঐ এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ঐ সকল অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। সেই সকল দেশের সাংস্কৃতিক ধারাই ঐ সকল উৎসবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এমন এক সময় ছিল যখন বিদেশাগতদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন, যে দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন সে দেশের রীতিনীতি, ধরনধারণ, জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের ভুলতেই হবে। সাম্প্রতিককালে কিন্তু সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, নূতন দেশে তাদের সঙ্গে তাঁরা যে সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে এসেছেন এতো তারই অঙ্গ। এখন লোকসঙ্গীত ও ঘোড়ার নৃত্যের যে সকল সংস্থা আছে তারা ঐ সকল

বিদেশাগত ব্যক্তিবৃন্দের সম্মান দক্ষতিদের, তাদের পিতৃপিতামহের দেশের লোকসঙ্গীত ও নৃত্যানুশীলনের জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। বড়দিন, ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস, নববর্ষ এবং মার্ডাগ্রাস প্রভৃতি উৎসবকে নূতন নৃত্যধারায় অভিষিক্ত করার জন্য ঐ সকল উৎসবে আনন্দ সঞ্চারের জন্য তারা তাদের আহ্বান করে থাকেন। তাই এখন সারাবছরই ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো, সেণ্টলুই, লসএঞ্জেলস প্রভৃতি সহরের সকল উৎসব ও অনুষ্ঠানে পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরীয় এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের ঘোড়ায় নাচ ও গানে মুখরিত হয়ে উঠে: পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরাই এই সকল স্থানে একরা বসতি স্থাপন করেছিলেন।

উৎসব মুখরিত রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ রাজ্যে সারাবছর ধরেই বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউরোপ ছাড়া এশিয়ারও বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত ও নৃত্যকেও এই সকল অনুষ্ঠানের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লোক উৎসবের দিক থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে নিউ মেক্সিকো। এখানকার উৎসবে দেখা যায় রেড ইণ্ডিয়ান জাতির জমকালো নাচ আর শোনা যায় তাদের সঙ্গীত। আমেরিকার বেশীর ভাগ রাজ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল রেড ইণ্ডিয়ান এবং প্রাচীন স্পেনীয় জাতির ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট। এখানকার প্রথমযুগের দিনগুলি ছিল বর্ণাঢ্য ও রোমাঞ্চকর এবং সমাজজীবন ছিল আনন্দোৎফুল্ল।

আমেরিকার লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, নানাদেশের লোকসাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য ধারায়ই গড়ে উঠেছে। মানুষের চিত্তবিনোদনের দিক থেকে যেমন এদের একটা বিশেষ মূল্য আছে তেমনি জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মিলন সাধনেও লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যের আছে একটা বিশেষ তাৎপর্য।

# উৎসব-রাজ শান্তিনিকেতনে

কালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ( ১৮১৭-১৯০৫ ) প্রায় ৯০ বছর পর্যন্ত বেঁচে ১৯-২০ শতাব্দীর যোগসেতু হয়েছিলেন। তাঁর মনীষী পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১ ) ৮০ বছরের জীবনে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন জগতের পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন এই দুই মহাপুরুষের জীবন ও সাধনা দীপ্ত হয়ে উঠেছে শান্তি-নিকেতনকে কেন্দ্র করে। অথচ বীরভূম জেলার এই বিরাট প্রান্তরের কোলে স্নিগ্ধ পল্লীটি "পল্লীসমাজে" কীভাবে পরিণত হয়েছিল তার আভাস পাই শান্তিনিকেতনের স্বর্গীয় নানা পূজা-পার্বণ ও পল্লী-উৎসবে। সংক্ষেপে তার বর্ণনা করব।

গ্রীষ্মকালে ২৪শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সেবার ১৯১ সালে ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে। তখন বোলপুর গ্রাম নয়; ষ্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল পথ হেঁটে আমরা কলকাতা থেকে বহু নরনারী ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে কবি জন্মোৎসবে গিয়েছিলাম। প্রায় ৫০ মাইল দূর লাইন ধরে প্রথম বর্দ্ধমানে থামা ও সেখানে বিখ্যাত সীতাভোগ ও চা-খেয়ে বীরভূম জেলার গ্রাম "ভেঁইথা" পার হয়ে বোলপুর ষ্টেশনে নামা গেল। আশ্রমের ছেলেরা হাসিমুখে আমাদের জিনিষপত্র নামিয়ে মেয়েদের জন্য গোরুর গাড়ী ও আমাদের জন্য পদযাত্রা ব্যবস্থা করল ও হাতীর সঙ্গে "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটীর পথ" গানটি গেয়ে আমাদের পথ-দেখিয়ে চলল। সহরে মানুষদের গ্রামে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করল। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪০-১৯০৬ ) থাকতেন নীচুবাংলায়। তাঁর সেবা করতেন তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর তিনি ৯০ বছর পার করে আজও বেঁচে আছেন। এঁদের প্রণাম করে মঞ্চে এলাম সঙ্গে ছিলেন সপরিবারে মনীষী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও সাহচর্য্যে 'প্রবাসী' পত্রিকা ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করে যেন নবযুগের সূচনা করলেন; তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে ( ১৮৩৮-১৮৯৪ ) স্মরণ করে নব-পর্য্যায়ে "বঙ্গ দর্শনের" সম্পাদকত্ব নিলেন। সেই পত্রিকায় 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস শেষ করে বিরাট গল্প উপন্যাস "গোরা" প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে জাতিকে একটি বড় বৈপ্লবিক প্রেরণা দিলেন। আমরা সেই যুগের ছাত্র-ছাত্রী কবি আশ্রমে সেদিন ছিলাম ভাবতে আজ গর্ব্ব অনুভব করি। উদার প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত ও আকাশে রঙের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বৈদিকযুগের ঋষিদের মতন রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ও ছাত্রদের পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছেন, পণ্ডিত-প্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী ও তাঁর সতীর্থ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বেদভাষা সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, উপনিষদ পাঠ হচ্ছে ও সেই সমাবেশে কবির দীর্ঘ জীবন ও সার্থকতা কামনা করা হল, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম বালকদের সম্মিলিত কণ্ঠে "ব্রহ্মসঙ্গীত" গান শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। এই সন্ধ্যায় আবার তাদের খোলাপাতার ছাওয়া নাট্য-ঘরে রাতে সম্বরচিত নব নাটক 'রাজা'র অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে। ছাত্ররা বেশীর ভাগ খালিপায়ে ছুটাছুটি করে, মোটাহলেও কাপড় চোপড় নেই তবু পরিচ্ছন্নতার প্রতিমূর্ত্তি এই ছাত্ররা তাদের সেবায়

ওপে "সহরে" অতিথিদের মুগ্ধ করেছিল। তারা আবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও তাঁর নাতি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষায় "রাজা" অভিনয়ে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিল। Stage সজ্জা শুধু গাছ পাতা ও ডালপালা দিয়ে : মূল নায়ক 'রাজা' অন্তরালে অপূর্ব্ব অভিনয় করছেন তাঁর কণ্ঠ যেন মন্ত্রশক্তিতে দীপ্ত—যে শুনেছে সে মুগ্ধ হয়েছে। বিদ্রোহী রাজাদের নায়করূপে হেডমাষ্টার জগদানন্দ রায় ও রানী সুদর্শনারূপে শ্রীসুধীরঞ্জন দাসকে অভিনয়ে নামতে দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের কী উৎসাহ ও আনন্দ অথচ সহরে থিয়েটার না হয়ে গ্রামের "যাত্রা" যেন রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিস্তারে সেটি দেখলাম। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে তার মধ্যে কাউগাছের তলায় সুকণ্ঠ ছাত্রদের ধরে রাজার গানগুলি আবার আমরা গাইয়েছিলাম—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে
সেইখানে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে দগ্ধ মাটির ঢেলা রে।"

শান্তি নিকেতনের সেই ছোট ব্রহ্মবিদ্যালয় আজ বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠে বাঙালী তথা সারা ভারতবাসীর গৌরব স্থান হয়ে উঠেছে তার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের "আনন্দ" মন্ত্র ও উৎসবই তার সার্থক আজিক যেটি বুঝতে নানা দেশের মানুষ ছুটে আসছে।

Russia গিয়ে দেখে এসেছি তারা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে তাদের নানা ভাষায় রবীন্দ্র নাট্যের রচনাগুলি লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে বিতরণ করছে এবং রুশ-জাতির মূল-উৎস Ballet Dancing যেটি কেন্দ্র করে সমগ্র U.S.S.R.-এর নরনারী এক সম্পূর্ণ নৃত্যকলা ও ছন্দ লাভে ধন্য হয়েছে সুদূর Siberia-র নির্জ্জন নির্ব্বাসনে কত মনীষী লেখক বন্দী করে পাঠান নিষ্ঠুর জার-তন্ত্রের যুগে, তাই শ্রেষ্ঠ রুশ নেতা Lenin (1870-1924) মাত্র অর্দ্ধশতাব্দীর জীবনেই বিশ্ববিপ্লবকে সার্থক করে শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্ত্র Soviet গড়ে গেছেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরাও সানন্দে যোগ দেব। জানাচ্ছি তাই রুশ বন্ধুরা আমাদের গল্পভারতীর উৎসব সংখ্যায় সহযোগ জানিয়েছেন বলে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। তখন রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ( ১৯৩১—৩২ ) বিশ্বের সব ভাষায় বিতরিত হবে ১৯৬০—৬১ সালে দেখে অবাক হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক রচনা মূল বাঙলা থেকে পড়ে তারা অনুবাদ করে বলেছেন যা ইংরেজী ফরাসী বা অন্য কোন ভাষাতেই সম্ভব হয়নি। শুধু তার মহাকাব্য 'বলাকা' ( ১৯১৬ ) আমি বাঙলা ভিত্তিক ফরাসী অনুবাদ করে এসেছি ( ১৯২০-২৭ ) সেটি U N. E. S. C. O. রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে তাঁরা প্রকাশ করেছেন ও আমিও ভারতবাসীর জন্য "দেবনাগরী" অক্ষরে বলাকা ও তার "ফরাসী"-অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ করেছি। তাই ১৯১১ সালের জন্মতিথি উৎসবকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। যার ভিতর দিয়ে বৈদিক আশ্রমজীবনের সঙ্গে যেন প্রাণগত যোগ আমাদের সার্থক হয়। সেটি আবার বসন্ত উৎসব নামে ও রাগরাগিনীতে মূর্ত্তি পেয়েছিল; তারপর এল আশ্রমের আর এক গৌরব "বর্ষামঙ্গলের" উৎসব।

বাঙলা তথা বাঙালীর সর্ব্বের জিনিষ বর্ষা-ঋতু এবং মেঘদূতের কবি কালিদাসের মতোরবীন্দ্রনাথও আসলে প্রধানত বর্ষার কবি এবং তাঁর এই সময়েই রচিত "অচলায়তন" নাটকটিও বর্ষাকেন্দ্রিক। তার অভিনয়ও আশ্রমে দেখে এসেছি ও পরে কলিকাতায় বহুস্থানে বর্ষামঙ্গলের গীতোৎসব দেখে ধন্য হয়েছি।

আজি বাহিরে ঝরঝর ঝরা বাদরে
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় ঠেকে ঠেকে
জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে মাঠের 'পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে ?

এইসব প্রসিদ্ধ গান রাগরাগিনী সমেত যখন আরম্ভ হবে তার সঙ্গে রুশশিল্পীরা হয়ত Uzbekistan-এতে নৌকাডুবির ( Daughter of Ganga ) মত বর্ষামঙ্গলও জগতের সুরজগতের সম্পদ হয়ে উঠবে। নৃত্যও বাদ যাবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-যোজনাও স্বদেশে নিয়ে এসেছেন। অচলায়তন অভিনয়ে শুধু ভারতীয় দলনয় ইংরেজ অধ্যাপক Pearson সাহেবও অভিনয় নেমেছেন ও নেচেছেন শান্তিনিকেতনে দেখে এসেছি। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর ( ১৯২৩ ) একটি আরোগ্যশালা Pearson Hospital গড়ে উঠেছে। বর্ষামঙ্গলের কত গান ও সুর অপূর্ব প্রেরণায় আমাদের মাতিয়েছিল ও বিখ্যাত কলাবিদ নাটোরের মহারাজা তাঁর পাকা হাতে পাখোয়াজ বাজে হৃদয়ে কাঁপিয়ে গেছেন—সব মনে পড়ে।

বর্ষার পরেই আসে শরৎকাল। ইংরেজী Autumnএর সঙ্গে মেলে না তার বিষাদভরা মূর্তি। শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের রূপের যেন বন্যা বইয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শারদোৎসব নাটো গেঁথে গেছেন—

"সোনার থালায় সাজাব আজ দুঃখের অশ্রুধার,
জননী গো পাঠিব তোমার গলায় মুক্তাহার ॥"

মীড়ে মূর্ছনায় সে সুর যে বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁরা জানেন। তাঁর সঙ্গে এসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশ পরিভ্রমণ করে দেখেছি সুরের রাজা উৎসবরাজ রবীন্দ্রনাথকে আবার নূতন করে যেন আবিষ্কার করতে হবে তবে সুরসন্ধানী অথবা তালদিং USSR সেই আবিষ্কার করবে। সেটি ভবিষ্যৎকালই অবশ্যই বলে। নৃত্যনাট্য পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ সার্থক, সুর-রসিকের মনীষা মেলিয়ে গেছেন। আজই "শেষ বর্ষণ" অভিনয় দেখতে যাবো। উৎসবের পর উৎসব দিয়ে শুরুতে শুরুতে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নূতন পথনির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে গেছেন। হয়ত "রবীন্দ্রভারতী" তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর সার্থক রূপ দেবেন।

এ বিষয় গবেষণার কত বড় ক্ষেত্র আছে তার আভাষ দিয়েছি আমার "সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে। এই ধারা অবলম্বনে কাজ সুরু হলে ভারতের নানা বিচিত্র সুর ও নৃত্যধারা-মণিপুরী থেকে ভরতনাট্যম ও কথাকলি পর্যন্ত সবদলের শিল্পীরাই বাঙালীর সঙ্গে সহযোগ করবেন ও Western music এর ধুরন্ধর দল ও Piano Violin Cello বাজনা নিয়ে বসবেন এ আশা আমরা করতে পারি Manhein এর মত World Famous শিল্পী সে কথা বলে গেছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশই আবার 'সকল দেশের সেরা' হয়ে উঠবে। সুরের সঙ্গে ভাষা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার ৭০—৮০ বছরের মধ্যে ২০০০ ছবি নিজহাতে এঁকে রেখে গেছেন। তার মধ্যেও অনেক মূল্যবান রূপায়ণের নিদর্শন ও তথ্য আমরা পাব।

তাই শুধু 'রবীন্দ্র প্রবাবলী' পাঠ নয় তাঁর সঙ্গীত ও নাট্যযোজনা তথা শিল্প ইত্যাদির তুলনামূলক চর্চা করলেই তাঁর মত বিশ্বশিল্পীর যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হবে—লেখক এই প্রসঙ্গে জানালাম। বাঙলা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাদি একাজ সুরু করতে পারেন একথা মনে করাবার জন্য "উৎসব সন্ধ্যায়" এই লেখা দিলাম ও "শিল্পের ছিটে ফোঁটা" সুরু করলাম। প্রত্যেক উৎসবেই বাঙলা ভাষা বোঝবারও সমাবেশ দেখাবার যতন দক্ষ শিল্পী,

চিত্রী ও নাট্যসঙ্গীতের শাখা গঠন করতে হবে। তাই পূর্বে মণিপুর ( বৈষ্ণব ) থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে মাদ্রাজ ও কেরলের কথাকলি পর্য্যন্ত স্থান পাবে তাই রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদে বাংলা নাট্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশও যথাযথ আমাদের দেখাতে হবে, আবার জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে ও বহির্ভবনে শুধু প্রবন্ধ চিত্র ও বহুসমবয় ( Harmony ) কেন্দ্রও গড়ে তুলতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও দায়িত্ব এক্ষেত্রে আছে সেকথা যেন আমরা না ভুলি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রাণদাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে মনে করাই তিনিই রবীন্দ্রনাথকে Universityতে টেনে Convocation address ও বরণাধকৃতামালা দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকেই জয়যুক্ত করিয়েছিলেন—তাঁদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ৫০ কোটীর স্থানে লোকসংখ্যা যখন ৫০ কোটী হয়ে উঠবে, তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়বে, যেমন ৪০০ বছর পর Strat ford গ্রামের এক ছেলে Shakespeare জন্ম উৎসবে আজ সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে ও রবীন্দ্রনাথ সেক্ষণীয়রকে কাব্যবন্দনা করে গেছেন ( 1916 )। বলাবাহুল্য অনুরোধের সময় ফ্রান্সে সেকথা জানিয়ে এসেছি। এখন বাঙালী জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য হয়ে উঠুন—জয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জয় !

শ্রীফাঁসীর [illegible] বসু মল্লিক
১২নং ৫৮ [illegible]
কলিকাতা-২৯
তাং.....

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !! সমস্যা নয় সমাধান !!!

# মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে।
এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য
ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।
বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি
ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।

মূল্য : ৪·৭৫ নয়া পয়সা

প্রকাশক : শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : ৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫—৬৮২৭

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বুলডগ মার্কা
যন্ত্রপাতি
উৎকৃষ্ট ইস্পাতে
প্রস্তুত

G.S.M. WKS. & FDRY.
BULLDOG

অধিকতর
মজবুত
ও
দীর্ঘ স্থায়ী

# গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্কস এণ্ড ফাউণ্ড্রী

২১০, হরিয়া পাকী রোড, কলিকাতা

Regd. No. C3643 CALPA-BHARATI Bengali Monthly Oct. 1964 Price Rs. 4·00 Ph

পূজোর দিনে

দিয়েও আনন্দ

পেয়েও আনন্দ

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী খাবার

দিয়েও আনন্দ

পেয়েও আনন্দ

লক্ষ্মীদাস
৮, বহুবাজার
কলিকাতা-২

Cover printed by
SARITOR ART PRESS, CALC